ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

ওঁ জটিনে দণ্ডিনে নিত্যং লম্বোদরশরীরিণে
কমণ্ডলুনিষঙ্গায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ॥

কবি-ভাগবত
স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী
শ্রীকরকমলে

ভূমিকা

যুগ-প্রয়োজনে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। যুগ-প্রয়োজনে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। যুগ-প্রয়োজনে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীবিজয়কৃষ্ণ। তিন অবতার-পুরুষ। বারদীর ব্রহ্মচারী বিজয়কৃষ্ণকে বলতেন জীবনকৃষ্ণ। বলতেন, তোদের কৃষ্ণ অচলবিগ্রহ, আমার কৃষ্ণ সচল। মেরা আশুতোষ, বলতেন ভোলানন্দ গিরি-মহারাজ। রামদাস কাঠিয়া বাবাজি বলতেন, গোঁসাইজি তো সাক্ষাৎ মহাদেব হ্যায়, প্রেমকা অবতার। ময়ূরমুকুট বাবা বলতেন, মেরা কিষণজি। আর তৈলঙ্গস্বামী বলতেন, বিজয়কৃষ্ণ সমাধির যে অবস্থায় আছেন মানবদেহে এর চেয়ে উচ্চ অবস্থা আর হতে পারে না। যে পরমানন্দ মাধব মূককে বাচাল করেন পঙ্গুকে দিয়ে গিরিলঙ্ঘন করান, তাঁর কৃপায় আমিও তিন অবতার-পুরুষের পুণ্য জীবনকাহিনী ক্রমে-ক্রমে লিখে ফেললাম। কিছুই আমার কৃতিত্ব নয়, সব তাঁর কৃপা। নামে যেমন সমস্ত ন্যূনতার পূরণ হয় তেমনি ভক্তিতে সমস্ত বিচ্যুতির মার্জনা হোক।

অচিন্ত্যকুমার

লেখকের অন্যান্য জীবনী-গ্রন্থ ঃ

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ (তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ)
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (চার খণ্ডে সম্পূর্ণ)
পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (১ম ও ২য় খণ্ড)
রত্নাকর গিরিশচন্দ্র
গরীয়সী গৌরী
উদ্যত খড়্গ (নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনী ১ম খণ্ড)

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

॥ ১ ॥

বাড়িতে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে। ব্যাপার কী?

আদালতের পেয়াদা এসেছে ক্রোকী পরোয়ানা নিয়ে।

পেয়াদা-বরকন্দাজকে তখন বিষম ভয়। কী হল্লা হাঙ্গামা শুরু করে না জানি। বাড়ির মেয়েরা যে যেখানে পারল গা ঢাকা দিল। স্বর্ণময়ী লুকোল বাড়ির পিছনে পিটুলি গাছের নিচে কচুবনের মধ্যে।

বাপের বাড়ি এসেছে স্বর্ণময়ী। বাপ গৌরীপ্রসাদ জোয়ারদার।

পরোপকারী হলে যা হয়। কোন এক দেনদার বন্ধুর জামিন হয়েছিলেন গৌরীপ্রসাদ। যথাকালে সে বন্ধু ফেরার হয়েছে। সুতরাং ধরো গৌরীপ্রসাদকে। ক্রোক করো তার অস্থাবর।

ক্রোকের হাঙ্গামা মিটতে-মিটতে সন্ধে।

শ্রাবণের ঝুলন পূর্ণিমার সন্ধে। দিকে-দিকে কৃষ্ণনামসুধার ঢেউ।

পেয়াদারা বিদায় হলে খোঁজ পড়ল মেয়েদের। সবাই ফিরল কিন্তু স্বর্ণময়ী কোথায়? বাপ গৌরীপ্রসাদ অস্থির হয়ে উঠলেন। মেয়ে যে অন্তর্বত্নী। আসন্নপ্রসবা।

খুঁজতে খুঁজতে স্বর্ণময়ীকে পাওয়া গেল কচুবনে। কিন্তু এ কী অঘটন! সে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে আর তার কোলে সদ্যোজাত শিশু। পবিত্রের পবিত্র, মঙ্গলের মঙ্গল, ভুবন-সুন্দর-আনন্দকর।

এই শিশুই বিজয়কৃষ্ণ।

কৃষ্ণের জন্ম কারাগারে। বুদ্ধের জন্ম বৃক্ষতলে। যীশুর গোয়াল ঘরে। রামকৃষ্ণের ঢেঁকিশালে। নিমাইয়ের নিমতলায়। আর বিজয়কৃষ্ণের কচুবনে।

'যা বাড়ি যা, আমি তোর ঘরে তোর পুত্র হয়ে জন্মাব।' বিজয়ের বাপ আনন্দকিশোর গোস্বামী পুরী গিয়েছেন, মধ্যরাত্রে জগন্নাথকে স্বপ্ন দেখলেন।

কী অমানুষিক ক্লেশ করে গিয়েছিলেন পুরী। নিত্যপূজার শাল-গ্রামচক্র গলায় বেঁধে দণ্ডী কাটতে কাটতে গিয়েছিলেন চারশো মাইল—শান্তিপুর থেকে শ্রীক্ষেত্র। যেতে লেগেছিল দেড় বছর। নদী পার হবার সময় নৌকোতেও দণ্ডী দেবার কামাই ছিল না। বুকে ও হাঁটুতে ঘা হয়ে গেল, ঘায়ে জড়িয়ে নিলেন চট, তবু নিরস্ত, হলেন না সাষ্টাঙ্গ থেকে। শ্রীধামে ফিরে মনস্থ করলেন, আর ফিরবেন না। পেয়ে গেছি পুরুষোত্তমকে।

তখন স্বপ্ন দেখলেন। জগন্নাথ বললে, 'যা, পুরুষোত্তম তোর পুত্র-রূপে তোর ঘরে আবির্ভূত হবে।'

'পুরুষোত্তম তো তুমি।'

'হ্যাঁ, আমিই তোর পুত্ররূপে জন্মাব। গত জন্মে যে কাজটুকু বাকি ছিল তাই সম্পন্ন করব এবার।'

দু-দু'বার বিয়ে করেছিলেন আনন্দকিশোর। দু' স্ত্রীই নিঃসন্তান।

বড় ভাই গোপীমাধব মৃত্যুকালে পাশে ডাকলেন আনন্দকে। বললেন,— 'যাবার সময় একটা কথা বলে যাই তোকে। আমার এই অন্তিম অনুরোধ তোকে রাখতেই হবে।'

'বলুন।'

'দেখছিস আমার স্ত্রীর ছেলেপিলে নেই। তোর ছোট ছেলেটি তাকে দত্তক দিবি।'

'সে কী!' আকাশ থেকে পড়লেন আনন্দকিশোর : 'আমিও তো নিঃসন্তান। তা ছাড়া আমি আবার বিপত্নীক। আমার আবার দত্তক দেওয়া কিসের?'

গোপীমাধব চঞ্চল হলেন না। বললেন,—'আমি দিব্যচক্ষে দেখছি তুমি তৃতীয়বার বিয়ে করেছ আর তোমার দুটি ছেলে হয়েছে। আমি অপুত্রক— তোমার ছোট ছেলেটি আমার স্ত্রীকে দিয়ে দিও।'

মনে মনে হাসলেন আনন্দকিশোর। বিয়ের নামে দেখা নেই, তায় পোষ্যপুত্র।

কিন্তু এ কী স্বপ্ন দেখালেন জগন্নাথ!

আর এমন আশ্চর্য, পঞ্চাশ বছর বয়স আনন্দকিশোরের, তৃতীয়বার বিয়ে করলেন! বিয়ে করলেন নদীয়া জেলার শিকারপুরের কাছে দহকুল গ্রামের গৌরী জোয়ারদারের মেয়ে স্বর্ণময়ীকে।

স্বর্ণময়ীও তেমনি মেয়ে। আসলে জীবন্মুক্ত অবস্থা, লোকে বলে পাগলিনী।

এক মুসলমান ফকিরের বরে তার জন্ম। বাপ-মা ফকিরকে বলেছিল, দ্বিতীয় সন্তান জন্মালে তোমাকে দিয়ে দেব। দ্বিতীয় সন্তান জন্মালে প্রতিশ্রুতি পালন করল না। ফকির শাপ দিল : দেখিস, তোদের প্রথম সন্তান থাকবে না স্ববশে।

পাগল কোথায়! ও তো করুণার মন্দাকিনী।

শান্তিপুরে কোত্থেকে এক পাগলি এসে জুটেছে। দুরন্তেরা তার পিছু নিয়েছে, ছুঁড়ছে ধুলোবালি। অসহায় পাগলির মুখে শুধু একটা করুণ কান্নার শব্দ।

কী হয়েছে রে তোর? স্বর্ণময়ী তাকে হাত ধরে নিয়ে এলেন ঘরে।

'আমি পুত্রশোকে উন্মাদ।'

'পুত্র কি তোমার যে তুমি শোক করছ? যাঁর জিনিস তিনি নিয়ে গিয়েছেন। তোমাকে দুদিন দিয়েছিলেন নাড়তে চাড়তে, সেবা করতে। নেড়েছ

চেড়েছ, সেবা করেছ। বাস, ফুরিয়ে গিয়েছে। পরের জিনিসে শোক কিসের? কৃষ্ণজীকে ডাকো, তিনিই তোমাকে শান্ত করবেন, স্নিগ্ধ করবেন বুঝিয়ে দেবেন আগাগোড়া।'

হাত-ভরতি তেল নিয়ে পাগলির মাথায় মাখিয়ে দিলেন স্বর্ণময়ী। ঘড়ায়-ঘড়ায় জল ঢেলে স্নান করিয়ে দিলেন। পাগলির পাগলামি সেরে গেল বোধ হয়। বললে,—'মা, তুমি আমাকে জুড়িয়ে দিলে। এমনটি আর কোথাও দেখি নি। সবাই আমাকে পাগল বলে, ক্ষেপায়, দূর হ' বলে ঢিল ছোঁড়ে, জ্বালার উপর জ্বালা দেয়। কেবল তুমিই আমাকে স্নিগ্ধ করলে। তুমি কে মা?'

এক কুলত্যাগিনীকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিলেন। পতিতা বলে ঘৃণা করলেন না। শুধু আশ্রয় নয়, সমস্ত গৃহকর্মের ভার চাপিয়ে দিলেন তার উপর। আরো বড় কথা, দীক্ষা দিলেন কৃষ্ণমন্ত্রে। প্রত্যহ ভোরে উঠে গঙ্গাস্নান করে সেই মেয়ে, স্নানান্তে ইষ্টমন্ত্র জপ করে, তারপর সংসারের কাজে লাগে। সংসারের কাজে তার অন্তহীন স্ফূর্তি। চিন্তাহীন উৎসাহ।

কোথায় পড়ে থাকতাম পঙ্ককুণ্ডে, তুলে নিয়ে এসে লাবণ্য-উচ্ছ্বল বিকচ পদ্মে পরিণত করলেন। করুণার এমনি কত শত বৃষ্টি বিন্দু।

কালীঘাটে যাচ্ছেন। দেখলেন পথের ধারে খোলার ঘরের সামনে অল্প বয়সের একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুরন্ত শীত, তবু ফাঁকা ছেড়ে ঘরে যাচ্ছে না। মেয়েটি কে বুঝতে দেরি হল না স্বর্ণময়ীর। ফিরিয়ে নিলেন চোখ। কিন্তু মন্দির থেকে ফেরবার সময় দেখলেন তখনো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে সেই বারাঙ্গনা। শীতে কাঁপছে নিরালায়।

স্বর্ণময়ী এগোলেন তার কাছে। সঙ্গে যা টাকা-পয়সা ছিল সব সেই মেয়েটির হাতে ঢেলে দিলেন। বললেন, 'বাছা, আর শীতে দাঁড়িয়ে থেকো না, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো।'

স্টেশনে এসে শান্তিপুরের টিকিট কিনতে গিয়ে দেখেন, সব পয়সা দিয়ে এসেছেন সেই বারাঙ্গনাকে।

সংসারের যা বরাদ্দ তার চেয়েও বেশি রান্না করেন স্বর্ণময়ী। গরিব দুঃখী স্ত্রীলোক যারা শান্তিপুরের বাজারে শাক-সবজি বেচতে আসে, তাদের বাড়িতে ধরে ধরে এনে খাওয়ান। বলেন, 'যে একলা নিজের জন্যে রান্না করে সে তো শেয়াল কুকুরের মতো। পাঁচজনের কম রান্না করা উচিত নয় কখনো।'

আর খাওয়ান কৃপণদের। বলেন, 'ওদের মতো দুঃখী বুঝি আর কেউ নেই। নিজেদের থেকেও ওরা উপোস করে থাকে।'

আর আনন্দকিশোর? তাঁকে সসম্ভ্রমে সকলে ঋষি-গোস্বামী বলে। ভোগ রান্নার কাঠও গঙ্গাজলে ধুয়ে নেন। নিষ্ঠার আধিক্যের জন্যে কেউ কেউ বা বলে লকড়ি-ধোয়া বা খড়ি-ধোয়া গোঁসাই। গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর,

তারই সেবা-পুজো ও বৈষ্ণবসেবাই তাঁর নিত্য কর্ম। আর, শুনে যাও দেখে যাও, তাঁর ভাগবতপাঠ।

যখন ভাগবত পড়েন তখন চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যায়, পুঁথির পাতা ভিজে ওঠে। শুধু তাই? রোমকূপ থেকে রক্ত ফেটে পড়ে, গায়ের জামা লাল হয়ে যায়। ভাবাবেশে হুংকার দিয়ে ওঠেন : রাধাশ্যাম, রাধাপ্যারী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! সে হুংকারে শ্রোতাদেরও রোমাঞ্চ জাগে। আত্মসংবরণ অসাধ্য হয়। কান্নায় লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

একবার দোলের দিন এক শিষ্যের দেওয়া আবির ভাগবতের উপর ছড়িয়ে দেন আনন্দকিশোর। শিষ্য ক্ষুণ্ণ হয়, কেন বিগ্রহকে না দিয়ে ভাগবতকে দেওয়া! আনন্দকিশোর শিষ্যকে বিগ্রহের কাছে নিয়ে গেলেন ডেকে। দেখ দেখ বিগ্রহের গায়েও আবির মাখানো। এ কী, কে আবির দিল বিগ্রহকে? কেউ দেয় নি। ওই ভাগবতের আবিরেই বিগ্রহ রঙিন হয়ে গিয়েছে।

আনন্দকিশোরের প্রথম পুত্র ব্রজগোপাল। যত দিব্য ঘটনার সূত্রপাত দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের প্রাক্কালে।

রাসপূর্ণিমার দিন শ্যামসুন্দরকে দর্শন করে ঘরে যাচ্ছেন স্বর্ণময়ী, বিগ্রহ থেকে এক জ্যোতির্ময় শিশু বেরিয়ে এসে তাঁর আঁচল চেপে ধরলো। চলল সঙ্গে সঙ্গে।

স্বর্ণময়ী চমকে উঠল। কে? কে তুমি?

কই, কেউ নেই তো।

কিন্তু রাতে স্বপ্ন দেখলেন স্বর্ণময়ী। সেই জ্যোতির্ময় শিশু তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। অমনি ধরেছে আঁচল চেপে। বলছে, মা, তোমার কাছে এলাম।

তখন থেকে কত কী দেখছেন। সোনার রোদ গাছের পাতায় ঝিকমিক করছে, মনে হচ্ছে যেন রাধাকৃষ্ণ নাচছে। শুয়ে আছেন, দেখছেন গর্ভের সন্তান বাইরে বেরিয়ে এসে শুয়ে আছে মাথা ঘেঁষে। আলো হয়ে গেছে ঘরদোর। গৃহকাজে হাঁটছেন চলছেন, কে যেন নূপুর পরে ফিরছে পায়ে-পায়ে। সুগন্ধে আমোদ হয়ে গিয়েছে দশ দিক।

স্বামী ছাড়া আর কাকে বলবেন এসব অনুভূতির কথা। আনন্দকিশোর বলছেন,—'পুরীর স্বপ্ন কখনো মিথ্যে হবার নয়।'

কচুবন থেকে শিশুকে ঘরে নিয়ে আসা হল। ডাকা হল কবরেজ। দেখুন দেখি, শিশু এমন নিঝঝুম হয়ে রয়েছে কেন?

কবরেজ দু'রকম ওষুধ দিল। একটা খাবার, আরেকটা মালিশের। প্রথমটাতে মুসব্বর, দ্বিতীয়টাতে আফিং।

স্বর্ণময়ী ভুল করে আফিং খাইয়ে দিলেন শিশুকে।।

সর্বনাশ করেছিস। নিজের হাতে বিষ দিয়েছিস মা হয়ে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, বিষেই উল্টো ফল হল। জ্ঞান হল শিশুর।

শান্তিপুরে খবর গেল। গোপীমাধবের স্ত্রী কৃষ্ণমণির আনন্দ আর ধরে না। দত্তক পাবেন এই শিশুকে।

ছ মাস পরে স্বর্ণময়ী ফিরলেন শান্তিপুরে। পতিগৃহে। কত বড় মর্যাদাসম্পন্ন সে ঘর! অদ্বৈত আচার্যের বংশ। যার আর্তিতে-হুঙ্কারে মহাপ্রভুর আবির্ভাব। সেই মহাপ্রভুই আবার এলেন নদীয়ায়, ঝুলন পূর্ণিমার সন্ধ্যায়, বহিরঙ্গনে বৃক্ষতলে। আর যখন অষ্টম মাসে শিশুর অন্নপ্রাশন হল, শিশু আগের মতোই, সোনা রূপা মাটি না ধরে ধরল ভাগবত। ধরল মঙ্গলময় হরিকথা।

কিন্তু নাম উঠল কী রাশিচক্রে? দুই নাম উঠল। দুইই অসামান্য। এক নাম দিগ্বিজয়, আরেক নাম বিজয়কৃষ্ণ। শুধু দিক-দেশ বিজয় নয়, সর্বাংশে সর্বজনমন জয় করবে বলেই বিজয়কৃষ্ণ নির্ধারিত হল।

শিশুর গায়ে গয়না উঠেছে। আয় খোকা, পাখি ধরে দেব, বলে চোর তাকে কোলে তুলে নিয়েছে। এগিয়ে চলেছে নিরালার সন্ধানে। কিন্তু এ কী, চোরের দিকভ্রম হল নাকি? কোথায় নির্জনে যাবে, তা নয়, ঘুরতে ঘুরতে আনন্দকিশোরের দোরগোড়াতেই এসে হাজির হল।

'বাবা!' আনন্দকিশোরকে দেখে লাফিয়ে পড়ল ছেলে। বাপের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হাত মেলে।

চোর কিছুতেই তাকে পারল না ধরে রাখতে। বেগতিক দেখে নিজেই চম্পট দিল।

শ্যামসুন্দর, আমার বিজয়কে দেখো, আতান্তরে ফেলো না।

কিন্তু বিজয়ের যখন প্রায় চার বছর বয়েস, আনন্দকিশোর চোখ বুজলেন। জমিদার শিষ্য মুকুন্দ চৌধুরির বাড়িতে ভাগবত পড়তে পড়তে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

'কালো কুচকুচে, লাল টুকটুকে, শাদা ধবধবে, আবার হলুদে মেশানো—তুই কে রে?' এক পাগল বারে বারেই ছুটে আসে বিজয়ের কাছে, আর ওই বলে হাঁক পাড়ে। পাগলের নাম শ্যামা ক্ষেপা। সকলে বলে, সর্বজ্ঞ।

তার মানে তুমিই কি সেই ভাগবতবর্ণিত কৃষ্ণ? 'শুক্লো রক্ত স্তথা পীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ?' তুমিই কি সেই তমালশ্যামল কৃষ্ণ, পরমসুখকন্দ গোবিন্দ? আর্তত্রাণ-পরায়ণ জগন্নাথ?

স্বামী গত হবার পর স্বর্ণময়ী ছেলেদের নিয়ে ফাঁপরে পড়লেন। নিজেই যেতে লাগলেন স্বামীর শিষ্যদের বাড়িতে। ওখান থেকে যা আদায় হয় তা দিয়েই সংসারনির্বাহ। কায়ক্লেশে দিন কাটানো। আবার কখনো যান পিত্রালয়ে, শিকারপুরে।

একবার ছেলেদের নিয়ে শিকারপুর থেকে আসছেন শান্তিপুরে। দেখলেন নদীর খানিকটা শুকিয়ে গিয়েছে। শান্তিপুর আর দূরে নয়, দু' তিন ঘন্টার পথ। কিন্তু হঠাৎ এ কী দুস্তর বাধা! ঘুরে যেতে হলে তিন দিনের

ধাক্কা। এখন কী করেন, কে আছে—তাঁদের পার করে দেবে, কোথায় তুমি অচল-চালক!

কে এক বিরাট পুরুষ হঠাৎ আবির্ভূত হল সেখানে। শুকনো ডাঙার উপর দিয়েই নৌকো টেনে নিয়ে চলল সবলে। জলে এনে ছেড়ে দিল, ভাসিয়ে দিয়ে গেল।

তারপর কোথায় মিলিয়ে গেল কেউ দেখল না।

সর্বক্ষণ ভয়ে কাঁপছে বিজয়। কে এই অপ্রমেয় মহাবাহু। কে এই বহুমঙ্গল লোকবন্ধু!

শিকারপুরে দিঘির জলে পড়ে গিয়েছে বিজয়। অতলতল দিঘি, কেউ সন্ধান পাচ্ছে না শিশুর। গৌরীপ্রসাদ জাল ফেলেছেন। পারে দাঁড়িয়ে হাহাকার করছেন স্বর্ণময়ী। শুধু স্বর্ণময়ী নয়, গাঁয়ের কত শত লোকজন।

ও মা, ছেলে দেখি ওপারে চলে গিয়েছে। কে একজন শিশুর লম্বা চুল ধরে টেনে তুলে দিয়েছে ওপারে। সেই বুঝি জলের মধ্যে এতক্ষণ শিশুকে বুকে করে ছিল। কী আশ্চর্য, এক ফোঁটা জল খায় নি বিজয়।

মাথার চুলে সুন্দর জটা হয়েছিল বিজয়ের। আদর করে সবাই ডাকে জটে গোঁসাই।

'তেঁতুল ঝোলা দেখাও তো জটে গোঁসাই।'

বললেই হল, শিশু আনন্দে অমনি মাথা ঝাঁকাতে শুরু করে। ঝটপট শব্দ হয় জটায়, তা দেখে সবাই হেসে কুটিকুটি।

মায়ের স্নেহে ভরপুর থাকলে কী হবে, বাবাকে প্রায়ই মনে পড়ে শিশুর। ছাদে কখন একা-একা চলে এসেছে বিজয়। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। চেয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছে অতর্কিতে।

এই দেখ, ছাদে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। কী ভীষণ ছেলে! ভয় ডর কিছু নেই।

ডাকাডাকি করতেই চমকে উঠল বিজয়।

'কী রে, তখন অমন চমকে ছিলি কেন?' জিগগেস করলেন স্বর্ণময়ী।

'জানো মা, বাবাকে দেখলাম।'

'কাকে?' এবার স্বর্ণময়ী চমকালেন।

'বাবা এসে আমার হাত ধরলেন, বললেন ওঠ। বলে তাঁর কোলে বসিয়ে নিয়ে গেলেন চাঁদের দেশে। কত সেখানে নদী, কত পাহাড়, কত ফুল বাগান—'

'কিছু বললেন?'

'বললেন, আমার ঘরে একজন খুব বড় সাধু হবে। তুই হবি সেই সাধু।' হাসতে লাগল বিজয়।

'তুই কী বললি?'

'বললাম, হব। আমিই তো হব।' একটু বুঝি উদাস হল শিশু :

'বললাম, আর অমনি বাবা খুশি হয়ে ফিরে গেলেন। জেগে দেখি চাঁদে নয়, ছাদে শুয়ে আছি।'

ছেলে এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে—এবার তবে পোষ্য দাও। দাবি করলেন কৃষ্ণমণি।

আর ফেরানো যায় না, যায় না ঠেকানো।

বিধিমতো লেখাপড়া করলেন কৃষ্ণমণি। করলেন শাস্ত্রমতো যাগযজ্ঞ। গণ্যমান্যদের সাক্ষী রাখলেন দলিলে। বিজয়কৃষ্ণ দত্তক হয়ে গেল।

কিন্তু কৃষ্ণমণিকে কিছুতেই মা বলবে না বিজয়। আমার নিজের মা থাকতে কেন আরেক জনকে মা বলতে যাব?

কৃষ্ণমণি তাকে নিজের ঘরে বন্দী করে রাখতে চান, নিজের স্নেহাঞ্চলে। বিজয় মানবে না সে বন্ধন, গোঁ ধরে থাকবে। আমি আমার মায়ের ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে যাব কেন? আমার মায়ের ঘরে কি আদর নেই? তাঁর পাশটিতে কি জায়গা নেই আমার বিছানার? কত বড় মা আমার।

গয়ার পাহাড়ে পাথরে পা ঠুকে ব্যথা পেয়েছে বিজয়কৃষ্ণ। মা গো—বলে আর্তনাদ করে উঠেছে। দুঃখে-দৈন্যে আঘাতে-ব্যাঘাতে মা নাম ছাড়া আর কী আছে সংসারে?

বাড়ি ফিরে এলে স্বর্ণময়ী বললেন, 'হ্যাঁ রে, পায়ে পাথরের ঠোক্কর খেয়ে ব্যথা পেয়েছিলি?'

'তুমি কেমন করে জানলে?'

'হঠাৎ সেদিন, ঘরে বসে আছি, আমার পায়ে একটা পাথরের চোট লাগল। আমি ভাবলুম, সে কী, ঘরে বসে আছি, পাথর এলো কোত্থেকে?'

'কিন্তু সে যে আমাকে লাগা পাথর, তা তুমি বুঝলে কী করে?' প্রশ্নে ব্যাকুল হল বিজয়।

'তোর ডাক যে আমার কানে বাজল, মনে হল, তুই নিশ্চয় কষ্ট পেয়েছিস।'

॥ ২ ॥

কুলদেবতা শ্যামসুন্দর।

ভোর বেলা, ঘুম থেকে উঠে স্বর্ণময়ী দেখলেন, বিজয় ঘরে নেই। কোথায় গেল দুরন্ত ছেলে! ও মা, শ্যামসুন্দরের মন্দিরের বন্ধ দরজায় ধাক্কা মারছে।

দ্রুত পায়ে ছুটে গেলেন স্বর্ণময়ী। 'ও কী, মন্দিরের দোর ঠেলছিস কেন?'

'আমার বল খুঁজে পাচ্ছি না।'

'বল খুঁজে পাচ্ছিস না তো ওখানে কী!'

'এই শ্যামসুন্দরই আমার বল নিয়ে পালিয়ে এসেছে।'

'সে কী অসম্ভব কথা!' স্বর্ণময়ী অবাক মানলেন।

'বা, শ্যামসুন্দর যে খেলছিল আমার সঙ্গে।' বিজয় সরল মুখে বললে, 'খেলতে খেলতে পালিয়ে এসেছে।'

'তা পুজুরী আসুক। পুজুরী এসে দরজা খুলুক। তখন দেখা যাবে।'

কখন পুজুরী আসবে কে জানে। গায়ের জোরে দরজা যখন খুলতে পারছে না, তখন বিজয় কাকুতি-মিনতি করছে। 'দাও না আমার বল। কেন বসে আছ দোর এ'টে? বাইরে বেরিয়ে এসো না। খেলার মাঝখানে পালিয়ে গিয়ে কেউ লুকোয় ঘরের মধ্যে?'

কে শোনে কার কথা!

তখন বিজয় এক লাঠি কুড়িয়ে আনল। দাঁড়াও, কতক্ষণ বন্ধ হয়ে থাকবে? পুজুরী এসে দরজা খুললেই দেখে নেব তোমাকে। কে তখন তোমাকে বাঁচায় দেখা যাবে।

দরজা খোলা হল যথাসময়ে। কিন্তু হায়, বিজয়কে ঢুকতে দেওয়া হল না। তার যে এখনো পৈতে হয় নি!

সারা দিন উপোস করে রইল বিজয়। স্বর্ণময়ী এসে কত সাধ্যসাধনা করলেন, নরম হল না এতটুকু। শ্যামসুন্দরের উপর প্রতিশোধ না নিয়ে অন্নজল গ্রহণ করবে না কিছুতেই।

ঘরে ভাত রেখে শুয়ে পড়লেন স্বর্ণময়ী। খিদের কাছেও যে হার মানে না, সে কেমনতরো ছেলে।

মাঝ রাতে স্বর্ণময়ীর ঘুম ভেঙে গেল। বিজয় যেন কথা কইছে কার সঙ্গে!

'যাক, ঘাট মানলে তাই ছেড়ে দিলাম। নইলে দেখাতাম একবার মজা!'

তারপর আবার অন্যরকম সুর ধরল।

'আমি না হয় তোমার উপর রাগ করে খাই নি। কিন্তু তুমি খেলে না কেন? তোমার কী হয়েছিল? বেশ বেশ, এসো দু'জনে একসঙ্গে খাই।' ঢাকা তুলে খেতে লাগল বিজয়। যেন তার সঙ্গে আরো একজন কে খাচ্ছে তৃপ্তি করে।

সকালে উঠে পুজুরীর কাছে খোঁজ নিল স্বর্ণময়ী। পুজুরী বললে, 'আমি কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি শ্যামসুন্দর বলছেন তাঁর মাধ্যাহ্নিক ভোগ হয় নি।'

সে কী কথা! বিজয়কে ডেকে জিগগেস করলেন, 'কাল রাতে ঘরে কার সঙ্গে বসে কথা কইছিলি?'

বিজয় আকাশ থেকে পড়ল : 'কই কিছু জানি না তো!'

বিজয়কৃষ্ণ তখন ব্রাহ্মসমাজে। একদিন শ্যামসুন্দর তাকে বললেন, 'আমি সোনার চূড়ো পরব। আমাকে একটা গড়িয়ে দে না।'

বিজয় বললে, 'আমি তোমাকে মানি না। যারা মানে তাদের বলো গে। আমার টাকা-পয়সা নেই।'

'তোর নেই, তোর খুড়ির আছে,' বললেন শ্যামসুন্দর। 'দ্যাখ গে তোর খুড়ির ঝাঁপির মধ্যে অনেক টাকা। খুড়িকে বলে চেয়ে নে গে।'

খুড়িমাকে বললে গিয়ে বিজয়।

'কী আশ্চর্য!' খুড়িমা অভিভূতের মতো বললেন, 'কাল যে আমাকেও স্বপন দিয়েছেন শ্যামসুন্দর। বললেন, ওগো সোনার চূড়ো পরব। আমি বললুম, টাকা কোথায় পাব! শ্যামসুন্দর বললেন, দ্যাখ না ঝাঁপি খুলে, চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা কোন না পাবি! লুকিয়ে-চুরিয়ে সাতষট্টি টাকা জমিয়ে ছিলাম ঝাঁপিতে, কেউ জানে না, কিন্তু শ্যামসুন্দর ঠিক দেখে রেখেছেন। সাধ্য নেই তাঁর চোখে ধুলো দি।'

বিজয়ের হাতে টাকা দিল খুড়িমা। সেই টাকায় ঢাকা থেকে গড়ানো হল সোনার চূড়ো।

সেই চূড়ো পরানো হল শ্যামসুন্দরকে।

সন্ধ্যের আগে ছাদে গিয়েছে বিজয়, শ্যামসুন্দর ঘর থেকে উঁকি মারল উপরে। বললে, 'ওরে একবার দেখে যা না, চূড়ো পরে আমাকে কেমন দেখতে হয়েছে।'

'আমি আর কী দেখব।' স্নেহকটাক্ষ ফিরিয়ে দিল বিজয় : 'আমি তো আর তোমাকে মানি না। যারা তোমাকে মানে তাদের ডেকে আনো গে।'

শ্যামসুন্দর হাসল মৃদু মৃদু। বললে, 'নাই বা মানলি, তাতে একবার দেখতে দোষ কী।'

সত্যিই তো, দেখতে বাধা কিসের! একটা পাথরের মূর্তির মাথায় মুকুট পরানো হয়েছে, এইটুকুই তো দেখা। দেখি না কেমন গড়িয়ে এনেছে সোনার চূড়ো।

শ্যামসুন্দরের কাছে এসে দাঁড়াল বিজয়কৃষ্ণ। এ কী, চোখ যে আর ফিরিয়ে নিতে পারছে না। পদ্মপত্রবিশালাক্ষ কী অপার স্নেহে তাকিয়ে আছেন! সমস্ত ঘর নয়, সমস্ত ভুবন যেন দাঁড়িয়েছেন আলো করে।

'কি রে, মানিস না, তবে অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন?' হাসল শ্যামসুন্দর। 'চোখের দেখা তো কখন হয়ে গিয়েছে। এবার যা না ফিরে!'

কোথায় ফিরে যাবে? পা ওঠে না বিজয়ের, নিষ্পলক দেখছে শ্যামসুন্দরকে।

শান্তিপুরের এক প্রান্তে শ্যামচাঁদের মন্দির। সেখানে নানা সাধু-সন্ন্যাসীর ভিড়। সেখানে কখন একা-একা চলে আসে জটে-গোঁসাই, সকলের আদরের জিনিসটি হয়ে বসে থাকে। এ যেন আগন্তুক কোনো শিশু নয়,

সকলের মনে হয়, যেন কোন অন্তরঙ্গ আত্মীয়। কোথায় বাড়ি-ঘর কে জানে, মন তবু চায় না ছেড়ে দিতে।

সেদিন সন্ধ্যেও যায় যায়, বিজয়ের দেখা নেই। স্বর্ণময়ী ঘর-বার করতে লাগলেন। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হল, রাত মাঝরাত। কোথায় বিজয়! ঘরে-বাইরে হাহাকার পড়ে গেল। বিজয়কে পাওয়া যাচ্ছে না।

পরদিন সকালে খবর পাওয়া গেল, ঠিক জায়গাতেই আছে—শ্যামচাঁদের বাড়িতে, নিরাপদ পরিবেশে—সাধুসঙ্গে। সাধুরা তাকে আদর করে খাইয়েছে, হরিনাম শুনিয়েছে, বিছানা করে ঘুম পাড়িয়েছে। এমন স্বাদুসঙ্গ থেকে পারে নি বিচ্ছিন্ন থাকতে।

ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেকে ছিনিয়ে নিলেন স্বর্ণময়ী।

মা কেমন সুন্দর রাঁধেন শ্যামসুন্দরের জন্যে। কেমন সুন্দর ভোগ সাজান, পরিবেশন করেন। কিন্তু শ্যামসুন্দরের পাশে যে আছেন ওই শ্রীমতী, তিনি কী করেন? তিনি একটু পরিশ্রম করে পরিবেশন করতে পারেন না?

'মা, তুমি রাধাকে একটু বলো না, আমাকে পরিবেশন করে খাওয়াতে। বলো না।' স্বর্ণময়ীকে পিড়াপিড়ি করতে লাগল বিজয়।

'তা কি কখনো হয়?' স্বর্ণময়ী বিমূঢ়ের মতো হয়ে গেলেন।

'খুব হয়। কেন হবে না? তুমি বলো না রাধাকে।' গম্ভীর-গম্ভীর মুখ করল বিজয় : 'আমাকে খাওয়াবে না তো ও কাকে খাওয়াবে!'

দুই ভাই, ব্রজ আর বিজয়, বলরাম আর কৃষ্ণ সেজেছে। আমরা কৃষ্ণলীলা অভিনয় করছি। আর এই যে দেখছ আমাদের সহচর-অনুচর, এরা সব রাখাল বালক। শ্রীদাম সুদাম।

অভিনয়ের শেষে দুই ভাই হাত ধরাধরি করে নাচে আর গায় : কানাই বলাই দুই ভাই, পথ ছেড়ে দে বাড়ি যাই।

কোথায় বাড়ি! গঙ্গার পারে বেড়াতে বেড়াতে পথ হারিয়ে ফেলেছে বিজয়। রাত হয়ে এল, পথঘাট মুছে গেল অন্ধকারে। কোথাও লোকজন নেই, এ ধারটা একেবারে নির্জন। একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল, ডাকতে লাগল শ্যামসুন্দরকে। শ্যামসুন্দর, আমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দাও। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পাচ্ছি না, আমাকে পথ দেখাও।

একটি সমবয়সী ছেলে কোত্থেকে পাশে এসে দাঁড়াল। বললে, এসো আমার সঙ্গে।

পথ আলো করে চলতে লাগল শ্যামসুন্দর। বাড়ি পৌঁছিয়ে দিল নির্ভুল।

'ও সন্নিসি ঠাকুর, তুমি ও কার পুজো করছ?' বাড়িতে এক সন্ন্যাসী অতিথি হয়েছেন, তাঁকে জিগগেস করল বিজয়। বললে, 'ও তো দেখছি একটা পাথরের টুকরো।'

'হোক। ওই আমার ঠাকুর।'

'ওটি আমাকে দাও না।' সন্ন্যাসীর শালগ্রাম-শিলার দিকে হাত বাড়াল বিজয় : 'আমি ওর পুজো করব।'

কী সর্বনাশ! শিলা বুঝি ছুঁয়ে দিল ছেলে, সবাই আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। সন্ন্যাসী শিলাকে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরল বুকের মধ্যে। বিজয় কাঁদতে লাগল।

সন্ন্যাসী ভাবলে, পালাই। যা দস্যি ছেলে, কখন না জানি শিলা অশুচি করে দেয়। যাবার সময় ছল করে একটা পাথরের টুকরো দিয়ে গেল বিজয়কে। বললে, 'এই নাও ঠাকুর।'

ঠাকুর পেয়ে বিজয়ের আনন্দ দেখে কে! ছল-অছল কী জানে, এক মনে সেই পাথরের টুকরোকেই পুজো করতে লাগলো।

ফিরতি পথে এসেছে সেই সন্ন্যাসী। ছদ্ম-হাসির আড়ালে দাঁড়িয়ে বিজয়ের পুজো দেখছে।

চমকে উঠল সন্ন্যাসী। এ কে পুজো করছে? কার পুজো? স্বর্ণময়ীকে বললে, 'মা, তোমার এ ছেলে সামান্য নয়।'

'নয়? কেন?' ভয় পেলেন স্বর্ণময়ী।

'ওই প্রস্তরখণ্ড জাগ্রত হয়ে উঠেছে।'

'বলেন কী সর্বনেশে কথা!' স্বর্ণময়ী বিজয়ের ঠাকুর, সেই পাথরের টুকরো, সন্ন্যাসীকে ফিরিয়ে দিলেন।

বিজয় মনে মনে হাসল। যেন ঠাকুরকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়! যেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তাকে সরিয়ে দেওয়া চলে! যেন তাড়িয়ে দিলেই তাকে তাড়ানো যায়!

উন্মাদ অবস্থায় শান্তিপুর থেকে একা ঢাকায়, গেণ্ডারিয়া আশ্রমে, চলে এসেছেন স্বর্ণময়ী। বিজয়কৃষ্ণ তো অবাক। এ কী, তুমি কোত্থেকে? এত দূর পথ কী করে এলে একা-একা?

'আমাকে ওরা সবাই পাগলা-গারদে দিতে চেয়েছিল।' বললেন স্বর্ণময়ী, 'আমি ভয় পেয়ে শ্যামসুন্দরকে বললাম, শ্যামসুন্দর, আমাকে তুমি আমার ছেলের কাছে রেখে এস। শ্যামসুন্দর বললেন, তোর ছেলে কোথায়? আমি তখন ধমকে উঠলাম, বললাম, দ্যাখ, চালাকি করতে হবে না। শিগগির রেখে আয় বলছি। তখন আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে রেখে গেল তোর কাছে।'

'শ্যামসুন্দর?'

'হ্যাঁ, এই দ্যাখ, তোকে দেবার জন্যে তাঁর এই গাত্রবস্ত্র আমাকে দিলেন। বললেন, আমার বিজয়কে দিবি।' বলে স্বর্ণময়ী শ্যামসুন্দরের এক খণ্ড উত্তরীয় বিজয়কৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করলেন।

অভিভূত হয়ে সেই উত্তরীয় মাথায় ধরল বিজয়কৃষ্ণ। আমি তাঁকে

জানি বা না জানি, মানি বা না মানি, তিনি আমাকে কখনো ছাড়েন না, পারেন না ছেড়ে থাকতে।

প্রচারক অবস্থায় একবার বাড়ি ফিরেছে বিজয়। বাড়ি ফিরেছে মাকে দেখে যেতে। দুপুর বেলায় বসে আছে চুপচাপ, শ্যামসুন্দর এসে বললেন, 'দ্যাখ, আজ আমাকে খাবার দিয়েছে, কিন্তু জল দেয় নি। জল ছাড়া খেয়ে কখনো তৃপ্তি হয়?'

তখুনি উঠে পড়ল বিজয়। খুড়িমাকে গিয়ে বলল, 'তোমার শ্যামসুন্দর বলছেন, আজ তোমরা তাঁকে জল দাও নি।'

খুড়িমা ঝামটা মেরে উঠলেন : 'শ্যামসুন্দর তো আর লোক পেলেন না, তুই ব্রহ্মজ্ঞানী, তোকে এসেছেন নালিশ করতে!'

'তার আমি কী জানি। তুমি একবার দেখ না খোঁজ নিয়ে।'

খুড়িমা খোঁজ নিয়ে জানলেন, সত্যিই আজ জল দেওয়া হয় নি শ্যামসুন্দরকে। তখন ত্রুটিমোচন করতে পথ পান না খুড়িমা।

পুজুরির কোনো যদি অনাচার ঘটে তা হলে, বলতে গেলে, শ্যামসুন্দর সেই বিজয়কেই বলবে। আমি আর কাউকে জানি না, তোমাকে জানি—তুমি এর প্রতিবিধান করো।

বলছেন বিজয়কৃষ্ণ, 'আমি না মানলেও তিনি আমাকে ছাড়েন নি।'

শ্যামসুন্দরকে উদ্দেশ করে বলছেন, 'ঠাকুর, আমার উপর তোমার এতই দয়া, তবে আর এতকাল এত ঘোরালে কেন? সমস্ত ভাঙিয়ে-চুরিয়ে বিষম কালাপাহাড় করেছিলে কেন?'

শ্যামসুন্দর বললেন, 'তাতে তোর কী? ভেঙেও ছিলাম আমি, এখন আবার গড়ে নিচ্ছিও আমি। তাতে তোর কী হয়েছে? ভেঙে গড়লে ঢের-ঢের সুন্দর হয় না কি!'

কিন্তু সকলের আগে মা। মা-ই সমস্ত।

সরল বিশ্বাসে যথার্থ কাতর হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে ভগবান নিশ্চয়ই পূর্ণ করেন প্রার্থনা। সরল বিশ্বাস মানেই বালকের বিশ্বাস। বালকের যেমন মাকে বিশ্বাস। আর যথার্থ কাতর তো একমাত্র শিশুই হতে পারে তার মায়ের কাছে।

ইউরোপে কোথাও অনেকদিন ধরে দারুণ অনাবৃষ্টি যাচ্ছে। বৃষ্টির জন্যে নগরবাসীদের সমবেত প্রার্থনা হবে গির্জেয়, চারদিকে রাষ্ট্র হয়েছে বিজ্ঞাপন। নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার দিকে গির্জেয় দলে দলে লোক এসে জমায়েত হল—প্রার্থনায় যদি ফল হয়। জনতার মধ্যে একটি বালক ছাতা হাতে করে এসেছে। সবাই পরিহাস করছে, এমন সময়ে গরমে ছাতা কেন? সরল চোখ তুলে বালক বললে : 'আজ বৃষ্টি হবে না?' বৃষ্টি হবে—কে বললে? সবাই সরবে হেসে উঠল। 'বা, বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা হবে না, সমবেত প্রার্থনা?' তা হবে তো হবে, তাতে এখুনি-এখুনি বৃষ্টি কী। 'বা, সমবেত

কাতর প্রার্থনা শুনলেই ভগবান বৃষ্টি দেবেন। আর তখন বৃষ্টি হলে আমি যাই কোথায়? যাই বলো, ভিজে-ভিজে বাড়ি ফিরতে আমি প্রস্তুত নই।'—যেই সমবেত প্রার্থনা শেষ হল, তক্ষুনি ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। ছাতা খুলে বাড়ি চলল বালক, সকলকে বললে, 'ভগবানের উপর যদি তোমাদের সত্যি-সত্যি বিশ্বাস থাকত তা হলে ছাতা ফেলে আসতে না, আমার মতো নিয়ে আসতে সঙ্গে করে। এখন দেখ, তোমরা পড়ে রইলে, আর আমি চলে যাচ্ছি বৃষ্টির মধ্যে।'

'তোমাদের পায়ে পড়ে বলছি,' বলছেন বিজয়কৃষ্ণ, 'একবার মাকে ডাকো। শিশু যেমন ডাকে তেমনি কাতর হয়ে ডাকো। মায়ের দয়ার ইতি-অন্ত নেই। বিশ্বাস করে ডাকলে, সরলভাবে ডাকলে মা দেখা দেবেন, ধরা দেবেন। তেমনি করে মাকে একবার ডেকে দেখ না কী হয়, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।'

মায়ের সঙ্গে কুটুম্ব বাড়ি গিয়েছে বিজয়।

রাত্রে ঘরে একা-একা ঘুমুচ্ছে।

অমাবস্যা, কোথাকার এক বনে ভাঙা মন্দিরে কালীপুজো হবে। নর-বলির বলি সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে লোক, কিন্তু বলির দেখা নেই এখনো। কে একজন ঘুমন্ত শিশু বিজয়কে এনে হাজির করল। সকলের আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা রইল না। এমন নির্মল নিরবদ্য বলি আর কোথায় মিলবে? স্নান করিয়ে শিশুকে নিয়ে এল মন্দিরে। তান্ত্রিক কাপালিক খড়্গ তুলেছে বলি দিতে, এমন সময় কোত্থেকে কে জানে, এক পাগল এসে উপস্থিত। মুহূর্তে কাপালিকের হাত থেকে খড়্গ কেড়ে নিয়ে উলটে আক্রমণ করল। কাপালিক আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা দে-দৌড়।

বিজয়কে কোলে করে কুটুম্ব-বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পাগল। কেমনতরো মা ঘুমন্ত শিশুকে একা ফেলে রাখে! কেমনতরো কুটুম্ব! অতিথি শিশুর দিকে নজর রাখে না! বকতে বকতে, অসতর্কতাকে শাসন করতে করতে চলে গেল রক্ষাকর্তা।

কে এই পাগল? কে এই গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী? কে এই সাক্ষাৎ-সুহৃৎ।

'কে ও? দুলাল দাদা না?' ডেকে উঠল বিজয়।

'আরে কে ও? গোঁসাই-দাদা?' দুলাল-সর্দারের হাতের বর্শা শিথিল হয়ে পড়ল।

গোস্বামীদের প্রজা, জাতিতে জেলে, রংপুর অঞ্চলে খামারে এলে বিজয়কে নিয়ে খেলা করত। কাঁধে চড়াত। রং-বেরঙের পাখি দেখাত। ডাকত গোঁসাই-দাদা বলে।

তুমি আমার দুলাল-দাদা। পাল্টা সম্ভাষণ করত বিজয়।

রংপুরে শিষ্যবাড়ি চলেছেন স্বর্ণময়ী। পথে রাত হতে চড়ার কাছে

ঝাউবনের আড়ালে নৌকো বাঁধল মাঝিরা। নদীতে ডাকাতের ভয়। দুলাল সর্দারের ভয়ে সমস্ত নদীই এখানে তটস্থ।

যা ভয় করেছিল, হারে-রে-রে রব তুলে ডাকাতের ছিপনৌকো এসে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। মারো, লোটো, কাটো। কেটে নদীর জলে ফেলে দে টুকরোগুলো।

'কে ও? দুলাল দাদা না?' ডাকাতের সর্দারকে পলকে চিনতে পেরেছে বিজয়।

'আরে কে ও? তুমি? আমার গোঁসাই-দাদা?' দুলালের হাতের বর্শা, যা কোনোদিন হয় নি, থরথর করতে লাগল।

কত ছেলেকেই তো কোলে-পিঠে করেছে দুলাল, কত লোকের কন্ঠেই তো শুনেছে দুলালদাদা, কিন্তু এ কে অপরূপ, যার কন্ঠস্বরটি তখনো কানে লেগে আছে মধু হয়ে! যার ডাকটি শত কোলাহলেও ডুবে যায় না, মুছে যায় না মন থেকে। এক ডাকে চেনা যায়!

'কোথায় চলেছ?'

'শিষ্যবাড়ি।'

'এত রাত্রে, এখানে? ঝোপের মধ্যে?'

'তোমার ভয়ে।' হেসে উঠল বিজয়।

'সঙ্গে আর কে আছে?'

'মা আর দাদা।'

নৌকোয় নিজের লোক দিয়ে দিল দুলাল। বলে দিল নিরাপদে এদের শিষ্য বাড়িতে পেঁাছে দিয়ে আসবি। দেখিস পথে কেউ যেন না বিরক্ত করে, একটি আঙুলও যেন না তোলে। বলবি দুলাল-সর্দারের লোক।

দুলাল-সর্দারের মধ্যেও শ্যামসুন্দর।

জয়গোপালদের নাটমন্দিরে কীর্তন শুনতে যাচ্ছে বিজয়। পথে দেখতে পেল অশ্বত্থ গাছের ডাল তাক করে একটা লোক বাঁটুল ছুঁড়ছে। সঙ্গে সঙ্গেই একটা ঘুঘুপাখি রক্তাক্ত দেহে ছিটকে পড়ল জলের উপর, মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল।

'গোপাল-দা, দেখ দেখ, কে এই লোকটা, নিরীহ পাখিটাকে মারলে!' আহত পাখিটাকে বুকে নিয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল বিজয়।

পাখিটার মুখে-গায়ে জল দেওয়া হল। কন্ঠনালীটা একবার নড়ল পাখির, তারপর নিস্পন্দ হয়ে গেল।

পীতাম্বর তর্কবাগীশের বাড়ির সামনে ঘটনা। তিনি কান্না শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন মৃত পাখি হাতে নিয়ে ছোট একটি ছেলে আকুল হয়ে কাঁদছে।

কে রে এই জগন্মোহন ছেলে, সামান্য পাখির শোকে এমন করে কেঁদে ভাসায়!

বিজয়কে কোলে নিলেন পীতাম্বর। শান্ত করতে বসলেন। তাঁর নিজের চোখও সিক্ত হল।

আর যে মেরেছিল পাখিটাকে—পান্তু ঘাসী তার নাম—চিরজীবনের মতো ছেড়ে দিল পাখিশিকার।

আমতলায়, নিজ আসনে ধ্যানমগ্ন আছেন বিজয়কৃষ্ণ। হঠাৎ চমকে উঠে বললেন, 'দেখ তো, দেখ তো, ওদের তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও, পাখিরা ডাকছে।'

কোথায় পাখি ডাকছে! কোথায় কাকে তাড়িয়ে দেবে?

গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'গিয়ে দেখ কুঞ্জ ঘোষের বাড়ির বড়ো আম গাছে।'

শিষ্য ভক্ত কুলদানন্দ তখুনি ছুটল। গিয়ে দেখল, কুঞ্জ ঘোষের বাড়ির বড়ো আম গাছটাকে লক্ষ্য করে দুটো ছেলে ঢিল ছুঁড়ছে। ওখানে কী? শালিকের বাসা। তিন চারটে শালিক গাছের উপরে এ-ডাল থেকে ও ডালে ওড়া-উড়ি করছে আর ডাকছে। ধমক দিতেই ক্ষান্ত হল ছেলেগুলো। পাখিরাও স্থির হল। ফিরে এল কুলদা।

'কী দেখলে?' জিগগেস করলেন বিজয়কৃষ্ণ।

কুলদা যা দেখেছে বললে। বললে, 'আমি তো এখানেই বসেছিলাম, পাখিদের শব্দ তো কিছুই শুনতে পাই নি। আপনি মগ্নাবস্থায় থেকে অত দূরে পাখিদের ডাক কী করে শুনলেন?'

গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'নিকটে বা দূরে, তার কী করবে? যেখানে যে অবস্থায়ই থাকা যাক, কোনো আপদে পড়ে কেউ ডাকলে তখুনি তা এসে প্রাণে বাজে।'

॥ ৩ ॥

ভগবান সরকারের পাঠশালাতে ভর্তি হল বিজয়।

মাস্টার তো নয় একখানা লিকলিকে বেত। শাসনে যেমন কঠোর স্নেহে তেমনি কোমল। পড়ায় ভুল করলেই প্রহার। দুরন্তপনা করলে তো কথাই নেই। হাতে পায়ে ইঁট নিয়ে নাড়ুগোপাল সাজো। নয় তো বোসো লাল পিঁপড়ের ঢিপিতে।

তারপর পালপার্বণে আনো আলুটা-মুলোটা। তেল-ঘি-তামাকও আনো কেউ-কেউ। বিজয় আরো বেশি দেয়। দেয় শ্যামসুন্দরের প্রসাদ। শিষ্য-বাড়ি থেকে পাওয়া নতুন কাপড়।

বিজয়ের উপর খুব প্রসন্ন ভগবান। তা ছাড়া লেখাপড়ায়ও সে হীরের টুকরো ছেলে।

কলেরা লেগেছে শান্তিপুরে। পাঠশালার দু'জন পড়ুয়া মারা গেল।

বিজয়ের মন খুব ম্লান। সমস্ত কিছু সেই রকম আছে, আর ওরা দু'জন শুধু নেই? তাদের জায়গা পড়ে আছে, বই খাতা খেলনা পড়ে আছে, ওদের সঙ্গী সহচররা পড়ে আছে, ওরা গেল কোথায়? কেউ চলে যেতে পারে নিশ্চিহ্ন হয়ে? বাজে কথা। নিশ্চয়ই কোথাও আছে লুকিয়ে। আমারই দোষ দেখতে পাচ্ছি না, শুনতে পাচ্ছি না। ধরতে পাচ্ছি না হাতে হাতে।

কে বলে আমার দোষ? যারা মরে যায়, চলে যায়, তারা কি আর থাকে?

সহসা, নির্জনে পথের মাঝখানে, সেই দুই ছেলে সমস্বরে বলে উঠল : বিজয়, আমরা আছি। আমরা আছি।

বিজয়ের বুকের মধ্যিখানটা কেঁপে কেঁপে উঠল। ব্যাকুল হয়ে তাকাতে লাগল চারপাশ। কোথায়? কোনখানে?

এই যে এখানে। সবখানে।

ছুটতে ছুটতে পাঠশালায় এল বিজয়। গুরুমশাইকে সব বললে।

'আমাকে শোনাতে পারবি?' গুরুমশাই ভুরু কুঁচকোলেন।

'কেন পারব না? আমার সঙ্গে যখন কথা বলেছে তখন আপনার সঙ্গেও বলবে।' শৈশবসারল্যে বললে বিজয়। 'চলুন।'

সেই নির্জন পথের মাঝখানে এল দু'জন। কতরকমের শব্দ, লতায়-পাতায়, কিন্তু অশরীরী কন্ঠস্বর কই?

ভগবানের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তেড়ে গেলেন বিজয়ের দিকে : 'ফাজলামোর জায়গা পাওনি! নচ্ছার, মিথ্যেবাদী কোথাকার।'

এই মারে তো সেই মারে।

বিজয় কাঁদো কাঁদো মুখে বলে উঠল, 'ওরে তোরা কোথায়? সেই আমার সঙ্গে কথা বলেছিলি তেমনি আবার বল। নইলে আমার আর রক্ষে নেই। আমাকে মেরে শেষ করে ফেলবে।'

কই, কোনো সাড়াও নেই শব্দও নেই। শূন্যতার কোলে শুধু স্তব্ধতা শুয়ে আছে।

গালাগালের তুবড়ি ছোটালেন ভগবান। বেত না থাক, সোজা কিল-চড়েই সজুত করব তোকে।

'গুরুমশাই, বিজয়কে মারবেন না।' পাশের থেকে কারা বলে উঠল সমস্বরে : 'মারবেন না বলছি।'

ভগবানের হাত আড়ষ্ট হয়ে এল। সত্যিই তো, ঐ তো ছেলে দুটোর মিলিত কন্ঠস্বর। মূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তোরা কোথায়!

'এই তো এইখানে। এই যে দেখুন—'

বিজয় ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না ভগবান। দু'হাতে বিজয়কে জড়িয়ে ধরলেন বুকের মধ্যে। কে রে তুই দিব্য-চক্ষু দিব্য-কর্ণের ছেলে?

লছমনদাস বাবাজী বুঝি চিনতে পেরেছে। গঙ্গাতীরে বন্তার ঘাটে থাকে সেই

বৈষ্ণব। কী যে করে কে জানে, কেবল দোঁহা পড়ে আর গান গায়। বাবাজীর গান শুনতে খুব ভালোবাসে বিজয়। সহচরদের নিয়ে আসে আর মাঝে মাঝে সুরের সঙ্গে স্বর মেলায়। তালি দিয়ে তাল রাখে।

'এ ছেলেটির অবস্থা বড় মনোহর। হৃদয় প্রেমরসে পরিপূর।' বিজয়কে লক্ষ্য করে বলেন বাবাজী। 'এ একজন মহাপুরুষ।'

বিজয় যখন বোঝে তাকে নিয়েই চলছে এই স্তবস্তুতি তখন সে সেখান থেকে চম্পট দেয়।

ধুলট উৎসব হচ্ছে। কার সাধ্য পথে হাঁটে। আসল উৎসব শেষ হয়ে গিয়েছে কবে, তবু ধুলো ওড়ানো থামছে না। হাকিম ঈশ্বর ঘোষালের কাছে নালিশ করছে পথচারীরা।

'কারা ধুলো ওড়াচ্ছে?'

'বিজয় গোস্বামী আর সাঙ্গোপাঙ্গেরা। দুরন্তের একশেষ।'

'দাঁড়ান, আমি পুলিশ দিচ্ছি।'

কনস্টেবলদের বলে দিলেন শুধু ফোঁস করবে, ছোবল মারবে না। গোঁসাই পাড়ার ছেলে, সাবধান।

ভেঙে গেল ধুলট খেলা। ভাঙুক। আরো কত খেলা আছে।

জমিদার অম্বিকাবাবুর ঘোড়া ধরে লুকিয়ে রেখেছে ছেলেরা। খবর গিয়েছে জমিদারের কাছে। ছেলেদের ধরে এনেছেন। নিয়েছ আমাদের ঘোড়া?

সকলে একবাক্যে বললে, 'না। আমরা তার কী জানি?'

'তুমি জানো?' বিজয়কে জিগগেস করলেন জমিদার।

'জানি।' সত্যভাষণের দীপ্তিতে স্বভাবসুন্দর বিজয়কৃষ্ণ : 'ঐ জঙ্গলের মধ্যে গাছের সঙ্গে বাঁধা আছে।'

ধরা যখন পড়েছি, সত্য কথা বলব। সত্য বলতে পেছপা হব না। সত্যই কলির তপস্যা।

অম্বিকাবাবু তো সামান্য, স্বয়ং মহকুমা হাকিমেরই ঘোড়া ধরল ছেলেরা। একে-একে সকলে চড়ল তার পিঠে। যেই বিজয় চড়ল অমনি মনের সুখে অশ্বিনীতনয় লম্বা ডাক ছাড়ল। সে-ডাক হাকিমের সহিস চিনতে পারল পলকে। ছুটল ঘোড়া ধরতে। ছোকরারা দৌড় মারল। বিজয় পালাল না। ঘোড়া সমেত তাকে ধরে আনা হল হাকিমের কাছে।

'তোমরা নিয়েছ ঘোড়া?' হুমকে উঠল ঈশ্বর ঘোষাল।

'নিয়েছি।'

'কোত্থেকে নিয়েছ?'

'আপনাদের আস্তাবল থেকে।'

'কেন নিয়েছ?'

'চড়বার শখ হয়েছিল, তাই।' সরল-উজ্জ্বল মুখে বললে বিজয়।

এক মুহূর্ত কী ভাবলেন ঈশ্বর ঘোষাল। বললেন, 'বেশ। আবার যখন শখ হবে বলবে আমাকে, আমি ঘোড়া সাজিয়ে দেব। ঘোড়া সাজানো না থাকলে পড়ে যেতে পারো। জিন লাগাম গদি না থাকলে কি ঘোড়সওয়ার হওয়া যায়?'

ঘোড়ার পর এবার নৌকো ধরেছে বিজয়ীরা। চল কালনায় ঝুলনের মেলা দেখে আসি।

রাত্রে শান্তিপুরের ঘাটে নৌকো বাঁধা আছে মাঝিদের। তারই একটা খুলে নিয়ে চলে যায় ওপারে। আবার ভোর হবার আগেই ফিরে আসে শান্তিপুর। যেমন নৌকো তেমনি আবার ঘাটে বাঁধা থাকে।

একদিন অন্যরকম হল। বিজয় ও তার দলবল পেঁাচেছে কালনায়, শুরু হল ঝড়বৃষ্টি। এ দুর্যোগে নদী পার হওয়া নৌকোর অসাধ্য।

মন মুখ মেঘলা করে ছেলের দল জেগে রইল সারারাত।

আকাশ পরিষ্কার হতে হতে প্রভাত হয়ে গেল। এখন দিনের আলোয় নৌকো ফেরাতে গেলে মাঝিরা আর আস্ত রাখবে না। কিন্তু খেয়ার নৌকোয় পার হবার মতো পয়সা নেই। যা পয়সা ছিল সব মেলায় খরচ হয়ে গেছে। এখন উপায়?

উপায় সারল্য। উপায় সত্যকথা। উপায় মধুবাক্য।

খেয়ার মাঝিকে বিজয় বললে, 'দেখ ভাই আমাদের কারুর পয়সা নেই। ঝড়ে-জলে ঘুমুতে পারি নি সারারাত। এখন তুমি যদি দয়া করো আমরা ফিরতে পারি। খেতে পারি বাড়ি গিয়ে।'

খেয়ার মাঝির মন গলল। বিনি পয়সায় পার করে দিল।

বাড়ি ফিরে এসে প্রথমেই মাকে বললে এই দুর্বিপাকের কথা। মাগো, অপরাধ করে ফেলেছি। এখন কী করি?

স্বর্ণময়ী বললেন, 'মাঝিদের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দাও আর মাপ চাও।'

সাপের উদ্যত ফণায় ধুলো পড়ল। মারমুখো মাঝিরা নরম হয়ে গেল।

কিন্তু দুষ্টুমি কি যায়?

আগে-আগেও কি দৌরাত্ম্য কম ছিল? নন্দনন্দনের চাঞ্চল্যে ব্রজমণ্ডল অস্থির হয়ে উঠেছিল। আর মহাপ্রভু? মহাপ্রভু তো ছিলেন উদ্ধতের শিরোমণি।

গয়লানীরা বাজারে ময়রার দোকানে ছানা বেচতে আসছে। বিজয় আর তার দলের ছেলেরা রাস্তায় গর্ত করেছে, কচুপাতা কলাপাতা দিয়ে তা ঢেকে রেখে তার উপর ধুলো ছড়িয়ে চৌরস করে রেখেছে। গর্তে পা পড়-লেই হাঁড়িশুদ্ধু উলটে পড়ে যায় গয়লানীরা। আয়, আয়, যত পারিস কুড়িয়ে নে ছানা, খা পেট ভরে, বানরদেরও দে বিলিয়ে।

গয়লানীরা স্বর্ণময়ীর কাছে নালিশ করতে আসে।

আমার ছেলে অমনি অশান্তের একশেষ। তা তোমাদের কত লোকসান

হয়েছে বলো বাছা, দাম দিয়ে দি।

পশু পাখির প্রতি অগাধ ভালোবাসা বিজয়ের। জীবে দয়া অর্থ শুধু দুঃস্থ-আতুর মানুষের প্রতি নয়। সমগ্র প্রাণিলোকের প্রতি। কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে বাঘ-সাপ-বেড়াল-বানর পর্যন্ত।

বানরদের নানারকম নাম রেখেছে বিজয়। হুঁকোমুখো, বুড়োদাদা, কানি, ফেলি, লেজকাটি। গায়ে দিব্যি হাত দিয়ে ঠেলে আদর করে নেয় খাবার। গরু আসে, ছাগল আসে, বেড়াল তো ঘুর-ঘুরই করে, এমন কি ইঁদুর আরশুলাও এসে গা খোঁটে। ওরে ওদের এখন খাবার দে। ওদের খিদে পেয়েছে।

গেণ্ডারিয়া আশ্রমে ভজনকুটিরের গর্তে একটি সাপ এসে বাসা করেছে। গোঁসাইজি যত্ন করে তাকে দুধকলা খাওয়ান, গায়ের স্পর্শ দিয়ে আদর করেন। জটা বেয়ে সাপ কাঁধ ছাড়িয়ে মাথায় গিয়ে ওঠে, আবার নিজের খেয়ালে নেমে যায়। ছোবল তো মারেই না, ফোঁসও করে না, যেমন মসৃণ তেমনি মসৃণ হাঁটে-চলে ওঠে-নামে।

'এটা কী ব্যাপার?' কেউ-কেউ প্রশ্ন করে গোঁসাইজিকে : 'সাপ আপনার গায়ে-মাথায় ওঠে কেন?'

'ওঠে নামধ্বনি শুনতে।'

ভক্তরা সকলে তাকাল কৌতূহলী হয়ে।

'নামের সঙ্গে যখন স্বাভাবিক প্রাণায়াম চলে তখন শরীরের মধ্যে একটা মধুর অব্যক্ত ধ্বনি হতে থাকে। সাধারণত দুই ভুরুর মাঝখান থেকে ওঠে সেই ঝংকার। সাপ তা শোনবার জন্যে তাই মাথায় ওঠে, কখনো বা সুর মিলিয়ে শিস দেয়। অমনি অবস্থায় পৌঁছবার আগে দেহ সম্পূর্ণরূপে অহিংস হয়ে যায়। তখন হিংস্র জন্তুও নম্র হয়ে সামনে বসে।'

একটা কুকুর আছে আশ্রমে। সবাই তাকে 'কেলে' বলে ডাকে। কীর্তন শুরু হলেই বসে এসে ভিড়ের মধ্যে। কাঁপতে-কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তখন কর্ণমূলে হরিনাম দিলে চেতন হয়।

একদিন গোস্বামী-প্রভুর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। যেন কী নীরব প্রার্থনা আছে, তাই তার ঐ আর্ত-আর্দ্র মিনতি।

গোঁসাইজি বললেন, 'কালু, আমাকে মিনতি করলে কী হবে? এ জন্ম এই ভাবে কাটাও, পরের জন্মে তোমার উদ্ধার।'

ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে লাগল কালু।

কিন্তু ঐ লোকটা অমন পরিত্রাহি কাঁদছে কেন। ছ-সাত বছরের ছেলে বিজয় খেলা ফেলে ছুটল সেই কান্নার দিকে। দেখল জমিদার পাওনা টাকা আদায়ের জন্য একটা লোককে বাঁশডলা দিচ্ছে। অসহায় লোকটা চেঁচাচ্ছে প্রাণপণে। যন্ত্রণায় আছড়াচ্ছে হাত-পা, ঝলকে-ঝলকে রক্ত উঠছে মুখ দিয়ে।

বিজয়ের অসহ্য লাগল। জমিদারের সামনে লাফিয়ে পড়ে সে গম্ভীর-

বজ্রস্বরে গর্জন করে উঠল : 'তুমি ডাকাত! তুমি ডাকাত!'

জমিদার রোষনেত্রে তাকাল বালকের দিকে।

'লোকটা যে মরে গেল—এই দেখেও তোমার লাগছে না এতটুকু?' কাঁদতে লাগল বিজয় : 'ভালো চাও তো ছেড়ে দাও বলছি, এখুনি ছেড়ে দাও।' বলেই বিজয় মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

কি জানি কী হল, জমিদার ছেড়ে দিল লোকটাকে।

সেই জমিদারেরই পরে কী দশা হয়েছে দেখ।

অসহায় ব্রাহ্মণ বিধবা—তারও বুঝি ঋণ ছিল জমিদারের কাছে। দিনে-দুপুরে তার বাড়ি ঢুকে জমিদার তার যথাসর্বস্ব লুট করল। রান্না চড়িয়েছে বিধবা, তার ভাতের হাঁড়িটা পর্যন্ত লাথি মেরে ভেঙে ফেলল। বিধবা বললে, 'আমি কার কাছে এর প্রতিকার চাইব? আমার কে আছে? যিনি সকলের হয়েও আমারই একমাত্র সেই ভগবানকে বলছি, তিনি এর বিচার করবেন। যেমন যেমনটি আমাকে তুমি করলে, তোমার স্ত্রীর বেলায়ও তেমন তেমনটি ঘটবে।'

কী হল তার পর?

জমিদার বেশ শক্ত মামলায় পড়ে সর্বস্বান্ত হল। ফৌজদারিতে সশ্রম কারাদণ্ড হল। জেলেই রোগে পড়ে মারা গেল।

তার স্ত্রী হবিষ্যান্ন করতে রান্না চাপিয়েছে, শত্রুপক্ষের লোকেরা ঢুকল বাড়ির মধ্যে, সর্বস্ব লুট করল। আধাসেদ্ধ ভাতের হাঁড়িটাকে একজন লাথি মেরে ফেলে দিল উনুন থেকে। হাঁড়িটা পেতলের বলে তাও নিয়ে গেল দস্যুরা। জমিদার-গৃহিণী কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে।

'দুঃখ পেয়ে হাড়িনী শাপে, এড়াতে পারে না বামুনের বাপে। কথাটা খুব সত্যি।' বললেন গোসাইজি, 'নিতান্ত অধম অপদার্থ দুরাচার ব্যক্তিও যদি দারুণ ক্লেশ পেয়ে শাপ দেয়, একটিও দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সাত্ত্বিকতম ধার্মিক ব্রাহ্মণও তার হাত এড়াতে পারে না।'

কিন্তু ভগবান গুরুমশাই যে মারেন সে বুঝি মমতার মার।

বেত মারবার সময় তিনি সংখ্যা গোনেন, কিন্তু এক দুই তিন না বলে বলেন, রাম দুই তিন।

'আচ্ছা, আপনি রাম দিয়ে আরম্ভ করে শেষে দুই তিন বলেন কেন?' বিজয় একদিন জিগগেস করলে : 'রাম দুই তিন না বলে রাম কৃষ্ণ হরি বলতে পারেন না?'

সেই গুরুমশাই পাঠশালার ছাত্রদের ডাকলেন তাঁর বাড়িতে। বললেন, 'ওরে ছেলেরা, কাল সকালে আসিস একসঙ্গে গঙ্গায় নাইতে যাব।'

কী ব্যাপার, ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

'গঙ্গায় কেন জানতে চাস?' ভগবান বুঝিয়ে দিলেন সকলকে : 'সেখানে আমি দেহত্যাগ করব।'

পরদিন প্রাতে সকলকে নমস্কার করে পুত্রটির হাত ধরে গঙ্গার ঘাটে চলে এলেন ভগবান। স্নান আহ্নিক সেরে গঙ্গার জলে গিয়ে বসলেন জপ করতে। চারদিকে শুরু হল সংকীর্তন। ঘাট-বাট জনতায় ভরে গেল। জপ শেষ করে ভগবান ছাত্রদের সম্বোধন করে বললেন, 'ছেলেসব, আমি কায়স্থ, তোমরা অনেকে ব্রাহ্মণ, কত তোমাদের আমি মেরেছি-ধরেছি, তাড়ন-তর্জন করেছি, আমার মাথায় তোমরা পা দাও, আমার সকল অপরাধ খণ্ডে যাক। আর দেরি নেই। ঐ দেখ আমার রথ এসেছে।' খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়ালেন ভগবান। নাম করতে লাগলেন। দেহত্যাগ করলেন সজ্ঞানে।

ভগবানের মৃত্যুর পর উঠে গেল পাঠশালা। শান্তিপুরের মাইল দুই দূরে হেজল নামে এক পাদ্রীর একটা ইস্কুল ছিল, তাতে ভর্তি হল ব্রজ-বিজয় দুই ভাই। সংস্কৃত বিভাগেই ভর্তি হল দু'জনে।

আয়, চল কৃপণদের শায়েস্তা করি। বিজয় ডাকে তার অনুচরদের। পুজোর আগের দিন কৃপণদের বাড়িতে প্রতিমা রেখে আসে অলক্ষিতে— কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী। তখন আর তাদের পুজো না করে উপায় নেই। সুতরাং ভক্তজনে প্রসাদ দাও। বিজয়ীরা গিয়ে হাত পাতে।

এদিকে আবার চড়ক পুজো করে। গাজনা বসায়। মূল সন্ন্যাসী বিজয়, শিয়ালকাঁটা বিছিয়ে গড়াগড়ি খায়। শ্মশান থেকে মড়ার খুলি কুড়িয়ে এনে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে আগুন-সন্ন্যাস করে। শিব গড়ে, আশুতোষেরও পুজো করে। বাঁশের চড়কগাছ তৈরি করে বন্ধুদের নিয়ে পাক খায়, চক্কর মারে।

আবার তারণ গোস্বামীর কথকতা শুনতে ভিড় জমায়। তন্ময় হয়ে শোনে সেই কথকতা। তারণ ঠাকুরের মিষ্টিকথা এত ভালো লাগে যে তাঁর জন্যে নিজের হাতে মালা গেঁথে আনে। কৃষ্ণকথাই মিষ্ট কথা। শুনতে শুনতে দুই চোখে অশ্রুর সাগর উথলে ওঠে। আহা, এই বালকে প্রেমের সঞ্চার হয়েছে।

নারদ বলছেন ব্যাসকে, 'সাধুরা প্রত্যহ কৃষ্ণকথা গান করতেন, তাঁদের অনুগ্রহে আমি শুনতে পেতাম সে সব মনোহারিণী কথা। সশ্রদ্ধ হয়ে কৃষ্ণকথা শুনতে শুনতে আমার প্রিয়শ্রব শ্রীকৃষ্ণে রতি জন্মাল।'

মহৎ সঙ্গলাভের সৌভাগ্য যার হয়েছে তারই এই ভাব বা রতির অধিকার। 'কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।' সাধুসঙ্গ থেকেই সর্বমঙ্গলের শিরোমণি পূর্ণানন্দময়ী ভক্তি। ভক্তি অহৈতুকী।

যাত্রা শুনতেও বিজয়ের নিদারুণ আগ্রহ। যদি সঙ্গী না জোটে একলাই সে একশো। ভয়-ডরের ধার ধারে না। কিন্তু এ কে যে অন্ধকার রাতে লণ্ঠন হাতে করে তাকে পথ দেখায়?

রাতের পর রাত যাত্রা হচ্ছে। রোজই বাড়ি ফিরতে দেরি হয় আর রোজই লণ্ঠন হাতে লোকটা বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয়।

বিজয় ভাবে মা-ই বোধ হয় পাঠান লোকটাকে। নইলে এত আপনা-

আপনি করে কেন?

'তুই রোজ এত রাত করে ফিরিস কেন?' ব্যাকুল হয়ে জিগগেস করলেন স্বর্ণময়ী।

'বা, গান যে খুব দেরিতে ভাঙে।'

'রাত করে ফিরতে তোর ভয় করে না?'

'ভয় করবে কেন! তুমি আলো দিয়ে যে লোকটাকে পাঠাও সেই তো পথ দেখিয়ে ঠিক পেঁাছিয়ে দেয় বাড়ি। আমি তো ওর ভরসায় নিশ্চিন্ত থাকি।'

'কে পেঁাছিয়ে দেয়!' চমকে উঠলেন স্বর্ণময়ী : 'খবরদার তুই আর যাবি না যাত্রা শুনতে। ফিরবি না একা-একা।'

'কেন মা, কে ঐ লোকটা?'

'কে জানি কে। শান্তিপুরে অনেক ব্রহ্মদৈত্যি। তাদেরই একটা কিনা তার ঠিক কী।' স্বর্ণময়ী ছেলেকে টানলেন কোলের কাছে : 'শেষকালে তোর একটা অমঙ্গল করে বসুক।'

তবু পরের দিন দুষ্টু ছেলে মাকে লুকিয়ে গিয়েছে আবার গান শুনতে। আজ না হয় ভাঙবার আগেই ফিরব তাড়াতাড়ি।

কিন্তু এমনি দুর্দৈব, ঘুমিয়ে পড়েছে বিজয়। ঘুম যখন ভাঙল দেখল আসর প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, লোকজনও না থাকার মধ্যে। অন্ধকারে পথ চিনবে কী করে? কই, আলো হাতে সেই লোক কই? আসবে না আজ এগিয়ে দিতে?

'চল বাড়ি চল।' মুহূর্তে অদৃশ্যলোক থেকে সেই আগের চেনা লোকটা আবির্ভূত হল। হঠাৎ দেখা গেল আলো। হ্যাঁ, সেই চেনা লন্ঠন।

'তুমি কে?' জিগগেস করল বিজয়।

'তা জেনে তোমার কাজ কী? বাড়ি যাবে তো চল আমার সঙ্গে। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে।'

'তুমি কি ব্রহ্মদৈত্য? আমার মা বলেছেন অনেক ব্রহ্মদৈত্য ঘুরে বেড়ায় শান্তিপুরে। তুমি কি তাদের একজন?'

'আমি তা হতে যাব কেন? চল পা চালিয়ে চল।' লোকটা আরো একটু ঘেঁসে এল : 'তোমার মা আর কী বলেন?'

'বলেন গয়ায় পিণ্ড দিলে ব্রহ্মদৈত্যরা উদ্ধার পায়।'

'হ্যাঁ তাই বটে।' লোকটা একটু থামল। বললে, 'দেখ, রাত অনেক হয়েছে, রাস্তা দিয়ে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তার চেয়ে এই জঙ্গলটুকু পেরিয়ে চল, সময় কম লাগবে। মা কত ব্যস্ত হয়ে আছেন না জানি।'

'চল।' বিন্দুমাত্র টলল না বিজয়।

'তবে এখানকার গাছে অনেক বানর থাকে।' বললে লোকটা, 'গাছের ডাল ধরে নাড়া দিলে ভয় পেয়ো না যেন।'

'কেন তুমি ওকে মিথ্যে কথা বলছ?' গাছের উপর থেকে কে হুঙ্কার করে উঠল : 'আমরা বানর নই। আমরা মানুষও নই। আমরা অন্যপ্রকার।'

গাছের উপর থাকা আরেকজন বলে উঠল : 'আমরা কে যদি জানতে চাও তো পরকাল দেখ। পরকাল দেখ।'

আর দেখতে হবে না। চল দ্রুত পায়ে।

ঘর বার করছেন স্বর্ণময়ী। লন্ঠনের আলো দেখে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন বাড়ির কাছে আসতেই আলো নিবে গেল, আর লন্ঠনওলা সিধে উঠে গেল তালগাছে।

স্বচক্ষে দেখলেন স্বর্ণময়ী। চিনতে পারলেন।

'কে মা?'

'শ্যামসুন্দরের পুজুরি ছিলেন। নাম পুরন্দর পুজুরি। সেবার জিনিস চুরি করার অপরাধে তাঁর আজ এই গতি।'

পুরন্দর হিতৈষী আত্মা। সে শুধু পথপ্রদর্শক নয়, সে বিজয়ের শরীর-রক্ষক।

বিজয়ের পাড়ার সঙ্গে বেপাড়ার ছেলেদের ঝগড়া মারামারি হয়েছে। অজান্তে বিজয় একদিন বিরুদ্ধ দলের হাতে গিয়ে পড়ল। তারা ঠিক করলে মেরে বিজয়কে ছাতু বানিয়ে দেবে। আজ আর রক্ষে নেই। বিপক্ষীয়েরা লাঠি হাতে তাকে ঘিরে ধরেছে। এই মারল বলে।

হঠাৎ পুরন্দর এসে উপস্থিত হল। বিজয়ের চারদিকে ঘুরতে লাগল ভন ভন করে। রাশি রাশি ধুলো উড়তে লাগল। সবাই ভাবলে ঘূর্ণি বাতাস উঠেছে বুঝি। মারমুখোদের চোখ মুখ ধাঁধিয়ে গেল। বিজয়কে কেউ আর দেখতে পেল না। ধুলোর ঝড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

বিজয়কৃষ্ণ পরে যখন গয়ায় যান, মনে করে পুরন্দরের উদ্দেশে পিণ্ড দেন।

মানুষ মৃত্যুর পর কোথায় যায়?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে একদিন জিগগেস করলেন বিজয়কৃষ্ণ।

মহর্ষি বললেন, 'কেন, যে সকল গ্রহ-নক্ষত্র দেখছ সেখানে যায়।'

'জীবের কী প্রকার অবস্থায় দেহত্যাগের পরেই আবার দেহ আশ্রয় করতে হয়?' গোস্বামী-প্রভুকে জিগগেস করল কুলদা।

'বিষয়ে যাদের ঘোর তৃষ্ণা, ভোগেচ্ছা যাদের প্রবল', বললেন গোঁসাইজি, 'তারা দেহত্যাগ মাত্রই অপর দেহ আশ্রয় করে।'

'পিতৃলোকে কারা যায়?'

'বিষয় উপস্থিত হলে যারা ভোগ করে কিন্তু তা লাভের জন্যে তেমন স্পৃহা রাখে না তারাই পিতৃলোকবাসী।'

'আর ব্রহ্মলোকে? ব্রহ্মলোকের অতীতে?'

'বাসনা হেতুই জীবের ভিন্ন ভিন্ন লোকে গতি হয়।' বললেন গোঁসাইজি,

'সমস্ত বাসনার মূল পর্যন্ত যাদের নষ্ট হয়েছে যাদের ভগবান ছাড়া আর লক্ষ্য নেই, তারাই ব্রহ্মলোকের অতীত।'

'বাসনা-ত্যাগ হবে কিসে?'

'ব্রহ্মচর্যে প্রধান সাধন সত্য অহিংসা আর বীর্যধারণ।' বললেন গোঁসাইজি, 'সন্ন্যাসে তেমনি প্রধান সাধন সর্বদা ভগবানকে স্মরণ ও বাসনা-ত্যাগ। বাসনাটি ত্যাগ করতে পারলেই বুঝবে এবার পাড়ি দিলে।'

'বাসনা নষ্ট হয়েছে বুঝব কিসে?'

'নিন্দা প্রশংসা যখন মনকে স্পর্শ করবে না তখনই বুঝবে বাসনা নষ্ট হয়েছে।'

॥ ৪ ॥

হেজেল সাহেবের পাঠশালা শেষ করে বিজয় ভর্তি হল গোবিন্দ ভটচাযের টোলে। এক বছরের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত করে ফেলল।

তারপরে ঢুকল বনমালী ভটচাযের চতুষ্পাঠীতে। সেখানে কাব্য পড়ল। সেখান থেকে এল কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রয়ে। আর কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছেই তার বেদান্তের পাঠ। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই সূক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

ন বছরে উপনয়ন হল বিজয়ের। কৃষ্ণগোপাল তর্করত্ন তাকে গায়ত্রী মন্ত্র দিল। কুলপ্রথা অনুসারে মা স্বর্ণময়ীই দীক্ষাদাত্রী কিন্তু অনুষ্ঠান-গুলো শেখাবার জন্যে চাই একজন সদাচারী পণ্ডিত, একজন উপগুরু। সেই উপগুরুই কৃষ্ণ গোস্বামী। বেদান্তবিদ্বান।

পোষ্যপুত্র করে নামঞ্জুর করে দিয়েছেন কৃষ্ণমণি, কবে বা চলে গিয়েছেন পৃথিবী ছেড়ে, বিজয় এখন স্বর্ণময়ীর ষোল আনা।

দীক্ষা গ্রহণের পর থেকেই বিজয় 'হরিবোলা।' যে নামে পাপ হরণ করে তাই হরিনাম। দুর্গানাম কালীনামও হরিনাম। মা নামও হরিনাম।

ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজে বাৎসরিক উৎসব হচ্ছে। বেদীতে বসে গোস্বামী-প্রভু উপাসনা করছেন।

সময়টা শারদীয়া পুজোর প্রাক্কালে। পুজো আসছে তাই সর্বত্র একটা আনন্দের আভাস। মন্দিরে ও প্রাঙ্গণে অপূর্ব সমারোহ।

উপাসনায় বসে দু চার কথা বলবার পরেই ভাবাবেশে বলতে লাগলেন গোঁসাইজি : 'মা—! এই যে আমার মা এসেছেন! তাঁর কাঙাল ছেলেদের খাওয়াতে প্রসাদের থালা হাতে নিয়ে এসেছেন। মা আমাকে প্রসাদ নিয়ে সাধছেন। মা গো, আজ আমি একা পাব না, সকলকে তুমি হাতে ধরে তোমার প্রসাদ দাও, তবে আমি পাব।'

যেন প্রত্যক্ষ দেখছেন মাকে। করজোড়ে কাঁদ-কাঁদ স্বরে প্রার্থনা

করছেন। পড়ছেন ঢলে ঢলে।

ব্রাহ্মমন্দিরে এ কী ভাব! এমনটি কেউ দেখেনি। যারা দেখতে এসেছে তাদেরও ভাবোচ্ছ্বাস। আনন্দ-ক্রন্দন। ক্রমে বিপুল ব্যাকুল কোলাহল।

জয় মা, জয় মা, বলে বেদী থেকে লাফিয়ে পড়লেন গোঁসাইজি। সংকীর্তনের মধ্যে নৃত্য করতে শুরু করলেন। শুরু করলেন হুংকার-গর্জন। তার পরেই গাঢ়স্বরে হরিবোল, হরিবোল। হরিবোল বলছেন আর ঘুরে ঘুরে সকলের মাথায় হাত রাখছেন। আর কারু অস্থিরতা নেই, ভাবালুতা নেই, উন্মথিত সমুদ্র শান্ত হল। নেমে এল গম্ভীর স্তব্ধতা।

বর্ষায় বাওড়ের বাঁধ কাটা হয়েছে, গঙ্গার জল ঢুকছে হু হু করে। ওরে গেল, গেল—কে একটা ছেলে ডুবে গেল বাওড়ে।

আর্তধ্বনি আর কেউ না শুনুক, বিজয় শুনেছে। শোনা মাত্রই ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। তুলেছে শেষ পর্যন্ত। নিজের ঘাড়ে বিপদ কতখানি তার হিসেব করেনি।

'ওরে বোনো, দেখে যা, দেখে তোর নয়ন সার্থক কর।' বনমালী ভটচাযের মা ডাকছে বনমালীকে : 'তোর ছাত্র বিজয়ের কীর্তি দ্যাখ। খড়-ভাঙা স্রোতের মুখ থেকে কেমন দ্যাখ বাঁচিয়েছে ছেলেটাকে।'

'কই, কোথায় ছেলেটা?' বনমালী ব্যাকুল চোখে তাকাল এদিক ওদিক।

'ঐ যে পোলের উপর।'

বনমালী ছুটল পোলের দিকে। দেখল ছোট একটা ছেলে শুয়ে আছে, শ্বাস ফেলছে মৃদু-মৃদু আর বিজয় তার হাত পা টিপে দিচ্ছে।

'তুমি গোঁসাইদের ছেলে, তুমি আমার ছেলের পা ধোরো না।' ছেলেটার মা কাঁদছে আর বারণ করছে। 'আমরা নিচু জাত, তুমি পা ছুঁলে যে ঘোর অপরাধ হবে আমাদের।' ছেলের জীবনরক্ষার চেয়েও যেন অপরাধভঞ্জনের দায় বেশি।

ও সব কথায় বিজয়ের কান নেই। ছেলেটাকে সুস্থ করাই তার একমাত্র উদ্যোগ।

তারপর সেবার আগুন দেখা দিল।

আগুন! আগুন! গেল, গেল, সব গেল। পুড়ে খাক হল সর্বস্ব।

তাঁতিপাড়ায় আগুন লেগেছে। আর সবাই আগুন দেখ আমরা আগুন নেবাই। বিজয় তার দলবল নিয়ে ছুটল আগুনের মতো। এই সেই তাঁতি-পাড়া যেখানে রামলাল থাকে, যার সঙ্গে বিজয়ের ভাব। যাকে দেখলেই ঠাট্টা করে ছড়া কাটে বিজয় : 'তাঁতি তাঁত বুনতে মন, দুটো কেষ্ট কথা শোন।' কৃষ্ণ এসেছে আজ কৃষ্ণবর্ম্মা হয়ে। তার সংহার কথা শোনাতে।

কিন্তু আমরা তাকে বশীভূত করব। শীতল করব জল ঢেলে।

এ তো না হয় বুঝি। সেদিন একটা কলেরার রুগীকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে গোলোককিশোরের নাটমন্দিরে এনে তুলল, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে

সুস্থ করে তুলল, এ সব হৃদয়ের কথা হলেও যুক্তি-বুদ্ধির কথা। কিন্তু অনাবৃষ্টির প্রতিকারে মহাদেবকে মহাস্নান করাতে হবে এ বুজরুকি ছাড়া আর কী। তুই, বিজয়, একটা লেখা পড়া জানা ছেলে, তুই এ সব অযৌক্তি-কের মধ্যে যাস কেন?

কতদিন ধরে একবিন্দু মেঘ নেই আকাশে। চাষীরা হাহাকার করছে। গ্রামবাসীরা কত ডাকছে দেবতাকে, মমতার এতটুকু একটু আভাস নেই কোথাও। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যজ্ঞের ধোঁয়া আকাশকে আরো আতাম্র করে তুলেছে। ছন্নছাড়ার মতো ছুটোছুটি করছে সকলে, অনুপায়ের উপায় কী?

শিবমন্দিরের গাছতলায় নতুন এক সাধু এসে বসেছে, চল তার কাছে যাই। দেখি সে কিছু বলে কি না।

বিজয়কে অগ্রণী করে সবাই গিয়ে ধরে পড়ল সাধুকে। বল কিসে আকাশ দ্রব হবে। সজল-শ্যামলের স্পর্শ পাবে মৃত্তিকা।

ধ্যানস্থ হল সাধু। ধ্যানভঙ্গে বললে, মন্দিরে যে মহাদেব আছেন, অনেক দিন জল পাননি, তাঁকে মহাস্নান করাও।

চল চল শিবের মাথায় জল ঢালি। গ্রামের অগণন স্ত্রী-পুরুষ জল-পূর্ণ পাত্র নিয়ে এল। বিজয় সুক্তমন্ত্র বলে জল ঢালল প্রথমে। তারপর আর সকলে।

আদিগন্ত মেঘ করে এল। নামল সহর্ষ বর্ষণ। মাটি স্নিগ্ধ হল। বৃক্ষলতা সবুজ হল। মাঠ ভরে উথলে উঠল ফসলের ঢেউ।

সেই থেকে সেই মহাদেবের নাম হল জলেশ্বর।

'আমার অবিশ্বাস তো কিছুতেই যায় না। কী করি?' শ্রীচরণ চক্রবর্তী একদিন ধরলেন গোঁসাইজিকে।

'যাঁরা সাধন লাভ করেছেন, অবিশ্বাসের সময় তাঁদেরকে স্মরণ কোরো।' বললেন গোঁসাইজি : 'তাঁরা কিছু না কিছু পেয়েছেন বিশ্বাসের বস্তু। শুধু সেই কথাটা ধরে থেকো। তাছাড়া অবিশ্বাসের সময় যদি পাঁচ ছটি নাম করতে পারো তা হলেও বাঁচোয়া। কিন্তু এমনিই দুর্দৈব তাও কেউ করে না।'

কুঞ্জ গুহ রোগশয্যায় শুয়ে। সে বললে, 'আমি তো নাম করতেই পারি না।'

'নাম করার ইচ্ছে আছে? নাম করার ইচ্ছে হলেও হয়।' গোঁসাইজি বললেন, 'আমাদের যে যোগ তা নামের যোগ। আনন্দ না পেলে নাম করব না, যখন ভালো লাগবে তখনই কেবল করব এ ভাব ব্যবসাদারি। ভালো আমার লাগুক আর নাই লাগুক, আদেশমতো নাম করতেই হবে। নামদ্বারা ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে। ক্রুশবিদ্ধ হলেই পরে পুনরুত্থান।'

গোয়ালা শিষ্যদের বাড়ি গিয়েছে বিজয়। কিন্তু ওরা সব কোথায়? কে বললে, আপনাকে দেখে পালিয়েছে।

'কেন, কী হল? আমি কী করলাম?'

'না, আপনি নিজে কিছু করেননি। কিন্তু গোঁসাই কর্তারা ওদের ধোপা নাপিত বন্ধ করেছে। দিয়েছে একঘরে করে।'

'কেন, ওদের অপরাধ?'

'সময়মতো তিনশো টাকা দিতে পারেনি গোঁসাইদের।'

'কিসের টাকা?'

'জরিমানার টাকা।'

'সে কী, জরিমানা কেন?'

'কী এক সামাজিক অবিধি করেছিল গোয়ালারা। তাই এই শাস্তি। তিনশো টাকা জরিমানা। তখন-তখন টাকাটা দিতে পারেনি বলে এই দণ্ড।'

'কোনো ভয় নেই। ওদের আমার কাছে আসতে বলো। ধোপা নাপিত ডাকাও। ওদের সমস্ত মলিনত্বের মোচন হবে। হ্যাঁ, দায়িত্ব আমার। দণ্ড দেওয়া যদি সহজ হয়, প্রীতি দেওয়া মৈত্রী দেওয়া আরো সহজ।'

পায়ের কাছে প্রণামে লুটিয়ে পড়ল গোয়ালারা। এক থলে টাকা এনে রাখল। এতদিন ধরে যা সংগ্রহ করেছে—পাঁচশো টাকা।

'এ কী? টাকা কেন? টাকা দিয়ে কী হবে?'

'সেই জরিমানার টাকা। গোঁসাই কর্তাদের পাওনা।'

'জরিমানারও সুদ হয় বুঝি!' বিজয় হুমকে উঠল : 'খবরদার, ও টাকা আমি নিতে পারব না।'

সমাজে পতিত থাকাটা যখন উঠে গেল, তখন টাকাটা পৌঁছে না দিলে কেমন হয়! একজন পড়শীর হাত দিয়ে গোপনে পাঠিয়ে দিল টাকাটা।

বাড়ি পৌঁছুতে কর্তারা তেড়ে এলেন : 'তুই আমাদের মান-সম্মান রাখতে দিবি নে?'

'সেই মান-সম্মানের দাম এই পাঠিয়ে দিয়েছে গোয়ালারা।' বললে সেই প্রতিবেশী : 'এই পাঁচশো টাকা।'

বিজয় মাথায় হাত দিয়ে বসল। জরিমানা তো বটেই তার আবার সুদ!

টাকা পেয়ে কর্তারা মহা খুশি। বললে, 'এই টাকায় তোরও অংশ আছে।'

'কানাকড়ি অংশও আমার কাম্য নয়।' বিজয় চলে গেল রাগ করে।

একদিকে যেমন বিদ্যা, বিনয়, বৈষ্ণবতা, তেমনি আরেক দিকে চলেছে ঘোর অনাচার, দুর্নীতি, বীভৎসতা। চলেছে মদের ভরা জোয়ার। ভদ্র ঘরের মেয়েরা পর্যন্ত দাসী দিয়ে দোকান থেকে মদ কিনিয়ে এনে খাচ্ছে। শান্তিপুরের সরু সুতোর শাড়ি পরে স্নান করে উঠছে। বাবু লোকেরা ডাকাতের সর্দারি করছে, কেউ কেউ বা বেশ্যা আনছে বাড়িতে। চলেছে নগ্নিকা পুজা।

বিজয় তার দলবল নিয়ে মার-মার করে উঠল। যদি অনুরোধ না শোনে, শেষে একেবারে নিশ্বাসরোধ। যদু পাল ছোঁড়াটা খুব দুর্ব্যবহার করছে, মিষ্টি কথা কানে তুলছে না। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। বাচ খেলবি গঙ্গায়? প্রলোভন

বুঝতে পারল না যদু, এক কথায় রাজি হল। তারপর মাঝগঙ্গায় বিজয় বললে, 'প্রতিজ্ঞা কর, কু-অভ্যাস ছাড়বি জন্মের মতো, নয় হাত পা বেঁধে ফেলে দেব নদীতে।'

যদু প্রত্যাবৃত্ত হল। যদু মধু হয়ে গেল।

ঐ লোকটা ঘরে বেশ্যা এনে রেখেছে। কে লোকটা? খোঁজ নিয়ে জানল, বিজয়েরই আত্মীয়। হোক আত্মীয়, রেহাই দেব না। দলবল নিয়ে মার-মার করে ঢুকল বিজয়, মেয়েমানুষটা পালিয়ে গেল চটপট।

আর কারা এমনি পুষেছ ঘরের মধ্যে, বার করে দাও।

আর, দয়া করে আপনারা একটু স্থূল বস্ত্র পরুন। অন্তত স্নানের সময়।

কী স্পর্ধা এই গোঁসাই ছেলেটার। আমরা যা খুশি খাব পরব, তাতে ওর কী মাথাব্যথা? আমাদের তরফ থেকে উলটে কেউ ওকে ঘায়েল করতে পারে না?

তাই ঠিক হল। প্রত্যূষে বিজয় যখন স্নান করতে আসবে তখনই দেওয়া যাবে উত্তমমধ্যম। সংস্কারক সাজার বাহাদুরি বন্ধ হবে।

কিন্তু উলটা বুঝিলি রাম হল। একজনকে মারতে গিয়ে আরেকজনকে মেরে বসল।

স্ত্রী-পুরুষের ঘাট আলাদা হয়ে গেল। আর পুরুষই যদি না থাকে দেখবার, তাহলে সাজেরই বা মানে কী, অসাজেরই বা দাম কী।

বিজয়ের এক বন্ধু মদ খায়। অনেক বারণ করেছে বিজয়, কিন্তু কে কার কথা শোনে! সে দিনও ছোকরা টেনে এসেছে। আজ আর মিষ্টি কথার প্রলেপ নয়, বিজয় তার গাল বাড়িয়ে প্রচণ্ড এক চড় বসাল।

'তুই আমাকে মারলি?'

'মারলাম। বেশ করলাম।'

দুঃখে অপমানে ছোকরা দেশান্তরী হয়ে গেল।

প্রায় পঁচিশ বছর পর সেই বন্ধু ফিরেছে শান্তিপুরে। গোঁসাইজির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ডেকেছে : 'বিজয়!'

গোস্বামী-প্রভু ডাক চিনতে পেরেছে। বেরিয়ে এসে চক্ষু স্থির। 'এ কী, তুই? তোর সন্ন্যাসী বেশ?'

বন্ধু বললে, 'বিজয়, তোর সেই চড়ই আমার ধর্মজীবনের মূল। সে চড় চড় নয়, সে চড় কৃপা।'

'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে। উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা, পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। এর অর্থ কী?' জিগগেস করলে কুলদা : 'এই থেকেই তো তান্ত্রিকেরা সুরাপানের মাহাত্ম্য দেখাচ্ছে।'

গোস্বামী প্রভু বললেন, 'না। যে সুরাপানের এই ব্যবস্থা তা বাইরের সুরা নয়। না বুঝে লোকেরা ভুল করে। ভক্তিতে দেহেই এক রকম সুরা

তৈরি হয়, আর তা খেলেই অপার নেশা। তা খেলেই আর জন্ম নেই। তাই তার নাম অমৃত!'

'কী করে সুরা তৈরি হয় আর কী করেই বা খায়?'

'আমাদের যখন ক্রোধ হয় তখন রক্ত গরম হয়ে অস্বাভাবিক অবস্থায় শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। কামেও তাই। এই রকম সৎ-অসৎ সব ভাবেই মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ স্থানে এক-একরকম অনুভবে রক্তের পরিবর্তন ঘটায়। ভাব ভক্তি আনন্দেও রক্তের পরিবর্তন হয়। সে পরিবর্তনটা বেশি হলেই এক রকম রস তৈরি হয়। সে রস টাকরা দিয়ে চুঁইয়ে জিভে এসে পড়ে। ওটাকেই তান্ত্রিকেরা সুরা বলেছেন। আসলে ওটাই অমৃত।

'যে ভক্তিতে এই অমৃত তৈরি হয় তা পাই কিসে?' জিগগেস করল কুলদা : 'এই অমৃতে কি আমাদের অধিকার নেই?'

'নিশ্চয়ই আছে।' বললেন বিজয়কৃষ্ণ, 'এই অমৃত লাভ করতে হলে শ্বাসে-প্রশ্বাসে খুব নাম করো। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করতে পারলেই দেখবে ক্রমে-ক্রমে সমস্ত লাভ হচ্ছে। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।'

'মা গো, একশোটা টাকা দাও।' স্বর্ণময়ীর কাছে হাত পাতল বিজয় : 'কাশী যাব।'

'কেন, কাশী কেন?'

'বেদান্ত পড়ব।'

একশো টাকা বার করে দিলেন স্বর্ণময়ী। কাশী তখন দুর্গমের দেশ। রেল বসেনি। হয় নৌকোয় যাও নয়তো পদব্রজে। যদি পথেই মরো ভাবতে পারো কাশীতেই মরলে। মায়ের আশীর্বাদ রক্ষা করবে বিজয়কে। তার জ্ঞানের পিপাসায় বাদী হই কী করে?

সতেরো বছরের ছেলে বিজয় পায়ে হেঁটেই কাশী যাত্রা করল। মাথায় জটার মতো লম্বা চুল, কপালে তিলক, গালায় মালা। চলেছে এ এক অভিনব তীর্থঙ্কর। হ্যাঁ, সন্দেহ কী, বেদান্তই তার তীর্থ—অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

বিশেষরূপে জানলেই সত্য বলা যায়। চিন্তা না করলে জানা যায় না। শ্রদ্ধা না থাকলে চিন্তা হয় না। নিষ্ঠা না থাকলে শ্রদ্ধা হয় না। চেষ্টা না করলে নিষ্ঠা হয় না। সুখ না পেলে চেষ্টা আসে না। আর ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নেই।

ভূমা কী? অল্পই বা কী?

কখনো চটিতে কখনো ধর্মশালায় কখনো বা বৃক্ষতলে বিশ্রাম নিয়ে-নিয়ে এগুচ্ছে বিজয়। নবীন বিদ্যার্থী। বিদ্যা-তীর্থী।

পাটনা ছাড়িয়ে এক দেবালয়ে আশ্রয় পেয়েছে বিজয়। পূজারী মেদিনীপুরের এক ব্রাহ্মণ, উপযাচক হয়ে বহুমানে ডেকে এনেছে। রাত্রে এখানে থাকুন, আহারাদি করে বিশ্রাম করুন। পরদিন প্রভাতে আবার যাত্রা করবেন।

পথঘাট ভালো নয়। ডাকাতি যত্র তত্র। আর এখানকার ডাকাত লুণ্ঠন

করেই ছেড়ে দেয় না, অবলীলায় হত্যা করে।

সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু আছে তো?

তা কোন না আছে। দূরদেশে বিদ্যার্জন করতে চলেছি, একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলে চলে কী করে?

তবে থাকুন আজ এখানে। আমি অতিথির সেবা করি।

বিজয় রাজি হল।

অন্তরের গোপনে উল্লসিত হল পূজারী। ডাকাত শুধু পথেই নয়, দেবালয়েও। আর হত্যা শুধু নির্জনে অরণ্যেই হতে পারে না, হতে পারে মন্দিরে, বিগ্রহের সামনে। আর মৃতদেহ? মৃতদেহ মাটির তলায় পুঁতে ফেলতে কতক্ষণ?

কিন্তু অতিথি ঘুমিয়ে পড়ছে না কেন?

পূজারী এল গল্প করতে। অল্পে অল্পে তন্দ্রাবেশ আনতে।

'বাড়ি কোথায় আপনার?'

'শান্তিপুর।'

'নামটি জিগগেস করতে পারি কি?'

'আমার নাম বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।'

'গোস্বামী? আপনার বাবার নাম?'

'আনন্দকিশোর—'

থরথর করে কাঁপতে লাগল পূজারী। বিজয়ের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল কাঁদতে কাঁদতে। বললে, 'আমি পাপিষ্ঠ নরাধম, আমি আমার গুরুপুত্রকে হত্যা করবার আয়োজন করেছি। অতিথিকে আশ্রয় দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে খুন করে তার সর্বস্ব কেড়ে নেওয়াই আমার ব্যবসা। আজ সে ব্যবসার ইতি হল। আমাকে ত্রাণ করুন।'

বিজয়ের আর কাশী যাওয়া হল না। পূজারীই তাকে ফিরিয়ে দিল। তোমার বাবা মার দোহাই, তুমি ফিরে যাও। পথের ডাকাত বরং ভালো, মন্দিরের ডাকাতই ভয়ংকর। মন্দিরের ডাকাত ছদ্মবেশী। আর এ রকম মন্দির পথের দুইধারে।.

মার কাছে ফিরে এল বিজয়। বললে সব বিবরণ। স্বর্ণময়ী তার বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বাবা শ্যামসুন্দর তোকে রক্ষে করেছেন। পরমান্ন রেঁধে ঠাকুরের ভোগ দেব, তোর আধিব্যাধি সব কেটে যাবে।

এখন তবে কী করব?

বাল্য সহচর বন্ধু অঘোর গুপ্তকে সঙ্গে করে বিজয় চলে এল কলকাতা। অঘোরও টোলের পড়া সাঙ্গ করেছে, দুজনে কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হল। কিন্তু কলকাতায় থাকবার জায়গা কই বিজয়ের? সাঁতরাগাছিতে জেঠতুতো ভগ্নীপতি কিশোরী মৈত্রের বাসাবাড়ি, সেখানে এসে উঠল বিজয়। সেখান থেকে কলেজ করতে লাগল।

কী করে আসে কলেজে? তিন চার মাইল পায়ে হেঁটে, পরে নৌকোয় গঙ্গাপার হয়ে। কিন্তু কষ্টের কাছে নতিস্বীকারে সম্মত নয় বিজয়।

তখন কলকাতায় নতুন যুগের হাওয়া বইছে, আপাতরম্য পাশ্চাত্য সভ্যতার হাওয়া। খৃস্টান হবার হিড়িক পড়েছে, পান ভোজনের ধুম। হিন্দুধর্ম একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পা, বীভৎসতম কুসংস্কার। পাদ্রীদের কাগজে ছাত্র মাধব মল্লিক প্রবন্ধ লিখল, যদি কোনো কিছুকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ঘৃণা করে থাকি তা হচ্ছে হিন্দুধর্ম।

রামময় আর কৃষ্ণময় দুজনেই ভটচার্য, দুজনেই বিজয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এবং স্বধর্মনিষ্ঠ। কুলপুরোহিত পণ্ডিত ননী শিরোমণির দুই ছেলে। কী আশ্চর্য, তারা দুজনেই খৃস্টান হয়ে গেল।

বিজয়ও বুঝি হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানে আস্থা হারাতে শুরু করেছে।

ঘোর বৈদান্তিক হয়ে উঠেছে। জীবে ব্রহ্মে ভেদ নেই, দাঁড়াচ্ছে এসে এই ভূমিকায়। সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম। এই একমাত্র সত্য। আর আমিই যদি ব্রহ্ম হই তাহলে কাকে আর ভজন করব? উপাসনা অনাবশ্যক। ভক্তি নিরর্থিকা।

রংপুরে আমলাগাছিতে পৈত্রিক শিষ্যবাড়িতে এসেছে বিজয়। শিষ্য যথারীতি পদপূজা করল বিজয়ের। বললে, 'গুরুদেব, আমাকে উদ্ধার করুন।'

চমকে উঠল বিজয়। আমি উদ্ধার করবার কে? কী শক্তি আমার আছে যে আমি অন্যকে উদ্ধার করব? নিজে কী করে উদ্ধার পাব তার ঠিক নেই, তা পরের জন্যে ভাবনা। হাতের ক্ষমতা নেই তো পায়ের ক্ষমতা!

এই গুরুগিরি মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। আরো কত-কত শিষ্য ছিল সেই গ্রামে, তাদের কারু বাড়ি আর গেল না বিজয়। এ ব্যবসা ছেড়ে দেব। কলকাতায় মেডিকেল কলেজে ভর্তি হব, ডাক্তার হয়ে স্বাধীনভাবে স্বোপার্জিত অর্থে জীবিকানির্বাহ করব।

পথ দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ আকাশবাণী হল। 'পরলোক চিন্তা কর।'

চারদিকে বিজয় তাকাল ব্যাকুল হয়ে। কে বললে এ কথা? কী অর্থ এ কথার? পরলোক—পরলোক কেন, পরলোক কোথায়?

জ্বর হয়ে গেল বিজয়ের।

মৃত্যুর পরে কী হয়? পরলোক বলে যে সকল স্থানের কথা শোনা যায় তা কি সত্য? সকলেই কি এক জায়গায় যায়?

'মৃত্যুর পরে প্রত্যেকেই পিতৃলোকে যায়। সেখানে তার সত্যিকার কী অবস্থা তাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে ক্রমে-ক্রমে আবার তার বাসনা জন্মায়। আর বাসনা বৃদ্ধি হলেই জন্মের ইচ্ছে হয়।' বললেন গোস্বামী-প্রভু, 'জন্ম যে কেবল পৃথিবীতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। সৌরজগৎ বলে যা জানি, তেমনি সংখ্যাতীত সৌরজগৎ আছে। বিষ্ণুলোক আছে,

চন্দ্রলোক আছে, আছে তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ও সব গ্রহেও তার জন্ম হতে পারে। এ পৃথিবীতে জন্ম না হলেই কেউ মুক্ত হল এমন নয়। অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহেও থাকবার মতো বাসস্থান আছে। স্ত্রী-পুরুষ আছে। এই পৃথিবীর স্ত্রী-পুরুষের মতোই তাদের সম্পর্ক নয়, তবে তারাও মোহের অধীন। সেখানেও বাসনা, আবার সেই বাসনার তারতম্যে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে জন্ম। তাই নানা প্রকার পরলোক।'

যমুনার তীরে কালীদহের কাছে এক প্রেত মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। বললে, 'প্রভু, রক্ষে করুন, আর এ যন্ত্রণা সইতে পারছি না।'

'কোন পাপে আপনার এ দণ্ড?' জিগগেস করলেন গোঁসাইজি।

'মন্দিরে পূজারী ছিলাম। ঠাকুর সেবার সমস্ত অর্থ ভোগ বিলাসে উড়িয়েছি—'

'আপনার শ্রাদ্ধ হয়নি?'

'না। দয়া করে আমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়ে দিন।'

'কী করে করব?'

'শ্রাদ্ধের খরচের জন্যে দেড় হাজার টাকা রেখেছিলাম ভাইপোর কাছে। সেও বুঝি সেই টাকা ফুঁকে দিয়েছে।'

ভাইপোকে খবর করা হল। টাকা বের করে দিল। প্রেতের শ্রাদ্ধশান্তি হল। হল সেই মন্দিরের বিগ্রহের মহোৎসব।

॥ ৫ ॥

সংস্কৃত কলেজে পড়তে পড়তে বিজয়ের বিয়ে হয়ে গেল। বিজয়ের বয়েস আঠারো আর যোগমায়ার বয়েস ছয়।

শিকারপুরের কাছেই দহকুল গ্রাম। শিকারপুরে পিত্রালয়ে এসেছেন স্বর্ণময়ী, শুনতে পেলেন দহকুলের রামচন্দ্র ভাদুড়ি অকালে মারা গেছে। দুটি শিশুকন্যা নিয়ে বড়ই আতান্তরে পড়েছে তার স্ত্রী, মুক্তকেশী।

কেন কে জানে, প্রাণে দয়া এল, স্বর্ণময়ী স্বচক্ষে দেখতে গেলেন। দারিদ্র্যের একশেষ। মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন প্রথমে। কিন্তু শুধু মাসোহারায় কী হবে?

বড় মেয়েটি লাবণ্যের ছবি, শ্যামাঙ্গী, আনন্দনির্ঝর। সুলক্ষণা। একেই তবে আমার বিজয়ের বউ করে আনি।

শান্তিপুর থেকে বরযাত্রী গেল দুজন। দাদা ব্রজগোপাল আর এক বয়স্ক জ্ঞাতি, বরকর্তা হয়ে। বেশি লোক গেলে মুক্তকেশী সামলাবে কী করে?

যোগমায়া একাই পতিগৃহে এল না। তার মা আর তার ছোট বোনকেও

স্বর্ণময়ী আনালেন নিজের কাছে, নইলে তাদের দেখবে শুনবে কে? খেতে-পরতে দেবার মতো আর লোক কই?

বালিকা যোগমায়া খেলছে নিজের মনে, হঠাৎ কী খেয়াল হল, ছুটে চলে এল বিজয়ের কাছে। ভীষণ খটকা লেগেছে তার, এখুনি সমাধান চাই।

'আমি তোমায় কী বলে ডাকব?' মুখ যথাসাধ্য গম্ভীর করে জিগগেস করল বালিকা।

সত্যিই কঠিন সমস্যা। মা দাদা দিদি—সবাইকে কিছু না কিছু ডাকা যায়, কিন্তু তোমাকে ডাকি কী বলে?

বহু শাস্ত্র-পুরাণ পড়া পণ্ডিত বিজয়, তার মুখ আরো গম্ভীর। বললে, 'তুমি আমাকে আর্যপুত্র বলে ডাকবে।'

তাই সই। আর্যপুত্র বলেই সম্বোধন করেছে যোগমায়া।

কলকাতায় সুকিয়া স্ট্রিটের বাসায় প্রত্যহ নির্জনে যোগমায়া দেবী গোঁসাইজির চরণ পুজো করছেন। প্রথমে চরণে তুলসী চন্দন দেন, পরে মাথায় ফুল-তুলসী দিয়ে কপালে এঁকে দেন চন্দনের ফোঁটা। তারপর মুখে কিছু তুলে দেন মিষ্টি। তারপর প্রণাম করেন সাষ্টাঙ্গে। নিত্যকার এই পুজো না করে জলগ্রহণ করেন না।

সারারাত বাতাস করেন গোঁসাইজিকে। আর শোনেন গোঁসাইজির শরীর থেকে কী একটা মধুর শব্দ বার হচ্ছে।

কী এই শব্দ?

'এরই নাম অনাহতধ্বনি।' বললেন গোঁসাইজি : 'এ শুধু সাধকদের শরীর থেকেই বার হয়। এ শব্দ এত মধুর যে শুনতে পেলে সাপ একেবারে শরীর বেয়ে উঠে পড়ে।'

স্বর্ণময়ী বললেন, 'এবার একবার সাতশিমলার হারাধন নন্দীর বাড়ি ঘুরে আয়।'

সাতশিমলা বগুড়া জেলায়, সেখানে গিয়ে হাজির হল বিজয়। সেখানে কাজ সেরে চলে এল সদরে, তিনজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। ব্রাহ্মদের সম্পর্কে বিজয়ের কোনো উচ্চ ধারণা ছিল না। শুনেছিল তারা যা-তা করে, যা-তা খায়। কিন্তু এই তিন জনকে দেখে—কিশোরীলাল রায়, হারাধন বর্মন আর গোবিন্দচন্দ্র দাস—তার ধারণা বদলে গেল। তারা বললে, এবার কল-কাতায় ফিরে গিয়ে মহর্ষি দেবেন ঠাকুরকে দেখো, আর যদি পারো তো তাঁর উপাসনাটা শুনো।

কলকাতায় ফিরে এসে নতুন বিপদে পড়ল বিজয়। এক বন্ধু তার সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে পালাল। হাতে একটিও পয়সা নেই, কী করে? কোথায় যায়? কে আশ্রয় দেয়? বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে গেলে কেমন হয়? কে বললে, ভদ্রসন্তানদের কাছে অনেক ঠকেছেন বলে উনি আর বাড়িতে কাউকে স্থান দেবেন না বলে সংকল্প করেছেন। তবে, যা থাকে কপালে, দেবেন

ঠাকুরের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি।

মুখে সব বলা সম্ভব না হতে পারে তাই বিজয় একখানা আবেদনপত্র লিখল। ভয়ে-ভয়ে তাই পাঠিয়ে দিল মহর্ষির কাছে। না পড়েই মহর্ষি তা ছিঁড়ে ফেলল। যে লোকটা দরখাস্ত নিয়ে গিয়েছিল সেই এসে বললে।

শুনে বিশেষ ক্ষোভ বা রাগ হল না বিজয়ের। বগুড়ার বন্ধুদের কাছে সে শুনেছিল মহর্ষির মতো এমন লোক হয় না, তিনি যে দরখাস্তটা ছিঁড়ে ফেললেন, এ শুধু আগে-আগে এমনি আবেদন-নিবেদনে প্রতারিত হয়েছেন বলে। নইলে যদি দেখতেন বিজয়কে, জানতেন তার কী হাল, তাহলে কি থাকতেন বিমুখ হয়ে?

তবে আর কী উপায়! দীর্ঘ দিন উপবাস, রাত্রে সংস্কৃত কলেজের বারান্দায় শুয়ে থাকা। এমনি করে কাটল দু দিন। বন্ধুবান্ধব তো আছে এখানে-সেখানে, কিন্তু এখন এ অবস্থায় গেলে তাদের অবজ্ঞা হবে, বন্ধুতা আর থাকবে না। দেখি, আরো একদিন দেখি।

তিনদিনের দিন পথচারী এক ভদ্রলোকের মায়া হল। 'খাওনি বুঝি কদিন?' বলে একটা সিকি বিজয়ের হাতে দিল।

এমন সময় আয় তো আয়, সেই চোর বন্ধুটি এসে উপস্থিত। শুকনো মুখ, ম্লান বেশ, ক্লেশ-কষ্টের প্রতিমূর্তি।

'কী রে, তোর এমন অবস্থা?' জিগগেস করল বিজয়।

'কত দিন খাইনি।'

'টাকা পয়সা কী হল?'

'কিছু নেই। সব জুয়ো খেলায় উড়ে গিয়েছে।'

'আমার কাছে চার আনা পয়সা আছে। তাই দিয়ে খাবার কিনে ভাগা-ভাগি করে খাই, আয়।'

সর্বস্বাপহারক বন্ধুকে ক্ষমা করতে এতটুকু বাধল না বিজয়ের।

তখন দুজনে বেচু চাটুজ্জের বাড়িতে একখানা ঘর ভাড়া করে রইল।

'ভালোই করেছ, একজন নতুন সভ্য জোগাড় করে এনেছ।' বেচু চাটুজ্জে পাঁড় মাতাল, সুরাপান মহাসভার সভাপতি। সাকরেদকে বললে, 'দাও, একে একপাত্র পরিবেশন করো।'

তখনকার দিনে মদ না খাওয়াটা দারুণ অসভ্যতা, সমস্ত শিষ্টতা শালীনতার বাইরে। যে মদ খায় না সে নিতান্ত সেকেলে, পাড়াগেঁয়ে, অপদার্থ। কিন্তু বেচু চাটুজ্জের দল কিছুতেই বিজয়কে মদ খাওয়াতে পারল না। বরং উলটে তারা বিজয়ের মুখের গালাগাল খেতে লাগল। পাষণ্ড, কুলাঙ্গার, আমি মদ খাই না বলে আমাকে অসভ্য বলো? তোমরা তো ভূতপ্রেত।

তার চেয়ে চলো যাই ব্রাহ্মসমাজে। মহর্ষির উপাসনা শুনে আসি।

কেমন সুন্দর আলো জলছে। ভিতরে, তান-লয়ে শুদ্ধ কেমন গান হচ্ছে, ভক্তিতে ভরপুর স্তবপাঠ হচ্ছে, কেমন সবাই বসেছে শান্ত হয়ে—বিজয়ের

মনে হল স্বর্গধাম বুঝি একেই বলে। আশ্চর্য, এরও লোকে নিন্দে করে।

আর কী অপূর্ব সুন্দর বলছেন মহর্ষি। বলবার বিষয়ও আন্তরিক। পাপীর দুর্দশা আর ঈশ্বরের করুণা!

সহসা আগের ভক্তিভাবের কথা মনে পড়ল বিজয়ের। হৃদয় হাহাকার করে উঠল। কত, কত দিন ইষ্টদেবতার পুজো করিনি, ডাকিনি প্রাণের থেকে। কী করে বেঁচেছিলাম এতদিন? নিজেকে হঠাৎ নিতান্ত নিরাশ্রয় মনে হল, চোখ ছাপিয়ে নেমে এল অশ্রু। অজানতে প্রাণের মধ্যে পুঞ্জীভূত হল প্রার্থনা। দয়াময়, ধর্ম সম্বন্ধে আমার মতো হতভাগ্য বোধহয় আর কেউ নেই। আগে ইষ্টের পুজোয় কত আনন্দ পেতাম, এখন সে আনন্দ আমাকে ছেড়ে গেছে। কেন আমার আগের সেই বিশ্বাস তুমি হরণ করেছ? শুনলাম তুমি অনাথের নাথ, অকূলের কূল, তবে তোমাকেই শরণ নিলাম। তুমি আমাকে রাখো আর না রাখো আমি আর কোথাও যাব না। তোমার দুয়ারেই পড়ে থাকব।

মনে-মনে মহর্ষিকেই গুরু বলে মানল বিজয়।

কী বলছে ব্রাহ্মরা?

বলছে, পরমেশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। নিরাকার, সর্বব্যাপী, অন্তর্যামী। সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত কল্যাণ ও করুণার আধার। কল্যাণ ও করুণা পাবার একমাত্র উপায় প্রার্থনা, কোনো মন্ত্রতন্ত্রের দরকার নেই। পরমেশ্বর আর সাধকের মধ্যে গুরু নিরর্থক। সরল ও ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করো, আর স্থিরচিত্তে লক্ষ্য করো তিনি অন্তরে কী প্রেরণা দিচ্ছেন। সে প্রেরণাই তাঁর আদেশ আর সেই আদেশ প্রতিপালনই ধর্মজীবন। নিরন্তর পরমেশ্বরের সহবাস ও তাঁর প্রিয়কার্য সাধনরূপ সেবাই একমাত্র লক্ষ্য। আমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে, অসত্য থেকে সত্যে, মৃত্যু থেকে অমৃতত্বে নিয়ে যাও। হে সত্যস্বরূপ, তোমার সত্য শিব সুন্দর রূপ আমাদের কাছে প্রকাশ করো।

নিয়মিত প্রার্থনা করতে লাগল বিজয়, আর অন্তরে যে সব সাড়া আসতে লাগল, যেসব উপলব্ধি তা ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ করলে। আর তাই একদিন ছেপে দিল 'ধর্মশিক্ষা' বলে।

শান্তিপুরে এল বিজয়। বসল তার নতুন তত্ত্বের আলোচনায়। ঈশ্বর যদি সকলের পিতা, তাহলে জাতিভেদ থাকে কী করে? এক বাপের ছেলে-দের কি আলাদা আলাদা জাত হয়? সকলের মধ্যেই যখন ঈশ্বর, তখন মানুষের মধ্যে আর উঁচু-নিচু কী! কী করে একজন আরেকজনকে ঘৃণা করে?

'তবে মশাই তুমি গলায় পৈতে রেখেছ কেন?'

চমকে উঠল বিজয়। তাকিয়ে দেখল একটা এগারো-বারো বছরের ছেলে মুখিয়ে আছে। 'এদিকে জাতিভেদ মানো না, তবে ঐ জাতিভেদের নিশানটা গলায় ঝুলিয়েছ কেন?'

সত্যিই তো! ঠিক বলেছে বালক। বিজয় তখুনি গলার পৈতে ফেলে দিল ছুঁড়ে।

স্বর্ণময়ী ছুটে এলেন। 'এ তুই কী করেছিস? শিগগির পর ফের পৈতে।'

বিজয় রাজি হল না! যা অসত্যের প্রতীক তা রাখব না কিছুতেই।

স্বর্ণময়ী গলায় দড়ি দিতে ছুটলেন। তখন মাকে নিরস্ত করবার জন্যে পৈতে কুড়িয়ে নিল বিজয়।

চলো মহর্ষির কাছে গিয়ে দীক্ষা নিই। দীক্ষা না নিলে ধর্মভাব উচ্চারিত হয় না।

তার আগে বৃত্তি ঠিক করো। গুরুগিরি করে জীবিকার্জন করা পোষাবে না। তার চেয়ে ডাক্তার হই। লোকসেবা আর টাকা রোজগার দুইই হবে। মায়ের অনুমতি চাইতে বিজয় গেল শান্তিপুর। স্বর্ণময়ী আপত্তি করলেন : 'গোস্বামী সন্তান হয়ে কী করে মড়া কাটবে?'

'বা, শরীরতত্ত্ব জানতে হবে না?'

'মড়াকাটা যে ম্লেচ্ছাচার।'

'যে জ্ঞানে লোকসেবা হবে তা অর্জন করতে যা সাহায্য করে তা অশুচি হয় কী করে?' বিজয় তার সংকল্পে দৃঢ় রইল।

অবশেষে স্বর্ণময়ী সম্মত হলেন।

মেডিকেল কলেজের বাংলা বিভাগে ভর্তি হল বিজয়। পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, 'নেটিভ ডাক্তার' হয়ে গ্রামে গিয়েই বসবে।

এবার তবে চলো যাই মহর্ষির কাছে। বিজয় একা নয়, সঙ্গী হল অঘোর গুপ্ত আর গুরুচরণ মহলানবিশ।

তিনজনেই দীক্ষা নিল। কিন্তু কই মহর্ষি তো উপবীত ত্যাগ করতে উপদেশ দিলেন না।

উপবীতে অশান্তি হতে লাগল বিজয়ের। প্রার্থনা করার সময় বুক কাঁপে, পৈতে যেন সাপের মতো দংশন করছে নিরন্তর। এ তো অসত্য ব্যবহার। অসত্য ব্যবহারে কি দর্শন মেলে ঈশ্বরের?

'উপবীত রাখা কি উচিত হচ্ছে?' সরাসরি মহর্ষিকেই জিগগেস করল বিজয়।

'নিশ্চয়ই হচ্ছে। না রাখলে সমাজের অনিষ্ট।' বললেন মহর্ষি।

'কিন্তু—'

'এই দেখ না আমি রেখেছি।' মহর্ষি নিজের গলার উপবীত দেখালেন।

'আর মাছ-মাংস খাওয়া কি ঠিক?' বিজয় আবার প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়ই ঠিক। মাছ-মাংস না খেলে শরীর রক্ষা হবে কী করে?'

'কিন্তু—'

'মশা ছারপোকা যখন মার তখন অন্য জীবহত্যায়ই বা আপত্তি

কিসের ?'

মহর্ষির উত্তরে সন্তুষ্ট হল না বিজয়। ভাবল, ব্রাহ্মদের এ এক কুসংস্কার। কিন্তু তাই বলে যে-মহর্ষি তাকে পাপ-কূপ থেকে উদ্ধার করলেন তাঁকে এই বিপরীত মতের জন্যে ত্যাগ করা যায় না।

মেডিকেল কলেজের পড়া শেষ হয়েছে, উপাধি পরীক্ষা নিকটবর্তী, এমন সময় কলেজে গোলমাল বাধল। কলেজের ওষুধ চুরি করেছে এই মিথ্যা অভিযোগে কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ চিবার্স বাঙলা বিভাগের একটি ছাত্রকে পুলিশে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সমস্ত জাত ধরে গালাগাল দিয়েছে বাঙালিদের। ছাত্রের দল বিক্ষুব্ধ হল আর বিজয়ের নেতৃত্বে বেরিয়ে এল কলেজ ছেড়ে। ছাত্রসমাজে এই প্রথম ধর্মঘট। যারা গোড়ায় ধর্মঘটে যোগ দেয়নি তাদের উত্তেজিত করবার জন্যে বিজয় গোলদিঘিতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিল। আর সে বক্তৃতা এত তপ্ত-দীপ্ত যে বাকি ছাত্ররাও এসে হাত মেলাল। ছাত্র ছাড়া কলেজ খাঁ খাঁ করতে লাগল।

বিরোধ যখন চরমে উঠেছে তখন বিজয় ছাত্রদের হয়ে বিদ্যাসাগরের সাহায্য চাইল। বিদ্যাসাগর ছোটলাট বিডন-এর কাছে চিঠি লিখলেন। বিডন চিবার্সকে বললেন, ছেলেদের কাছে দুঃখপ্রকাশ কর আর বিনাদণ্ডে ওদেরকে ফিরিয়ে নাও কলেজে।

আদেশ পালন করল চিবার্স। ওষুধ চুরির মামলাও তুলে নেওয়া হল।

কিন্তু বিজয় সেই যে কলেজ ছাড়ল আর ঢুকল না।

শুধু এক লাভ, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল।

বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়' লিখেছেন কিন্তু তাতে ভগবানের কথা নেই।

'যিনি সমস্ত বোধের উৎস, প্রকৃত বোধোদয়ের যিনি প্রধান অবলম্বন, সেই ভগবানের কথাই নেই আপনার বইয়ে?' বিদ্যাসাগরকে ধরল বিজয়।

বিদ্যাসাগর হাসলেন। বললেন, 'বইয়ের পরের সংস্করণে ঢুকিয়ে দেব ঈশ্বরকে।'

পরের সংস্করণে ঈশ্বর দেখা দিল। কিন্তু প্রথমে 'পদার্থ,' পরে 'ঈশ্বর'।

'ভগবানের কৃপাই সার। আর কিছুই কিছু নয়।' বলছেন গোস্বামী প্রভু : 'সাধন ভজন শুধু জেগে থাকবার জন্যে, যেন তাঁর কৃপা এলে ধরতে পারি। নইলে সাধন ভজন করে কার সাধ্য তাঁকে লাভ করে? নিজের তৃপ্তির জন্যেও লোকে সাধন ভজন করে বটে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় অন্নজল না পেলে মানুষ যেমন অস্থির হয়, নামের অভাবে পুজোর অভাবেও তেমনি কষ্ট। তাই নামার্চনা না করে থাকা যায় না। কর্ম শেষ না হলে তাকে পাওয়া যায় না এই বা কে বলে? কর্ম শেষ হতে আর কী লাগে! তাঁর কৃপা হলে মুহূর্তে শেষ হয়ে যায় প্রারব্ধ। মহারাণী যখন এম্প্রেস হলেন একটি হুকুমে কত শত কয়েদীর বহুকালের মেয়াদ একেবারে খালাস হয়ে গেল। ভগবানের কৃপাই সব। আর কিছুই কিছু নয়। শুধু তাঁর কৃপার জন্যে কাতর ভাবে

তাঁরই দিকে তাকিয়ে থাকো।'

বিদ্যাসাগর যখন রোগশয্যায় গোঁসাইজি তখন ঢাকায়, গেণ্ডারিয়া আশ্রমে। বিদ্যাসাগর বহুমূত্রে আক্রান্ত এমনি একটা কথা বেরিয়েছিল কাগজে, আর বিদ্যাসাগর তখুনি প্রতিবাদ করে জানিয়েছিলেন, আমার চৌদ্দপুরুষেও বহুমূত্র রোগ নেই।

সবাই ভেবেছিল, ভালোই আছেন, ভয়ের কিছু নেই।

কিন্তু সেদিন দুপুর প্রায় একটার সময় সমাধি ভঙ্গের পর গোঁসাইজি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন, পশ্চিমের খোলা দরজার মধ্য দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টে, আর বলতে লাগলেন : 'আহা কী সুন্দর! কী সুন্দর! সোনার রথে কী শোভা। হলদে রঙের পতাকা উড়ছে। হলদে রঙের ছটায় সারা আকাশ ঝলমল করছে। দেবকন্যারা চামর দোলাচ্ছে, অপ্সরারা নৃত্য করছে, গান করছে। আহা, কত আনন্দ! গুণের সাগর বিদ্যাসাগরকে নিয়ে ওঁরা চলেছেন আকাশপথে। মহাপুরুষ আজ পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গে চললেন। হরিবোল! হরিবোল!'

সকলে ভাবল ভবিষ্যতে যা ঘটবে বুঝি তারই ছবি দেখছেন গোঁসাইজি। কিন্তু, না, পরে খবর এল ঐ দিনই দেহ রেখেছেন বিদ্যাসাগর।

মেডিকেল কলেজের কয়েকজন ছাত্র 'হিতসঞ্চারিণী' নামে এক সমিতি করেছে। তার মন্ত্র হচ্ছে : যা সত্য বলে বুঝব তাই পালন করব। জীবনান্ত হলেও কপটাচরণ করব না। যদি পাপ বলে কিছু থাকে তবে তা কাপট্য।

সন্দেহ কী, জাতিভেদ মিথ্যাচার। আর উপবীত সে জাতিভেদের চিহ্ন। সতরাং বিজয় উপবীত ত্যাগ করল। সেই মর্মে চিঠি লিখে দিল বাড়িতে।

শান্তিপুরে ছি ছি পড়ে গেল। এ কী কাণ্ড! কই দেবেন ঠাকুর তো উপবীত ছাড়েনি। তুই এমন কী ব্রেহ্মজ্ঞানী হয়েছিস!

কিন্তু কেউ-কেউ আবার ধন্য ধন্য করল বিজয়কে। বললে, একেই বলে সত্যসন্ধ। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশ' কাগজে বিজয়কে অভিনন্দন জানাল। উপবীত ত্যাগের বিরোধী বলে ব্রাহ্মসমাজকে নিন্দা করলে। সত্যের মর্যাদা রাখাই প্রধান কর্তব্য। বিজয় যে তা রেখেছে, অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে দৌর্বল্য প্রকাশ করেনি এ জন্য তাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করা উচিত।

কেশব সেন ধর্মোন্নতির জন্যে 'সঙ্গত সভা' করেছে। নিমন্ত্রণ নেই, তা না হোক, বাৎসরিক উৎসবসভায়, কেশবের কলুটোলার বাড়িতে, হাজির হয়েছে বিজয়। এই তার প্রথম কেশবকে দেখা।

উৎসবে 'অনুষ্ঠান' নামে একটা পুস্তিকা উপহার পেয়েছে বিজয়। দেখল তাতে উপদেশের মধ্যে আছে— 'উপনয়নের সময় উপবীত গ্রহণ করবে না।'

তা হলে উপবীত ত্যাগ এরা সমর্থন করে! তবে আর দ্বিধা নেই, 'সঙ্গত সভা'য় নাম লেখাল বিজয়। ধীরে ধীরে কেশবের বন্ধু হয়ে গেল।

মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়ে ডিপ্লোমা নিয়ে বিজয় শান্তি-

পুরে ফিরল। কিন্তু সেখানে সে টিকতে পারে এমন মনে হয় না।

পৈতে ত্যাগ করেছে বলে সবাই বিজয়ের উপর খঙ্গ হস্ত। পদে পদে অপমান। পথে বেরুলে কেউ গাল দেয় কেউ ধুলো দেয় কেউ বা একেবারে মারমুখো হয়ে ওঠে। সেদিন তো কে একজন ছাদ থেকে জুতোর মালা ছুঁড়ে মারল বিজয়ের গলা লক্ষ্য করে। কীর্তনের সভায় বিজয়ের ভাবাবেশ হয়েছে, কে একজন একটা জ্বলন্ত চিমটে বিজয়ের গায়ে চেপে ধরল। এমনি কত শত অত্যাচার। সব অম্লান মুখে সহ্য করল বিজয়।

স্বর্ণময়ী এসে কেঁদে পড়লেন। একটা পৈতে কাছে রেখে পা চেপে ধরলেন ছেলের।

মায়ের এই কাণ্ডে বিজয় মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

মূর্ছাশেষে বললে, 'আমাকে আবার যদি পৈতে নিতে বাধ্য কর আমি ঠিক আত্মহত্যা করব। যত বড়ই প্ররোচনা হোক, আমি কিছুতেই অসত্যকে ধারণ করব না।'

স্বর্ণময়ী বুঝলেন বিজয়ের এবার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। তাই তিনি এবার গোঁ ছেড়ে দিলেন। বললেন : 'পৈতে নেবার আগে যেমন তুই ছিলি, মনে করব এখনো তুই তেমনি আছিস। তুই তেমনি থাক।'

শান্তিপুর এত সহজেই ছাড়ল না বিজয়কে। ব্রজগোপালকে দিয়ে সভা ডাকাল। সভায় সিদ্ধান্ত হল, ধর্মদ্রোহীকে বিতাড়িত করো। শুধু গৃহ থেকে নয়, গ্রাম থেকে।

সেই মর্মে বিজয়ের উপর হুকুম জারি হল।

কিন্তু যাবার আগে শান্তিপুরে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করে যাব। দেখবে শ্যামসুন্দরের মন্দিরই কালক্রমে ব্রাহ্মমন্দিরে পরিণত হবে।

সবাই একে-একে ত্যাগ করল বিজয়কে। শুধু একজন করল না। সে সেই ভগ্নীপতি কিশোরীলাল মৈত্র। কিশোরীলাল তার পটলডাঙার বাসায় বিজয়কে নিয়ে এল। বিজয় শুধু একা এল না, তার স্ত্রী আর শাশুড়ীকেও সঙ্গে নিলে। কিশোরীলালও ব্রাহ্ম হয়েছে। ছেলেকে হিন্দুমতে বিয়ে দিতে রাজি হল না। রাজি হলে হাজার টাকা পেতে পারত অনায়াসে, কিন্তু সত্যের অনুরোধে সে টাকা সে তুচ্ছ করে দিলে।

নিদারুণ সাংসারিক কষ্টে পড়েছে কিশোরীলাল, কিন্তু কিছুতেই তার ধৈর্যচ্যুতি নেই, সংশয় নেই ঈশ্বরে। ধর্মের জন্যে হাসিমুখে মানুষ কত সহ্য করতে পারে—কিশোরীলাল তারই মহৎ প্রতিচ্ছবি!

বিজয়কৃষ্ণ বললে, 'এ'দের কষ্টের কাছে আমার যন্ত্রণা যৎসামান্য বলে মনে হচ্ছে।'

'সঙ্গত সভা'য় গিয়ে বিজয় শুনতে পেল ব্রাহ্মসমাজে প্রচারকের অভাব। যশোর জেলার বাগআঁচড়া গ্রামের কতগুলো লোক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করবার জন্যে উৎসুক হয়েছে, লিখছে 'সঙ্গতসভা'য়, কিন্তু এমন কেউ উপযুক্ত নেই যে সেখানে পাঠানো যায় প্রচারক হিসাবে।

বিজয় বললে, 'আমি যাব।'

তখন তার কলেজের শেষ পরীক্ষা অত্যন্ত কাছে, কেউ-কেউ তাকে নিরস্ত করতে চাইল, বললে, নৌকো পারের কাছে এনে ডুবিয়ে দিলে চলবে কী করে! শেষ পরীক্ষায় পাশ না করলে খাবে কী? সংসার চালাবে কী দিয়ে?

'ঈশ্বর চালাবেন।'

'তুমি না চালালে ঈশ্বর চালাবেন কেন?'

'যিনি মরুভূমিতে তৃণকণা বাঁচিয়ে রাখেন, সমুদ্রের গহনে বাঁচিয়ে রাখেন প্রাণকণা, তিনিই অনাহারে এক দুঃখী পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখবেন—এতে আশ্চর্য হবার কী আছে?' বললে বিজয়। কেশবচন্দ্রের কাছে গিয়ে প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করল : 'আমি যাব প্রচারক হয়ে।'

কেশব বললে দৃঢ়স্বরে, 'যাব বললেই যাওয়া হয় না। প্রচারক যে হবে তোমার যোগ্যতা কী।

'পরীক্ষা নিন।'

'হ্যাঁ, পরীক্ষাই দিতে হবে তোমাকে। লৈখিক আর মৌখিক দুরকম পরীক্ষা।'

'তাই দেব।'

সসম্মানে উত্তীর্ণ হল বিজয়।

তবু ছাড়া পেল না তক্ষুনি। কেশব বললে, 'গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আয়ত্ত করতে হবে।'

দু মাসে আয়ত্ত করল বিজয়।

কেশব বললে, 'দেবেন ঠাকুরের সঙ্গে গিয়ে দেখা করো।'

দেখে-শুনে খুশি হলেন দেবেন্দ্রনাথ। প্রচারক বলে স্বীকার ও গ্রহণ করলেন বিজয়কে। বললেন, 'আমার লেখা এই সংস্কৃত গ্রন্থ ব্রাহ্মধর্ম অধ্যয়ন করো।'

তথাস্তু। অধ্যয়ন শেষ করল বিজয়।

এবার তবে কলকাতায় আর কলকাতার কাছাকাছি জায়গায়, কোন্নগরে শ্রীরামপুরে প্রচার শুরু করো। তারপর যাও এবার বাগআঁচড়ায়।

প্রচারকের জন্যে একটা মাসোয়ারি মাইনে ঠিক করতে চাইলেন মহর্ষি। বিজয় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। ধর্মপ্রচারব্রতে পার্থিব লাভালাভের কথা অবান্তর। তবে খালি-হাতে খালি-পেটেই পাড়ি জমাও।

ম্যালেরিয়ায় উজাড়-হয়ে-যাওয়া গ্রাম বাগআঁচড়া। অথচ রোগে-শোকে গ্রামবাসীদের ধর্মবল স্তিমিত হয়নি। নয় দিনে তেইশটি পরিবারকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করল বিজয়। শুধু দীক্ষা নয়, শিক্ষা দিতে বসল। সকালে ডাক্তারি সেরে দুপুরে মাস্টারি, আবার রাত্রে নাইট-ইস্কুল। দিবানিশি জনহিতচেষ্টা। ঈশ্বরের করুণার কথা যেমন বলছে তেমনি আবার বলছে মানুষের করণের কথা। পরাকৃপা পাবার আগে আত্মকৃপা করো।

প্রাণনাথ মল্লিক বললে, 'মশাই, ব্রাহ্ম তো হলাম, কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজে এই কাপট্য কেন?'

'সে আবার কী?'

'ব্রাহ্মমতে উপবীত ধারণ করা তো মহাপাপ। তবে কলকাতার উপাচার্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ আর বেচারামবাবু কী করছেন? উপবীত ত্যাগ না করেই বেদীর কাজ করছেন। এটা কি কপটতা হচ্ছে না?'

ঠিক কথা। বিজয় কেশবের কাছে নালিশ করে পাঠাল। স্বয়ং উপাচার্যরাও যদি উপবীতধারী থাকে তাহলে সে-ব্রাহ্মসমাজ অসত্যের আলয় বলে সে ত্যাগ করবে।

কেশব সে চিঠি দেবেন ঠাকুরকে দেখাল। দেবেন্দ্রনাথ সমর্থন করল বিজয়কে। নিজেও তখন তিনি উপবীত ছেড়েছেন। বললেন, 'তুমি দুজন উপবীতত্যাগী ভক্তবক্তা আমাকে জোগাড় করে দাও, আমি তাদেরই বেদীর কাজে নিযুক্ত করব।'

দুজন নির্বাচিত হল। একজন অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, আরেক জন বিজয়কৃষ্ণ।

কলকাতায় ফিরল। খোদ বেদীতে গিয়ে বসল। দেবেন ঠাকুর আশীর্বাদ করে দিলেন।

'সম্পদে-বিপদে স্তুতি-নিন্দায়, মানে-অপমানে অবিচলিত থেকে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার করবে। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার শরীর বলিষ্ঠ হোক, অভিপ্রায় মহান হোক, ধর্ম নিঃস্বার্থ হোক, হৃদয় পবিত্র হোক। জিহ্বা মধুময় হোক, তোমার চক্ষু ভদ্ররূপ দর্শন করুক।'

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর দৌহিত্রের নামকরণের উপলক্ষ্যে বিজয়কে উপাচার্যের কাজ করতে অনুরোধ করলেন। সেই মর্মে চিঠি লিখলেন দেবেন্দ্রনাথ, সঙ্গে পাঠালেন একখানি গরদের ধুতি ও সোনার আংটি। ধুতি আর আংটি কেন? পুরোহিতের দক্ষিণা? ক্ষেপে গেল বিজয়। ধুতি আর আংটি তক্ষুনি প্রত্যর্পণ করল। প্রতিবাদ জানাল উত্তরে। এ ভাবে যদি পুরুতি হালচাল চলে আসে তাহলে ব্রাহ্মসমাজের বৈশিষ্ট্য রইল কোথায়?

দেবেন্দ্রনাথ বিজয়ের উপর বিরক্ত হলেন।

একদিন বললেন, 'যেখানে যেতে বলব সেখানেই তোমাকে যেতে হবে।'

'প্রচারের কাজে?'

'হ্যাঁ। যখন যেখানে পাঠাব। তুমি প্রস্তুত থাকবে সব সময়।'

'সব সময়ে আপনার আদেশই শিরোধার্য করতে হবে?'

'তা ছাড়া আর কী।'

'ঈশ্বরের আদেশ শুনব না?' বিজয়কে স্পষ্ট ও দৃঢ় শোনাল : 'ঈশ্বরের আদেশ যদি বিপরীত হয় তা হলে?'

দেবেন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন।

'প্রচার কার্যে যাওয়া ঈশ্বরের আদেশ অনুসারেই হওয়া উচিত। প্রচারের মধ্যে যেন সংসারের প্রভুত্ব না ঢোকে।'

বিজয়ের স্বাধীনচিত্ততায় খুশি হলেন দেবেন্দ্রনাথ। কথা ঘুরিয়ে নিলেন। বললেন, 'বুড়ো হয়েছি তো, সব জায়গায় যেতে পারি না। যেখানে যাবার শখ অথচ যেতে পাচ্ছি না, ইচ্ছে, সেখানে তুমি যাও, সেখানেই তোমাকে পাঠাই। সে কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম। নইলে তুমি স্বাধীন ভাবে ঈশ্বরের সত্য প্রচার করবে তার চেয়ে আর আনন্দ কী।' দেবেন্দ্রনাথ আত্মতন্ময়ের মতো বললেন, 'বীজ বপন করো, ঈশ্বরের কৃপাতেই সুফল উৎপন্ন হবে। ফলদাতা যখন ঈশ্বর তখন ফলের জন্যে আর কে ভাবে? ঈশ্বরই তোমার সহায় হবেন।'

'আমার আত্মার গভীরে কী এক আশ্চর্য শক্তি আছে।' বলছেন বিজয়কৃষ্ণ : 'বুঝতে পারি এ-শক্তি আমার নয়, এর উপর আমার বিন্দুমাত্র কর্তৃত্ব নেই। তবু এ শক্তিই আমাকে অন্ধের মতো চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়; কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাবে কিছুই জানি না। শুধু বলে, সমস্ত প্রবৃত্তিকে জগৎমঙ্গলে নিয়োজিত করো, শুধু অগ্রসর হও। এই তোমার ঈশ্বরের আদেশ, আত্মার মহোন্নতি সাধন করো। সে ধ্বনি এত স্পষ্ট এত সুগোচর যে লেশমাত্র দ্বিধা বা সংশয়ের অবকাশ নেই।'

শুধু অগ্রসর হও। এ আদেশই জীবনের একমাত্র সম্বল। সমস্ত প্রার্থনার ইন্ধন, সমস্ত নৈরাশ্যের চিকিৎসা।

প্রাচীন ব্রাহ্মরা দেবেন্দ্রনাথের উপর বিরক্ত হলেন। প্রধান কারণ তিনি কেন কেশবকে এত প্রশ্রয় দিচ্ছেন। বেদান্তবাগীশ আর বেচারামবাবুকে সে বরখাস্ত করিয়েছে, আচার্য পদে বসিয়েছে অল্পবয়স্ক ছোকরাদের। ওসব ছোকরারা আবার অসবর্ণ বিয়ের পাণ্ডা হয়েছে। পৌত্তলিকতা ছাড়বার জন্যে লেগেছে উঠে পড়ে। এ সবের প্রতিবিধান চাই।

দুটো দল হল। একদলে প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীলেরা—আরেকদলে বিপ্লবী সংস্কারপন্থীরা। দেবেন্দ্রনাথ প্রথম দলে, দ্বিতীয় দলে কেশব-বিজয় আরো সব যুবক কর্মী।

বিজয় বললে, 'ব্রাহ্মসমাজ থেকে জাতিভেদের শৃঙ্খল দূর করতে হবে।

শুধু পৈতে ছাড়লে হবে না। দিতে হবে অসবর্ণ বিয়ে। অসবর্ণ বিয়ে ছাড়া এই শৃঙ্খলমোচনের অন্য উপায় নেই।'

মুখে বলা সোজা, কাজে দেখাতে পারো তো বুঝি।

[illegible] মেয়ে, বিজয়ের ভাগ্নী রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে প্রসন্নকুমার সেনের বিয়ে হতে পারে। পাত্র-পাত্রী দুই পক্ষ সকলেই রাজি।

কেশবের কাছে গিয়ে কথা পাড়ল বিজয়। কেশব আনন্দে লাফিয়ে উঠল। ব্রাহ্মসমাজে অসবর্ণ বিয়ে চালু হল।

শুধু অসবর্ণ বিয়েতে হবে না, চাই বিধবা-বিয়ে।

কেশব-বিজয় অগ্রণী হল। পার্বতীচরণ গুপ্ত এক বালবিধবা বৈষ্ণব কন্যাকে বিয়ে করল।

শুরু হল বিধবা-বিয়ে।

দুই দলে প্রবল হল মতভেদ। মতান্তর থেকে মনান্তর।

তারপরে বারো শ একাত্তরের আশ্বিনের ঝড় উঠল। তারিখটা কুড়ি, বুধবার। দিন থাকতেই প্রচণ্ড অন্ধকার, দুর্মদ ঝড় পলকে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল। কত যে গাছ পড়ল, চাল উড়ল, দেয়াল ভাঙল তার লেখা জোখা নেই। চারদিকে ত্রাস আর ত্রাণচেষ্টা আর অসহায়ের আর্তনাদ। তাণ্ডব দেখবার জন্যে বিজয় ছাদে উঠল, ঘড়িতে বেলা আর তখন নেই, আকাশে একটানা কালিমা। হঠাৎ মনে পড়ল, এ কী, আজ বুধবার না? আজ না সমাজে আমার উপাসনার দিন!

আর কথা নেই। কোমর বাঁধল বিজয়। যাব মন্দিরে, হ্যাঁ, এখনি, এই মুহূর্তে।

সবাই একবাক্যে নিষেধ করে উঠল। এই দুর্যোগে কেউ কখনো ঘরের বার হয়? উলঙ্গ ঝড় জল ছাড়া কেউ আর এখন পথে নেই।

হ্যাঁ, এই ঝড় জলকেই পথের সাথী করব। ঈশ্বর শুধু অকলঙ্ক নীল আকাশই নন, তিনি আবার বিদ্যুৎজ্বলন্ত।

প্রবল ধর্মাকাঙ্ক্ষার কাছে সমস্ত নিষেধ পরাস্ত। সমস্ত বাধা অপসৃত।

জল ভেঙে এগুলো বিজয়। হ্যালিডে স্ট্রিটের কাছে এসে দেখল জল এক গলা। ভেসে চলেছে অগণ্য মৃতদেহ। ওসব দেখে লক্ষ্যচ্যুত হবে না বিজয়। আরো এগুল। পড়ল সাঁতার জলে। সাঁতার কেটে বাকি পথ অতিক্রম করে পৌঁছল এসে মন্দিরে।

মন্দিরেরও ভগ্নদশা। একটি লোকও উপস্থিত নেই।

ভাগ্যিস মন্দিরের চাকরটা পালায়নি। তাকে দিয়ে চিরকুট লিখে পাঠাল দেবেন্দ্রনাথের কাছে। এ অবস্থায় কী করব?

দেবেন্দ্রনাথ লিখলেন : 'আজ এই ঘোর দুর্যোগের মধ্যেই পরমেশ্বরের লীলা দেখ।'

পরমেশ্বরেরই লীলা। জনহীন ঘরে একাকীই উপাসনা করল বিজয়।

উপাসনা সেরে বাড়ি ফিরছে, রাস্তায় কেশবের সঙ্গে দেখা। কেশব পালকি চড়ে মন্দিরে যাচ্ছে।

দুজনে একত্র উপনীত হল মন্দিরে। দুজনে একত্র বসল উপাসনায়।

ঝড়ে মন্দির ভেঙে পড়েছে, ঠিক হল সাপ্তাহিক উপাসনা দেবেন্দ্র-আলয়ে বসবে। অন্নদাবাবু পীড়িত, তাই দেবেন্দ্র বিজয়কে লিখলেন, তুমি ও পাকড়াশী আজ বুধবার বেদীর কাজ করো।

পাকড়াশী? সে কি? পাকড়াশী তো পৈতে ছাড়েনি।

সভাস্থলে গিয়ে দরজায় দুবাহু বিস্তার করে দাঁড়াল বিজয়। যারা উপসনায় যোগ দিতে যাচ্ছে তাদের বাধা দিতে লাগল আর যারা আগেই ঢুকে পড়েছে তাদের বললে বেরিয়ে আসতে। গলায় পৈতে ব্রাহ্ম, এর চেয়ে বড় কাপট্য আর কী হতে পারে? পৌত্তলিকতার চিহ্ন বুকে রেখে নিরাকারের উপাসনা অর্থহীন।

হৈ-হৈ কান্ড। যারা উপাসনায় যোগ দিয়েছিল তারা বেরিয়ে এল; আর যারা ঢোকেনি তারা আর গেল না।

দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল বিজয়। অনুগামী কেশব। অন্যত্র এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উপাসনা বসাল দুজনে।

পুরো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। দেবেন্দ্রনাথের সমাজ আদি ব্রাহ্ম সমাজ নাম নিল আর কেশব বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিষ্ঠা করল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ। কেশবের দলে বিজয়, আর বিজয়ের হাতেই প্রচারের পতাকা।

জলন্ত প্রাণ নিয়ে অকুতোভয় বীরের মতো প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিজয়। জীবনে একমাত্র মন্ত্র : ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম। এই প্রাণ প্রভুর, এই কাজ প্রভুর, প্রতি নিশ্বাসে এই এক উদ্দীপ্ত উৎসাহ। নিন্দা প্রশংসায় নির্বিচল, সংসার ও শরীর সম্বন্ধে উদাসীন, তীব্র বৈরাগ্যে উচ্ছ্বসিত সে এক ঈশ্বর মহিমার উজ্জ্বল মূর্তি। যে দেখে সেই আকৃষ্ট হয়, যে শোনে সেই নাম লেখায়।

এদিকে সংসারের শোচনীয় অবস্থা। কিন্তু কে তা লক্ষ্য করে। অন্নের চেয়ে অর্চনাই তখন লোভনীয়, শরীরের চেয়ে আত্মা।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে নির্জনে উপাসনা করতে গিয়েছে বিজয়, সকাল কখন দুপুর হয়ে গিয়েছে খেয়াল নেই। দুপুর যখন বিকেলে গড়িয়ে যাচ্ছে তখন উপাসনায় ব্যাঘাত ঘটতে লাগল। কী ব্যাপার? মনে পড়ল কিছু খাওয়া হয়নি। খিদে পাচ্ছে বলে মন স্থির হচ্ছে না উপাসনায়। উঠে পড়ল বিজয়। কিন্তু খাবে কী? খাবার কোথায়? কাছাকাছি একটা পুকুর দেখতে পেল। সেই পুকুর থেকে কিছু জল আর কাদা তুলে খেল বিজয়।

সন্ধে হলে বাড়ি ফিরল। শুনল যোগমায়া কিশোরীলালের ভুক্তাবশিষ্ট এক মুষ্টি অন্ন খেয়ে রয়েছে আর শাশুড়ি ঠাকরুণের পাতকুয়োর জল ছাড়া আর কিছু জোটেনি।

তবে আর কী করা যাবে? বিজয় শুয়ে পড়ল।

শুয়েও কি শান্তি আছে? যদুনাথ চক্রবর্তী এসেছে। এসেছে ধর্ম-প্রসঙ্গ করতে।

উঠল বিজয়। খালি-পেটেই ঈশ্বরকথা বলতে বসল।

যদুনাথ বললে, 'আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। উপবাসে আছেন বোধহয়।'

'ভগবান তাই রেখেছেন।' বিজয় বললে কাতর মুখে, 'অন্যদিন তাঁর উপর নির্ভর করে থাকি, কিছু না কিছু জুটে যায়, আজ নিজের উপর নির্ভর করতে গিয়েছিলাম, তাই এই দশা।'

পকেটে হাত ঢোকাল যদুনাথ। কী সম্পদ না জানি সে বার করে। আহা বেরুল দেড় পয়সা।

দেড় পয়সাই অঢেল।

মুড়ি কেনা হল। তাই সস্ত্রীক খেল বিজয়। ভাগ দিল শাশুড়িকে।

যদুনাথ গিয়ে আরেক ব্রাহ্ম কান্তিবাবুকে খবর দিল। কান্তিবাবু একটি আধুলি পাঠিয়ে দিলেন।

তবে আর কি! আজ তো তা হলে মহাভোজ!

রান্না শেষ হয়েছে, এমন সময় হালিশহরের মহেন্দ্রবাবু উপস্থিত। আর বুদ্ধিকে বলিহারি, একা আসেনি, সঙ্গে শ্বশুর আর শালাকে নিয়ে এসেছে। আর শ্বশুরটিও চমৎকার, এসেই বলেছে ছেলেটার তিনদিন আহার হয়নি।

সুতরাং সর্বাগ্রে বাপ আর ছেলেকে খাওয়াও। তারপর যা আছে তা দিয়ে তুমি আর তোমার মা ক্ষুন্নিবৃত্তি করো। যোগমায়াকে বললে বিজয়।

বিজয়ের জন্যে কিছু রেখেই তবে খেয়েছে মা-মেয়ে। কিন্তু বিজয়ের সামান্য বরাদ্দও আবার দু ভাগ হল। মহেন্দ্রও যে অভুক্ত তা কে জানত।

'যদি যথার্থ শিশুর মতো থাকতে পারি তা হলেই মা সর্বদা দৃষ্টি রাখেন।' উত্তরকালে বলছেন গোসাইজি : 'আমার নিজের জীবন আলোচনা করে দেখি আমি ইচ্ছে করে ভেবে চিন্তে কিছুই করিনি। টোলে পড়তাম, গোঁড়া হিন্দু ছিলাম, হঠাৎ সংস্কৃত কলেজে ঢুকলাম, অজ্ঞাতসারে বৈদান্তিক হলাম, পরে ব্রাহ্মসমাজে গেলাম, প্রচারক হলাম, চিকিৎসা করলাম, আবার ঘুরে ফিরে বর্তমান অবস্থা।

'যখন চিকিৎসা করতাম মনে হতো ওষুধ দিলে ঐ রোগের উপশম হবে। ক্রমে দেখি তা হয় না। দেখতে দেখতে বুঝলাম ওষুধ কিছু নয়, ভগবানের কৃপা চাই। প্রচার করতে গেলাম, প্রথম প্রথম লোকে শুনত একবাক্যে, সাহায্য করত, ক্রমে দেখি লোকের সে-ভাব আর নেই, আর আমার কথায় কিছু হয় না। তখন বুঝলাম আমার শাস্ত্রজ্ঞান ও বক্তৃতার ক্ষমতা কিছুই নয়। ভগবৎ-কৃপাই সার। এরূপ আঘাত খেয়ে-খেয়ে এখন বুঝছি, আমি কিছুই নয়, অসারের অসার, ভগবানই সর্বময়।'

কৃষ্ণনগর থেকে প্রচারক নগেন চাটুয্যে এসেছে।

'উঠেছ কোথায়?'

'আর কোথায়, তোমার এখানে।'

'আমার এখানে খাবে কী?' বিজয় জিগগেস করল কুণ্ঠিত হয়ে।

'যা খাওয়াবে তাই।'

'প্রভুর কৃপায় জুটেছে আজ শুধু তেঁতুলগোলা ভাত।'

'তাই, তাই সই।' নগেন উৎসাহভরা কণ্ঠে বলে উঠল, 'তাই অমৃত করে খাব।'

দু এক টাকা চাঁদা দিত কেউ-কেউ। তাও দাতারা প্রায়ই ভুলে যেত। খুব অভাব হলে চার আনা আট আনা করে অগ্রিম ভিক্ষে আনত তাদের থেকে।

দেখ আজ কাঁটানটে শাক হয়েছে। দেখ আজ দোপাটি ফুলের বড়া করেছি।

'নিজে কিছুই স্থির করতে নেই।' বলছেন গোস্বামী প্রভু : 'ভগবৎ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। নিজের হাতে ভার নিলেই কষ্ট। ভগবান যখন যে ভাবে রাখেন তাতেই আনন্দ করতে হবে। আমার নিজের পছন্দ করবার কিছুই নেই। প্রভু, কাঠের পুত্তলী যেমন কুহকে নাচায়, আমাকে তেমনি করো।'

'তোমার আবার নিজের প্রয়োজন কী?' কুলদানন্দকে বলছেন গোঁসাইজি : 'আজ থেকে আহারের জন্যে ভিক্ষে করবে। অর্থ কারো কাছে চাইবে না। ভিক্ষায় দৈনিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করবে না। কেউ বেশি দিলে কাউকে দিয়ে দেবে। আহারের কোন বস্তুই সঞ্চয় করবে না। নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত রান্নাও করবে না। এই ভাবে চলে যদি তেমন বৈরাগ্য জন্মে তবেই তো সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্য ঠিক হলেই তো সব হল। এসব অভ্যাস এখন না করলে আর কবে করবে?'

'ভিক্ষে ক বাড়ি পর্যন্ত করতে পারব?' জিগগেস করল কুলদা।

'তিন বাড়ি পর্যন্ত।'

'কোন কোন জাতির বাড়ি ভিক্ষে করা যায়?'

'চাল ভিক্ষা সব বাড়িতেই করা চলে। শ্রদ্ধার ভিক্ষান্ন সর্বত্রই পবিত্র। ব্রহ্মচারীদের ভিক্ষাই ব্যবস্থা।'

নব্যদল কেশবের কলুটোলার বাড়িতে মিলিত হল। নতুন সমাজকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করবার উদ্দেশে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে বেরুল কেশব। বিজয় তার ডানহাত।

কেশব বললে, 'তুমি এবার পূর্ববঙ্গে প্রচারে যাও। আমাদের রাজ্য বিস্তৃত করো।'

বিচ্ছিন্ন হবার আগে নব্যদল দেবেন্দ্রনাথকে অভিনন্দন-পত্র দিল। সম্বোধন করল, 'মহর্ষি' বলে। অভিনন্দনের উত্তর দিলেন দেবেন্দ্রনাথ।

নব্যদলের অগ্রণী কেশবকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করলেন।

বন্ধু অঘোরনাথকে নিয়ে বিজয় ঢাকায় গেল। ব্রজসুন্দর মিত্রের আরমানিটোলার বাড়িতে এসে উঠল দুজনে। ঢাকায় নতুন ব্রাহ্মবিদ্যালয় খোলা হয়েছে, অঘোর তাতে মাস্টারি করবে আর বিজয় ব্রাহ্মধর্মের প্রচার করে বেড়াবে।

বিজয়ের প্রচারের ফলে ঢাকায় অনুরাগের বন্যা নেমে এল। জাগল নতুন আশা নতুন বিশ্বাস নতুন উৎসাহ।

আনন্দ রায়ের ভাই গোবিন্দ রায় জাতিভেদের চিহ্ন উপবীত বর্জন করে ব্রাহ্ম হল। দীননাথ সেনের বিধবা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল ব্রাহ্মমতে। আগে ব্রাহ্ম-উপাসনায় খৃস্টানরা ঘরের ভিতরে জায়গা পেত না, এখন বিজয় তাদের ডেকে নিল ভিতরে। শুধু ব্রাহ্মমতে বিশ্বাস করলে চলবে না সে বিশ্বাসকে কাজে প্রতিফলিত করতে হবে। জাতিভেদ উড়িয়ে দিতে হবে। নস্যাৎ করতে হবে পৌত্তলিকতা। আর নীতিবোধকে জাগ্রত করতে হবে জীবনে। সর্বো-পরি বলবান হতে হবে চরিত্রে।

ঢাকার ঢাকা খুলে গেল। নতুন ভাবে নতুন চিন্তায় নতুন কর্মের উদ্দীপনায় উদ্বেল হয়ে উঠল।

'জয় জয় বিজয়ের জয়।' বিজয়কে চিঠি লিখল কেশব : 'ঈশ্বরকে একমাত্র নেতা জেনে উচ্চে তাঁর নামকীর্তন করো। বৈরাগী হয়ে সংসারকে পদানত করো। উৎসাহদ্বারা সকলকে বদ্ধ করো এবং দেশবিদেশ জয় করে আমাদের রাজ্য বিস্তৃত করো। তুমি যত প্রচার করবে ততই আমাদের ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে।

তুমি এত স্বার্থপর কেন? তুমি কি একা সমুদয় সুখভোগ করবে? ঢাকাতে যে সকল অতুল্যরত্ন ঢাকা ছিল তা কি কেবল নিজেই আহরণ করতে হয়? আমাকে কি একবারও ডাকতে নেই? নিতান্ত দরিদ্রভাবে এখানে পড়ে আছি। তোমার উৎসবে কি আমাকে অংশী হতে দেবে না?'

॥ ৭ ॥

কত জায়গায় প্রচারের কাজে গিয়েছে বিজয়।

বাগআঁচড়া থেকে চলেছে শিলাইদহ। পথে সন্ধে হতেই ফুলতলায় এক মুদির দোকানে এসে উপস্থিত হল।

কে বলে দিল মুদিকে, শান্তিপুরের গোঁসাই।

মুদি তো মহাখুশি। গোস্বামী প্রভুর প্রসাদ পাবে। অকৃপণ সৌভাগ্যের উদয় আজ তার জীবনে।

'আপনি বিশ্রাম করুন, আমি আপনার আহারের ব্যবস্থা করি।'

তক্তপোশের উপর পরিপাটি বিছানা করে দিল মৃদি। রান্নার আয়োজনে তৎপর হয়ে উঠল।

'শোনো। আমি শান্তিপুরের গোঁসাই তা সত্যি, কিন্তু আমি ব্রহ্মজ্ঞানী।' বিজয় বললে স্নিগ্ধ স্বরে।

মুদি আহতের মতো তাকিয়ে রইল।

'তার মানে আমার জাত নেই। আমি জাত মানি না। আমি সকল জাতের ভাত খাই।' বিজয় স্নিগ্ধতর হল : 'তোমাকে জানিয়ে রাখা ভালো, কী বলো?'

'তা হলে আপনাকে কী করে আমার ঘরে স্থান দিই?' মুদির স্বপ্নের প্রাসাদ ভেঙে গেল : 'আপনি অন্যত্র দেখুন।'

'তা ঘর না পাই আমার পথ আছে। তুমি আমার জন্যে ভেবো না।' বিজয় দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেল : 'আমার আর কিছু না থাক সত্য আছে।'

এক বটগাছের নিচে রাত কাটাল বিজয়।

কুমারখালিতে এসে দেখা হল কাঙাল হরিনাথের সঙ্গে। প্রচারসভায় বিজয়ের বক্তৃতার আগে গান ধরল হরিনাথ।

প্রাণমাতানো পাষাণগলানো গান।

হে হৃদয়রঞ্জন, তুমি আমার হৃদয়ে এসে বসো। আমার কাছাকাছি হও। তুমি আমার কাছে, আমি তোমার কাছে। তোমাকে দিয়ে হৃদয় পূর্ণ করে রাখি। তোমার নয়নে আমার নয়ন মিলিয়ে দেখি তোমাকে প্রাণ ভরে, দেখি অনিমেষে। আমার মাঝেই তোমার আবির্ভাব।

শান্তিপুরে এল বিজয়। অশান্ত মনকে শান্ত করতে।

মন অশান্ত কেন?

ব্রাহ্মসমাজে কপটতার প্রাদুর্ভাব হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ঢুকেছে। অন্তরে সহিষ্ণুতা নেই। কে কাকে কোণঠাসা করবে শুধু তার প্রচেষ্টা। মন শুকিয়ে যাচ্ছে, দীর্ঘকাল উপাসনায় আবিষ্ট থাকা যাচ্ছে না। দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে অশান্তিতে।

প্রকৃতির স্পর্শ ছাড়া মনকে শান্ত করে কে? জাহ্নবীর মতো কে আছে আর দাহহারিণী?

নির্মলসলিলা গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। আকাশে এক, নদীর ঢেউয়ে টুকরো টুকরো. কে এই সুধার ভাণ্ডার চাঁদকে সৃষ্টি করেছে? নীলনয়ন আকাশকে? এই সমীরণে কার স্পর্শ? তরঙ্গমালায় এ কার কলস্বর?

নির্জনে বসে চিন্তা করতে লাগল বিজয়। দয়াময় ঈশ্বর যে হাতে প্রকৃতিপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন সেই হাতেই আমাকেও সৃষ্টি করেছেন? তবে আমার মধ্যে কেন এত গ্লানি, এত শূন্যতা? শান্তি আসে আবার কেন চলে যায়?

হরিমোহন প্রামাণিকের সঙ্গে দেখা করো।

'কে হরিমোহন?'

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব। অমানীমানদ। খালি পায়ে হাঁটেন। খোলা মনে কথা কন।

বিজয়কে বললেন, 'চৈতন্যচরিতামৃত পড়ো, মনের সমস্ত দারিদ্র্য সমস্ত দুর্দশা কেটে যাবে।'

'আমি যে ব্রহ্মজ্ঞানী।'

হরিমোহন হাসল। বললেন, 'আমিও ব্রহ্মজ্ঞানী।'

'আপনি?'

'হ্যাঁ।' বললেন হরিমোহন, 'শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আর শ্রীমতী রাধিকা মহাভাব। সুতরাং প্রভু, আমিও ব্রহ্মজ্ঞানী।'

দগ্ধ হৃদয়ে প্রেমবারি সিঞ্চন করল হরিমোহন। বিজয় চৈতন্যচরিতামৃত সংগ্রহ করে পড়তে লাগল। মহাপ্রভুর কী বিনয় আর ভক্তি, অনুরাগ আর ব্যাকুলতা। কেমন তাঁর ঈশ্বরদর্শন, কেমন তাঁর ঈশ্বরসম্ভোগ। এ দেহ পাওয়াই তো ঈশ্বরসম্ভোগের জন্যে। আর ঈশ্বরসম্ভোগের জন্যেই তো ঈশ্বরসাধন।

উন্নতাত্মা চৈতন্যদেবকে গুরু বলে ভক্তি না করে থাকতে পারল না বিজয়। 'জীবে দয়া ও নামে রুচি'-র তত্ত্ব বুঝি হৃদয়ঙ্গম হতে লাগল।

বিজয় আবার চলল পূর্ববঙ্গে। সঙ্গে এবার অঘোর গুপ্ত আর কেশব সেন।

ব্রজসুন্দরের খালি বাড়িতে আছে তারা। ভুবনমোহন সেন এসেছে দুধ নিয়ে। দেখল বিজয় রাঁধছে আর কেশব পান সাজছে। চাকরবাকর জুটছে না কোথাও।

তিন বন্ধুই সমানে বক্তৃতা আর উপাসনা চালাচ্ছে। কেশব কখনো বা ইংরিজিতে। ঢাকা শহর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

এক বক্তৃতা সভায় বিখ্যাত বৈষ্ণব লকাড়িদাস কমলদাস উপস্থিত ছিল। বক্তৃতা শুনে সে কেঁদে ফেলল অঝোরে।

সে কী কথা? ব্রাহ্মর বক্তৃতা শুনে বৈষ্ণবের কান্না? কৈফিয়ৎ দিন বাবাজী।

বাবাজী বললে, 'বক্তৃতায় যে ওরা প্রহ্লাদের নাম করেছিল, প্রহ্লাদের ভক্তির কথা বলেছিল, আমি না কেঁদে থাকতে পারলাম না।'

সাধু, সাধু! এর চেয়ে আর বড় কৈফিয়ৎ কী হতে পারে?

অঘোর ব্রাহ্ম এম-ই ইস্কুলের শিক্ষকতা করছে আর কেশব নৌকোযোগে চলে গেল ময়মনসিং। কুমিল্লায় ব্রজসুন্দরকে চিঠি লিখল বিজয় : 'আমি আপনার প্রশস্ত ভবনে একা আছি। একা কিন্তু একাকী নই। যাঁর সঙ্গে কোনোকালে বিচ্ছেদ হবে না সেই চিরজীবনের সখাই আমার সঙ্গী।'

ঢাকা থেকে বরিশাল গেল বিজয়। উঠল উকিল দুর্গামোহন দাসের

বাড়ি।

পৌষমাস, প্রবল শীত, কিন্তু বিজয়ের কোনো গাত্রবস্ত্র নেই। দুর্গামোহন তাকে একখানা দামী আলোয়ান কিনে দিল।

পরদিন ঠাহর হল সেই আলোয়ান নেই। চুরি করে নিয়ে গেল নাকি কেউ? না, প্রচারে বেরিয়ে পথে এক শীতার্ত দরিদ্রকে সে আলোয়ান দিয়ে দিয়েছে বিজয়।

খবর শুনে অপরিমাণ খুশি হল দুর্গামোহন।

আরেকখানা শীতবস্ত্র কিনে দিল বিজয়কে। ঠিক প্রথমের অনুরূপ।

সেখানাও আগের পথ ধরল। এখন উপায়? দুর্গামোহন বুঝলেন শীতবস্ত্র যা দেবেন গোস্বামী প্রভুকে, তাই দরিদ্রের গায়ে উঠবে। সুতরাং কিছু অল্প মূল্যের অনেক শীতবস্ত্র কেনা হোক, তারপর বিলোনো হোক গরিবদের।

তাই হোক। প্রসন্ন হলেন গোঁসাইজি। দয়া যে করবে, বিচার করে করবে। হ্যাঁ, দয়াতেও বিচার চাই। বলছেন গোস্বামী প্রভু, বিচারহীন কখনো হবে না। যতটুকু সাধ্য, কর্তব্য, ততটুকু মাত্র দয়া করবে। অতিরিক্ত দয়া করতে গিয়ে অনেক বড় বড় সাধু মারা পড়েছেন। যোগী যখন দেখবে এ লোককে এ পরিমাণে দয়া করলে ঠিক-ঠিক উপকার হবে তখনই সে দয়া করবে।

বরিশাল থেকে নোয়াখালি হয়ে বিজয় চট্টগ্রামের দিকে চলল। সীতা-কুণ্ডের কাছে এসে ক্লান্তিতে পর্বতপার্শ্বেই ঘুমিয়ে পড়ল। আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল। দেখল আকাশ তারা জ্যোতিষ্ক সমস্ত ঘোরবেগে ঘুরছে, তার পেছনে এক মহান পুরুষ। কে তুমি? আমি পুরুষ, আর বাকি যা সব দেখছ সমস্ত প্রকৃতি। যে দীপ দেখছ তা প্রকৃতি, আর দীপসত্তা বা দাহিকা-শক্তি যার তেজে দীপ জলছে তাই পুরুষ। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মই পুরুষ।

'প্রতিদিনই কিছু দান করবে।' বলছেন গোস্বামী প্রভু, 'দয়া বা সহানু-ভূতি থেকেই প্রকৃত দান। প্রতিদিনই কারু না কারু ক্লেশ দূর করতে চেষ্টা করবে। অন্য কিছু না পারো কাউকে অন্তত দুটো মিষ্টি কথা বলবে—তাও দান।'

কিন্তু চটির লোকটা একটা মিষ্টি কথাও বলল না, তাড়িয়ে দিল। বললে, 'বিদেশী লোকের আশ্রয় নেই এখানে। একবার কটাকে আশ্রয় দিয়ে ঠকেছি। সিন্দুক ভেঙে তিন শো টাকা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।'

'সকলেই কি আর—'

'তুমি যে সাধু তার প্রমাণ কী? চোরেরাও অমন সাজে।'

নিরুপায়ের আশ্রয়, বৃক্ষতলে এসে বসল বিজয়। দীর্ঘ পথ হেঁটে-হেঁটে ক্লান্তিতে ডুবে যাচ্ছে, সমস্ত শক্তি স্তিমিত হয়ে এল। কে জানে, অজ্ঞান হয়ে পড়ল শেষ পর্যন্ত।

পথপ্রান্তে বৃক্ষতলেই বুঝি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে বিজয়। হার্টের রুগীর আর ভরসা কী।

কোথা থেকে গ্রাম্য এক পাগল এসে হাজির। চটির মালিক দোকানদারকে যাচ্ছেতাই বকে কাঠ খড় আর আগুন সংগ্রহ করে চলল সেই গাছের নিচে। আগুন করে বিজয়কে তপ্ত করতে লাগল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে বিজয় চোখ চাইল। বললে, 'তুমি কে?'

'বলছি—'

'তুমি আমাকে বাঁচালে।'

'আমি না, ঐ দোকানদারই তোমাকে বাঁচিয়েছে। তারই কাঠ বাঁশ আগুন।'

'কিন্তু কে তুমি?'

'বলছি'—বলে হঠাৎ কোথায় চলে গেল পাগল।

তাড়াতাড়ি চটিতে ছুটে এল বিজয়। 'বলতে পারো কে ঐ পাগল? কী নাম? কোথায় বাড়িঘর?'

'কিছুই জানিনা।' দোকানদার হতভম্বের মতো বললে, 'কেউই কিছু জানে না।'

চট্টগ্রামে কোন এক পাহাড়শিখরে উঠছেন। হঠাৎ এক দাবানল তাঁকে গ্রাস করতে এল। চারদিক থেকে ঘিরে ধরল বেড়া আগুন। পালাবার আর পথ নেই বিজয়ের। চোখ বুজে অগ্নি-আলিঙ্গনের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু এ কে সুশীতল! কে এক বিরাট পুরুষ বিজয়কে হঠাৎ কোলে তুলে নিল। লাফ দিয়ে পড়ল এক নিরাপদ জায়গায়। কে তুমি? চেঁচিয়ে উঠল বিজয়। বা, আমি আবার কে! তুমি নিজেই লাফ দিয়েছ।

চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লায় এল বিজয়। ব্রজসুন্দরের বাড়ি এসে উঠল। কালীকচ্ছের আনন্দ নন্দী দীক্ষা নিল বিজয়ের কাছে। কুমিল্লার লোক খেপে গেল। ঠিক করল বিজয়কে মেরে গঙ্গা পার করে দেবে।

সন্ধ্যায় যথারীতি কীর্তন আর উপাসনা হচ্ছে, প্রায় এক শো লোক লাঠি হাতে এগিয়ে এল সভা আক্রমণ করতে।

দাঁড়াও, দু মিনিট পরে হামলা কোরো। কীর্তনটা শেষ হোক।

কী গাইছে রে গানটা! বেড়ে গাইছে কিন্তু। কথাটা কী?

'দয়াময় নাম বল রসনা অবিশ্রাম।'

হ্যাঁ রে গোঁসাই কোন জন?

ঐ যে তন্ময় হয়ে নামে ডুবে আছে, সে। কী সুন্দর দেখতে, তাই না?

মারধোর করার কথা ভুলে গেল সকলে। কারু কারু বা চোখের পাতা ভিজে উঠল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে আবার বরিশাল। বরিশালের নবদীক্ষিত তেজস্বী ব্রাহ্মদের চেষ্টায় এক পতিতার বিয়ে হয়ে গেল।

বরিশাল থেকে কলকাতায়।

কলকাতায় ফিরে ব্রজসুন্দরকে চিঠি লিখছে বিজয় : 'পরম্পর অনটন বশত আপনাকে চিঠি লিখতে পারিনি। এবার বেয়ারিং লিখছি। আমার স্ত্রী অসুস্থ। রীতিমতো ওষুধ পথ্য দিলে সেরে যেতেন নিশ্চয়। কিন্তু কোথায় কী ওষুধপথ্য! শুধু একা আমার নয়, প্রত্যেক প্রচারকের ঘরেই এই দুর্দশা। মরুক সকলে শুষ্ক কণ্ঠে অনাহারে, রোগবিকারে, কেবল ঈশ্বরের জন্যেই প্রাণত্যাগ করুক, তবু যেন কেউ ব্রাহ্মধর্মের জয় ঘোষণা করতে ক্ষান্ত না হয়।'

ব্রাহ্মরা কেশব সেনকে খৃস্টান বলে গাল দিতে আরম্ভ করেছে। শুরু হয়েছে নানান গোলযোগ। বিতণ্ডার তাণ্ডব।

শান্তির আশায় বিজয় আবার চলে গেল শান্তিপুর।

তারপর সটান শ্রীপাট কালনায় সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজীর আশ্রমে। কোথায় বিজয় প্রণাম করবে, তা নয়, বাবাজীই সাষ্টাঙ্গ হল। বসতে আসন দিল এগিয়ে।

বিজয় বললে, 'বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাব।'

বাবাজী নিজের কমণ্ডলু ধুয়ে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল এনে ধরলেন সামনে।

বিজয় কুণ্ঠিত মুখে বললে, 'আমি যার তার হাতে খাই, জাতটাত মানিনে। আমি ব্রহ্মজ্ঞানী। আমাকে আরেক পাত্রে জল দিন।'

বাবাজী কাতর ভাবে করজোড়ে বললেন, 'প্রভু, আমার আকাঙ্ক্ষায় বাধা দেবেন না। জাত-কুল থাকতে কি কখনো ভক্তিলাভ হয়? ব্রহ্মজ্ঞানই তো সমস্ত ধর্মের মূল। দয়া করে এই পাত্রেই জল পান করুন।'

জল খেয়ে কমণ্ডলুটা রাখতেই বাবাজী সেটা নিয়ে কপালে ঠেকালেন। কপালে ঠেকিয়েই কমণ্ডলুর বাকি জলটুকু খেয়ে নিলেন এক চুমুকে।

কয়েকজন ভদ্রলোক বসে ছিলেন সেখানে, একজন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এ কী করলে? ইনি যে পৈতে ফেলে দিয়েছেন, ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছেন, কিছুই মানেন না।'

'আমার অদ্বৈতেরও পৈতে ছিল না। ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছেন, তাই না?' বাবাজী গর্বের ভাব করলেন 'কিন্তু দেখ সেখানে আমার গোঁসাই-ই আচার্য।'

ভদ্রলোক কথার সুরে ব্যঙ্গ মেশালেন। 'তা আচার্যই বটে! কেমন ধুতি-চাদর, কেমন জামা-জুতো। চমৎকার।'

শুনে বাবাজীর চোখে জল এল। বললেন, 'আহা, প্রভুকে সাজা না পরিপাটি করে, মনের মতো করে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা পারলাম না সাজাতে। প্রভু নিজের দরকারি জিনিস নিজেই সংগ্রহ করে নিচ্ছেন। কই আমরা সেই অল্পেই আনন্দ করব, তা নয়, আমাদের ভাগ্য মন্দ।' বলে হাউ-

হাউ করে কাঁদতে লাগলেন বাবাজী।

ভগবানদাসকে বলত সিদ্ধ ভগবানদাস। সিদ্ধ শুনলেই কেমন ভয় করে। কিন্তু সিদ্ধ মানে তো নরম। ভগবানদাস সেই নম্রতার অবতার। কারু দোষ দেখতে পান না কিছুতেই। দোষের কথা কেউ বললে তিনি কাঁদতে বসেন। বলেন, ওরে আমি যে সকলের চেয়ে হীন।

এখানেই সর্বপ্রথম নাম ব্রহ্মের পট দেখে বিজয়। হিন্দুদের মঠ-মন্দিরে সাধারণত দেবদেবীর মূর্তিই থাকে, নয়তো শালগ্রাম বা শিবলিঙ্গ। কিন্তু ভগবানদাসের আশ্রমে নামব্রহ্মের পট প্রতিষ্ঠিত।

নামব্রহ্মের পট কী?

একটি পটে লেখা মহাপ্রভু-নির্দেশিত হরিনাম মাহাত্ম্য।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

তারপর বিজয় চলল নবদ্বীপ। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীকে দেখে আসি।

বাবাজীর এমনি নিষ্কিঞ্চন ভাব কুকুর বেড়ালকেও ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার করেন। সম্পত্তির মধ্যে একখানি ছেঁড়া কাঁথা, একটি নারকেল মালা আর একটি মাটির করোয়া। আর দৈন্যের নির্ঝর।

অপরিচিত অতিথিকে দেখে সানন্দ অভিনন্দন করলেন বাবাজী।

কিছুক্ষণ আলাপ করার পর বিজয় জিগগেস করল, 'বাবাজী, ভক্তি কিসে হয়?'

প্রশ্ন শুনে থমকালেন বাবাজী। একদৃষ্টে বাবাজীর দিকে চেয়ে থেকে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। রোমাঞ্চে মাথার শিখা খাড়া হয়ে উঠল। হুঙ্কার করে উঠলেন, 'কী বললে গোঁসাই, কী বললে? ভক্তি কিসে হয়? তুমি আমাকে প্রতারণা করতে এসেছ? নচেৎ, তুমি বললে কিনা ভক্তি কিসে হয়?' বলতে বলতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

সমাধিভঙ্গের পর বাবাজী সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে করজোড়ে বললেন, 'প্রভু, আশীর্বাদ করুন, যেন নিষ্কিঞ্চন কাঙাল হতে পারি। তা না হওয়া পর্যন্ত তো ভক্তির নাম-গন্ধও নেই। কিন্তু যাই বলুন, আমি আপনার ললাটে তিলক, মাথায় জটাভার আর গলায় তুলসীর মালা দেখছি। ভক্তি তো আপনারই ভাণ্ডারের জিনিস।। আমার অদ্বৈতের ভাণ্ডারে কি ভক্তির অভাব আছে?'

বিজয় কি তখন জানত যে সত্যিই তাকে একদিন তিলক মালা নিতে হবে?

'অন্তরে একবিন্দু অহঙ্কার থাকতে ভক্তিলাভ অসম্ভব। জলস্রোত যেমন ঊর্ধ্বে ওঠে না ভক্তিও তেমনি আসে না অহঙ্কারে।' বাবাজী আরো বললেন।

বিজয়ের ভয় করতে লাগল। ভাবল, আমার স্বভাব অত্যন্ত উদ্ধত

অসহিষ্ণু—আমার মতো ক্রুদ্ধ হতে পারে এমন কজন আছে সংসারে?এই গর্বের পর্বত চূর্ণ করা সোজা নয়। তার মানেই আমার বোধহয় কোনোদিন ভক্তিলাভ হবে না। কিন্তু বাবাজী বলছেন কী? ভক্তি আমার ভাণ্ডারের জিনিস!

বিজয়কে খেতে দিলেন বাবাজী। খেয়ে থালাটা একধারে রেখেছে বিজয়, অমনি বাবাজী ভুক্তাবশিষ্ট তুলে নিয়ে মুখে পুরলেন।

'এ কী করছেন?' বিজয় লাফিয়ে উঠল : 'আমি ব্রাহ্ম হয়েছি।'

'তুমি যাই হও, তুমি অদ্বৈতবংশে জন্মেছ।' বললেন বাবাজী, 'তোমার প্রসাদ খাব না? একশোবার খাব। চিত্রগুপ্ত সাক্ষী, আজ আমার প্রভু-সন্তানের প্রসাদ পেলাম।'

কলকাতায় ফিরে এল বিজয়।

মন খালি বলছে, শুধু জ্ঞান নয়, ভক্তির কথা হোক। মন আর শুষ্ক থাকতে চাইছে না, চাইছে স্নিগ্ধ হতে।

বিজয়ের দাদা ব্রজগোপাল ভালো গাইয়ে। কথকতারও ওস্তাদ। কলকাতায় বিজয়ের বাড়িতে এসে রয়েছে। সে দিন সে কীর্তন ধরল।

কানু পরশমণি আমার।
কর্ণের ভূষণ আমার সে নামশ্রবণ
নয়নের ভূষণ আমার সে রূপদরশন
বদনের ভূষণ আমার সে রূপগায়ন
হস্তের ভূষণ আমার সে পদসেবন
(ভূষণের আর কি বাকি আছে!)
আমি কৃষ্ণচন্দ্র হার পরেছি গলে ॥

এ কীর্তন শুনে সকলে মুগ্ধ তো বটেই, অণুপ্রাণিত হল। বিজয় কেশবকে গিয়ে বললে, 'আমাদের সমাজে কীর্তন চালু করি, কী বলো? আমার তো মনে হয় ভীষণ জমবে।'

'আমারও সেই মত।' কেশব সায় দিল।

উল্টোডিঙ্গির মনোহর দাস বাবাজীকে ডাকানো হল। আমাদের সভায় পারবে কীর্তন গাইতে? কেন পারব না? কোনখানা গাইবে বলো তো? মনোহর বললে সুর করে 'প্রেম পরশমণি শ্রীশচীনন্দন বিলাইয়াছেন প্রেম-সুধা দেখি দীনহীনরে।'

খুব ভালো লাগল বিজয়ের। কেশবেরও। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে কি চলবে?

যে যাই বলুক, ভক্তি ছাড়া উপায় নেই। শুধু শাস্ত্রে শুধু ব্যাখ্যায়-বক্তৃতায় হবে না। গান চাই। আর কীর্তন ছাড়া গান কই? আর কৃষ্ণ ছাড়া কীর্তন কই? আর শচীনন্দনই তো কৃষ্ণ। এটুকু সহ্য করে যেতে হবে।

বিজয়ই প্রথম কীর্তন ঢোকাল ব্রাহ্মসমাজে। নিজেই গান বাঁধল।

পাপে মলিন মোরা চল সবে ভাই
পিতার চরণ ধরি কাঁদিয়ে লুটাই।

তারপর ক্রমে ক্রমে নগ্নপায়ে নগর-সঙ্কীর্তনে বেরুল ব্রাহ্মরা। কেশব বিজয় চিরঞ্জীব শর্মা। আরো অনেকে। খোল করতাল মৃদঙ্গ বাজতে লাগল তালে-মানে। গান ত্রৈলোক্য সান্যালের রচনা।

এতদিনে দুঃখের নিশি হল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।

মেতে উঠল কলকাতা।

অনেক ব্রাহ্ম কীর্তনে আপত্তি জানাল। ওসব হিন্দুয়ানি অচল।

ব্রাহ্মধর্ম কি হিন্দুত্বছাড়া? আর বিদ্বেষ-বিভেদ ভোলাতে কীর্তনের মতো আছে কী?

চলো কীর্তনে যাই। শরীরে ঈশ্বরস্পর্শের শিহরণ আনি।

'ধর্মলাভের সর্বপ্রধান উপায় শরীর।' বলছেন গোস্বামী প্রভু, 'সর্বাগ্রে এই শরীরকেই রক্ষা করতে হয়। দুধে ঘিয়ে শরীরের যে পুষ্টি তা অসার। আসল পুষ্টি বীর্যধারণে। আহারটি খুব পবিত্র ভাবে না হলে বীর্যধারণ হবে না। আর শরীর যদি সুস্থ পবিত্র না হয় সাধন করবে কী নিয়ে?'

'কিছুতেই যাচ্ছে না কামেচ্ছা। স্বপ্নেও এসে উপস্থিত হয়।'

'কে বললে? দুটি ঘন্টা খুব স্থির হয়ে বসে নাম করো, দেখি কেমন সে আসে।'

'কিন্তু সিদ্ধি কত দিনে?'

'সিদ্ধি কী?' বললেন গোস্বামী প্রভু, 'ষড়ৈশ্বর্যলাভ সিদ্ধি নয়। মাত্র একটি বৎসর যদি বীর্যধারণ করে সত্য বাক্য সত্য চিন্তা ও সত্য ব্যবহার করতে পারো, অনেক ঐশ্বর্যশক্তি লাভ হবে। কিন্তু তাকে সিদ্ধি বলে না। যখন দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রতিক্ষণে আপনা আপনি ভগবানের নাম করবে তখনই যথার্থ সিদ্ধিলাভ হয়েছে জানবে। কোন একটি বিষয়ে লোভ বা আসক্তি থাকতে সে অবস্থা আসবে না। সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লোভ ও অনাসক্ত হলেই আসবে। তখনই সত্যিকার নামে রুচি। আর নামে সিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধি।'

॥ ৮ ॥

প্রচারের কাজে ময়মনসিং সেরপুরে যাচ্ছে বিজয়, এক বুনো মোষ তাকে তাড়া করল। কী খাড়া শিঙ, লক্ষ্যে তীক্ষ্ম হয়ে ছুটে আসছে। বিজয় চোখ বুজে বসে পড়ল পথের উপর। একমনে ডাকতে লাগল ভগবানকে।

সরু গ্রাম্য পথ, দু পাশে কাশ বন। হঠাৎ ঝড় উঠল। আন্দোলিত

কাশে ঢাকা পড়ল বিজয়। সহসা মোষ পথ খুঁজে পেল না। বিজয় দেখল অদ্ভুত একটা কুম্ভকারের গর্ত। সেখানে গিয়ে গা ঢাকা দিল। ঝড় থামতেই মোষ আগের জায়গায় পেঁছে খুঁজতে লাগল শিকার। শিকারের নাম-গন্ধও নেই। দারুণ রোষে মত্ত মোষের শিঙ দিয়ে মাটি খোঁড়াই সার হল।

মোষ গেল তো কোত্থেকে দুটো হরিণ এসে জুটল। আর ছুটন্ত হরিণের পিছে দুরন্ত বাঘ। ভগবান বলে চোখ বুজল বিজয়। হরিণে মনোযোগী বাঘ বিজয়ে আকৃষ্ট হবার সময় পেল না। হরিণের সন্ধানেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেবার রংপুরে এক গ্রামে যাচ্ছে। মাঠে এসে পড়েছে, অমনি মুষল-বর্ষণ শুরু হল। জলের সঙ্গী ঝড়ও এসেছে ঘনঘটায়। এখন কী করি, কোথায় আশ্রয় নিই! ভিজতে ভিজতে রাস্তায় উঠে দেখল এক সার দোকান। যেটা সামনে পেল, জিজ্ঞেস করল, 'একটু ঠাঁই দেবে?'

এখানে জায়গা কোথায়! কে না কে আগন্তুক, আশ্রয় দিয়ে শেষে বিপদে পড়ি! একে একে সবগুলি দোকানই প্রত্যাখ্যান করল।

কিন্তু আমার বৃক্ষতল কে কাড়ে! বিজয় এক গাছতলায় এসে আশ্রয় নিল। দেখল কে এক পাগলি বসে আছে। শীর্ণকায়, গায়ের রঙ কালো, পিঠে দীর্ঘ কেশভার। দু চোখ জ্বলছে অন্ধকারে।

'মা, তুমি কে?' মধুস্বরে জিগগেস করল বিজয়।

'মা! তুই আমাকে মা বলে ডাকলি? ডাকে প্রাণ জুড়িয়ে গেল।' বললে পাগলি, 'আমার রামপ্রসাদ বলে এক ছেলে ছিল, সেও অমনি ডাকত মিষ্টি করে। জানিস তেল না মেখে মাথাটা জ্বলে যাচ্ছে। আগে আগে কত মাখিয়ে দিত রামপ্রসাদ। তুই দিবি?'

বিজয় এক ছুটে দোকান থেকে তেল কিনে আনল।

বিজয়ের হাতের নিচে মাথা পেতে দিল পাগলি। বললে, 'রাত্রে থাকবি কোথায়?'

পাগলির মাথায় তেল ঢেলে দিল বিজয়। বললে 'আর কোথায়! এই গাছের নিচে।'

'সে কি? একটা দোকানে গিয়ে থাকলেই তো হয়।'

'ওরা দিল না থাকতে।'

'দিল না?' পাগলির চোখ থেকে আগুন বেরুল। 'কেন, দিল না কেন?'

'বিদেশী লোক, তাই বিশ্বাস হল না।'

'বটে? তোকে ওদের বিশ্বাস নেই?' কোত্থেকে একটা লাঠি কুড়িয়ে নিল পাগলি। তেড়ে গেল দোকানের দিকে। একটার পর একটা দোকানের বন্ধ দরজায় লাঠি মারতে লাগল। কি, আশ্রয় দিবি নে? দেখি তোরা নিরাশ্রয় হস কিনা। দেখি কে তোদের রক্ষা করে।

পর পর দরজা খুলে গেল দোকানের। একটাতে আশ্রয় নিল বিজয়।

কিন্তু পাগলি কোথায় গেল?

কেউ তার খোঁজ পেল না। যাকে দেখে ভয়, তাকে এখন না দেখে অনুতাপ!

গোঁসাই-গতপ্রাণ কুঞ্জ ঘোষের বাড়িতে রক্তবৃষ্টি হয়ে গেছে। কুঞ্জবাবুর স্ত্রী ও ছেলে প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী। ব্যাপার কী?

'সমস্ত তোমার শাশুড়ির অপরাধ। তাকে ডাকাও।' আদেশ করলেন গোঁসাইজি।

বৃদ্ধ শাশুড়ি দাঁড়াল হেঁট মুখে।

'কী করেছ?'

'কালীকে ঝাঁটা ছুঁড়ে মেরেছি।'

'সে কী? কালীকে পেলে কোথায়?'

'প্রায়ই আজকাল নাম করবার সময় কালীমূর্তি দেখা দেয়।' বলতে লাগল বৃদ্ধা, 'নাম যতই গাঢ় হয় কালীও ততই কাছে আসে। আমি বলি, তুমি আমার ইষ্ট নও, তুমি সরে যাও, কিন্তু কালী সরে না, দাঁড়িয়ে থাকে। আমার কথা গ্রাহ্যও করে না। সেদিন ঘর ঝাঁট দিয়ে দরজার কাছে বসে নাম করছি, দেখি কালী আবার ঠিক তেমনি এসে দাঁড়িয়েছে। বারে-বারে বললাম চলে যেতে, কথাটা কানেই তুলল না। তখন নিদারুণ রাগ হল। হাতের কাছে ঝাঁটাগাছটা ছিল, ছুঁড়ে মারলাম। বেটি তখন ভাগল। তারপর আর আসেনি কোনদিন।'

'আসেনি? এই উৎপাতটা তা হলে কী! কিন্তু আমি ভেবে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি, তুমি তাকে ঝাঁটা মারলে কী বলে?' গোস্বামী প্রভু অবাক মানলেন।

'আমি ওকে চাই না, তবু ও আমার কাছে আসে কেন?' বৃদ্ধা তড়পে উঠল।

'লোকে সাধ্যসাধনা করে একবার দর্শন পায় না, আর তিনি তোমাকে নিজের থেকে কৃপা করলেন, আর তুমি কিনা তাঁকে ঝাঁটা ছুঁড়লে!'

'আমার মনে হচ্ছিল,' বৃদ্ধা বললে, 'কালী আমার সাধনপথের প্রলোভন।

'সে কী? কালী কি ভগবান নন?'

'শ্রীকৃষ্ণই তো ভগবান। আমি তো সেই ভাবেই দেখি, সেই ভাবেই নাম করি।'

'দীক্ষাকালে ভগবানের নির্দিষ্ট কোনো রূপের কথা তো বলা হয়নি।' বললেন গোঁসাইজি; 'তিনি দ্বিভুজ না চতুর্ভুজ কে বলবে। কোন রূপে তিনি তোমার কাছে প্রকাশ পাবেন তা তিনি জানেন। যে মূর্তিতে আসেন সেই মূর্তিটি মেনে নেবে।'

বৃদ্ধা হাঁপাতে লাগল : 'আমি এখন তবে কী করব?'

'যাও, মনসিক করে কালীপুজো করোগে।'

বুড়ি চলে গেলে কুঞ্জ ঘোষকে ডাকালেন গোঁসাইজি। বললেন, 'তোমার শাশুড়ি শুনবে না। যাও তুমি নিজে গিয়ে শিগগির কালীপুজোর ব্যবস্থা করো। নচেৎ ঘোর অকল্যাণ। শোনো। নাম করতে-করতে যা কিছু প্রকাশ পাবে তাকেই প্রণাম করে মেনে নেবে, তারই কাছ থেকে চেয়ে নেবে আশীর্বাদ।'

'কী আশীর্বাদ চাইব?'

'ভগবানের চরণে মতি-গতি হোক, ভক্তি হোক, এর চেয়ে আর বড় প্রার্থনা নেই।'

এলাহাবাদে এসেছে বিজয়। সঙ্গে কেশব সেন আর প্রতাপ মজুমদার।

একদিন ভক্তদের নিয়ে উপাসনা করছে বিজয়, এক মিশনারি সাহেব ঘরে ঢুকল। উপাসনা শেষ হয়ে গেছে তবু বিজয় উঠছে না। কেউ খবরের কাগজ পড়ছে, কেউ বা গল্প করছে, কিন্তু বিজয় বসে আছে ধ্যানস্থ হয়ে। কিছুতেই ভাঙছে না তার তন্ময়তা।

মিশনারি কেশবকে জিগগেস করলে, 'ঐ লোকটি কে?'

'কোন লোকটি?'

'যিনি সভা ভেঙে গেলেও স্থিরভাবে বসে আছেন—ঐ যে—' পাদ্রী নির্দিষ্ট করে দিল : 'তাঁর সঙ্গে আমি কিছু কথা বলতে চাই।'

'তাঁকে ডাকব?'

'না। তিনি নীরবে উপাসনা করছেন, তাঁর উপাসনা ভাঙতে আমার ইচ্ছে নেই। আমি চেয়ারে বসি।'

ধ্যানভঙ্গের পর বিজয় এল সাহেবের কাছে।

'শোনো, যীশুখৃষ্ট ছাড়া জগতে আর কোনো উপাস্য নেই।' বললে পাদ্রী, 'আর তিনি ছাড়া কার সাধ্য জগতের পাপভার মোচন করে?'

ইংরেজ হলে কী হয়, পাদ্রী বেশ বাঙলা শিখেছে।

বিজয় বললে, 'তুমি তো অনেক দিন ধরে খৃস্টধর্ম প্রচার করছ, বইও পড়েছ বিস্তর। আমার গোটা কতক প্রশ্নের উত্তর দেবে?'

'বেশ তো। বলো না তোমার কী প্রশ্ন?'

'ধর্ম কাকে বলে? আত্মা কাকে বলে? সত্য কী, পাপ কী, মায়া কী?'

প্রশ্ন শুনে সাহেব স্তম্ভিত। শুষ্ক মুখে বললে, 'এসব প্রশ্ন কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেনি, নিজের মনেও ওঠেনি কোনদিন। ধর্ম বলতে শুধু যীশুখৃষ্ট আর বাইবেলই বুঝি, এর বাইরে আর কিছু জানি না।'

'কিন্তু তোমার যীশু যে এশিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে এক গ্রামে জন্মেছিলেন তা জানো?' কেশব এগিয়ে এল : 'জানো আমাদের ভারতবর্ষ সেই এশিয়ারই অন্তর্গত?'

'না, না, অত শত জানবার আমার কী দরকার!'

'তোমার যীশুকে আমরা তোমার চেয়েও বেশি জানি, বেশি ভালোবাসি।'

'তবে তাকে তোমরা ভজনা কর না কেন?'

'তাকে আমরা মহাপুরুষ জ্ঞানে ভক্তি করে থাকি, কিন্তু আমাদের উপাস্য তাঁর পিতা সেই পরমেশ্বর। শোনো, যদি এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে চাও, তা হলে দেশে ফিরে যাও, সেখানে সবার সঙ্গে চর্চা করে আমাদের প্রশ্নগুলির উত্তর নিয়ে এস। উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত এ দেশের লোক আকৃষ্ট হবে না। স্বধর্ম কেন ছাড়বে, কার হাতে সর্বস্ব তুলে দেবে, একটু যাচাই করে দেখবে না? সুতরাং—'

আর বাকস্ফূর্তি করল না সাহেব, দেশে পিটটান দিল।

লাহোরে এসেছে বিজয়। একদিন তার চিত্তবিকার উপস্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গেই মনে জাগল অনুতাপ। আমি প্রচারক, ধর্মোপদেষ্টা, আর আমারই মনের এ বিভ্রম! কাঁদতে লাগল বিজয়। নিজেই একটি গান তৈরি করে গাইতে লাগল।

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে নাথ ডাকিব তোমায়
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যেথায়।
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায় ॥

গান করেও প্রাণে শান্তি এল না। স্থির করল আত্মহত্যা করবে। সেই সংকল্পে নির্জন মধ্যরাত্রে রাভি নদীর পারে এসে দাঁড়াল। মণ দুয়েকের একটা প্রস্তর খণ্ড বাঁধল কোমরে। ঝাঁপ দিতে যাবে, হঠাৎ কোত্থেকে এক ফকির এসে জাপটে ধরল। বললে, 'শরীর ছাড়লেই পাপ প্রবৃত্তি নষ্ট হবে না।'

বিজয় থমকে তাকাল ফকিরের মুখের দিকে।

'ধৈর্য ধরো। ধৈর্য ধরলেই মঙ্গল হবে।' বললে ফকির, 'কখন পাপ দগ্ধ হয়ে যাবে টেরও পাবে না। তার এখনো অনেক দেরি আছে। কিন্তু যাবে সে একদিন, নিশ্চয় যাবে। সব কাজেরই সময় ভগবান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হবার নেই। বাতাসে যে ধুলো ওড়ে তাও তাঁর ইচ্ছেতে। তাই ভাবনা কোরো না। সংসারে ভগবানের লীলা দেখ।'

'কিন্তু আপনি—আপনি কী করে জানলেন আমার মনের কথা?'

'আমি নদীতীরে বসে ভজন করছিলাম,' বললে ফকির, 'হঠাৎ দৈববাণী হল, এক মহাত্মা আত্মহত্যা করছে, তাকে বাঁচাও।'

'কিন্তু আমাকে বাঁচিয়ে লাভ কী হল? আমার মন অশুচি।'

ফকির হাসল। বললে, 'তাই তো বলছি, অশুচি মন নিয়ে পরকালে গিয়েই বা লাভ কী? ভগবানের নাম করো, তিনিই তোমাকে পবিত্র করবেন। যখন পরলোকে যাবে পবিত্র জীবন নিয়ে যাবে—অমনি-অমনি গিয়ে লাভ

কী।'

আশ্বস্তের মতো তাকাল বিজয়।

'তুমি নিজেকে এখন অপবিত্র মনে করছ, কিন্তু তুমি আসলে কত সুন্দর, একদিন জানতে পারবে।'

'কবে?' বিজয়ের কণ্ঠে আকুলতা ঝরে পড়ল।

'সাধন পথে অগ্রসর হলেই দেখতে পাবে চোখের সামনে একখানা আয়না ফুটে উঠেছে। সেই আয়নায় দেখবে তোমার স্বরূপ। বুঝবে তুমি কত সুন্দর।' ফকির সাধন পথের ইঙ্গিত দিতে চাইল। বললে, 'প্রত্যহ রাত্রে শোবার সময় ভগবানের মাতৃবাচক নাম জপ করবে।'

'ভগবানকে মা বলে ডাকব?'

'হ্যাঁ। মা বলে ডাকবে। জপ করতে-করতে মন যখন তন্ময় হবে দেখবে নিদ্রা এসে গেছে। আর কোনো মলিন চিন্তা তোমাকে চঞ্চল করতে পারবে না।'

মনে অপরিমেয় বল পেল বিজয়। বাড়ি ফিরে শান্তিতে ঘুমুতে গেল।

দুর্দান্ত কামকে বশীভূত করা দূরের কথা, মন্দীভূত করা যাচ্ছে না। যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে কুলদানন্দ। এসেছে গোঁসাইজির কাছে। বলছে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত। স্বপ্ন দেখেছে এক তরুণী আত্মীয়ার সঙ্গে প্রসাদ নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। এত নিয়মনিষ্ঠার পরেও এরকম স্বপ্ন কেন?

'স্বভাবদোষ খণ্ডন হয়নি এখনো।' বললেন গোঁসাইজি, 'মেয়েটির উপর যে তোমার বহুকালের আসক্তি।'

'এ আসক্তি কী করে যাবে?'

'শুধু শ্বাসেপ্রশ্বাসে নাম জপে। কোন অসৎ কল্পনা মনে এলেই চেঁচিয়ে পাঠ কোরো কিংবা গান ধোরো। কল্পনাতেও কামভাব না জাগলে বুঝবে শত্রু পরাভূত হয়েছে। বীর্যরক্ষার জন্যে চাই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। সামান্য একটু অসতর্ক ফাঁক রাখলেই ঢুকে পড়বে কালসাপ।'

শ্বাসেপ্রশ্বাসে নামজপের কথা সাধারণ লোকের মুখেও শোনা যাচ্ছে। মাঝিরা গান গাইছে:

'মন পাগলা রে হরদমে গুরুজীর নাম লইও।
দমে দমে লইও রে নাম কামাই নাহি দিও।'

আর যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যেমন জপযজ্ঞ, তেমনি নামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাতৃনাম। 'মা, আমি তোমার পোষা পাখি।' মাঘোৎসবে উপাসনা করছেন গোস্বামী প্রভু : 'মা, অন্নপূর্ণা, আজ ছোট-বড় কাঙাল-ফকির সবাইকে তুমি পেটভরা অন্ন বিতরণ করছ। দেশে-বিদেশে আজ কত লোক তোমার প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হচ্ছে। আমাকেও অভুক্ত রাখনি, দিয়েছ অঢেল করে। আর না, মা, আর না—একটা কাণাকড়ি হলেই আমার যথেষ্ট। একটা কাঙাল

ছেলের এর বেশি আর কী চাই? বেশি হজম করি এমন সাধ্য কই? রোজ-রোজ দিও মা, একটি করে কাণাকড়ি দিও। তার বেশি নয়, কখনো নয়।'

মথুরা হয়ে বৃন্দাবনে এসেছে বিজয়। ব্রাহ্মসভায় বক্তৃতা দিচ্ছে, হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা এসে গেল। 'সে কী মশাই! ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতে বসে শেষ পর্যন্ত গোষ্ঠলীলা! লোকে বলবে কী!'

'লোকে বুঝবেই বা কতটুকু? স্থান মাহাত্ম্য যে আছে তা কে অস্বীকার করবে।'

'হাঁ, বক্তৃতার সময় চোখের সামনে যা দেখলাম তাই বললাম। এ যে বৃন্দাবন। এ যে ব্রজবালকের গোচারণের স্থান।'

একদিন তো উপাসনায় জগজ্জননীর আবির্ভাব হল। বিভোর হয়ে বিজয় ডাকতে লাগল 'মা' 'মা' বলে। গোঁড়া ভক্তেরা আপত্তি জানাল—আমরা কি ভগবতী, না, জগদ্ধাত্রীর আরাধনা করছি?

জানি না। মাকে দেখলুম। ডাকলুম। প্রাণ-মন ভরে গেল।

বৃন্দাবন থেকে মথুরা হয়ে আগ্রায় এল বিজয়। তাজমহল দেখল। রাত্রে দেখল এক অনির্বচনীয় স্বপ্ন।

দেখল, যেন তাজের প্রাঙ্গণে ঘুরছে। চার পাশে ফুলন্ত গাছ, জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে দিক-দেশ। শাদা আর সবুজ একসঙ্গে হাসছে। মনে হল, গাছ নেই, সুন্দরী তরুণী হয়ে গিয়েছে। বিহ্বল হয়ে তাকাল বিজয়। এরা কারা? দেবকন্যা? না কি অপ্সরী?

'তুমি কেন এ পবিত্র জায়গায় এসেছ?' কলকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল মেয়েরা।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকল বিজয়। বললে, 'তোমাদের কাছ থেকে একটি বিষয় জানতে এসেছি।'

'আমাদের কাছ থেকে?' সুধাকণ্ঠীরা আবার হেসে উঠল : 'বলো, শুনি কী তোমার জিজ্ঞাসা।'

'ঈশ্বর যে সর্বব্যাপী তা কী করে বুঝি?'

'আশ্চর্য, আজও তুমি বোঝনি? যাঁর রাজ্যে বাস করছ, যাঁর দয়া ছাড়া এক পল বাঁচবার অবকাশ নেই তাঁর সর্বব্যাপিত্বে তুমি আজও সন্দিহান?'

'আমি ঘোর মূর্খ, কিছুই জানি না।'

'আচ্ছা, আমাদের মতো সুন্দরী কোথাও দেখেছ?'

'না, স্বপ্নেও দেখিনি।'

'আমাদের কে এত সুন্দর করেছে? আমাদের এ রূপ-লাবণ্য কার সৃষ্টি, কার শিল্পকর্ম? কার করুণা?'

'ঈশ্বরের।'

'হ্যাঁ, ঈশ্বরের। ঈশ্বর এ দেহে বর্তমান বলেই এ দেহ এত সুন্দর। তাঁর অধিষ্ঠান ছাড়া কিছুই সুন্দর হতে পারে না। সমস্ত সুন্দরে ঈশ্বরকে

দেখ।' রূপসীরা কন্ঠস্বর উজ্জ্বলতর করল : 'তার চেয়েও বেশি করে দেখ। সমস্ত কিছুতেই ঈশ্বর আছেন বলে সমস্ত কিছুকেই সুন্দর বলে দেখ। সর্ববিশ্বে ঈশ্বরকেই পরমসুন্দর বলে জানো।'

রূপসীরা আবার বৃক্ষরূপ ধারণ করল।

চমকে উঠল বিজয়। তাকিয়ে দেখল কতগুলি প্রাচীন বৃদ্ধ বসে আছে। তারা বলে উঠল, 'যে ঈশ্বরকে সুন্দর বলে জানলে সেই ঈশ্বরকেই প্রাণ বলে জানো। তিনি প্রাণরূপে আছেন বলেই আমরা এতদূর সারবান হতে পেরেছি।'

বৃদ্ধেরা বৃহদাকার বৃক্ষে রূপান্তরিত হল।

ঘুম ভেঙে গেল বিজয়ের। আশ্চর্য, আগে যা মাত্র শূন্য বলে বোধ হতো এখন তা পরিপূর্ণ বলে বোধ হল। সর্বত্রই ঈশ্বর। সর্বত্র তাঁর দয়া, সর্বত্র তাঁর পবিত্রতা। সমস্ত বিশ্ব তাঁরই আবির্ভাবে নীরন্ধ্র।

প্রথমা কন্যা এল সংসারে। বিজয় তার নাম রাখল সন্তোষিণী।

পরিবার বড় হচ্ছে। প্রতিপালনের ব্যবস্থা কী? চিকিৎসাবৃত্তি তাই ছাড়তে পারল না বিজয়। কিন্তু বৃত্তিতে উন্নতি করতে হলে যে অখন্ড মনোযোগ দরকার তার অবকাশ কোথায়?

দুর্গাচরণ বাঁড়ুয্যে স্বপ্নযোগে দেখা দিয়ে ওষুধ বলে দেয় আর সেই ওষুধে সুনিশ্চিত আরোগ্য।

দুর্গাচরণ বিরাট ডাক্তার, দেশনেতা সুরেন বাঁড়ুয্যের বাবা। পরলোকে গিয়েও চিকিৎসা করছে। লাঘব করছে যন্ত্রণা।

একদিন স্বপ্নে বিজয়কে বললে, 'তোমাকে কেবল দেহরোগেরই চিকিৎসা নয়, ভবরোগেরও চিকিৎসা করতে হবে। শুধু দেহজ্বরের আরাম নয়, ভবাগ্নিদাহের আরাম।'

তবে এই তুচ্ছ চিকিৎসা ছেড়ে দিই। কিন্তু সংসার চলবে কী করে? যাঁর সংসার তিনি চালাবেন।

তার আগে একবার গুপ্তিপাড়ায় যেতে হয়। রুগী মুমূর্ষু, চলে এসেছিল, আরেকবার যাবে দেখতে, নতুন ওষুধ নিয়ে। সেই কথাটা রাখতে হয়। রুগীর আত্মীয়েরা তার জন্যে বসে আছে আকুল হয়ে।

কিন্তু যাবে কী করে? তুমুল ঝড়জল শুরু হয়ে গিয়েছে।

শান্তিপুরের ওপারে গুপ্তিপাড়া। খেয়ানৌকোর জন্যে বিজয় ঘাটে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু পাটনী নৌকো ছাড়তে রাজি নয়। এই দুর্জয় দুর্যোগে পারাপার অসম্ভব।

'বা, তাই বলে রুগী মারা যাবে?'

'তা জানিনা। কিন্তু আমি মারা পড়তে রাজী নই।'

খেয়ার মাঝি প্রত্যাখ্যান করল।

কিন্তু নিবৃত্ত হবার লোক নয় বিজয়।

ওষুধের শিশি মাথায় বেঁধে নদীতে ঝাঁপ দিল। ভাদ্র মাসের ভরা নদী ঝড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে, তারই মধ্য দিয়ে পথ করে এগুতে লাগল। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে পরের প্রাণকে রুগ্নের প্রাণকে, আর্তের প্রাণকে বেশি গৌরব দিল। পরসেবাই পরম সেবা।

এ কী! এ দুঃসময়ে আপনি! রুগীর আত্মীয়েরা বরাভয়প্রদ ধন্বন্তরিকে দেখলে।

'হ্যাঁ, সাঁতরে পার হয়ে এসেছি, ওষুধ এনেছি মাথায় বেঁধে।'

ঈশ্বরই মহৌষধি। ঈশ্বরই শিরোধার্য।

চিকিৎসা ব্যবসা ছেড়ে দিল বিজয়। বন্ধু ব্রজসুন্দরকে লিখলে :

'আমি ভিখারির ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছি। ব্যবসা করা আমার কাজ নয়। আমি আবার ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিলাম। ব্রাহ্মভাইয়েরা আমাকে সাহায্য করেন, ভালোই, না করেন, তাও ভালো। ঈশ্বরের চরণে শরীর মন বহুদিন হল বিক্রয় করেছি। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করবেন না। তিনি অন্তর্যামী, তিনিই আমাকে সস্নেহে সাহায্য করবেন। ব্রাহ্মধর্মের জয় হোক। আমার শোণিত ব্রাহ্মধর্মকে পোষণ করুক।'

॥ ৯ ॥

কন্যা পৃষ্ঠে প্রথম পুত্র হল বিজয়ের। নাম রাখল যোগজীবন।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্যে বিজয় এসেছে মুঙ্গেরে। প্রাচীনকালে এস্থানে মঙ্গু ঋষির আশ্রম ছিল বলে সহরের নাম মুঙ্গের। আর মুঙ্গেরের সব চেয়ে বড় আকর্ষণ কষ্টহারিণী।

গঙ্গার উপরেই কষ্টহারিণী প্রতিষ্ঠিতা। আর তারই নামে ঘাট কষ্ট-হারিণীর ঘাট। মনোরম ভজনের জায়গা। কত সাধুসন্ত নিবিষ্ট রয়েছে ধ্যানে। সমস্ত স্থান জুড়ে ভগবৎ স্পর্শ যেন প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। স্তব্ধ হয়ে একটু বসলেই আপনা-আপনি ধ্যান জমে যায়। জ্বালাযন্ত্রণার লেশমাত্র থাকে না।

এই ঘাটেই এক যোগীর দেখা পায় বিজয়।

কিন্তু মুঙ্গেরে সন্তোষিণী মারা গেল। শোকের শেল হৃদয় ছিদ্র করে দিল বিজয়ের।

যিনি হরণ করেন তিনিই আবার পূরণ করেন। যাঁর দেওয়া শোক তাঁরই দেওয়া সান্ত্বনা।

কেশবও চলে এসেছে মুঙ্গেরে।

কিন্তু এ কী অকরণ! কয়েকজন ব্রাহ্ম ভক্ত অবতারজ্ঞানে কেশবকে পুজো

করতে লাগল। বিগলিত হল প্রণামে। খেয়ে নিল পাদোদক।

বিজয় চটে গেল। বললে, 'এ সব কী হচ্ছে?'

'কী সব?'

'এই সব ব্রাহ্মবিগর্হিত কর্ম। পায়ের ধুলো নেওয়া পা ধুইয়ে দেওয়া—'

'তা আমি কী করব?'

'তুমি এর প্রতিকার করো।'

'আমি কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারিনা।'

বিজয় চলে এল কলকাতায়। যদুনাথ চক্রবর্তীকে দলে নিল। সংবাদ পত্রে শুরু করল আন্দোলন। এ সব নরপূজার প্রশ্রয় নেই ব্রাহ্মধর্মে।

কলহের ধূম্রজাল ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বিজয়ের সমর্থকেরা কেশবকে বলতে লাগল ভণ্ড, কেশবের সমর্থকেরা বিজয়কে বলতে লাগল নাস্তিক।

পরস্পরে শুরু হল কাদা ছোঁড়াছুড়ি।

এ গ্লানির শেষ হবে কিসে? তিক্ত-বিরক্ত হয়ে বিজয় ফের এল শান্তি-পুর। হঠাৎ নির্জনে কুলদেবতা শ্যামসুন্দর দেখা দিল বিজয়কে। বললে, 'তোকে ঘর থেকে বের করলাম, আবার তুই সেই ঘরেই প্রবেশ করলি?'

চমকে উঠল বিজয়। কিন্তু অলৌকিককে বেশি আমল দিল না। ভাবল অলীক কল্পনা, হয়ত বা মস্তিষ্কের বিকার।

কিন্তু এ যা ঘটল এও ভাবনাতীত। কেশব চিঠি লিখল বিজয়কে। বললে, আমার দিকের কথাটা একবার বোঝ। তারপর এস, ঝগড়া মিটিয়ে ফেলি।

প্রীতিসুন্দর চোখে সমস্ত পরিচ্ছন্ন করে দেখতে পেল বিজয়। দেখতে পেল ওটা আসলে নরপূজা নয়, ভক্তি প্রকাশের আতিশয্য মাত্র। কেশবের নিজের মনে কোনো অভিমান নেই, সে সম্মানের প্রত্যাশী নয়। সুতরাং এ আন্দোলন বন্ধ হোক।

'আমি অনুসন্ধান করে দেখে স্থির করেছি,' ধর্মতত্ত্ব পত্রিকায় ঘোষণা করল বিজয়, 'কেবল বাহ্যিক কার্যে ও শব্দে আতিশয্য দোষ আছে, মতে কোনো দোষ নেই। যাঁরা এরূপ ব্যবহার করেন তাঁদের মধ্যে কেউই মানুষকে উপাসনা করেন না বা ঈশ্বর বা ঈশ্বরের মধ্যবর্তী জ্ঞানে কোন মানুষের কাছে প্রার্থনাও করেন না। কেশববাবুর প্রতি তাঁরা যেরূপ ব্যবহার করেন, তা যতই অযৌক্তিক হোক না কেন, আমি কখনোই মনে করতে পারিনা যে তাঁরা কেশববাবুকে ভক্ত পরিবারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পরম উপকারী বন্ধু ছাড়া অন্য কোনো ভাবে দেখেন। এরূপ বাহ্যিক ব্যবহার মানুষের প্রতি যত অল্প হয় ততই ভালো কেননা তা দিয়ে অন্যের অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা।

"ভক্তিভাজন কেশববাবুর প্রতি আমি কখনো দোষারোপ করিনি। অপর ভ্রাতারা তাঁকে সম্মান দিতে যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন তিনি তার জন্যে

দাবী নন। তিনি সেরূপ সম্মানের অভিলাষী নন। তার জন্যে কাউকে তিনি অনুরোধ করেননি, বরং এ যে তাঁর অভিপ্রেত নয় তা অনেকবার বলেছেন। তিনি স্পষ্টরূপে তৎকালে ঐরূপ সম্মান প্রকাশে নিষেধ করেননি তাঁর কেবল এইটুকু ত্রুটি আমি দেখেছিলাম। এছাড়া বর্তমান আন্দোলনে তাঁর অণুমাত্র অপরাধ নেই। এ আমি নিশ্চয় রূপে বলতে পারি।'

বিজয়ে কেশবে পুনর্মিলন হল। শুষ্কতার মহামারী দূরে গিয়ে দেখা দিল আরোগ্যের সুপ্রভাত।

ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই তখন গোঁসাইজির পিছনে। লিখছেন শিবনাথ শাস্ত্রী : 'তিনি মনে করলে নিজের একটা দল বাঁধতে পারতেন, কিন্তু সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। তিনি নিজের জয় চাইলেন না, ব্রাহ্মধর্মেরই জয় চাইলেন। এতে তিনি আমার হৃদয়ের নিকট সহস্রগুণ প্রিয় হলেন।'

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটিত হল। দূরে হয়ে গেল মনোমালিন্য। জেগে উঠল প্রীতি-মৈত্রীর নির্মল আনন্দরৌদ্র।

রানাঘাটের কাছে কলাইঘাটায় তখন আছে বিজয়, পুনর্মিলন উপলক্ষে মেলাতেও ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হল। কেশব স্বয়ং উপস্থিত হল সে উৎসবে। সরল, উদার, সুপ্রসন্ন। লিখছেন শিবনাথ :

'একদিন সন্ধের পর কেশববাবু সশিষ্য কীর্তন করতে-করতে নৌকায় করে চূর্ণী নদীতে বেড়াতে গেলেন। প্রাতে উঠে দেখি কেশববাবু ব্রাহ্মদের পায়ের তলায় একপাশে পড়ে ঘুমুচ্ছেন। আহার করতে বসে দেখলাম, তাঁর বড়মানুষী কিছুই নেই, সামান্য ডালভাত মনের আনন্দে আহার করছেন।'

আর বিজয়? বিজয় সত্যসন্ধ। সত্যব্রতধারী। সত্যের অনুরোধে তুচ্ছ করতে পারে নিজের মানমর্যাদা। সর্বাঙ্গে নিতে পারে দৈন্যের আবরণ।

ব্রাহ্মদের হিতের জন্যে কতগুলি নিয়ম প্রবর্তন করল বিজয়।

প্রত্যহ অন্যূন তিনবার পরব্রহ্মের উপাসনা করবে। অভ্যস্ত কতগুলি বাক্য উচ্চারণ না করে জীবন্ত ভাবে উপাসনা করবে। দয়াময় নামের মধ্যে সাধন করতে হবে। নামসাধন হলে অন্তরে পিতার সঙ্গে যোগসাধন করতে বিশেষ ব্যাকুলতা হবে। অন্তরে দয়াময় পিতা প্রকাশিত হবেন। নিন্দা-স্তুতিতে সাধকের মন বিচলিত হয় না, সুতরাং তার সঙ্গে বিবাদবিসংবাদ অসম্ভব। প্রত্যেক ব্রাহ্মকে এরূপ সাধন করতে হবে—সাধন না করলে মঙ্গল কোথায়? সাধন না করলে ব্রাহ্ম হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

কেউ বিশ্বাসবিরুদ্ধ কাজ করবে না। মনে যা সত্য বলে জানবে কাজে তা পরিণত করবে। সহস্র ক্ষতি হলেও কপট আচরণ করতে পারবে না। ব্রাহ্মকে ব্রাহ্ম অবিশ্বাস করতে পারবে না। সুরাশক্তি, মাদকসেবন, মিথ্য কথা, মিথ্যা ব্যবহার প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা, ব্যভিচার, পরনিন্দা, উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি পাপাচরণ করলে তাকে ব্রাহ্ম বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। ব্রাহ্ম শুধু ঘৃণা করে কাজ শুধু পরিহারেই করবে না, শ্রদ্ধার সঙ্গে সৎকর্মের

অনুষ্ঠান করবে। পাপ করা যেমন অধর্ম কর্তব্যপালন না করাও তেমনি অধর্ম।

কারো দোষ দেখলে তার দুর্বলতা দূর করবার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে এবং গোপনে তাকে সংশোধন করতে হবে। ভাইয়ের দোষ নিয়ে উপহাস করা চলবে না। যেমন একাকী উপাসনা করবে তেমনি আবার নিয়মিত সামাজিক উপাসনা করবে। নিজের দুর্বলতাকে সমর্থন না করে বিনীতভাবে স্বীকার করবে দুর্বলতা। কেউ ঈশ্বরের নাম নিয়ে উপহাস করলে কানে হাত দিয়ে তার কথাকে অগ্রাহ্য করবে। ঈশ্বর, পরলোক, প্রার্থনা, প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তি, অনন্ত উন্নতি ইত্যাদি ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্যে যার বিশ্বাস নেই তাকে ব্রাহ্ম বলে গণ্য করা হবে না।

ব্রাহ্মধর্ম শুষ্ক ধর্ম নয়, ভক্তিই ব্রাহ্মধর্মের প্রাণ। ব্রহ্মানুরাগ থেকেই ভক্তির উৎপত্তি। 'কর সাধন ব্রহ্মের চরণ, যাতে পাবে নিত্য শান্তি নিত্য ধন।'

কেশব বিলেত চলে গেল। কমাস পর ফিরে এসে 'ভারত সংস্কার সভা' স্থাপন করল। পাঁচটা বিভাগ হল—সুলভ সাহিত্য প্রচার, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার, দাতব্য ঔষধালয়, সুরাপান নিবারণ, শ্রমজীবীদের শিক্ষাদান আর এক পয়সা দামের সাপ্তাহিক পত্রিকা সুলভ-সমাচার প্রকাশ।

কাজ নিয়ে বিজয় মেতে উঠল। ঢেলে দিল মন-প্রাণ।

কলকাতার বেহালায় মহামারীরূপে দেখা দিল ম্যালেরিয়া। সংস্কার সভা সেখানে এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করল। পরিচালনার ভার নিল বিজয়।

ভোরে উঠে সোজা চলে যায় পায়ে হেঁটে। দ্বারে দ্বারে ওষুধ দেয়, রুগীর শুশ্রূষা করে। কলকাতায় ফিরে আসতে আসতে দুপুর গড়িয়ে যায়। স্নানাহার সেরে স্ত্রী-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে। রাত জেগে সংবাদপত্রের জন্যে লেখে প্রবন্ধ। ক্রমাগত পরিশ্রমের ফলে হৃদরোগ দেখা দিল। একদিন হঠাৎ পড়ল অজ্ঞান হয়ে।

প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তবু কাজের থেকে সেবার থেকে নিবৃত্ত হয় না। কেশব একজন দেহরক্ষী রেখে দিল। কখন কোথায় বিপন্ন হয়ে পড়ে তার ঠিক কী।

হঠাৎ একদিন এক স্বপ্ন দেখল বিজয়।

'এই, জগন্নাথ ঘাটে যা না।' কে যেন বললে : 'সেখানে এক সাধু আছেন। তাঁর কাছে ওষুধ পাবি। যা, দেরি করিস নে।'

বিজয় গেল না। স্বপ্ন আবার কখনো সত্য হয় নাকি? মাথার গরমে এই স্বপ্ন দেখা। অস্বাস্থ্যের নিদর্শন।

কয়েকদিন পরে আবার সেই স্বপ্ন। 'কী, গেলি না? যা না, একবার দ্যাখ না পরীক্ষা করে! ব্যাধিটা যদি সারে! একবার দেখতে দোষ কী!'

এবার কেন যেন প্রত্যাখ্যান করতে জোর পেল না। মন্দ কী, অসুখের যদি কিছু সুরাহা হয়।

গেল জগন্নাথ ঘাটে। হ্যাঁ, ঐ তো একজন সাধু দেখা যাচ্ছে।

বিজয় তার কাছে স্বপ্নবৃত্তান্ত বললে। 'আপনার কাছে ওষুধ আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। কিন্তু আসতে এত দেরি করলে কেন!' সাধু তাকাল বিজয়ের দিকে : 'ওষুধ যে এরই মধ্যে অনেক খরচ হয়ে গিয়েছে।'

'যা আছে তাই দিন।'

'তাই দিচ্ছি। কিন্তু এতে তোমার ব্যাধির সম্পূর্ণ আরোগ্য হবে না, তবে মূর্ছাটা বন্ধ হবে।' সাধু তার ঝুলিতে হাত ঢোকাল। 'আর কদিন আগে এলে পুরো ওষুধ দিতে পারতাম। ব্যাধিরও অবসান হত।'

'মূর্ছা যদি বন্ধ হয় তাও তো অনেক।'

ওষুধ অসঙ্কোচে খেয়ে নিল বিজয়। কী আশ্চর্য, তার পর থেকে আর মূর্ছা নেই।

মূর্ছা বন্ধ হলেও ব্যাধির মূল গেল না। হৃৎপিণ্ডে ব্যথাটা ঠিক তেমনিই আছে। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ চিবার্সকে দেখাল। চিবার্স বললে যন্ত্রণা অসহ্য হলে মরফিয়া নিতে হবে। এই একমাত্র উপশমের উপায়।

'ব্যারাম নির্মূল হবে না?'

'না। বরং এই ব্যারামেই তুমি মারা যাবে।'

নিশ্চিন্ত হল বিজয়। মূর্ছা দূরীভূত হয়েছে, ব্যথাটাও প্রশমিত হবে। আপাতত তা হলেই হল। মৃত্যুর কথা কে ভাবে! তার জন্যে কে বসে থাকে! যতদিন নিশ্বাস আছে খাওয়া যাবে না হয় মরফিয়া। আগে জীবনের কাজ তো সমাধা করি।

বিজয় বেরিয়ে পড়ল প্রচারের কাজে, উত্তর বঙ্গে। হোক অনাহার, হোক অনিদ্রা, অবিচ্ছিন্ন পথক্লেশ। সমস্ত দুঃখকষ্ট, রৌদ্রবর্ষা উপেক্ষা করে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার করে বেড়াতে লাগল। রংপুর, কাকিনিয়া, দিনাজপুর, কুচবিহার। কুচবিহারে শুরু হল সেই হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণা। ঈশ্বরের বিধানে দেহই যদি অক্ষম হয়, মানুষের আর কী স্পর্ধা!

কলকাতায় ফিরে এল বিজয়। কেশবের সঙ্গে দেখা করতে গেল। দেখল কেশব নিজের হাতে রান্না করছে।

কেশব চায় ব্রাহ্মদের মধ্যে বৈরাগ্য জাগুক। জাগুক মানশূন্যতা।

এবার এস আমরা 'ভারত-আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করি।

'ভারত-আশ্রমের' উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্ত পরিবারদের একসঙ্গে একত্র বসবাস করে নিষ্ঠায় ধর্মাচরণ করা।

'একাকী ধর্মসাধন করলে মুক্তি হয় না। একাকী ধর্মপথে বিচরণ করা স্বার্থপরতা। সকলে এক পরিবারবদ্ধ হয়ে পরিত্রাণের আশায় স্বর্গরাজ্যে যেতে হবে।' আশ্রমের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করছে বিজয়, 'নরনারী একসঙ্গে ধর্মগ্রন্থ

পাঠ ও উপাসনা করবে। তাদের স্নানাহার পৃথক পৃথক হলেও সকলেই এক আচ্ছাদনের আশ্রয়ে আছে এই মৈত্রীর বন্ধন মানতে হবে। সর্বসময়েই সৎ-প্রসঙ্গ উৎসাহে সকলে উদ্দীপ্ত হয়ে থাকবে। স্বর্গের মহাসত্যও মানুষের হাতে পড়ে বিকৃত হয়ে যায়। ভারত-আশ্রমের উদ্দেশ্য না বিকৃত হয়।'

প্রচণ্ড নিন্দাবাদ শুরু হল। প্রচারকেরা মূর্খ, অশিক্ষিত, এমন কথা বলতেও ছাড়ল না।

প্রচারকেরাও কেউ কেউ প্রতিবাদপত্র ছাপল।

বিরক্ত হল বিজয়। প্রচারকেরা কেন তাদের ব্রতভঙ্গ করবে? গালাগাল দিক, প্রহার করুক, অম্লান মুখে সহ্য করতে হবে। প্রার্থনা করতে হবে নিন্দুকদের জন্যে। ঈশ্বরে নির্ভর করে সমস্ত রোষকে শান্ত করতে হবে। যারা ব্যাকুল হৃদয়ে দয়াময়ের নাম ঘোষণা করে তাদের বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন কী। প্রচারকেরা যদি অভিমানী হয়, নিন্দায় মুখ বিষণ্ণ করে তাহলে তারা ধর্মরাজ্যে ঢুকবে কী করে?

কজন ব্রাহ্ম বকাবকি করে একটা গাড়োয়ানকে মারলে। তাই দেখে বিজয় নির্জনে কাঁদতে বসল। আরেকদিন উপাসনার শেষে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করল ভক্তেরা—কে বেশি খাবে তার লালসায়। সেদিন বিজয় উপবাস করে রইল। ব্রাহ্ম শুধু উপাসনায় নয়, জীবনের ছোটখাট ব্যবহারে। শুধু মুখে ব্রহ্ম নয়, আচরণে ব্রহ্ম। ব্রহ্মেই নিয়তস্থিতি।

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগ—সাধনের শ্রেণী বিভাগ করে দিল কেশব। যার মনের গতি যেদিকে সে সেই দিকে ব্রতী হোক।

অঘোর গুপ্ত নিল জ্ঞানযোগের সাধন। আর বিজয়ের জন্যে ভক্তিযোগ।

ব্রতের সপ্তদশ সংযম বিধি অনুধাবন করো।

প্রাতঃস্মরণ, প্রাতঃস্নান, নাম গান, নামশ্রবণ, ভক্তিগ্রন্থপাঠ, রন্ধন, দরিদ্রকে অন্নদান, সেবা, পশুপক্ষীসেবা, বৃক্ষলতাদি সেবা, বিশুদ্ধ আহার, পঠিত শ্লোকের পুনরাবৃত্তি, সৎপ্রসঙ্গ, নির্জনে স্তবকীর্তন ও ভক্তদের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা।

ভক্তিব্রত গ্রহণ করল বিজয়।

নামে ভক্তি প্রেমে ভক্তি ভক্তি সাধুসঙ্গে। ভক্তিতেই আহ্লাদ। চিরপ্রসন্নতাই ভক্তির লক্ষণ। জীবনে প্রসন্নতাই একমাত্র জীবিকা।

কায়মনোবাক্যে ব্রত পালন করতে লাগল বিজয়।

এক বছর পরে কেশব বললে, 'তুমি ভক্তিযোগে সিদ্ধ হয়েছ।'

বিজয়ের মন মানল না। বললে, 'ভক্তির অংকুর মাত্র যদি হয় তাহলে শম-দম তিতিক্ষা জাগবে। জাগবে অব্যর্থকালত্ব। জাগবে বৈরাগ্য, মানশূন্যতা। আমার মধ্যে সেসব লক্ষণ কোথায়? কোথায় আমার ভগবানকে পাবার জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, না পাবার জন্যে উদ্বেগ, কোথায় তাঁর নামগানে আনন্দ, তাঁর গুণবর্ণনে অনুরাগ? কোথায় তাঁর বিশ্ববসতিতে বিশ্বাস? ভক্তিরসামৃত-

সিদ্ধ গ্রন্থে ভক্তের যে লক্ষণ বলা হয়েছে আমার মধ্যে তার সুস্ফুট প্রকাশ কোথায়?'

কী বলেছে সেই গ্রন্থে? বলেছে—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা নাম গানে সদারুচিঃ ॥
আসক্তিস্তৎগুণাখ্যানে প্রীতিস্তৎ বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োনুভাবাস্যুর্জাত ভাবাঙ্কুরে জনে ॥

কেশব অভিভূত হয়ে গেল।

ভক্তি গোপনীয়া। গোস্বামী প্রভু বলছেন ভক্তদের,—'ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য তিনজন বৃদ্ধা ছিলেন। ভক্তিদেবী বৃন্দাবনে গিয়ে যুবতী হলেন। জ্ঞান বৈরাগ্য বৃদ্ধাই থেকে গেল। ভক্তিকে কৃপণের ধনের মতো গোপন রাখতে হবে। শাস্ত্রকারেরা যুবতীর স্তনের সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। বালিকা মুক্তদেহে ঘুরে বেড়ায়, যুবতী হলে বস্ত্রদ্বারা স্তন আচ্ছাদন করে। স্বামী ছাড়া পিতা-মাতা গুরুজনও তা দেখতে পায় না। ভক্তিও সেই রকম। ভগবান ছাড়া সকলের থেকেই সন্তর্পণে গোপনে রক্ষণীয়া। প্রথম প্রথম যখন ভাবের উচ্ছ্বাস আরম্ভ হল, চোখ দিয়ে একটু জল পড়তে লাগল, ভাবলাম লোকে দেখুক। পরে মনে হত, এ কী করে গোপন করব? হৃদয়ের কোন জায়গায় রাখব তা গোপন করে? ভক্তি গোপনীয়া।'

নির্জনে সাধন করবার জন্যে কোন্নগরের কাছে মোড়পুকুর গ্রামে একটি উদ্যান কিনল কেশব। কিন্তু কোথায় নির্জনতা? সেইখানে দিনে-দিনে ভিড় বাড়তে লাগল ব্রাহ্মদের। সাধ্য কী থাকে কেউ অজ্ঞাতবাসে?

নির্জন সাধনের ইচ্ছায় বিজয় মাঝে মাঝে যায় ইডেন গার্ডেনে। দেখে পথের ধারে বসে একটা লোক জুতো সেলাই করে, কিন্তু কী আশ্চর্য, মজুরির দর করে না, দাবি করে না, যে যা দেয় তাই নেয় মাথা পেতে, কথাটি না বলে। বিজয় একদিন তাকে অনুসরণ করে তার বাড়ি গেল, কী ধরনের লোক দেখি গে।

খিদিরপুর অঞ্চলে লোকটার বাড়ি, থাকে সামান্য বস্তিতে। সন্ধেয় বাড়ি ফিরে যন্ত্রপাতি রেখে গঙ্গাতীরে চলে এল লোকটা। স্নান করল, আহ্নিক করল, বাড়ি গিয়ে বিগ্রহ ও তুলসী বৃক্ষের অর্চনা করল। অর্জিত পয়সা দিয়ে ঘি-আটা কিনল, রুটি তরকারি তৈরি করে ভোগ দিল ঠাকুরকে। পরে আর সকলকে প্রসাদ ভাগ করে দিয়ে নিজে খেতে বসল। যদৃচ্ছা লাভ— ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় নেই। ভগবান যেমন রাখেন তেমনিই থাকব।

আলাপ করল বিজয়। বুঝল এ একজন উচ্চস্তরের সাধক। কর্মক্ষয়ের জন্যে গুরুর আদেশে মুচির কাজ করছে। গুরুর নিষেধ কারু কাছে পয়সা চাইতে পারবে না। যে যা দেবে তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে।

ভারত আশ্রমে দোতলায় গভীর রাত্রে একাকী বসে তন্ময় হয়ে ব্রহ্মনাম

করছে বিজয়, হঠাৎ মনে হল কে যেন বন্ধ দরজায় করাঘাত করছে। অভিভূতের মতো বিজয় দরজা খুলে দিল।

একদল জ্যোতির্ময় পুরুষ ঘরে ঢুকলেন সহসা। 'চিনতে পাচ্ছ? আমি অদ্বৈত আচার্য।' বললেন একজন।

'আর এঁরা।'

'ইনিই মহাপ্রভু। ইনি প্রভু নিত্যানন্দ। আর ইনি শ্রীবাস। শোনো।' বললেন অদ্বৈত, 'তোমার ব্রাহ্ম সমাজের কাজ শেষ হয়েছে। এখন মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হও। যাও স্নান করে এস, মহাপ্রভু এখনি তোমাকে দীক্ষা দেবেন।'

বিহ্বলের মতো বিজয় নিচে নেমে গেল। পাতকুয়োয় স্নান করে দ্রুত পায়ে চলে এল উপরে। মহাপ্রভু তাকে দীক্ষা দিলেন। অদ্বৈত বললেন, 'যথাকালে এই দীক্ষা স্ফূর্ত হবে তোমার মধ্যে। তখন তুমি বুঝবে এর সার্থকতা।'

সকলে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

পরদিন প্রাতে অসময়ে পাতকুয়োর কাছে স্বামীর সিক্ত বস্ত্র দেখে যোগমায়া অবাক হয়ে গেল। রাত্রে হঠাৎ স্নান করলেন, কেন, কী ব্যাপার?

স্ত্রীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বললে বিজয়।

নির্জনে নিয়ে গিয়ে বললে কেশবকে। কেশব বললে, 'একথা কাউকে বোলো না। কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না, তোমাকে পাগল বলে উপহাস করবে।'

পুরোপুরি বিজয়ই কি পারছে বিশ্বাস করতে? মনে হচ্ছে পরলোকগত কতগুলি আত্মা এসেছিল পরীক্ষা করে দেখতে। দীক্ষার নামে সে বিচলিত হয় কিনা। ব্রাহ্মধর্মে থেকে হয় কিনা বিভ্রান্ত বিচ্যুত। না কি পরব্রহ্মের ধ্যানেই সে আরূঢ় থাকে?

॥ ১০ ॥

ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে বিজয় কাশী এসেছে। উঠেছে কেদারঘাটে ডাক্তার লোকনাথ মৈত্রের বাসায়।

'আমাকে একটি নির্জন ঘর দিতে পারবেন?' জিগগেস করল বিজয়।

লোকনাথ সবিস্ময়ে তাকাল মুখের দিকে।

'কখন কোথায় যাই কখন ফিরি কিছু ঠিক নেই, তাই কাউকে বিরক্ত না করে একটা আলাদা ঘর যদি নিজের এক্তিয়ারে পাই তো এখানে থাকি। নচেৎ অন্যত্র জায়গা দেখতে হবে।'

নির্জনে সাধনা করবার জন্যে নয়, টো-টো করে ঘুরে যখন খুশি এসে বিশ্রাম করবার জন্যে।

লোকনাথ বললে, 'বা, পাবে বৈকি ঘর।'

টো-টো করেই ঘুরছে বিজয়। ঘুরছে মানে তৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গ করছে।

দুপুর হয়ে গিয়েছে, তবু বিজয়ের বাড়ি ফেরবার নাম নেই। ঈশারা করে জিগগেস করছেন, 'কি রে, খিদে পেয়েছে?'

'পেয়েছে বৈকি।'

তৈলঙ্গস্বামী কাকে কী ইশারা করলেন, রাশি রাশি খাবার এসে পেঁাছুল।

'এত কি খাওয়া যায়?' আপত্তি করল বিজয়। প্রশ্ন করল, 'আপনি খাবেন?'

'দাও।' হাঁ করলেন তৈলঙ্গ।

যত খাবার মুখে পোরে তত নিঃশেষ করে নিমেষে! বিজয় দেখল মহা-বিপদ, তার জন্যে কিছুই থাকবে না। তাই সে কিছু খাবার বুদ্ধি করে সরিয়ে রাখল নিজের জন্যে।

খাবার যখন শেষ তখন তৈলঙ্গ ইঙ্গিতে জিগগেস করলেন : 'তোমার? তোমার কী হবে?'

বিজয় বললে, 'আমার ভাগটা আগেই সরিয়ে রেখেছি।'

হেসে উঠলেন তৈলঙ্গ। মাটিতে লিখলেন কাঠি দিয়ে : 'বাচ্চা সাঁচ্চা হ্যায়।'

নির্জন কালীমন্দিরে ঢুকেছেন। হঠাৎ প্রস্রাব করে কালীর গায়ে ছিটিয়ে দিলেন।

'এ কী?' চমকে উঠল বিজয়।

তৈলঙ্গ মাটিতে লিখলেন : 'গঙ্গোদকং।'

'তা কালীর গায়ে ছিটিয়ে দেবার মানে কী?' বিরক্ত হল বিজয়।

'পুজা।'

'এ আবার কোন ধরনের পুজা? এর দক্ষিণা কী?'

'যমালয়।'

'যমালয়?'

'হ্যাঁ, দক্ষিণে যমালয়।'

মন্দিরে লোকজন আসতেই বিজয় নালিশ করল : 'উনি প্রস্রাব করে কালীর গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন। আর বলছেন, গঙ্গোদকং। আশ্চর্য, কেউ রুষ্ট হল না। বরং বললে ভক্তি গদগদ স্বরে, 'অমন করে বলতে নেই। উনি তো সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর। ওঁর প্রস্রাব গঙ্গাজল ছাড়া আর কী।'

একদিন হঠাৎ মৌনভঙ্গ করে বসলেন তৈলঙ্গ। বললেন, 'স্নান করে আয়।'

'কেন, স্নান করব কেন?'

প্রায় জোর করে ধরে স্নান করালেন বিজয়কে। বললেন, 'তোকে দীক্ষা দেব।'

'আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, আমি গুরুবাদ মানিনা।', বললে বিজয়। 'আর আপনি

তো সাকার উপাসক। গঙ্গাজল শিবের মাথায় চড়ান—'

খুশি হলেন তৈলঙ্গ। বললেন, 'বাচ্চা সাঁচ্চা হ্যায়।' পরে গম্ভীর হলেন : 'শোন, তোকে দীক্ষা দেবার আমার অন্য কারণ আছে—এ পুরোপুরি দীক্ষা নয়। সে পূর্ণ দীক্ষা পরে হবে, পরে সে গুরুর সাক্ষাৎ পাবি। গুরুগ্রহণ না করলে শরীর শুদ্ধ হয় না—আমি শুধু তোর শরীরশুদ্ধির গুরু হব। আমার উপর ভগবানের যে আদেশ হয়েছে তা আমাকে পালন করতে হবে।'

বিজয়কে মন্ত্র দিলেন তৈলঙ্গ।

'শিষ্য যেন গর্ভস্থ সন্তান।' বলছেন গোস্বামী প্রভু : 'মা যা কিছু খায় তারই একটু-একটু রস নাড়ীর মধ্য দিয়ে সন্তান গ্রহণ করে। তাতেই গর্ভস্থ শিশু পুষ্ট হয়। তেমনি গুরু যা কিছু লাভ করে তাই প্রয়োজনমতো শিষ্যে সঞ্চারিত হয়। গুরুর উন্নতিতে শিষ্যেরও উন্নতি। মার গর্ভে জন্মে ভালো শুশ্রূষা পেলে সন্তান ভালো হবে না কেন? সকলেরই যে এক মা হবে এমন কোনো কথা নয়। ভিন্ন ভিন্ন মার গর্ভে ভিন্ন ভিন্ন সন্তান জন্মে সুখে, স্বাচ্ছন্দ্যে থাকুক এই সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছে। তাই সকল মায়ের প্রতিই শ্রদ্ধাভক্তি রেখো। সাম্প্রদায়িক হয়ো না।'

'গুরুতে যতদিন নির্বিচল নিষ্ঠা না আসে ততদিন অন্য সাধুর সঙ্গ করা চলে?' জিগগেস করল কুলদা।

'অন্য কোথায়? সব সেই এক গুরুশক্তি।' বললেন গোস্বামীপ্রভু, 'অন্য ভেবে কেন অন্যের সঙ্গ করবে? জানবে সমস্ত বিশ্বে এক গুরু-শক্তিই পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। রক্তাধারের রক্তই সমস্ত দেহে সঞ্চালিত। শরীরে যত রক্ত সব সেই রক্তাধারের। শোনো, সংকীর্ণ ভাব কিছু নয়। সংকীর্ণ ভাবেই মহতী বিনষ্টি।'

'গুরুতে একনিষ্ঠতাও কি সংকীর্ণ ভাব নয়?'

'না, তাকে সংকীর্ণ ভাব বলে না। যে রক্তাধারকে চেনে সে ঠিকই জানে সর্বত্র সেই এক রক্ত, এক বস্তু।'

'ভারত-আশ্রমে' টিঁকতে পারল না বিজয়, চলে এল বাগআঁচড়ায়। এই গ্রাম্য পরিবেশই ভালো, এই শ্যামল নির্জনতা। এই শান্তিই যেন একটি তন্ময়ী প্রার্থনা। কী দরকার দলে, কোলাহলে? এই নিঃসঙ্গতাই সর্বপূর্ণ-কারক।

একদিন নির্জনে বসে প্রার্থনা করছে বিজয়, হঠাৎ একটা জ্যোতি তার মধ্যে প্রবেশ করল, যেন দৈববাণী হল, 'তুই আর নিজেকে বদ্ধ করে রাখিসনে। গণ্ডির মধ্যে থাকলে ধর্ম হয় না।'

বিজয়ের মনপ্রাণ শীতল হল। নীল আকাশে সে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম, খাঁচায় বন্দী হয়ে শেখানো বুলিতে সে অস্বীকৃত।

কলকাতার বন্ধুদের পছন্দ হল না এই গ্রাম্যতা। লিখে পাঠাল : 'কলকাতায় চলে এস। নির্জনে থেকে তুমি শুষ্ক হয়ে যাবে। মাতৃস্তন্য না

পেলে বাঁচবে কী করে?'

'মাতৃস্তন্য' মানে কেশবের সঙ্গ। কেশবই ভক্তিরসের উৎস!

মনে মনে হাসল বিজয়। এই তো আমি বেশ আছি। শান্তিতে আছি, আছি অচ্ছিন্ন পূর্ণতায়। এরা আবার আমাকে টানে কেন? কেন আবার চায় দলের দড়িতে গ্রন্থি দিতে?

না, বুঝি যেতে হল কলকাতায়।

সে বুঝি অন্য ভূমিকা। অন্য প্রসঙ্গ।

ব্রাহ্মবিধি ত্যাগ করে কেশব কুচবিহারের রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিল। ব্রাহ্মবিধিতে বিয়ের বয়েস ছেলের পক্ষে অন্যূন আঠারো ও মেয়ের পক্ষে অন্যূন চৌদ্দ বলে ধার্য হয়েছে। কিন্তু কেশবের মেয়ের বয়েস চৌদ্দর চেয়ে কম। তাতে কী, হিন্দুশাস্ত্রমতে বিয়ে দিল কেশব।

আগুন জ্বলে উঠল। যখন ব্রাহ্মবিবাহ আইন পাশ হয় তখন কেশব বলেছিল বেদীতে বসে, 'এ বিধি শুধু রাজবিধি নয়, এ ঈশ্বরবিধি, এ আইন ঈশ্বরের আদেশেই প্রবর্তিত হয়েছে।' কিন্তু নিজের মেয়ের বিয়ের বেলায় এ বিধি খাটল না। সবচেয়ে আশ্চর্য, এ বিধি লঙ্ঘনকেও সে ঈশ্বরেরই আদিষ্ট কার্য বলে প্রচার করল। যত অসন্তোষ-আন্দোলন এরই জন্যে।

বিজয় স্থির থাকতে পারল না। নিজে নিয়ম করে নিজেই তা আবার অমান্য করবে! এ কী স্বার্থান্ধতা! তীব্র প্রতিবাদ করে পাঠাল বিজয়। কেশবের অনুগত লোকেরা পাল্টা আক্রমণ করল বিজয়কে। তুমুল গোল-মাল শুরু হয়ে গেল।

যোগমায়ার কাছে পত্র এল কলকাতা থেকে : 'তোমার স্বামীকে সাবধান করো যেন কেশবের বিরুদ্ধাচরণ না করে। করলে বিপদ আছে।'

চিঠি দেখে হেসে উঠল বিজয়। 'এরা কি পাগল? এদের হাতেই কি ভুবনের কর্তৃত্বের ভার? কেশব কি আমার সৃষ্টিকর্তা না পালনকর্তা? আমি কি কেশবকে দেখে ব্রাহ্মসমাজে এসেছি? যে যাই বলুক, সত্যের অবমাননা আমি কিছুতেই সহ্য করব না আর যাই হোক, লোক মুখপ্রেক্ষিতা আমার নয়।'

এ বিয়ের ফলে দুই দলে ভাগ হয়ে গেল ব্রাহ্মসমাজ। কেশবকে যারা আঁকড়ে রইল তাদের দল 'নববিধান' আর কেশবকে যারা ত্যাগ করল, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু আর দুর্গামোহন দাস, তারা গড়ল 'সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ'। এই সম্পর্কে বিরাট সভা হল টাউন হলে। বিজয়ের অগ্রবর্তিতায় স্বতন্ত্র সমাজের প্রতিষ্ঠা হল। মহর্ষি তাঁর সম্মতি দিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ও প্রচারকরূপে নিযুক্ত হল বিজয়। জ্বলন্ত উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজের সমুদ্রে।

'যা সত্য বুঝব তাই নির্ভয়ে প্রতিপালন করব।' লিখছে বিজয় : 'হিন্দু সমাজে আদরে ও সম্ভ্রমেই অবস্থান করছিলাম। ঈশ্বর যতই আমাকে সত্যের

দিকে আকর্ষণ করতে লাগলেন ততই হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। মনে করলাম ব্রাহ্মসমাজ শান্তিনিকেতন, সেখানে অসত্য-অশান্তির ঠাঁই নেই। কই, সেখানে শান্তি নেই, সত্যেরও সমাদর নেই। অশান্ত ও অসত্যের প্রশ্রয়স্থলকে কে আর ব্রাহ্মসমাজ বলে গণ্য করবে?

'ব্রাহ্মসমাজের দুর্গতি হল কেন? কারণ ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের সম্মানের চেয়ে মানুষের সম্মান ও মানুষের প্রতি ভালোবাসাই বেশি হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত সাধু ভক্তের কাছে মাথা নত করব, কিন্তু ঈশ্বরের সিংহাসনে কাউকে বসতে দেব না। ঈশ্বরের রাজত্ব বিস্তৃত হোক। ব্রাহ্মসমাজে শান্তি-সদ্ভাব বিস্তৃত হোক।'

বিজয়ের সঙ্গে অঘোর গুপ্ত এসে হাত মেলাল। প্রগাঢ় বৈরাগ্যে প্রেরিত হয়ে দুই বন্ধু লাগল ধর্মপ্রচারে।

মেছুয়াবাজার রোড ধরে যাচ্ছে, একদিন বিজয় দেখল সামনেই এক সৌম্যোজ্জ্বল সন্ন্যাসী।

নমস্কার করল বিজয়। সাধু তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল। সেই স্পর্শে বিজয়ের দেহ মন স্নিগ্ধ হয়ে গেল।

ব্রাহ্মসমাজের কথা উঠল। ধর্মান্দোলনের কথা। নতুন যে এক অভ্যুত্থান হবে বাংলা দেশে তারই আশ্বাসের আভাস।

একদিন আসুন না আমাদের সমাজমন্দিরে। দেখুন না কেমন কী হচ্ছে?

বেদীতে বসে উপাসনা করছে বিজয়, একদিন দেখতে পেল, এক কোণে সেই সাধু বসে। একমনে শুনছে উপদেশ। মুখে বিনম্র আবিষ্টতা।

'কেমন লাগল উপাসনা?' সভাশেষে সাধুকে জিগগেস করল বিজয়।

'চমৎকার। সব তো শাস্ত্রের কথা।' বললে সাধু।

'শাস্ত্রের সঙ্গে সমতা রেখে, তাকে অতিক্রম না করে বলাই তো ভাল।'

'ঠিক। শাস্ত্রের মর্যাদা কখনো লঙ্ঘন করা উচিত নয়।' সমর্থন করল সাধু।

'কিন্তু, সাধুজী, শাস্ত্রীয় জ্ঞানে কিছু হচ্ছে না, যাচ্ছে না প্রাণের অশান্তি।' বিজয়ের স্বরে বুঝি কাতরতা ফুটে উঠল : 'এই অভাব এই শুষ্কতা কী করে যাবে? কবে, কোথায় পাব সেই স্থির নিরাপদ ভূমি?'

সাধু কিছুক্ষণ চুপ করে কী ভাবল। জিগগেস করল, 'তোমার গুরু হয়েছে?'

'আমি গুরুবাদ মানিনা।' বিজয় বললে গম্ভীর হয়ে।

সাধু হাসল। 'তুমি এত শাস্ত্র জান আর এই সার কথাটাই খেয়াল করোনি। যে অদীক্ষিত তার সমস্ত পণ্ডশ্রম। কর্ণধার ছাড়া সংসারসাগর পার হবে কী করে?'

'তা হলে আপনিই আমার গুরু হোন।' বিজয় ব্যাকুল স্বরে বললে, 'আপনিই আমাকে দীক্ষা দিন।'

'না, না, আমি তোমার গুরু হব না। তোমার গুরু আসছেন। কাল পরিপক্ক হলেই তিনি উপস্থিত হবেন।' উদার আশ্বাসে বললে সাধু : 'দীক্ষা দিয়ে তোমাকে পূর্ণ করবেন।'

'কাল পরিপক্ক হবে কবে?'

'যখন অন্তরে দৈন্য আসবে। অহংকার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।'

'ধূলিসাৎ হয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ, সকলের পদধূলি নিতে-নিতেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।' সাধু বললে, 'বিচলিত হয়ো না। প্রতীক্ষা করো।'

'ধৈর্যই ধর্ম, ধৈর্যই মানুষের মনুষ্যত্ব।' বলছেন গোস্বামী-প্রভু, 'চঞ্চলতাই অশান্তি। সকল বিষয়ে ধৈর্য অবলম্বন করাই সাধন। আগুন সর্ব অবস্থাতেই উত্তপ্ত, তেমনি যে ধার্মিক সে সর্ব অবস্থাতেই ধীর, নম্র, সমবুদ্ধি। বিপদে সম্পদে, নিন্দায় প্রশংসায়, দুই অবস্থাতেই পরীক্ষা হয় মানুষের সত্যি ধর্মলাভ হয়েছে কিনা। যদি দুই অবস্থাতেই সে অচঞ্চল থাকতে পারে, তার বিনয় ও সমতার ভাবান্তর না হয়, তা হলেই বুঝবে তার ধর্মলাভ হয়েছে।' আবার বলছেন, 'ধর্ম কি অমনি সহজ জিনিস? অভিমানশূন্য হতে হবে। গাছের যেমন বীজ না পচলে অঙ্কুর বার হয় না তেমনি মানুষের অভিমানটি একেবারে বিনষ্ট না হলে ধর্মের অঙ্কুর গজায় না। অভিমান যতকাল আছে ততকাল ধর্মের নামগন্ধও নেই। আসল কথা, জীয়ন্তে মৃত হতে হবে।'

কিন্তু কোথায় সদগুরু?

দেশে বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করছে বিজয়, কিন্তু সব সময়ে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে কোথায় সেই ভবার্ণবের নাবিক?

প্রথমে কর্তাভজাদের দলে গিয়ে ভিড়ল। ওদের দলপতি জগচ্চন্দ্র গুপ্তের কাছে দীক্ষা নিল। ওদের করবার মধ্যে এক কর্ম, তা হচ্ছে প্রাণায়াম। প্রাণায়ামে তো শরীরের উন্নতি কিন্তু অন্তরবস্তু কই?

কর্তাভজাদের ছেড়ে গেল এবার অঘোরপন্থীদের আস্তানায়। এদের ছেড়ে ধরল কাপালিকদের। হীনাচারের বীভৎসতায়ই বা চিত্তের প্রসন্নতা কই? বাউল রামাইত দরবেশ ফকির বৌদ্ধলামা একে একে সকলের দ্বারস্থ হল, কিন্তু কোথায় সেই পারাপারের মাঝি, কোথায় বা সেই তাপহরণ ঔষধের সন্ধান?

ঘুরতে-ঘুরতে এসেছে বিজয়। আছে সাহেবগঞ্জে। অদ্ভূত স্বপ্ন দেখল বিজয়।

যেন বিরাট এক নদীর পারে বসে আছে। কত শত লোক পার হচ্ছে নৌকোয়, কেউ তাকে ডাকছে না, ফিরেও তাকাচ্ছে না। হঠাৎ কে একজন এসে তাকে নৌকোয় তুলে নিয়ে এল ওপারে। ওপারে কতগুলো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা। তারা তাকে এক বাগানে নিয়ে গেল। বিচিত্র ফুল ফুটে আছে চারপাশে। ফুলগুলো একত্র হয়ে নিমেষে স্ত্রীরূপ ধারণ করল। বললে,

'তোমার হৃদয়নাথকে অন্বেষণ করো।'

কোথায় হৃদয়নাথ? উন্মনা হয়ে চারদিকে খুঁজছে, হঠাৎ একটা কুকুর ছুটে এসে বললে, 'এই ফল খাও।' ফল খেল বিজয়। কুকুর চলে গিয়ে এল এক জটাজুটধারী ঋষি। বললে, 'হাত ধরো।' হাত ধরতেই সে বিজয়কে নিয়ে আকাশে উঠতে লাগল, গ্রহ-তারা অতিক্রম করে, ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বলোকে। ক্রমশ নিয়ে গেল এক জ্যোতির্ময় ধামে। দেখল সেখানে আরো সব ঋষি বসে আছে। একজন জিগগেস করল, 'তুমি কে?' বিজয় বললে, 'পৃথিবীতে গঙ্গাতীরে শান্তিপুর নামে এক জনপদ আছে। সেইখানে অদ্বৈত আচার্য নামে এক সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। আমি অকিঞ্চন বিজয়কৃষ্ণ সেই কুলেই জন্মগ্রহণ করেছি।' 'এখানে এসেছ কেন?' 'ভগবানকে দেখতে। তাঁকে দেখবার লালসায় মনপ্রাণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।'

'বৎস ধৈর্য ধরো। তিষ্ঠ। দেখবে সেই দুর্লভদর্শনকে।' বলে ঋষিরা সমস্বরে স্তোত্র পাঠ করতে লাগল। পাঠ করতে-করতে নাচতে লাগল। ভগবান প্রকাশিত হলেন। অত শোভা সৌন্দর্য বুঝি কল্পনায়ও আনা যায় না। বিজয় মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

জ্ঞান পেয়ে দেখল সেই বাগানে পড়ে আছে। কাঁদতে কাঁদতে ছুটতে লাগল। কেন আমি মূর্ছা গেলাম? কেন প্রভুকে দেখলাম না চোখ ভরে? কোথায় তিনি? তাঁকে না দেখে বাঁচব কী করে? কেন সেই জ্যোতির্ধামেই আমার প্রাণ গেল না? কোথায়, কোথায় আমার সেই দয়িত দয়ানিধি, আমার করুণাঘন কমলনয়ন?

কে একজন বললে আকাশ থেকে : 'বৎস, স্থির হও। প্রভুর চরণ ধ্যান করো। তোমার আশা পূর্ণ হবে।'

আরো একটা স্বপ্ন দেখল বিজয়।

কোথায় ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসব হচ্ছে। সাধারণ সমাজের লোকদের নিমন্ত্রণ হয়নি। বিজয় চলে যাচ্ছে, কতগুলো লোক তার পথ আটকাল। কে বললে, এ ব্রহ্মজ্ঞানী। বীরবেশী এক পণ্ডিত এগিয়ে এসে বিজয়ের একটা দাঁত ভেঙে দিল। জিগগেস করলে, 'আমাকে চেন?' 'আজ্ঞে না।' 'আমি বীর হনুমান। এখানে এসেছ কেন?' 'আমি যে ব্রহ্মজ্ঞানী।' 'ব্রহ্মজ্ঞানী তো আমিই।' হনুমান বললে, 'আমি কি রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রকে পুজো করি নাকি? আমি সেই আত্মারাম পরব্রহ্মেরই পুজো করি। দেখবে?' বুক চিরে ফেলল হনুমান। বিজয় দেখল পঞ্জরের অস্থিতে, মাংসে, সোনার অক্ষরে ওঁ রাম লেখা।

বিজয় প্রণাম করে বললে, 'আমায় কিছু উপদেশ দিন।' হনুমান বললে, 'চলো, তোমাকে যোগদীক্ষা দেব।' বলে বৃক্ষতলে এক কুটিরে নিয়ে গেল। বললে, 'ইচ্ছে করলে এক মুহূর্তে এই কুটিরের জায়গায় একটা অট্টালিকা তৈরি করতে পারি। প্রয়োজন থাকে তো বলো।' 'না, প্রয়োজন নেই।' 'তবে

এই কুটিরে প্রবেশ করো, তোমার তপস্যা হবে।' কুটিরে প্রবেশ করল দুজনে। হনুমান বললে, "ওঁ তৎসৎ ওঁ রামঃ" এই নাম জপ করো, এই নামের ভাব ধ্যান করো। মন্ত্রসাধনের পর আমি আবার আসব।'

অনেকদিন কেটে গেল। হনুমান এসে বললে, 'তুমি সিদ্ধ হয়েছ। তোমার শরীরের লোমকূপ দিয়ে আনন্দস্রোত বয়ে যাচ্ছে। নয়নে প্রেমাশ্রু ঝরছে। কী, আত্মা পূর্ণ হয়েছে তো?' 'হয়েছে।' 'তবে অন্য সাধনের উপদেশ নাও।' বিজয় বললে, 'অন্য সাধন আবার কী!' হনুমান বললে, 'ব্রহ্মে প্রবেশ। আর এরই নাম সন্ন্যাস।' বিজয় আপত্তি জানাল। বললে, 'ব্রাহ্মধর্মে সংসারত্যাগ নিষিদ্ধ। তা ছাড়া প্রচারের কাজে আমি বেরিয়েছি, দেশে ধর্মের বড় অভাব।' 'বেশ, তবে দেশে আনন্দধর্ম প্রচার করো, তাতেই ব্রহ্মের বিস্তার হবে। পরে না হয় ব্রহ্মে প্রবেশ করবে। এস এখন আমরা সংকীর্তন করি।'

সর্বশরীরে ওঁ রাম, হনুমান, বিরাট বানরদেহ ধারণ করে দুই বাহু ঊর্ধ্বে বিস্তার করে নাচতে লাগল। বললে, 'আমার বানরদেহের মূল কী জান?' 'না।' 'আমার মুখখানা ওঁ। এই ওঁ পুরুষ, আর পুচ্ছ প্রকৃতি। এই পুচ্ছ দিয়েই রাবণের সর্বনাশ করেছি। সাধন করে ব্রহ্মে প্রবেশ করলে তুমিও পুরুষ-প্রকৃতি হয়ে যাবে।'

দেবতারা এসে কীর্তনে যোগ দিল। সহসা এক অপরূপ জ্যোতি প্রকাশিত হল কুটিরে। জ্যোতির মধ্যে লুটোতে লাগল বিজয়। হনুমান জিগগেস করলে, 'কী করছ?' 'গায়ে জ্যোতি মাখছি।' 'খুব মাখো। ও ব্রহ্মজ্যোতি। খানিকটা কাপড়েও বেঁধে নাও।' বিজয় বললে, 'নিরাকারকে কী করে বাঁধব?' 'এ জড় কাপড় নয়, হৃদয় কাপড়।'

কিছুকাল কীর্তনের পর দেবতারা বিদায় নিল। জ্যোতির্ময় ব্রহ্মও অন্তর্হিত হলেন। 'এখানে রোজ এরকম হয়।' বললে হনুমান, 'এতদিনে তুমি তপস্যামগ্ন ছিলে তাই জানতে পারনি।' 'আমার খুব ইচ্ছে এখানে থাকি। কিন্তু থাকবার উপায় নেই। কেশব সেন ব্রাহ্মসমাজের খুব অনিষ্ট করছে, তার প্রতিরোধে আমাকে যেতে হবে।' 'কেশব ভুল করছে। আমি যদি ব্রহ্মে প্রবেশ না করতাম তা হলে তাকে সংশোধন করে আসতাম। মহাভারত পড়েছ? কেমন নষ্ট করেছিলাম ভীমের অহংকার, মনে আছে?'

'আমি তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করব?' জিগগেস করল বিজয়।

'অসত্যের সঙ্গে সংগ্রাম করো, কিন্তু কেশবকে ভালবাসো। শুধু প্রেম করো, প্রেম করো। প্রেম—প্রেম ছাড়া কিছু নেই।'

ঘুম ভেঙে গেল বিজয়ের।

বিন্ধ্যাচলে, তিব্বতে, হিমালয়ে, স্থানে অস্থানে, গুরুর সন্ধানে ফিরতে লাগল বিজয়। কবিরপন্থী, দাউদপন্থী, গোরখপন্থী, সুন্দরপন্থী সব পথে ধাওয়া করলে। সকলের মুখেই এককথা, আমরা কেউ নই, গুরু তোমার

অন্যত্র ঠিক আছে, সময়ে পাবে।

কোথায় সেই গুরু? কোথায় চাতক পাখির ফটিক জল?

'স্বপ্নে দেবদর্শন যদি প্রকৃত হয়,' বলছেন গোঁসাইজি, 'বিষয়াসক্তি দূর হয়ে যায়। মনে হয় আমি ধন্য, আমি উদ্ধার পেয়ে গেছি, আমার আর ভয় নেই। যদি এমন ভাব না জাগে, জানবে স্বপ্নও অবাস্তব।'

'কলিতে সাক্ষাৎ দর্শন ও সিদ্ধিলাভ একই কথা। এজন্যেই স্বপ্নে দর্শন দিয়ে থাকেন।

'স্বপ্নেই চরিত্রের পরীক্ষা হয়। যদি দেখ প্রলোভনে পড়েও মন স্থির আছে, বুঝবে দৃঢ়ভূমিতে এসেছ আর যদি চাঞ্চল্য জাগে, বুঝবে ভিতরের দুর্বলতা জয় করতে পারনি। গুরু বা দেবতা সম্পর্কে যে স্বপ্ন দেখা যায়, সন্দেহ করবে না, তা সত্য বলে জানবে। স্বপ্নের মধ্যে যদি অসংলগ্নও কিছু মনে হয়, জানবে তারও তাৎপর্য আছে।

'ভালো স্বপ্ন দেখা মহাসৌভাগ্যের বস্তু। বহুকাল সাধন ভজন করে যে অবস্থা আয়ত্ত করা কঠিন তা কখনো কখনো এক মিনিটের স্বপ্নে লাভ হয়ে যায়।

'আমি যখন ডাক্তারি করতাম, তখন রোগ শক্ত দেখলে পরলোকগত দুর্গা-চরণ বাঁড়ুয্যে আমাকে স্বপ্নে ওষুধ বলে দিতেন। তাতে রুগীর অব্যর্থ উপকার হত।'

তৈলঙ্গ স্বামীর কথা বলুন।

'বিশ্বাস বনযায়।' এই বলেছিল বিজয়কে। বলেছিল, 'তোর গুরু নির্দিষ্ট আছে, যথাকালে তার দেখা পাবি।'

দীক্ষা লাভের পর তৈলঙ্গর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হল বিজয়ের। হাতের তেলোতে লিখে তৈলঙ্গ জিগগেস করলে, 'ইয়াদ হ্যায়?'

কী রে, ঠিক বলিনি? তাকাল চোখের মধ্যে।

ক্রমে ক্রমে অজগরব্রত নিয়ে সমস্ত ছাড়ল তৈলঙ্গ। একস্থানে বসে থাকে, নড়ে না চড়ে না, কোন রকম ইঙ্গিতও করে না। জীবন্ত শিব মনে করে সবাই তার মাথায় দুধ আর গঙ্গাজল ঢালে। হুঁ-হাঁও করে না। রাত চারটে থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত পৌষ মাসের শীতেও জল ঢালার বিরাম নেই।

দেহের ধর্ম, দেহ পচে গেল। একভাবে নির্বিকার অবস্থায় থেকে দেহ ছেড়ে দিল তৈলঙ্গ। গঙ্গায় তার জলসমাধি হল।

॥ ১১ ॥

ধর্মের ভিত্তি কোথায়? নিশ্চিন্ত হবার উপায় কী? সম্পূর্ণ নিরাপদভূমি কি কোথাও নেই?

নিরন্তর এ জিজ্ঞাসায় ছিন্নভিন্ন হচ্ছে বিজয়। সমাধান ঠিক বার করে ফেলল। ব্রহ্মলাভ ও দিনযামিনী তাঁর সহবাস ছাড়া অন্য উপায় নেই। তাঁর সঙ্গে সমস্ত প্রাণের যোগ ছাড়া এই মহাব্যাধির ওষুধ নেই কোনোখানে।

ওষুধের খোঁজে নানা জায়গায় ঘুরতে লাগল বিজয়।

ঘুরতে-ঘুরতে বিন্ধ্যাচল চলে এসেছে। খবর পেয়েছে একজন মহাপুরুষ আছেন এ অঞ্চলে, তিনি খাইয়ে দিতে পারেন ওষুধ। কিন্তু কোথায় সেই মহাপুরুষ? খুঁজতে খুঁজতে ঢুকে পড়েছে এক বনের মধ্যে। ভাঙা পুরনো একটা বাড়ি দেখতে পেয়ে এগুলো বিজয়। পরিত্যক্ত, মানুষবসতির চিহ্ন নেই। ঠিক করল এইখানে, এই মহারণ্যের নির্জনেই রাত কাটাবে।

গভীর রাতে সেই পোড়ো বাড়িতে একদল ডাকাত এসে উপস্থিত হল। ডাকাতি করতে নয়, লুট-করা সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করতে। কিন্তু এ কী উৎপাত! এই লোকটা এখানে এল কী করে? দেখলে সাধুটাধু বলে মনে হয়, কিন্তু কে জানে কী আসল মতলব? এই, ওঠ। শালা, ভাগ এখান থেকে।

বিজয়কে তাড়িয়ে দিল ডাকাতেরা।

জিনিসপত্র ভাগ বাঁটোয়ারা করবে কী, ডাকাতদের ভাবনা ধরল। লোকটা যদি পুলিশকে গিয়ে খবর দেয়। যদি দেখিয়ে দেয় আমাদের আড্ডা! যদি আমাদের ও সনাক্ত করে!

'ওকে কেটে ফেল।' ডাকাতেরা হুঙ্কার করে উঠল।

দলপতি বুঝি চাইল বাধা দিতে। সাধুকে হত্যা করলে বিপরীত কিছু না ঘটে বসে।

দলপতির কথা কেউ গ্রাহ্য করল না। বিপদ এড়াতে হলে সাধুকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই উচিত।

দুজন ডাকাত খোলা তলোয়ার নিয়ে এগুলো সাধুর সন্ধানে।

দূরে ঝোপজঙ্গলের পাশে ঐ বুঝি বসে আছে। কিছুদূর এগিয়েই ডাকাতেরা থমকে দাঁড়াল। সাধুর মুখোমুখি একটা বাঘ বসে আছে। কী ভয়ঙ্কর! সাধু যেমন নিশ্চল বাঘও তেমনি নিশ্চল। দরকার নেই সামনে থেকে আক্রমণ করে। ঘুরে যাই, পিছন দিক থেকেই কোপ বসাব। ডাকাতেরা ঘুরে পিছন দিকে হাজির হল। কী সর্বনাশ, সেখানেও একটা বাঘ বসে। সাধুকে রক্ষা করবার জন্যে যেন দুই দুর্দান্ত প্রহরী মোতায়েন।

ফিরে গেল ডাকাতেরা। দলপতিকে বললে। মারতে পারলাম না।

কে কাকে মারে!

প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হল, ধ্বসে পড়ল ডাকাতে আড্ডার ছাদ। দলপতি বাঁচল বটে, কজন ডাকাত প্রাণ হারাল।

কতক্ষণ পরে, কোথায় বজ্রবিদ্যুৎ, গগনের থালায় চাঁদ উঠল। ইতিমধ্যে

কোথায় কী হয়ে গেছে বিজয় বিন্দুবিসর্গও টের পেল না, ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে রইল। ভোরে উঠে শুনল কোথায় যেন মঙ্গল আরতির বাজনা বাজছে। বাজনা লক্ষ্য করে চলতে-চলতে পেঁৗছল এসে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে।

ডাকাতদের সর্দার খুঁজতে-খুঁজতে চলে এসেছে। এই সেই সাধু, চিনতে পেরেছে বিজয়কে। চিনতে পেরেই কাঁদতে-কাঁদতে পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বিজয় তো হতবাক। তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বললে সর্দার। 'সাধুজী, বহুৎ গুণা হুয়া, মাপ কিজিয়ে।'

যে অহিংসক তাকে কেউ হিংসে করে না।

'পড়েছ তো মহাভারত? তাতে কী লিখেছে?' বললেন গোঁসাই-প্রভু, 'লিখেছে যাদের ভেতরে হিংসে নেই তাদের বাইরেও হিংসে নেই। হিংস্র-জন্তুরাও তাদেরকে গাছ-পাথরের মতোই মনে করে।'

একটা ঘটনা বলি শোনো।

এণ্ডারসন সাহেবকে চিনতে তো? হাতিখেদার সাহেব। হাতিতে চড়ে জয়দেবপুরের জঙ্গলে শিকার করতে গেছে। নিবিড় বন, এণ্ডারসন একা। ভারি বাতাসে বাঘের গন্ধ পাওয়া গেল। হাতি ভয় পেয়ে হাওদা থেকে এণ্ডারসনকে ফেলে দিয়ে ছুট দিল। বাঘ একেবারে এণ্ডারসনের চোখের সামনে। বাঘকে লক্ষ্য করে দু তিনবার গুলি ছুঁড়ল এণ্ডারসন। লক্ষ্য ব্যর্থ হল। বাঘ ধাওয়া করতেই এণ্ডারসন ছুট দিল, এখানে-ওখানে, নানান দিকে, কিন্তু সঙ্গ ছাড়বার পাত্র নয় বাঘ। উপায় কী! হঠাৎ এণ্ডারসন দেখতে পেল অদূরে এক উলঙ্গ সাধু চুপচাপ বসে আছে। আমাকে বাঁচাও, সাধুকে ধরে পড়ল এণ্ডারসন। কী হয়েছে? অত ছুটোছুটি করছ কেন?

'বাঘ!'

'বাঘ? তাতে কী?' সাধু একবিন্দু চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। শান্ত স্বরে বললে, 'স্থির হয়ে বোস।'

'বসব কী, বাঘ যে আমাকে ধরে ফেলল।'

হাত নেড়ে বাঘকে অগ্রসর হতে বারণ করল সাধু। বললে, 'বৈঠ বাচ্ছা, আউর নাগিজ মৎ আও।'

আশ্চর্য, বাঘ থেমে পড়ল; মুখে গোঁ-গোঁ শব্দ, লেজ নাড়তে লাগল। কতক্ষণ নিশ্চেষ্ট হয়ে থেকে চলে গেল একদিকে।

'বাঘ পেলে কোত্থেকে?' এণ্ডারসনের মুখের দিকে তাকাল সাধু।

'শিকার করতে চেয়েছিলাম।' বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এণ্ডারসন : 'সব গুলিই ব্যর্থ হল, বাঘ পালিয়ে গেল না। ক্রুদ্ধ হয়ে আমার পিছু নিল।'

'তা তো নেবেই। তুমি ওকে গুলি মারতে গেলে কেন? তুমি কি বাঘ খাও?'

'তা নয়—'

'তোমার আমোদ হবে বলে তুমি তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে।' সাধু হাসল, 'কিন্তু সে যদি সুযোগ পায় সে একটু আমোদ করবে না?'

'তাই তো ভাবছি। আপনাকে দেখে সে স্তব্ধ হয়ে গেল। আশ্চর্য, কী করে আপনি বনের বাঘকে বশ করলেন?'

'কোনো মন্ত্রে-তন্ত্রে নয়, শুধু ভালোবেসে।' সাধু স্নিগ্ধস্বরে বললে, 'শুধু মনের থেকে হিংসাকে বিসর্জন দিয়ে। যতক্ষণ হিংসা ততক্ষণই প্রতিহিংসা। অন্যে তোমাকে হিংসা করে যেহেতু তোমার নিজের মনের মধ্যেই হিংসা আছে। হিংসাশূন্য হও, দেখবে সাপে বাঘেও কিছু করবে না।'

এণ্ডারসনের কী হল কে জানে, কাতর হয়ে সাধুর আশ্রয় প্রার্থনা করল। সাধু তাকে দীক্ষা দিল, শিখিয়ে দিল ভজন সাধন। বাবুর্চি তুলে দিয়ে রাঁধুনে বামুন রাখল এণ্ডারসন, নিরামিষ খেতে লাগল। এখন সে বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছে।

আর একবার গহন অরণ্যে পথ হারিয়েছিল বিজয়। পথশ্রমে দেহ অবসন্ন। একটা বৃক্ষের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। হিংস্র পশুর গর্জন কানে আসছে, অন্ধকারে পথ দেখিয়ে কে নিয়ে যাবে বাইরে? যা হবার হবে, নির্জন বনেই করবে রাত্রিযাপন। মাটির উপর ঘুমিয়ে থাকবে।

হঠাৎ কোত্থেকে লাঠি হাতে একটা লোক এসে উপস্থিত, বলা নেই কওয়া নেই বিজয়ের পা টিপতে বসল।

'কে, কে তুমি?'

লোকটা কোন উত্তর দিল না। বিজয় ছাড়িয়ে নিতে চাইলেও ছাড়ল না পা, আঁকড়ে রইল।

'এ কি, পাগল নাকি?'

তবু লোকটা উচ্চবাচ্য করল না, পা টিপতে লাগল।

ঘুমিয়ে পড়ল বিজয়। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল, চেয়ে দেখল লোকটা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। পাহারা দিচ্ছে।

ভোর হতেই ধড়মড় করে উঠে বসল বিজয়। কোথায়, কোথায় সেই প্রহরী? কখন কোন দিকে চলে গিয়েছে কে জানে।

বিজয় তখন লাহোরে, হঠাৎ বাড়ি থেকে চিঠি এল তার মা স্বর্ণময়ী পাগল হয়ে গৃহত্যাগ করেছে। বিজয় অস্থির হয়ে উঠল। তখুনি ফিরে চলল বাড়ি।

সন্দেহ কী, সংসারের জ্বালাযন্ত্রণায়ই মার এই উন্মাদ অবস্থা। দুঃখী দেখলেই তাঁর মন গলে, বাড়ির লোক কী খাবে না খাবে হিসেব না করেই সব খাদ্য-দ্রব্য বিলিয়ে দেন। কারু মুখ মলিন দেখলেই হল, স্বর্ণময়ীর কাছে এলেই তিনি তা সোনা করে দেবেন।

সেই থেকে রোজ আকাশগঙ্গায় আসে বিজয়। শশিভূষণও সঙ্গ নেয়।

একদিন শশীকে বললে, 'শশী, আমি আজ সমস্ত রাত ভজন করব, তুমি আমার পাশে চুপটি করে ঘুমোও।'

গায়ের চাদর পাকিয়ে শশীর জন্যে বালিশ করে দিল বিজয়।

'কী, ভয় করবে নাকি?'

শশী হাসল। বললে, 'তুমি পাশে থাকলে ভয় নেই।'

অরণ্যে পর্বতে কোথায় কে হিংস্র জন্তু গর্জন করছে, মাতৃপার্শ্বে পরিতৃপ্ত শিশুর মতো নির্ভয়ে ঘুমল শশী। আর খাড়া হয়ে বসে ব্রহ্মধ্যানে বিজয় মগ্ন হয়ে রইল। ব্রাহ্মমুহূর্তে তুলল শশীকে। চলো, নির্ঝরের জলে স্নান করি। পরে গুহামুখে বসি উপাসনায়। করতাল বাজিয়ে ললিতকন্ঠে গান ধরল বিজয় :

প্রভু হৃদিরঞ্জন মনোমোহনকারী।
ভগবজ্জন-প্রাণ-প্রাণ হৃদয়বিহারী ॥
তুমি প্রাণ-রমণ হৃদি-ভূষণ পাপহরণকারী।
আমার সাধ সতত হয় যে মনে ওরূপ নেহারি।
দরশন করি মোহ আঁধার নিবারি ॥
(সেদিন কবে বা হবে!)

দেখতে পেল একটা প্রকান্ড সাপ বিজয়ের উরু বেয়ে উঠছে উপরে। উঠুক। চঞ্চল হয়ো না। নির্বিচল থাকো। মনে যখন হিংসা নেই, যখন তুমি ভক্তিতে বিগলিত তখন বিষধরও নির্বিষ হয়ে যাবে।

আস্তে-আস্তে সাপ নেমে গেল গা থেকে।

'শশী, আমি আর কলকাতায় ফিরব না।' বললে বিজয়, 'তুমি একলাই ফিরে যাও।'

এমনি ধারা কথা বুঝি গৌরহরিও বলেছিল তার সঙ্গীদের। বলেছিল, 'তোমরা ঘরে ফিরে যাও। আমি আর ফিরব না। আমি আমার প্রাণেশ্বরকে দেখতে চললাম ব্রজধামে।'

ঠিক সেই কান্না সেই সুর। সেই উন্মাদনা।

একদিন শশীকে সঙ্গে করে বুদ্ধগয়ায় গেল। নিরঞ্জনার তীরে বুদ্ধ-চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। সারাদিনে আর গৃহে ফেরার নাম নেই। আহার্য প্রস্তুত করে বসে আছে শশী, কিন্তু কী আহার্য পেয়েছে বিজয় যে জৈব ক্ষুধা বিস্মৃত হয়েছে।

রঘুবরকে যত দেখে ততই অবাক মানে বিজয়। ইন্টে, রামচন্দ্রে, তার কী ঐকান্তিকতা। সাধনার বলে অনেক কর্তৃত্ব আয়ত্ত করেছে। ডাকলে ঝাঁক বেঁধে পাখিরা উড়ে আসে, কাঁধে বসে, ঠুকরে ঠুকরে জটা পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। সাপ গা বেয়ে উঠে আবার নেমে যায়, বাঘ দূরে মাথা নুইয়ে চুপ করে বসে থাকে।

মন্দ কী, এঁর থেকেই দীক্ষা নি।

'গুরু না পেলে কি ধর্মলাভ করা যায় না?' গোস্বামী-প্রভুকৃত 'আশাবরীর উপাখ্যান'-এর আশাবরী জিগগেস করল যোগীকে।

যোগী বললে, 'না মা, গুরু না পেলে ধর্মলাভ হয় না। ক-খ শিখতে গুরুর দরকার, অঙ্ক ভূগোল জ্যোতিষ শিখতে গুরুর দরকার, কৃষি বা বাণিজ্য শিখতেও গুরুর দরকার। গুরু ছাড়া রান্না বা গৃহকর্মও শেখা যায় না। শুধু ধর্মের বেলাই গুরুর দরকার হবে না এ বড় আশ্চর্যের কথা। যদি বলো ধর্ম আমার মধ্যেই আছে তা আবার কার কাছে শিখব? তেমনি ক-খও তো বইয়ের মধ্যে আছে, শিখে নিলেই হয়। অন্যকে তবে খোশামোদ করা কেন? বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-খনিতে তো রোগের ওষুধ পড়ে আছে, তা শিখবার জন্যে কবিরাজের দ্বারস্থ হও কেন? যদি পিপাসা পায়, পিপাসার্ত উন্তা-কোদাল নিয়ে কুয়ো খুঁড়তে বসে না, যেখানে জলাশয় আছে সেখানে পাত্র নিয়ে গিয়ে জল আহরণ করে। তেমনি জ্ঞানস্বরূপ ভগবান স্বয়ং গুরুশক্তি রূপে সর্বভূতে বিরাজ করছেন। যেখানে যেমনি প্রকাশ পাচ্ছেন সেখান থেকে তেমনি শিক্ষালাভ করতে হয়। যেখানে প্রেম ভক্তি বিশ্বাস রূপে প্রকাশমান সেখান থেকে প্রেম ভক্তি ও বিশ্বাস গ্রহণ করো। ধর্ম বাক্য নয়, মত নয়, দল নয়—ধর্ম স্বয়ং ভগবান, ভগবানের পরাশক্তি। যিনি এই পরাশক্তিকে দেখিয়ে দেন তিনিই গুরু। সকলের পদধূলি নিতে-নিতে অহঙ্কার নষ্ট হলে, হৃদয় বিনীত হলেই গুরুদর্শন সম্ভব।'

ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের নিচেই গোড়ধোয়া। দ্বাপরে কৃষ্ণ এইখানে এক ক্ষুদ্র জলাশয়ে পা ধুয়েছিলেন বলে এই নাম। এইখানে প্রতি বৎসর স্থানীয় ব্রাহ্মরা চৈতন্যোৎসব করে। এবার বিজয় আছে আকাশগঙ্গায়, তার চেয়ে যোগ্যতর উপাসক আর কে আছে, তার ডাক পড়ল।

উপাসনায় বসল বিজয়। কিন্তু কয়েকটি কথা বলতে না বলতেই তার কণ্ঠ ভাববিকারে রুদ্ধ হয়ে গেল।

সকলে বিমূঢ় হয়ে গেল। ও কে বসেছে উপাসনায়? উপাসক, না স্বয়ং উপাস্য?

বিজয় উঠে পড়ল। বললে, 'আপনারা কেউ বসে উপাসনা করুন। আমার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠছে।'

কিন্তু রঘুবর দাস তার গুরু নয়। প্রাণ বলছে এখানেই কাছাকাছি কোথাও তিনি আছেন। স্মরণে স্পষ্ট হচ্ছে, এ আশ্রম এ মন্দির সে স্বপ্নে দেখেছিল। হ্যাঁ, মন্দিরে ঐ মহাবীরের মূর্তি। মহাবীর তাকে হাত দিয়ে ইশারা করে জানিয়েছিল, আরো উপরে যাও, আরো উপরে।

আশ্রমে একজন ব্রহ্মচারী আছেন, তার সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মাতে দেরি হয়নি বিজয়ের। রঘুবর আছেন, একদিন ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা হচ্ছে, কটা রাখাল ছেলে এসে সংবাদ দিল, পাহাড়ের চূড়ায় এক সাধু বসে আছেন।

'আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।'

'না, আমার সঙ্গে তোমার থাকা চলবে না। তোমাকে যে আনন্দ দিলুম তা তোমাকে ঘরে-ঘরে জনে-জনে বিতরণ করতে হবে।' বললে পরমহংস, 'তুমি অদ্বৈত সন্তান, আচার্যের ধারা তোমার রক্তে, তোমাকে দিয়েই এই কাজ ভালো হবে। যাও সাধন করো, ঠিক মিলে যাবে সিদ্ধি। আমার জন্যে কাতর হয়ো না। যখনই চাইবে তখনই আমার দেখা পাবে। আমি সব সময়ে আছি তোমার কাছে-কাছে।'

সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা, এ সম্পূর্ণ কৃপাসাপেক্ষ। বলছেন গোস্বামী-প্রভু। এ দীক্ষা যে কোনো অবস্থায় যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময়ে একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই হয়ে থাকে। ভগবানই সদ্‌গুরু। ভগবানের পদাশ্রিত ভগবজ্জন মহাপুরুষেরাই সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু কি শিষ্য করেন? না। তিনি গুরু করেন। শিষ্যের মধ্যে নিজের ইষ্টকে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁরই সেবা-পুজো করেন। শিষ্যের দেহ তাঁর দেবমন্দির। দেবমন্দিরে কোনো রকম অপচার বা অনাচার দেখলে সেবক যেমন লজ্জিত হয়, সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতির জন্যে নিজেকেই অপরাধী মনে করে, তেমনি শিষ্যের কোনো দুর্দশা দেখলে গুরুও মলিন হয়ে যান, নিজেরই সেবাপুজোয় ভ্রংশভ্রান্তি হয়েছে ভেবে নিজেকেই দোষী করেন। সেবক যেমন মন্দির সংস্কারে প্রবৃত্ত হয় তেমনি গুরুও ছোটেন শিষ্যের উদ্ধারণে। সদ্‌গুরুদত্ত নাম শুধু নাম নয়, শব্দ নয়, অক্ষর নয়, ধ্বনি নয়। এ নামে ভগবানের অনন্ত শক্তি। শিষ্যের মধ্যে এই শক্তি-সঞ্চারই সদ্‌গুরুর দীক্ষা। এই দীক্ষা, ভগবানের কৃপায়, যদি একবারও কারু লাভ হয় তা হলে তার আর নিজের কিছুই করবার থাকে না। তার জীবনের সমস্ত কাজ—প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত সেই একজনেরই ইচ্ছাধীন হয়ে পড়ে। কুমুরে পোকার আরশুলা ধরার মতো সদ্‌গুরু শক্তি সঞ্চার করেন, দীক্ষা দিয়ে, শিষ্যকে ক্রমে-ক্রমে আত্মসাৎ করে নেন।

কী বলেছে শাস্ত্র? বলেছে, দীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ নরোনারায়ণো ভবেৎ।

সাধন করো। সাধন ছাড়া সাধ্যবস্তু পাবার নয়।

'সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য-সাধন তত্ত্ব জানিবে সে তবে।'

॥ ১৩ ॥

খুব ভোরে স্নান-পুজো সেরে আশাবতী আশ্রমের সাধুদের প্রণাম করল। প্রণাম করল যোগীকে। বললে, 'প্রভু, আগে আমি সাধুদের পদধূলির মাহাত্ম্য কিছু বুঝতাম না। এখন দেখছি আমার মতো পাপীর পক্ষে এ মহৌষধ। সময় সময় মন ভীষণ অবসন্ন হয়ে পড়ে, ভগবানের নামস্মরণেও

উৎসাহ থাকে না। প্রাণের মধ্যে ঘোর জড়তা, হাসিও নেই কান্নাও নেই, গভীর অন্তর্দাহ—সে এক শোচনীয় অবস্থা। এই অবস্থায় মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করতে প্রবৃত্তি হয়, শুধু পাপভয়ে নিবৃত্ত থাকি। ভাবি, এই অন্তর্জ্বালার বুঝি কিছুতেই নিবারণ নেই। কিন্তু যখনই আপনার বা বাবাজীর চরণ-ধূলি নিয়েছি, তখনই সকল জ্বালাযন্ত্রণার অবসান হয়েছে। প্রাণে জেগেছে গভীর প্রশান্তি, অব্যক্ত আনন্দোচ্ছ্বাস। প্রভু, আর কারু পায়ের ধুলো নিলে কি অমনি শান্তি হবে?'

যোগীবর বললে, 'মা, তুমি যে ভক্তিপদরজের মাহাত্ম্য অনুভব করছ তার মানেই তোমার যোগশিক্ষার সময় সন্নিহিত। যতদিন অহঙ্কার প্রবল থাকে ততদিন সাধুদের পদধূলির প্রতি ভক্তি হয় না। সাধু কে? যিনি নিকটবর্তী হলে হৃদয়স্থ ধর্মভাব প্রস্ফুটিত হয়, নিজের থেকেই জিভে হরিনাম আসে, পাপমতিগুলি লজ্জিত হয়ে মুখ লুকোয়, তিনিই সাধু। তাঁর পদধূলি নিলেই উপকার। শুধু সাধুর পায়ের ধুলো বলে নয়, মানুষ মাত্রেরই পায়ের ধুলোর অনেক বল। প্রত্যেক মানুষেই দীননাথ দীনবন্ধু বিরাজ করছেন। সুতরাং প্রত্যেক নরনারীই এক একটি দেবমন্দির। যার অন্তরে দেবভক্তি আছে, সে দেবমন্দির দেখলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করে। একবার প্রণাম করলে আর সে লোভ ছাড়তে পারে না। আশাবতী, এই প্রণামের মাহাত্ম্য না বোঝা পর্যন্ত গুরুলাভ হয় না। সুতরাং তার ধর্মজীবনের সূচনাও হয় না।'

গয়া-ফল্গুর পরপারে রামগয়া। দীক্ষার কিছু পরে একদিন রামগয়ায় চলে এল বিজয়।

এ কী! এ জায়গায় কি আমি আগে একবার এসেছিলাম?

'চলো আমরা রামগয়ায় যাই।' আশাবতীকে বললে যোগীবর। 'ফল্গু পার হয়ে ঐ যে পাহাড় দেখছ ওর নাম রামগয়া। রামগয়া নাম, যেহেতু ঐখানে রাম পিতৃশ্রাদ্ধ করেছিল। পাহাড়ের একটা গোফাতে এক সাধু থাকত, কেবল দুধ খেয়ে তপস্যা করত বলে নাম দুধাহারি বাবা। ঐ দেখ ওপারে শ্মশান। পাহাড়ের নিচে ঐ গুহায় সীতা দশরথের হাতে পিণ্ড দিচ্ছে। মাটির তলা থেকে হাত বেরিয়ে এসেছে দেখবে। আগে নৃসিংহ-মন্দিরে যাই চলো।'

আশাবতী বিহ্বল চঞ্চল হয়ে উঠল। বললে, 'প্রভু, এ কি, আমার প্রাণ এমন করছে কেন? আমি যেন এখানে ছিলাম।' একজন সন্ন্যাসীকে দেখে আরো অস্থির হয়ে উঠল : 'ওঁর মতো আরো তিনটি সাধু ছিল এখানে।'

সন্ন্যাসী চমকে উঠল : 'কী বললে? তুমি এখানে ছিলে? কই তোমাকে তো দেখিনি কখনো।'

'আর সেই তিনজন সাধু?'

'তারা তো এইখানে ছিল।'

'ছিল?' আশাবতী ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করল সন্ন্যাসীকে। বললে, 'আপনাকে আমি এখানে অনেকবার দর্শন করেছি। চরণসেবা করে কৃতার্থ হয়েছি। ঐ বৃক্ষতলে আমার আসন ছিল। ঐ বৃক্ষের উত্তরের শাখায় আমার একটি চিহ্ন আছে।'

'চলো দেখি তো আছে কিনা।'

সকলে চিহ্ন দেখে অবাক।

'কিন্তু তুমি স্ত্রীলোক, তুমি এ আশ্রমে থাকবে কী করে?' বললে সন্ন্যাসী, 'এ আশ্রমে স্ত্রীলোক থাকবার নিয়ম নেই। মনে হচ্ছে তোমার ভুল হচ্ছে। কোনো সময়ে তুমি স্বপ্ন দেখে থাকবে হয়তো। আজ তা সত্য-রূপে প্রত্যক্ষ করলে।'

যোগীবরও তাই বললে। 'আমারও তাই ধারণা। স্বপ্নদর্শনই সত্য হল।'

গুরুকৃপালাভের পর একটানা এগারো দিন একমনে সমাহিত হয়ে বসে ছিল বিজয়। তার আগে কয়েকদিন কেটেছে প্রবল বৈহ্বল্যে। কখনো অট্ট-অট্ট হেসেছে, হুঙ্কার-গর্জন করেছে, কখনো বা কেঁদেছে নিষ্করুণ আর্তিতে। কখনো বা নামসুধারসে মগ্ন হয়ে রয়েছে। কিন্তু এ কী অবস্থা! বাহ্য-জ্ঞানের লেশমাত্র নেই। আগে আগে দুধে বেলপাতা ভিজিয়ে মুখে কোন-রকমে ঢুকিয়ে দিয়েছে রঘুবর, এখন স্নান নেই, আহার নেই, শয়ন নেই, নিদ্রা নেই, নেই এতটুকু আসনবিচ্যুতি।

সমাধি ভঙ্গের পর বাহ্যজ্ঞান এলে কে একজন জিগগেস করলে, 'কোথায় ছিলেন?'

'কী জানি কোথায়! সাধন করতে বসেছি, দেখলাম মা সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী এসেছেন।' বললে বিজয়, 'বলছেন, মায়ার অপর পারে যেতে হলে পরীক্ষা দিতে হবে। আমি বললাম, আমি পরীক্ষার উপযুক্ত নই, আমায় দয়া করো। না, না, পরীক্ষা। মা শুধু পরীক্ষার কথাই বলতে লাগলেন। আমি শুধু কাতর প্রাণে কাঁদতে লাগলাম। মা প্রসন্ন হয়ে আমাকে কোলে করে আকাশপথে চলতে লাগলেন। চলতে-চলতে এক স্বর্ণোজ্জ্বল দিব্য-লোকে এসে উপস্থিত হলাম। সেই বুঝি মায়ার পার।'

'বরাবর' পাহাড়ে একজন মহাপুরুষ অবস্থান করছেন—বিজয়ের কাছে খবর এল। ব্রহ্মচারী বন্ধুকে বললে, চলো গিয়ে দেখে আসি।

পাহাড়ে মন্দির আছে, কিন্তু দুয়ারে যে দাঁড়িয়ে আছে, ঐ কি মহা-পুরুষ? সর্বাঙ্গে কালি মাখা, মুখমণ্ডলে সিঁদুর, কে ঐ ভয়ঙ্কর?

'আমি ভৈরব।' বললে সেই ভীমাকৃতি : 'আমি এ মন্দিরের প্রহরী! খবরদার, এগিয়ো না মারা পড়বে।'

ভৈরব অট্টহাস্য করে উঠল। সে হাসিতে পাহাড় কেঁপে উঠল। কিন্তু বিজয়ের ভয়-ডর নেই। যখন এসেছি তখন শেষ পর্যন্ত উপনীত হব।

বিজয় আর ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে লাগল ভৈরব।

তাতেও ওদের ভয় নেই। ওরা ভৈরবের স্তব শুরু করল। হে ভৈরব, ভূতনাথ, হে করাল, কালশমন, পিঙ্গললোচন, শূলপাণি, প্রসন্ন হও!

স্তবে শান্ত হল ভৈরব। ওরা এগিয়ে এসে ভৈরবের পদতলে লুটিয়ে পড়ল। বললে, 'দয়া করুন, আমাদের মহাপুরুষ দর্শন করান।'

'দর্শন হবে খন। আগে তোরা সুস্থ হ।' ভৈরব স্নিগ্ধ হল : 'তোদের ক্ষুধার্ত বলে মনে হচ্ছে। কিছু প্রসাদ খাবি?'

'আপনি যা করুণা করে দেবেন তাই প্রসাদ বলে মেনে নেব।' বললে বিজয়।

ভৈরব প্রসাদ এনে দিল। ধরল তাদের সামনে। বিজয় আর ব্রহ্মচারী দুজনেই শিউরে উঠল। এ যে দেখি নরমাংস।

বিনয় করে বিজয় বললে, 'আমরা যে আমিষ খাই না।'

হা-হা-হা করে হেসে উঠল ভৈরব : 'তবে অঘোরীদের আশ্রমে এসেছিস কেন?'

'আমাদের আর পরীক্ষা করবেন না।' বিজয় অবনত হয়ে বললে, 'আমরা তোমার সন্তান, তোমার মতো শক্তি আমাদের কী করে হবে? আমাদের মহাপুরুষ দর্শনে নিয়ে চলুন।'

'মহাপুরুষ না দেখলে তোদের চলছে না? তবে আয় আমার সঙ্গে।'

সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম দিয়ে ভৈরব ওদের এক গুহার মধ্যে নিয়ে এল। সেখানে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে চার কোণে চারজন সাধু নির্বিচল সমাধিতে বসে আছে। কী স্থৈর্য, কী প্রশান্তি!

সন্ধ্যাগমে সাধুদের সমাধিভঙ্গ হল। স্নানাদি সেরে বসল আসনে।

ভৈরব বললে, 'এরা আপনাদের দর্শন করতে এসেছে।'

সেটা যেন বড় কথা নয়, যিনি মহাপুরুষ, সকলের চেয়ে প্রদীপ্ত, জিগগেস করলেন, 'এঁদের সেবা হয়েছে?'

'মহাপ্রসাদ দিয়েছিলাম, নরমাংস বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।' বললে ভৈরব, 'কিঞ্চিৎ ফল মূল খেয়েছেন।'

'এ কী অন্যায়! এঁদের তুমি নরমাংস দিতে গেলে কেন?' মহাপুরুষ রুষ্ট হলেন : 'তোমার অঘোর পন্থে এ চলে বলে ভিন্ন মার্গীদের তা দিতে হবে? এ তো অতিথিকে অপমান করা।'

ভৈরবের ভঙ্গি কিছুমাত্র নরম হল না।

বিজয় জিগগেস করলে, 'নরমাংসাহার কি ধর্মের অঙ্গ?'

'না, না, তা ধর্মের অঙ্গ হতে যাবে কেন? রুচিভেদে নানা পথ, নানা মত। যে যে-পথে যেতে চায় সে সেই পথের আচার ব্যবহার অবলম্বন করে, সেই পথের খাদ্য-পানীয়।' বললেন মহাপুরুষ, 'কোনো পথের খাদ্য ফল-দুধ, কোনো পথের বা অন্নব্যঞ্জন, আবার কোনো পথের বা মদ্য-মাংস। পথ

দিয়ে কী হবে, মত দিয়ে কী হবে, আসল হচ্ছে গন্তব্যে পৌঁছুনো। গন্তব্যে পৌঁছুলে আর কোনো ভেদ নেই, ব্যবধান নেই। দেখ না আমরা এই চার সাধু,' অন্যান্য সাধুদের লক্ষ্য করলেন মহাপুরুষ : 'আমাদের মধ্যে একজন রামাৎ, একজন কাপালী, একজন নানকী, আর আমি অঘোরপন্থী। আমাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র পথ, কারু সঙ্গে কারু মিল ছিল না। মিল ছিল না কী, ঘোরতর বিরোধ ছিল। কিন্তু আজ আমরা চারজনই ভিন্ন পথ ধরে একই গন্তব্যে একই সত্যগৃহে এসে পৌঁছেছি। আর আমাদের ভেদ-বিবাদ নেই, আজ আমাদের ঐকতান। আমরা সবাই আজ একবস্তু দেখছি, একবস্তু শুনছি—আজ আমাদের এক আস্বাদন। আজ আর ফলমূল আর নরমাংসে কোনো তফাৎ নেই। নেই কোনো ভেদবুদ্ধির ক্লেশ।' মহাপুরুষ হাসলেন : 'যতক্ষণ লক্ষ্যে না পৌঁছনো যায় ততক্ষণই দলাদলি, সম্প্রদায়, ততক্ষণই আমি-তুমি-ওরা-আমরা।'

কথা শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। আসল হচ্ছে লক্ষ্যে পৌঁছুনো। আসল হচ্ছে স্থির হওয়া। স্থিতিই পরমগতি। শূন্যতাই পরম পূর্ণতা।

'শাস্ত্রে ভগবানলাভের ব্যবস্থা ও সাধনা-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কেন?' একজন জিগগেস করল গোঁসাইজিকে।

গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'শিশুর আহার এক প্রকার, বালকের একপ্রকার, যুবকের এক প্রকার, বৃদ্ধের একপ্রকার, আবার রোগীর একপ্রকার। প্রত্যেকে আপন আপন আহারে পুষ্টি লাভ করে। একজনের আহার অন্যজনকে দিলে জীবন নষ্ট হয়। সকলের এক নিয়মে হয় না। শরীরের প্রকৃতি, মানসিক প্রকৃতি আলাদা, সুতরাং বিধি-নিয়মও আলাদা।'

যে মহাপুরুষ দর্শন করে এলাম তাঁর নাম কী? তাঁর নাম গম্ভীরানাথ বাবাজি।

চল, গম্ভীরনাথকে দেখবে চল।

কুলদানন্দকে নিয়ে গোস্বামীপ্রভু গেলেন দর্শনে। গায়ে যেমন শীত লাগে তেমনি মহাপুরুষের প্রভাব কুলদার গায়ে লাগল। ভিতরের নাম চেষ্টার অপেক্ষা না করে ছুটে বেরুতে লাগল ফোয়ারার মতো।

বাবাজিকে গোঁসাইজি প্রণাম করলেন সাষ্টাঙ্গে।

শতচ্ছিদ্র একখানি মলিন কাপড়ের টুকরো বিছিয়ে দিলেন বাবাজি। তাতে বসলেন গোস্বামী-প্রভু। স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন বাবাজির দিকে। বাবাজিও রইলেন মৌনে।

কী তপোদীপ্ত শরীর। দীর্ঘ ঋজু শিখায়িত। প্রশস্ত ললাট উন্নত নাক, চোখ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। অবিশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণ হচ্ছে চোখ থেকে। কোমরে শুধু একখানি কালো রঙের কম্বল জড়ানো। শরীর একেবারে স্থির, নিষ্কির কাঁটার মতো নিস্পন্দ। ছেঁড়া একখানা চাটাই ধুলো-বালি আর ধুনির ভস্মে মলিন, তার উপর বসে আছেন পরিতৃপ্তের মতো।

বললেন, 'এঁদের চা খাওয়াও।'

পেস্তা বাদাম আখরোট প্রভৃতি কাবুলি মেওয়া দিয়ে চা তৈরি হল। বাবাজি নিজে পরিবেশন করলেন।

খেতে যেমন সুস্বাদু গুণেও তেমনি উত্তেজক। খাওয়ামাত্র শরীর আগুন হয়ে উঠল।

'ইনি কে?' ফিরতি পথে জিগগেস করল কুলদা।

'ইনি নাথ যোগীদের মহান্ত। ঐশ্বর্যপথে অতি কঠোর সাধন করে সিদ্ধ হন, পরে মহাসিদ্ধ অবস্থা লাভ করেন।' বললেন গোস্বামী-প্রভু, 'হিমালয়ের নিচে এমন শক্তিশালী সাধু আর নেই। পলকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করতে পারেন। কিন্তু এখন ইনি মাধুর্যে একেবারে ডুবে গেছেন। জানো তো এঁর সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। 'বরাবর' পাহাড়ে যে চারজন মহাপুরুষ দর্শন করেছিলাম তাদের মধ্যে ইনি একজন। গোরখ-পন্থী—কানফাট্টা যোগী, এদের মধ্যে অঘোরীও আছেন। এদের সাধন ভীষণ কঠিন।'

কুলদা বলছে, 'প্রয়াগে কুম্ভমেলায় এসে এ পর্যন্ত যত সাধু মহাপুরুষ দর্শন করলাম গম্ভীরানাথের মতো কাউকে লাগল না।'

ঐশ্বর্য নিয়ে কতক্ষণ থাকবে? শেষ পর্যন্ত আসতেই হবে মাধুর্যে। শঙ্করাচার্যের কী হয়েছিল?

বলছেন গোস্বামী-প্রভু, 'শঙ্করাচার্য প্রথমে অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করে তাই প্রচার করেছিলেন। পরে হালে পানি না পেয়ে দ্বৈতভাব আশ্রয় করলেন। আর, দ্বৈতভাব আশ্রয় করেই তাঁর প্রাণ সরস হল। আমাকেই কেন দেখ না। কালাপাহাড় তো হয়েছিলাম। কেবল গর্জন করতাম, ভাঙ, ভাঙ রে, ভেঙে ফেল। ঠাকুরদেবতা কিছু নয়, অবতার কিছু নয়, তীর্থ-টীর্থ কিছু নয়। এখন দেখ কী অবস্থায় এসে পড়েছি। শুষ্ক মতের উপর মানুষ কতদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে?'

আকাশগঙ্গা আশ্রমে ফিরে এল বিজয়। গুরুদত্ত মন্ত্র নিয়ে জপ করতে বসল। আসন থেকে বিচ্যুতি নেই, শুরু করল কঠিনতর তপস্যা।

হঠাৎ একদিন গুরুদেব পরমহংসজি এসে উপস্থিত হলেন।

বললেন, 'তোমাকে সন্ন্যাস নিতে হবে।'

'সন্ন্যাস?'

'হ্যাঁ, কাশীতে চলে যাও। সেখানে হরিহরানন্দ সরস্বতী নামে এক প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী আছে, তিনি তোমাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দেবেন।'

গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য। বিজয় তক্ষুনি কাশীর দিকে পা বাড়াল।

'শোনো।' পরমহংসজি আরো বললেন, 'তাঁর কাছে তোমার পূর্বের সমস্ত কার্যকলাপ বিবৃত করো। তোমার ব্রাহ্ম হওয়া, পৈতে বর্জন করা, সর্ব বর্ণের অন্ন খাওয়া—সব জানিও খোলাখুলি।'

কাশীতে এসে হরিহরানন্দের শরণ নিল বিজয়। আনুপূর্বিক বললে সব বৃত্তান্ত।

সরস্বতী বললেন, 'তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

'প্রায়শ্চিত্ত?'

'যদিও তুমি অত্যন্ত উচ্চ অবস্থা লাভ করেছ, তোমার দেহ-মন গঙ্গা-জলের মতো পবিত্র ও নির্মল, যদিও ব্যক্তিগতভাবে তোমার প্রায়শ্চিত্তের কোনো প্রয়োজন নেই, তবুও শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করা যাবে না। তুমি নিজে যদি শাস্ত্রের মর্যাদা না রাখ, তা হলে অপরে রাখবে কেন? সুতরাং লোক-শিক্ষার জন্যেই তোমাকে করতে হবে প্রায়শ্চিত্ত, আবার নিতে হবে পৈতে। যদি সানন্দে সম্মত হও তা হলেই দেব তোমাকে সন্ন্যাস, নচেৎ নয়।'

সানন্দে সম্মত হল বিজয়।

দ্বাদশবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করালেন স্বামীজি। পরে উপবীত সংস্কারে সংস্কৃত করলেন। তিন দিন পরে যথাশাস্ত্র বিরজাহোমে শিখাসূত্রের আহুতি দান হল। অর্পণ করলেন সন্ন্যাসাশ্রম। নতুন নাম-করণ হল—স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

শ্রীকৃষ্ণ কী করলেন? সনাতন পুরুষোত্তম হয়েও সান্দিপনী মুনির শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন। আর শ্রীগৌরাঙ্গ? পূর্ণ ভগবান হয়েও ঈশ্বর পুরীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা আর কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করলেন।

লোকশিক্ষার জন্যেই আবার এই আচরণ করতে হল। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়!'

> 'ধরিয়া যোগীর বেশ যাব দূর দেশে।
> যথা গেলে পাও প্রাণনাথের উদ্দেশে॥
> ইহা বলি কান্দে প্রভু ধরণী পড়িয়া।
> নিজ অঙ্গ উপবীত ফেলিল ছিঁড়িয়া ॥'

আকাশগঙ্গায় ফিরে এল বিজয়। ইষ্ট সাধনায় মন দিল।

কিন্তু রঘুবরের বুঝি অভিমান জাগল। বললে, 'এক জঙ্গলে দুই বাঘ থাকতে পারে না। এখানেও এই এক বাঘই আছে। তোমার যা কিছু হল জানবে আমার জন্যেই হয়েছে। তোমার জন্যে আমিই এখানে যমুনা নিয়ে এসেছি, আর কেউ নয়।'

এ কী দুর্জয় অভিমান!

'রঘুবর বাবাজি তো খুব বিনীত সাধু ছিলেন, তাঁর আবার অভিমান কিসে হল?' জিগগেস করল কুলদা।

গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'অভিমান তো এক রকম নয়। নানারকম। অনেক টাকায় অভিমান হয়, অনেক বিদ্যাতেও অভিমান হয়। এরূপ অভিমান নষ্ট করা যায় সহজেই। কিন্তু আরেক রকম অভিমান আছে যা ঠিক

উলটো, মানে না-থাকার অভিমান, আর এই অভিমান এড়ানোই খুব শক্ত।'

'কী রকম?'

'নির্ধন মনে করে ধনী তাকে ঘৃণা করছে, সুতরাং তার ধনীর উপরে অভিমান। মূর্খ মনে করে বিদ্বান তাকে অগ্রাহ্য করছে, তার বিদ্বানের উপর অভিমান। সংসারাসক্ত কামী ব্যক্তিও ধার্মিক উদাসীন সন্ন্যাসীর উপর অভিমান করে, কেন তার নিজের ধর্মে মতি হল না।'

'সদ্‌গুরুর কাছে যারা সাধন করে তাদেরও কি ভগবান দয়া করবেন না?'

'করবেন যদি নিজেকে সে দীনহীন কাঙাল বলে বুঝতে পারে। একমাত্র কাঙালকেই দীননাথ দয়া করে থাকেন। অভিমানী কখনো দয়ার পাত্র নয়।'

'কিন্তু রঘুবর বাবাজীর তো অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, অদ্ভুত বিভূতি—'

'ছিল। স্বচক্ষে দেখেছি বাবাজি আটার টিক্কর তৈরি করে রাখতেন, রাত্রে বাঘ এলে হাতে করে তাই খাওয়াতেন। গোখরো সাপ বাবাজির চার-দিকে খেলা করছে আর বাবাজি নিশ্চল হয়ে নামজপ করছেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে পাখিদের বলছেন, আরে তু রামজিকা জীব হো, মৈ ভি উনহিকা দাস; ইঁহা আয়কে মেরা কান সাফা কর দে। পাখিরা উড়ে এসে বাবাজির ঘাড়ে বসত আর কান খুঁচে দিত। দুতিনশ লোক এসেছে আশ্রমে, বাবাজি আসন হতে না উঠে তাদের লুচি মণ্ডা দিয়ে ভোজন করাতেন। পাহাড়ে জলাভাব, মহাবীরের কাছে ধন্না দিয়ে পড়লেন বাবাজি। মহাবীর বললে, লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর, ঝরনা বেরিয়ে পড়বে। বাবাজি লাঠি নিয়ে সেই পাথরে ঠুকলেন অমনি প্রকাণ্ড এক পাথরের চাঙড় বিরাট শব্দে ভেঙে পড়ল আর সেই ফাঁক দিয়ে কলকল করে জল জুটল। ঐ ঝরনার নামই যমুনা রেখেছিলেন।'

'কিন্তু বাবাজির পতন হল কেন?'

'বললাম তো, অভিমানে। আরো এক কারণে—দয়ায়।'

'দয়ায়? দয়ায় আবার পতন হয় নাকি?'

'কখনো কখনো দয়া যে জাগে সেই অভিমান থেকেই। সে কথা বলবখন আরেক দিন।'

সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়ে সাধন করবে মনে মনে এমনি সংকল্প করল বিজয়।

পরমহংসজি আবার এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'না, সংসার ত্যাগের দরকার নেই। যেমনটি ছিলে তেমনটি থাকো। স্ত্রীপুত্র পরিবারের সঙ্গে একত্র থেকে সাধন করো। সংসার তোমার কোন বিঘ্ন ঘটাবে না।'

'আর ব্রাহ্মসমাজ?'

'ব্রাহ্মসমাজ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ো না। এখন তা ত্যাগ করবার সময় হয়নি।' বললেন পরমহংসজি, 'যখন সময় হবে তখন তা সাপের খোলসের

মতো আপনিই খসে পড়বে।'

'সন্ন্যাস নিয়েও সংসার?'

'হ্যাঁ, তোমাকে দিয়ে ভগবান নতুন ধর্ম স্থাপন করবেন।'

'আমাকে দিয়ে?'

'হ্যাঁ,' বললেন পরমহংসজি, 'তুমিই ভগবানের নির্বাচিত।'

॥ ১৪ ॥

বিন্ধ্যাচলে নির্জনে সাধন করতে লাগল বিজয়। গুরুবলে তার অন্তরে জ্বলে উঠল নামাগ্নি। আর এই নামাগ্নিই আসল পঞ্চতপা।

এই আগুনেই বিষয় বাসনা বিনিঃশেষে দগ্ধ হয়ে যায়। এরই নাম জ্বলন্ত নির্মল।

কিন্তু এ বড় ক্লেশকর অবস্থা। বলতে পারা যায়, ভয়ঙ্কর অবস্থা। শুধু দাহ আর দাহ। সমস্ত বাহ্যজগৎ বিষতুল্য। যেন রৌদ্রে কোথাও বৃক্ষছায়া নেই; নেই বা জলরেখা। শুধু এক নিরন্ত যন্ত্রণা। একমাত্র যা ইচ্ছা জাগে তা আত্মহত্যার।

এই অবস্থায় পড়ে সনাতন জগন্নাথের রথের নিচে পড়তে চেয়েছিল, রঘুনাথ চেয়েছিল পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিতে। মহাপ্রভু সনাতনকে নিবৃত্ত করেন, রঘুনাথকে স্বয়ং সনাতন।

নামাগ্নিতে দগ্ধ হতে-হতে বিজয়ও বুঝি উন্মাদ হয়ে গেল। ঠিক করল আত্মহত্যা করবে।

তারও পিছনে সক্রিয় গুরুশক্তি। টেনে রাখল বিজয়কে।

'শোনো। জ্বালামুখী চলে যাও। সেখানে গিয়ে সাধন করো।' পরমহংসজি আবির্ভূত হয়ে বললেন বিজয়কে, 'এ জ্বালাযন্ত্রণা থাকবে না, সরস হয়ে উঠবে।'

বিজয় তখুনি চলল জ্বালামুখী। আর কিছু দিন নামসাধনের ফলে যন্ত্রণার অবসান হল। চিত্তে নামল জ্যোতির্ময় আনন্দ-অবস্থা।

'নাম করতে-করতে এমন হয় যে শরীরের প্রতি রক্তবিন্দু প্রতি অণু-পরমাণু পর্যন্ত নাম করে।' বলছেন গোস্বামী-প্রভু, 'এ অবস্থায় মহাত্মারা কাপড় দিয়ে দেহ ঢেকে রাখেন, নয়ত বা বিভূতি মাখেন। আর, জানো তো, নামসাধনের সমস্ত তত্ত্ব শ্বাসে-প্রশ্বাসে। প্রথমে শ্বাসে-প্রশ্বাসে লক্ষ্য রেখে নাম করো। পরে দেখবে শ্বাস-প্রশ্বাসেই নাম, নামই শ্বাস-প্রশ্বাস।

'একমাত্র শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ দ্বারাই আত্মার সমস্ত পাপ সমস্ত সংশয় নষ্ট হবে। প্রতি শ্বাসে নাম করাই একমাত্র উপায়।'

আবার আকাশগঙ্গায় ফিরেছে বিজয়। পরমহংসজি প্রায়ই উপস্থিত

হচ্ছেন আর সাধনবিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন।

সাধন করবার প্রকৃষ্ট সময় কোনটা?

গোস্বামী প্রভু নিজেই বলছেন : 'ব্রাহ্মমুহূর্তে অর্থাৎ রাত চারটের, বেলা এক প্রহরের পর এক দণ্ড আর সন্ধে—এই সময়ই ভজনের পক্ষে প্রশস্ত। আর রাত সাড়ে দশটা থেকে রাত চারটের মধ্যে আরেক বার। এই সব সময়েই দেবতা আর সাধু মহাত্মারা বিচরণ করেন। মহাপুরুষেরা রাত সাড়ে দশটায় বার হন আর চারটে পর্যন্ত থাকেন। এই সময় রাত্রি-জাগরণ অভ্যেস করা দরকার। তখন দু একবার প্রাণায়াম করে নাম করবে। মশারির মধ্যে বসে করলেও হয়। নাম করবার সময় মহাপুরুষেরা কাছে এসে দাঁড়ান, সাহায্য করেন। কোনো মহাপুরুষ এলেই চন্দনের গন্ধ ও ধূপের গন্ধ পাওয়া যায়। কখনো বা গাঁজার গন্ধ। মহাত্মাদের গাত্রগন্ধে মন অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়।'

'শাস্ত্রে অষ্ট সিদ্ধির কথা পড়ি, সে সব কি সত্যি?' পরমহংসজিকে জিগগেস করল বিজয়।

'নিশ্চয়ই সত্যি।' বললেন পরমহংস : 'তপস্যায় এই অষ্ট সিদ্ধিও লাভ হয়।'

'আমাকে দেখাতে পারেন?'

'পারি।'

অষ্ট সিদ্ধি অর্থ অণিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব, ও যত্রকামাবসয়িত্ব। অণিমা হচ্ছে অণু-পরমাণুর মতো সূক্ষ্ম হবার শক্তি। লঘিমা হাওয়ার মতো লঘু হবার ক্ষমতা। গরিমা পাহাড়ের মতো বড় হবার সামর্থ্য। আর ইচ্ছামাত্র দূরের জিনিসকে কাছে নিয়ে আসবার শক্তির নাম প্রাপ্তি। যা ইচ্ছা করা যাবে তাই ফলবে, অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির অব্যাঘাতের নাম প্রাকাম্য। আর বশিত্ব হচ্ছে বশীকরণের ক্ষমতা। ঈশ্বরের মতো সর্ববস্তুর উপর কর্তৃত্ব করবার শক্তির নাম ঈশিত্ব। আর যত্রকামাবসয়িত্বের আরেক নাম সত্যসংকল্পতা। অর্থাৎ বিষকে অমৃত করা, মৃতকে বাঁচিয়ে তোলার শক্তি।

'এস আমার সঙ্গে।' পরমহংসজি বিজয়কে নিয়ে গেলেন নির্জনে।

একে-একে সব প্রত্যক্ষ করালেন। এমন কি পরকায়-প্রবেশন পর্যন্ত।

পাহাড়ের নিচে কারা সৎকারের জন্যে মড়া নিয়ে এসেছে। মড়া রেখে সবাই গিয়েছে কাঠের সন্ধানে। কখন ফেরে তার ঠিক কী।

পরমহংসজি সেই মৃতদেহে প্রবেশ করলেন। মৃতদেহ নড়ে চড়ে উঠল, উঠে বসল, আর পরমহংসজি মৃতবৎ পড়ে রইলেন।

আর পাহাড়ি গাঁয়ের লোকদের কাঠ নিয়ে ফিরে আসবার আগেই পরমহংসজি সজীব হলেন আর যে মড়া সে মড়াই পড়ে রইল।

বিজয় উল্লসিত হয়ে উঠল। শাস্ত্রবাক্য তাহলে কিছুই মিথ্যে নয়। যে তপস্যাসিদ্ধ, যোগপারগ, তার পক্ষে এই অষ্টৈশ্বর্য অর্জন অসম্ভব নয়।

'শাস্ত্রই যথার্থ অবস্থার সাক্ষ্য দিচ্ছে।' বলছেন গোস্বামী প্রভু, 'তবু যা কিছু প্রত্যক্ষ করবে, বাজিয়ে নেবে। তোমাদের তো একটা কিছু প্রত্যক্ষ করলেই বিশ্বাস। আমার কিন্তু তা নয়। আমি যে পর্যন্ত দশ ইন্দ্রিয় দিয়ে তিন বার করে বাজিয়ে সত্য বলে না বুঝি, সে পর্যন্ত তাকে সত্য বলে নিই না। কোনো বিষয় শুধু দেখে শুনে বা স্পর্শ করেই সত্য বলে মেনো না, সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে তিন বার করে বাজিয়ে সত্য বুঝলে— আরেকবার শাস্ত্র দেখো। তাতেও যদি প্রমাণ পাও তবেই নিঃসংশয়। নচেৎ নয়, কিছুতে নয়।'

পরমহংসজি বললেন, 'চলো, এবার তোমাকে সিদ্ধ তান্ত্রিকের সাধন পদ্ধতি দেখাই। তাহলে বুঝবে ঠিক-ঠিক তন্ত্রসাধনে কী ফল!'

বরাবর পাহাড়ে এলেন দুজনে। দেখলেন নির্ধারিত গুহার সামনে খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে এক প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। পরমহংসজিকে দেখে প্রহরী পথ ছেড়ে ছিল। অন্দরের প্রকোষ্ঠে ঢুকলেন দুজনে।

রাত গভীর। পর্বতের চেয়েও পর্বতায়িত স্তব্ধতা।

প্রায় পনেরো জন সাধক চক্রে বসেছেন। তার মধ্যে, এ কী আশ্চর্য, একজন স্ত্রীলোক।

কতক্ষণ পরে চক্রেশ্বর সকলের গায়ে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিলেন। আর তৎক্ষণাৎ সকলের মধ্যে বালক-ভাব উপস্থিত হল। সকলে অনুভব করল, যিনি স্ত্রীলোক বসে আছেন তিনি সকলের মা, আর সকলে অপোগণ্ড শিশু।

বিজয়ের মধ্যেও বালক-ভাব প্রবল হয়ে উঠল। মা-মা বলতে বলতে হামাগুড়ি দিতে লাগল। নিষ্কলুষ শিশুর মতো স্তন্য পান করল।

স্ত্রীলোকটি বিজয়ের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'আজ থেকে তুমি জিতেন্দ্রিয় হলে।'

পরে স্ত্রীলোকটি ছিন্নমস্তা-সাধনের প্রক্রিয়া দেখালেন। ভাবাবেশে নাচতে-নাচতে ডান হাতের খড়্গ দিয়ে নিজের মাথা ছিন্ন করলেন। ছিন্ন মাথা ধরলেন বাঁ হাতে। কর্তিত কন্ঠ থেকে ফোয়ারার মতো রক্ত ছুটেছে, ছিন্ন মুণ্ড মুখ ব্যাদান করে তাই পান করছে সানন্দে। আবির্ভূত হয়েছেন মহাদেব। সাধকেরা কেউ স্তব পাঠ করছে, কেউ বা অর্চনা করছে পত্রে-পুষ্পে। ছিন্ন মুণ্ড গলায় এসে বসতেই আবার দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। সমস্ত আবার স্বভাবসুন্দর হয়ে গেল। সমস্বরে 'জয়' দিয়ে উঠল সকলে। মহাদেব সকলকে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিত হলেন।

বিজয় বুঝল শাস্ত্রোক্ত তান্ত্রিক সাধনও সত্য।

'ঘরে-ঘরে মঙ্গল চণ্ডীর পূজা হোক।' বলছেন গোস্বামী প্রভু : 'আনন্দময়ীর ঘট স্থাপন করো। দেহে ঘট স্থাপন করো। পূজা করো, মর্যাদা করো, সেবা করো। মর্যাদা না করলে মা চলে যান। পূজা না করলে থাকেন

না।'

আবার বলছেন, 'স্ত্রীজাতিকে যত সম্মান করবে তত নিজে পবিত্র হবে। যাঁকে সম্মান করি তাঁকে দূষিত ভাবে দৃষ্টি করা যায় না। ইংরেজ কেবল নারী জাতিকে সম্মান করেই জগতের মধ্যে বরেণ্য হয়ে উঠল। পুরাণে আছে, যেখানে নারীজাতির সম্ভ্রম সেখানেই লক্ষ্মী-নারায়ণ বর্তমান। ইংরেজ জাতির মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণ বিরাজ করছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, জনকের সভায় গার্গী উপস্থিত হলে ঋষিরা উঠে তাঁকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করলেন। গার্গীর পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান, পরনে বস্ত্র নেই, উলঙ্গিনী। শাণ্ডিল্যা-তপস্বিনী। গরুড় তাঁর প্রভাব দেখে স্থির করলেন, রাত্রি প্রভাত হলে এঁকে পিঠে করে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাব। শাণ্ডিল্যা তাঁর অন্তর জানলেন। অমনি গরুড়ের দুই পাখা খসে পড়ল। গরুড় তখন তাঁর স্তব করতে লাগলেন। নারীকে সম্মান না করলে কোনো সাধনই ফলপ্রদ হবেনা।'

'স্ত্রীলোকের মধ্যে মাকে দেখ।' বলছেন আবার গোঁসাইজি। 'মাকে দেখে প্রণাম করো। মা আনন্দময়ীকে যদি সমস্ত নরনারীর মধ্যে দেখ, কি, যদি একটি নারীকে সেই ভাবে ভালোবাসতে পারো, তাহলে সেই দেবী, আর সেই দেবীকে প্রণাম করলেই সমস্ত পাপের খণ্ডন। এরকম যদি পারো তাহলে এক দিনেই সিদ্ধিলাভ। চণ্ডীদাস যেমন করেছিল রজকিনীকে দিয়ে। নারীর প্রতি যে কুদৃষ্টি করে তার মরণ ভালো।'

বিজয় ফিরল কলকাতায়, নিজের বাসায় পরিবারের মধ্যেই বাস করতে লাগল। সবাই ভেবেছিল সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবে লোটা-চিমটা নিয়ে। কী আশ্চর্য, সংসারেই থেকে গেল বিজয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন চুঁচুড়ায়, বিজয় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

তাঁকে দেখে মহর্ষি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন : 'লোকে বলে কিনা গোঁসাই পাগল হয়ে গিয়েছে, পৌত্তলিকের মতো ব্যবহার করছে! কিন্তু কই, আমি তো এঁকে ধূপ ধুনার সুগন্ধ সমাবৃত উজ্জ্বল দুর্গা প্রতিমার মত দেখছি।' পরে আরো সন্নিহিত হলেন বিজয়ের, প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় পেলে এ দেবদুর্লভ বস্তু?'

'গয়ার পাহাড়ে এক মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে,' বললে বিজয়, 'তিনিই এ অবস্থা করে দিয়েছেন।'

'চমৎকার। যে অমূল্য বস্তু পেয়েছ তাতেই তুমি ধন্য হয়ে যাবে। এ রত্ন আর তুমি ছেড়ো না।' মহর্ষির দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল : 'হয়তো ব্রাহ্মসমাজ তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে, তা হোক, তবু এ রত্ন যেন না যায়।'

কতগুলি চিঠি এসেছে মহর্ষির কাছে। একটাতে একজন লিখেছে : 'আপনি তো নির্জনে অনেক দিন ধরে ধর্ম সাধন করলেন, কিন্তু কী লাভ করলেন আর সেই সম্পর্কে আমাদের প্রতিই বা আপনার কী উপদেশ

জানাবেন দয়া করে।'

তাঁর অনুগত ভক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে মহর্ষি বললেন, 'লিখে দাও, এখন থেকে গোঁসাই যা বলবেন তাই আমার কথা।'

মহর্ষি তখন তাঁর পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে, প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে দিয়ে বিজয়কে ডেকে পাঠালেন। 'ওঁকে নিয়ে এস। ওঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

প্রিয়নাথ এসে বিজয়কে বললে, 'মহর্ষি দেখতে চেয়েছেন আপনাকে।'

'কেমন আছেন তিনি?' বিজয় উন্মনার মতো বললে।

'অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কানে ভালো শোনেন না, দৃষ্টিশক্তিও কমে এসেছে। আপনি এখন কলকাতায় জেনে আপনার জন্যে ভারি ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। কী যেন বলবেন আপনাকে।'

'আমার কী সৌভাগ্য, তিনি আমাকে স্মরণ করেছেন। বলুন কবে যাব, কখন?'

নির্ধারিত দিন-ক্ষণে বিজয় চলল পার্ক স্ট্রিটে। সঙ্গে কতক অনুরাগী শিষ্যও জুটে গেল। কেউ আমরা দেখিনি মহর্ষিকে। আজ চক্ষু সার্থক করব।

প্রকাণ্ড হলঘরের মাঝখানে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন মহর্ষি। বিজয় নত হয়ে মহর্ষির পা দুখানি মাথায় ধরল আর অঝোরে কাঁদতে লাগল।

মহর্ষির মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠল। করপুট বুকে রেখে গদগদস্বরে বলতে লাগলেন : 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।' তারপর আর তিনবার বললেন, 'গোবিন্দায় নমো নমঃ গোবিন্দায় নমো নমঃ. গোবিন্দায় নমো নমঃ।' তাঁর দুগাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে এল।

বিজয়ও ভাবাবিষ্ট হয়ে মহর্ষির বাঁ দিকে চেয়ারে বসে পড়ল। কারু আর কোনো কথা নেই, দুজনেই স্তব্ধ, গভীরবিভোর।

বিজয়ের শিষ্যেরা আভূমি প্রণাম করল মহর্ষিকে। লম্বা একটা বেঞ্চি ছিল সামনে, তাতে সকলে বসল।

'এ'দের দেখে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে।' বললেন মহর্ষি : 'এ'রা কারা?'

মহর্ষির কানের কাছে মুখ রেখে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সজোরে বললে, 'এরা সব গোঁসাইয়ের শিষ্য।'

'আহা, মানুষ যখন ভালো খাবার জিনিস পায়, শুধু নিজে না খেয়ে অন্যান্যকেও তার ভাগ দিতে ইচ্ছে করে। গোঁসাই নিজে যা ভোগ করছেন তাই আবার শিষ্যদের দিচ্ছেন ভাগ করে। এই না হলে মহাপুরুষ। বিন্দু-মাত্র স্বার্থ নেই, শুধু শিষ্যদের কল্যাণেই এই রস বিতরণ। গোঁসাইই ধন্য, শিষ্যদের যথার্থ সন্তাপহারক। ওঁকে দেখে সেই প্রাচীন ঋষিদের কথাই মনে আসে।'

বোলপুরের আশ্রম নিয়ে কথা উঠল। নিয়ম প্রণালী কী রকম হওয়া উচিত বলে মনে করো।

দেশে অসাম্প্রদায়িক ভাবের কোনো আশ্রম নেই। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত, ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডি রচনা করে সঙ্কুচিত হয়ে আছে। ইচ্ছে করে একটা উদার অঙ্গনে সকল ধর্ম এসে একত্র হোক। সাধু সন্ন্যাসী ফকির দরবেশ সুফী বৈষ্ণব সমস্ত ভগবৎ-উপাসক যদি সেখানে স্থান পায়, আশ্রয় পায়, তা হলেই শান্তিনিকেতন নাম সার্থক হয়।

'সাধু! সাধু!' মহর্ষি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন : 'যাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেম তাদের কথাই অন্তর স্পর্শ করে, তাদের কথায়ই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। তুমি যা বললে, 'বিজয়কে লক্ষ্য করলেন মহর্ষি : 'তাই ঠিক, তাইই হওয়া উচিত। কিন্তু শান্তিনিকেতনের ভার যাঁদের হাতে, তাঁরা এই অসাধারণ উদার ভাব গ্রহণ করতে পারবেন না। আমার প্রাণের কথা কেউ বোঝে না। বলিও না কাউকে। তুমি বুঝবে, তোমাকেই তাই বলব।' মহর্ষি হাফেজের কবিতা আবৃত্তি করে তার ব্যাখ্যা করতে লাগলেন আর কাঁদতে লাগলেন বিহ্বল হয়ে। বললেন, 'ভগবানকে যেমন ভাবে পেতে চাই তেমন ভাবে পাচ্ছি না, পাচ্ছি না—' কান্নায় কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল মহর্ষির।

বিজয় শুনছে তন্ময় হয়ে।

'মাঝে মাঝে তিনি দর্শন দিয়ে বিদ্যুতের মতো অদৃশ্য হয়ে যান—আবার যতক্ষণ তাঁকে না দেখি, প্রেমময়ের সেই উজ্জ্বল রূপ, ততক্ষণ উন্মত্তের মতো থাকি—' মহর্ষি কাঁদছেন আর বলছেন, 'প্রাণ আমার ছটফট করে, সময় যে কী ভাবে কাটাই তিনি জানেন। তাঁর দয়া না হলে কি আর দর্শন মেলে! জ্ঞান একটা কথার কথা মাত্র, শুধু জ্ঞান দিয়ে কি আর পাওয়া যায় তাঁকে? আসল হচ্ছে প্রেমভক্তি। প্রেমভক্তি হলেই যদি তিনি কৃপা করেন!'

'কৃপা, কৃপা।'

'হাঁ, কৃপা। ঈশ্বরদর্শন চেষ্টাসাধ্য নয়, পুরুষকার নিরর্থক।' বলছেন আবার মহর্ষি : 'তাঁর চরণে নির্ভরই সার। শুধু তাঁর দয়ার দিকে চেয়ে পড়ে থাকা—' বালকের মতো অধীর হয়ে কাঁদতে লাগলেন মহর্ষি।

বিজয় 'জয়গুরু 'জয়গুরু' বলতে লাগল।

চোখ মুছে মহর্ষি আবার বললেন, 'কোথায় ভগবান অবতীর্ণ হবেন তা বোধহয় লক্ষণ দেখেই বোঝা যায় আগে থেকে। জন্ম সঙ্গ শিক্ষা ও সাধন, এই চার বস্তুর যেখানে সমাবেশ সেখানেই পরিপূর্ণ ধর্ম। তোমাতে এই চারবস্তুই প্রোজ্জ্বল। তুমি বিশুদ্ধ অদ্বৈত বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, সংগুরুর আশ্রয় পেয়েছ, পেয়েছ উপযুক্ত শিক্ষা, তারপর সাধনও করেছ ষোল আনা। গোঁসাই, তুমিই ধন্য, তুমিই বৈষ্ণবোত্তম।' একটু থেমে মহর্ষি আবৃত্তি করতে লাগলেন : 'কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন। নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরস্তু তেষাং, যেষাং কুলে বৈষ্ণব-নামধেয়।'

'আপনিই তো আমাকে হাতে ধরে মানুষ করেছেন।' কৃতজ্ঞতায় উচ্ছল হয়ে বললে বিজয় : 'আমার সবই তো আপনার থেকে। আপনিই তো আমার গুরু।'

'গুরু নয় গুরুমশায়।' হাসলেন মহর্ষি : 'পাঠশালায় প্রথম যেমন গুরুমশাই ছেলেকে ক-খ শেখায় তেমনি। কালক্রমে ঐ ছেলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষা পেয়ে ঐ গুরুমশায়ের গুরু হয়।'

'না, না, আমি আপনার বালক,' বিজয় বললে বিনম্র হয়ে, 'আমাকে আপনি আশীর্বাদ করুন।'

'আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব কী, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। তোমার জয় হোক।'

বিজয় ও তার সঙ্গীশিষ্যরা সকলে একে-একে মহর্ষিকে প্রণাম করল। সঙ্গীশিষ্যদের লক্ষ্য করে মহর্ষি বললেন, 'গোঁসাইকে কখন ছেড়ো না, গোঁসাই তোমাদের সকলকে অনন্ত উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন।'

চলে এল সবাই। পথে একজন বিজয়কে জিগগেস করলে, 'সদগুরুর কৃপা না হলে তো এমন অবস্থা হয় না। মহর্ষি এমন অবস্থা পেলেন কী করে?'

'সদ্‌গুরুকৃপায়। কে বলে সদগুরুকৃপা হয়নি তাঁর উপর?' বিজয় জোর দিয়ে বললে, 'নিশ্চয়ই হয়েছে।'

একদিন বিজয় বসেছে ভজনে, কেন কে জানে, মন কিছুতেই স্থির করতে পারছে না। চার দিক শুষ্ক লাগছে, অন্তরেও দাহ। কী করে এ জ্বালার নিবারণ হবে? কোথায় গেলে কী করলে স্নিগ্ধ হবে শীতল হবে?

চারদিকে অস্থির হয়ে তাকাতে লাগল বিজয়। হঠাৎ কেন কে জানে, একছুটে বেরিয়ে এল রাস্তায়। একটা ঝাঁকামুটে চলে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে বিজয় হঠাৎ তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল, তার পা থেকে ধুলো নিয়ে মাখতে লাগল সর্বাঙ্গে আর কাঁদতে লাগল অবুঝের মতো। মুটে তো অপ্রস্তুত। সেও বিজয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে গায়ে মাখতে লাগল আর আকুল হল কান্নায়। এ কী অদ্ভুত ব্যাপার, ধুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি, রাস্তায় ভিড় হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত ঝাঁকামুটেকে আলিঙ্গন করল বিজয়। সমস্ত দাহ জুড়িয়ে গেল। শুষ্কতা দ্রবীভূত হল। পদধূলিতে এত শান্তি তা কে জানত। পদধূলিই সমস্ত দাহের মহৌষধ।

গোঁসাইজি নিজেই বলছেন : 'কলকাতা ব্রাহ্মসমাজে একদিন উপাসনায় বসেছি, ভাবভক্তি কিছুই আসছে না। প্রাণ শুকনো কাঠের মতো মনে হচ্ছে। কী করব কিছু ঠিক করতে না পেরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। একটা কুলি যাচ্ছিল, তার পায়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ সরস হয়ে উঠল। ফের বসলাম উপাসনায়। উপাসনা ভীষণ ভালো হল। আরেক

দিন সেই শুষ্ক অবস্থা, উপসনায় মন বসছে না। কী করি—এক দারোয়ানকে এক ছিলিম তামাক সেজে দিলাম। অমনি মন আনন্দময় হয়ে উঠল। জমে উঠল উপাসনা।'

মন যখন বিক্ষিপ্ত হবে বা উদ্বিগ্ন হবে, মন যখন নামে বসবে না, বিরক্তিতে বিষিয়ে থাকবে, তখন আর কিছু না পারো, অন্যের কল্যাণ কামনা করো। অন্যের কল্যাণ কামনায়ও চিত্ত সুস্থির হবে।

মাঝে মাঝে শুষ্কতাও ভালো। শুষ্কতারও দরকার আছে।

'গ্রীষ্মকাল এমনিতে ভয়ানক,' বলছেন গোস্বামী-প্রভু, 'কিন্তু গ্রীষ্ম ছিল বলেই তো বর্ষায় এত সুখ এত সৌন্দর্য। সাধনের সময় যদি নৈরাশ্য ও শুষ্কতা না থাকত তাহলে ধর্ম যে এত আনন্দময় তা বোঝা যেত কী করে? শুষ্কতার মরুভূমি পেরিয়ে একবার শান্তির শ্যামলতায় চলে আসতে পারলে আর কোনো ভয় নেই।'

কিন্তু এদিকে কেশবের খুব অসুখ।

কেশবের এখন অন্যরকম অবস্থা। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাকে একদিন বললেন, 'মায়ের মূর্তি দেখে তোমার মনে চিন্ময়ীর ভাব না জেগে পাথর মাটি খড় এসব জাগে কেন?' না, এখন কেশব ঈশ্বরকে মা বলে ডাকছে। ডাকতে-ডাকতে কাঁদছে অনর্গল।'

কিন্তু দলকে তার ভীষণ ভয়। মনে সাধ, রামকৃষ্ণকে পুজো করে। একদিন করলও সেই পুজো, কিন্তু গোপনে করল, ঘরের দরজা বন্ধ করে।

রামকৃষ্ণ বললে, 'আজ কেশব আমার পুজো করেছিল, ঘরের দোর বন্ধ করে, পাছে ওর লোকেরা টের পায়। ' হাসল রামকৃষ্ণ : 'ও যেমন দোর বন্ধ করে পুজো করলে, তেমনি ওর দোরও বন্ধ থাকবে।'

বিজয় এসে দেখল, নিস্তেজ নিষ্প্রভ দেহে শুয়ে আছে কেশব। বিজয় পাশে বসল। কেশব বললে, 'গোঁসাই, যা ভেবেছিলাম তা হল না।'

বিজয় বেদনায় নম্র হয়ে রইল।

'পথহারা হয়ে শুধু ঘুরে-ঘুরেই বেড়ালাম, তারপর যখন পথের সন্ধান পেলাম বলে আশা হল তখনই এই ব্যাধি এসে ধরলে। হ্যাঁ হে,' বিজয়ের দিকে তাকাল কেশব : 'তুমি নাকি কী এক নতুন পথ আশ্রয় করেছ?'

'নতুন কি পুরোনো তা তো জানিনা,' স্নিগ্ধ স্বরে বললে বিজয়, 'ভগবানকে লাভ করা নিয়ে কথা। তারই জন্যে এসেছি ব্রাহ্ম সমাজে, বাইরের বিষয় নিয়ে গোল করতে নয়। ভগবানকে পেলাম এই প্রত্যক্ষ বোধ না হওয়া পর্যন্ত ফিরব না। পথ প্রশ্ন নয়, প্রাপ্তিই প্রশ্ন। উপেয়ই প্রশ্ন, উপায় নয়। মৃত্যুকালে বলে যেতে পারব, আমি কৃতার্থ, পূর্ণমনোরথ, আর, প্রভু, তুমিই সত্য—এই শুধু আকাঙ্ক্ষা।'

কেশব ক্ষীণ কন্ঠে বললে, 'এ সম্বন্ধে আমার অনেক কিছু বলবার আছে। যদি ভালো হই তোমায় ডাকব।'

কেশব আর ভালো হল না। লীলা সংবরণ করলে।

॥ ১৫ ॥

বরানগরে মণি মল্লিকের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে গেল বিজয়।

'এ কি, তোমার যে গর্ভলক্ষণ হয়েছে।'

তার দীক্ষালাভের সমস্ত কথা তখন ব্যক্ত করল বিজয়। রামকৃষ্ণের আনন্দ আর ধরে না। সন্দেহ কী. বিজয়ই বাসা পাকড়েছে। ফোয়ারা চাপা ছিল, খুলে গিয়েছে এবার।

সেবার গেল দক্ষিণেশ্বরে পশ্চিমের ভ্রমণ সেরে। রামকৃষ্ণ জিগগেস করলেন, 'এত তো ঘুরে এলে, কোথায় কী রকম দেখলে বলো তো!'

বিজয় বললে, 'কোথাও চার আনা, কোথাও আট আনা। চৌদ্দ আনাও দেখেছি, কিন্তু ষোল আনা এখানে।'

ভাবাবেশে জ্ঞানশূন্য রামকৃষ্ণ।

সেবার রামকৃষ্ণের অসুখ. ভক্তেরা কাউকে আসতে দিচ্ছে না কাছে। বিজয়কেও বাধা দিল। দূরে দাঁড়িয়ে দেখুন।

রামকৃষ্ণ হাততালি দিয়ে ডাকতে লাগলেন বিজয়কে। আর বিজয় কাছে আসতেই গদগদ ভাবে বলে উঠলেন. 'আহা. তোমাকে দেখে আমার হৃৎপদ্মটি ফুটে উঠল!'

আরেকবার গেল সহধর্মিণী ও শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে নিয়ে। পরিবারের আরো কেউ ছিল হয়তো সঙ্গে।

রামকৃষ্ণ বললেন. 'তুমি এতগুলি আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থেকেও ধর্মের এই উচ্চাবস্থা লাভ করেছ. তুমিই ধন্য। তুমিই একালের জনক রাজা। আমি তো ভেবেছিলাম সংসারে উদাসীন হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ। তুমি যে আদর্শ দেখালে তা জগতে দুর্লভ।'

যোগমায়ার মধ্যেও দেখলেন মহাশক্তি।

বললেন, 'কবে দীক্ষা দিলে এঁকে? সাক্ষাৎ মহাশক্তির কাছে এলে যেমন ভাব ও অবস্থা হয় এঁকে দর্শন করে আমার সেই ভাব সেই অবস্থা।'

শ্বশ্রূমাতা মুক্তকেশীকে ডাকলেন। বললেন. 'তুমি একজন নীতিপরায়ণা ব্রাহ্মিকা হয়ে এই ন্যাংটা মানুষের কাছে কেন এসেছ?'

মুক্তকেশী বললে, 'আপনার আবার ন্যাংটা কাপড়-পরা কী!'

'বটে? তুমি তা বুঝেছ?' রামকৃষ্ণ সস্নেহে বললেন, 'তবে কাছে এসে বোস।'

মুক্তকেশী বসল।

'সংসার কেমন দেখছ?'

'সংসারের কথা আর বলবেন না, এক ঢেউ যাচ্ছে আরেক ঢেউ আসছে।' বললে মুক্তকেশী।

'তোমার তাতে কী। তোমার তো জ্ঞান হয়েছে!' স্নিগ্ধ চোখে তাকালেন রামকৃষ্ণ : 'কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের শুকনো বাঁশের মুড়ো আর কদ্দিন চিবুবে? এখন ভক্তির আশ্রয় নাও। জ্ঞান ভক্তি ছাড়া দাঁড়াবে কোথায়? যাঁকে তুমি জামাই ভাবছ, তিনি ভক্তির ভাণ্ডারী, তাঁর কাছে প্রেম-ভক্তি লাভ করে ধন্য হও।'

মুক্তকেশী গোস্বামী-প্রভুর থেকে নিল যোগদীক্ষা।

বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীও বলে দেন, 'যাও, গোঁসাইয়ের কাছে যাও, সাধন নিয়ে এস।'

এক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আখড়ায় গিয়ে দেখলেন গৌরাঙ্গের দারুমূর্তি। বললেন, 'তোদের ও গৌরাঙ্গ তো অচল, নিম কাষ্ঠের।' আর, বিজয়কৃষ্ণকে লক্ষ্য করলেন : 'আর ও আমার সচল গৌরাঙ্গ, রক্তমাংসের।'

ব্রহ্মচারী বিজয়ের নাম রেখেছেন, জীবনকৃষ্ণ। যে কৃষ্ণ জীবিত, সে জীবন্তকৃষ্ণ, তার বিজয় দিক-দিগন্তে।

'বহু দেশ পর্যটন করেছি বহু পাহাড়-পর্বত ঘুরেছি কিন্তু এত অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য দেখিনি।' বলছে বিজয়, 'ব্রহ্মচারীর চোখে পলক নেই। পাঁচ মিনিট তাঁর চোখের দিকে চেয়ে থাক, মূর্ছিত হয়ে পড়বি। হিমালয় থেকে তিব্বত থেকে প্রাচীন যোগীরা রাত্রিকালে ব্রহ্মচারীর কাছে আসে। কেন আসে জানিস? যোগশিক্ষা করতে। সন্ধেতেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। কেউ যেতে পারে না।'

বিজয়ের প্রপিতামহের সহোদর, এই ভাবে ব্রহ্মচারী নিজের পরিচয় দেন। আশি বছর ধরে বনে-পর্বতে তুষারে-হিমবাহে কঠোর সাধন করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। বয়েস প্রায় দেড়শো।

যেদিন পৈতে নেন সেইদিনই ব্রহ্মচারীর বেশে বেরিয়ে পড়েন বাড়ি ছেড়ে। সঙ্গে নিজের আচার্য গুরু ভগবান গাঙ্গুলি আর সতীর্থ বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই যে বেরুলেন, আর ফিরলেন না সংসারে।

কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে যোগাসনে বসে দেহ ছাড়লেন ভগবান। ছাড়বার আগে আরেক ব্রহ্মচারীর হাতে লোকনাথ আর বেণীমাধবকে সঁপে দিলেন। সেই ব্রহ্মচারীই প্রসিদ্ধ তৈলঙ্গস্বামী।

সুমেরু পর্বত দেখবার অভিলাষে লোকনাথ আর বেণীমাধবকে নিয়ে যাত্রা করল হিতলাল। বদরিকাশ্রম উত্তীর্ণ হয়ে উত্তরে হাজার-হাজার মাইল গিয়ে সুমেরুর সন্ধান মিলল না। দেখি উদয়াচল মেলে কিনা—সঙ্গীদের থেকে বিদায় নিয়ে হিতলাল চলল পূর্বদিকে। আর লোকনাথ ও বেণীমাধব পাহাড় ভেঙে-ভেঙে অবশেষে উপস্থিত হল বাংলাদেশে, চন্দ্রনাথে। তারপর বেণীমাধব কোথায় গেল কে জানে, লোকনাথ এসে ঠাঁই নিল বারদীতে।

এক ব্রাহ্ম-ভক্ত এসেছে ব্রহ্মচারীর কাছে।

মনে অগণন প্রশ্ন, কিন্তু কী আশ্চর্য, উচ্চারণ করে বলতে হয় না। নিজের থেকে উত্তর বলে দেন ব্রহ্মচারী। তোমার মনে তো এই প্রশ্ন, তবে শোনো এই তার সমাধান। উত্তর যাই হোক, হৃদয়স্থ গোপনীয় প্রশ্নটা উনি জানেন কেমন করে?

ব্রাহ্ম-ভক্তের ইচ্ছে হল ব্রহ্মচারীর কাছে দীক্ষা নেবে।

অমনি ব্রহ্মচারী জেনে ফেলেছে মনের কথা। প্রবল-কন্ঠে বলে উঠলেন, 'না, না, তা হতে পারে না। তোমার গুরু অপেক্ষা করে আছেন। তিনিই তোমাকে ডেকে নেবেন।'

কে গুরু! কবে? কোনখানে?

কী এক উপলক্ষ্যে গোস্বামী-প্রভুর কাছে এসে বসেছে সেই ভক্ত। অমনি গোঁসাইজি বলে উঠলেন, 'পাবেন, আপনি সাধন পাবেন।'

ভক্তের সর্বদেহ পুলকিত হয়ে উঠল। বুঝল ব্রহ্মচারী কার কাছে পাঠিয়েছেন।

ব্রাহ্ম-ভক্তের ইচ্ছে দীক্ষার সময় তার বাল্যগুরু নগেন্দ্রবাবু উপস্থিত থাকে। কিন্তু কে তাকে খবর দেবে? তাছাড়া মনের এ চাঞ্চল্য পরিস্ফুটই বা করে কী করে?

স্নান করে ক্ষেত্রের ঘরে দীক্ষায় আশায় বসে আছে ভক্ত, গোঁসাইজি হঠাৎ বলে উঠলেন 'ক্ষেত্র, নগেন্দ্রবাবুকে ডাকো।'

আশ্চর্য, নগেন্দ্রবাবু উপস্থিত।

ভক্তের মনশ্চাঞ্চল্য দূর করে দিলেন প্রভু। নির্বিঘ্ন শান্তিতে দীক্ষা হল।

'সাধন নিলে যিনি যে অবস্থার লোক.' বললেন গোঁসাইজি, 'তাঁকে সেই অবস্থার সব কাজ করতে হবে ঠিক-ঠিক। মানে যিনি সংসারী তিনি সংসার কার্য অবহেলা করতে পারবেন না, যিনি ছাত্র তাকে নিয়মিত মনোযোগ করে পড়াশোনা করতে হবে—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, করব পড়াশোনা।'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'আরো একটা কথা আছে। অভিভাবকের অনুমতি নিতে হবে।'

সর্বনাশ! অনুমতি পাবে কী করে? বড়দা হরকান্ত তো ফয়জাবাদে ডাক্তার। আর মেজদা তো এ-সবের উপরে ভীষণ চটা। ছোড়দাকে বলতে তো তেড়ে এল। বললে, 'যোগ করলে ভীষণ রোগ হয়। মানুষ ভেড়া হয়ে যায়।'

ছোড়দা বলে দিল মেজদাকে। বরদাকান্ত কুলদাকে ডেকে পাঠাল। কুলদাকে দেখে চটি জুতো নিয়ে তেড়ে এল। বললে, 'ফের যদি যোগ শব্দ তোর মুখে শুনি জুতিয়ে পিঠের ছাল-চামড়া তুলে দেব।'

পালাল কুলদা। প্রতিজ্ঞা করল যদি দীক্ষা পাই তা হলে যোগশক্তি প্রথমে মেজদা ও ছোড়দার উপরে প্রয়োগ করব, গোঁসাইয়ের পায়ে বলি দেব দুজনকে। আর যদি দীক্ষা না পাই তা হলে আত্মহত্যা।

গোঁসাইজিকে গিয়ে বললে, 'অনুমতির কথা বলছেন, অনুমতির ব্যবস্থা আপনিই করে দিন।'

গোঁসাইজি বললে, 'তুমি তোমার বড়দাকে লিখে দাও।'

বড়দা মত দিলেন বটে কিন্তু লিখলেন, 'মা যখন বর্তমান আছেন তখন সর্বাগ্রে তাঁর মত নেওয়াই সমীচীন।'

'মা, আমি দীক্ষা নেব, আমাকে অনুমতি দাও।' মায়ের পায়ে এসে পড়ল কুলদা।

'তুই পৈতে ফেলে ব্রাহ্ম হবি?'

'না না, আমি গোঁসাইয়ের কাছে সাধন নেব। তুমি অনুমতি না দিলে কিছু হবে না।'

মা কুলদার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন, 'আমি তো নিজে কিছু ধর্ম-কর্ম করলাম না, তোরা যদি করিস নিষেধ করব কেন? তুই ধর্ম-কর্ম করবি তাতে আমার খুব অনুমতি আছে, খুব আনন্দ। শুধু বাপ পৈতেটি ফেলিসনে আর আমি যদ্দিন আছি নিরুদ্দেশ হয়ে যাসনে।'

সাধন পেল কুলদা।

কিন্তু বড়দা হরকান্ত এসেছে বারদীর ব্রহ্মচারীর কাছে দীক্ষা নিতে। সঙ্গে বরদা কুলদাও এসেছে।

হরকান্ত বললে, 'আমার যথার্থ কল্যাণ কিসে হবে বলে দিন।'

ব্রহ্মচারী বললেন, 'তাহলে গোঁসাইয়ের কাছে গিয়ে দীক্ষা নাও। তিনি আশ্রয় দিলেই তুমি পরম কল্যাণ লাভ করবে।'

মেজদা বরদাকান্ত জিগগেস করলে, 'আর আমি? আমি কোথায় যাব?'

'তুমি অর্থোপার্জন করো আর লোকসেবায় তা ব্যয় করো, তাতেই হবে।' ব্রহ্মচারী তাকালেন কুলদার দিকে : 'কি হে, তোমাকে কিচ্ছু বলতে হবে না?'

'বলুন।'

তাঁর আসনের পাশে কুলদাকে বসতে বললেন ব্রহ্মচারী। জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, তুই তো নিত্যি নোট লিখিস, তাই না?'

ব্রহ্মচারী তা কী করে জানলেন?

'তবে তোর খাতায় তোর সম্বন্ধে আমার দুটো কথা লিখে রাখ—বিলাসিতা ত্যাগ কর। বিদ্যা হবে না। কি রে, কথা দুটোর মানে বুঝলি?'

'মানে আর এমন শক্ত কী,' বললে কুলদা, 'সমস্ত সুখভোগ ত্যাগ হলেই ধর্মে মতি হবে আর ধর্মে মতি হলে লেখাপড়া গোল্লায় যাবে।'

'না রে লেখাপড়া করবি না কেন। খুব লেখাপড়া কর।' বললে লোকনাথ, 'লেখাপড়া করলেই পাশ হবি। কিন্তু বিদ্যা কী অবিদ্যা কী—জানিস

না তুই? সেই বিদ্যার কথা বলছিলাম। আর বিলাসিতা ছাড়বি মানে একখানা কাপড় ও একখানা চাদর মাত্র সম্বল করিস আর পায়ে এক নেড়া চটিজুতো। শোন তোর ধর্মকর্ম সব হবে। তুই একটা বেদনায় খুব কষ্ট পাচ্ছিস, তাই না? আমি তোর বুকে হাত বুলিয়ে দি, এখুনি সেরে যাবে।'

কুলদা বললে, 'আমার বেদনা সারিয়ে দেবেন আমি তার জন্যে আসিনি। আমি শুধু আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।'

'চলো এঁড়েদার মন্দিরের চিত্রপট দর্শন করে আসি।' একদিন রামকৃষ্ণ বললেন বিজয়কে।

'আজকাল ভগবানের বিগ্রহ আর চিত্রপট ভাবশুদ্ধরূপে নির্মিত হয় না।' বললে বিজয়।

'কিন্তু এঁড়েদার মন্দির তাঁর ব্যতিক্রম। যাবে একদিন দেখতে?'

'আপনিও চলুন।'

দুজনে গেলেন এঁড়েদা। গিয়ে দেখলেন মন্দির বন্ধ। সামনের দরজায় খিল দিয়ে পিছনের দরজা তালাবন্ধ করে চলে গিয়েছে পুজুরী।

আঙিনার প্রান্তে মহাপ্রভুর আমলের এক বৈষ্ণবের সমাধি। তাই দেখতে গেলেন দুজনে। বিজয়ের ভাবাবেশ হল, লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। রামকৃষ্ণ গান ধরলেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরে এসে বিজয় আবার এগুলো মন্দিরের দিকে। দেখলেন দরজা তখনো বন্ধ, পুজুরীর দেখা নেই।

মন্দিরের সামনে সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ল বিজয়।

আস্তে-আস্তে মন্দিরের সামনের দরজা খুলে গেল।

রামকৃষ্ণ আর বিজয় ঢুকলেন মন্দিরে। সে কী, পুজুরী তো আসেনি। পিছনের দরজা তো যেমন তালাবন্ধ ছিল তেমনিই আছে।

ঘুরে ঘুরে দুজনে দেখতে লাগলেন। এই সেই চিত্রপট।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল পুজুরী। এ কী, কে খুলল দরজা?

কে খুলল তা কে জানে।

পুজুরী তখন কী করে, প্রসাদী মালা উপহার দিল দুজনকে।

সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের পাটে ষড়ভুজ মহাপ্রভু দর্শন করতে গিয়েছেন গোঁসাইজি। সঙ্গে আছে শিষ্য ভক্ত। দূর থেকে তাদের দেখে পুজুরী দরজা বন্ধ করে দিল।

'আমরা দর্শন করব।'

'পাঁচ সিকে প্রণামী লাগবে।'

গোঁসাইজি বললেন, 'তা হলে করব না দর্শন।'

মন্দিরের আঙিনার বন্ধ দরজার সামনে গোঁসাইজি সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়লেন। আর, দেখ কী অপরূপ, মন্দিরের বন্ধ দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেল।

গোঁসাইজি সকলকে ডাকতে লাগলেন ব্যাকুল হয়ে : 'আয়, আয়, মহাপ্রভু দরজার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে।'

রামকৃষ্ণের ডান হাতখানা ভেঙে গিয়েছে, খুব যন্ত্রণা। একজন ব্রাহ্ম-ভক্ত বললে, 'আপনি তো জীবন্মুক্ত, এই যন্ত্রণাটুকু ভুলতে পাচ্ছেন না?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তোদের সঙ্গে কথা বলে ভুলব? তোদের বিজয়কে আন। তাঁকে দেখলে আমি নিজেকে ভুলে যাই।'

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অনেক ব্রাহ্ম এসে বিজয়ের কাছ থেকে যোগদীক্ষা নিতে সুরু করল। ব্রাহ্মদের মনে আতঙ্ক জাগল। এ কী অনাচার। প্রকাশ্য সভায় নয়, গোপনে সাধন দেওয়া কী ব্যাপার! তারপর রাধাকৃষ্ণ ও শ্যামা বামা নিয়ে গান? শুনি উনি দেবদেবীর মূর্তির সামনে প্রণত হন, বাড়িতে রেখেছেনও নাকি ও জাতীয় বিগ্রহ? এ সব তো ব্রাহ্মধর্মবিরুদ্ধ। এই লোকের কাছে আবার যোগশিক্ষা কী।

ব্রাহ্মরা সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল। যোগসাধন করবার ইচ্ছে হয়ে থাকে সমাজ হতে পৃথক হয়ে করুন।

বিজয়কৃষ্ণের মত ও সাধনপ্রণালী সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্যে কমিটি বসল। কমিটি বিজয়কে তলব করল অভিযোগের উত্তর দিতে। বিজয় বললে, কৈফিয়ৎ চাইলে তিনি কোনোই উত্তর দেবেন না, তবু যদি বন্ধুভাবে কেউ আমার বাড়ি এসে আমার সাধন ভজন সম্বন্ধে জানতে চান যথাযথ উত্তর দেব।

কমিটির সভ্যরা বিজয়ের বাড়ি এল। সবিস্তার জেনে নিল তার সাধন, প্রণালীর বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য। পরে তারা রিপোর্ট করল। না, ব্রাহ্ম মতে চলতে পারে না সাধন প্রণালী। এ সুনিশ্চয় ব্রাহ্মধর্মের অনিষ্টকারী। এর প্রতিকার দরকার।

কেন, কী ওর ধরনধারন?

প্রথমত সাধনের কথা তার রীতিনীতির কথা কারু কাছে বলা যাবে না। দীক্ষা গোপনে হবে। কেন, যদি তাতে সত্য থাকে তা হলে তার প্রকাশ্য প্রচারে ভয় কী? যে কৃতনিশ্চয় হবে গ্রহণ করবে, যে হবে না সে করবে না। এই তো সাধুতা। ব্রাহ্ম সমাজে কোনো গুপ্ত দল তৈরি হবে এ বাঞ্ছনীয় নয়। তা হলেই ব্যাঘাত হবে ভ্রাতৃভাবের।

গোস্বামীর সাধনে কেবল ভাবুকতা। তাতে মানুষকে স্বাধীনচিন্তা-শূন্য ও গুরুমুখাপেক্ষী করে তুলবে। এই মতে উচ্ছিষ্ট ভোজন আধ্যাত্মিক উন্নতির বিঘ্নকারক। উচ্ছিষ্ট ভোজন অন্য কারণে দূষনীয় হোক কিন্তু তার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্বন্ধ আছে বলে আমাদের বিশ্বাস নয়। এই মতে মাছ খাওয়া চলবে কিন্তু মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। মাছ খেলে ধর্মের হানি হবে না মাংস খেলে হবে এ এক অদ্ভুত যুক্তি। এদিকে বলছে, মানুষগুরু নেই, গুরু একমাত্র পরমেশ্বর অথচ পরোক্ষে প্রচার হচ্ছে গুরুবাদ। গোস্বামীর শিষ্যরা মনে করে গোস্বামীর সাধনই অভ্রান্ত, এইই তো গুরুবাদ। গোস্বামীকে প্রণাম করলে, তার পদধূলি মাথায় নিলে, তার পায়ে মাথা দিয়ে পড়ে থাকলে

আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়—এ অতি মারাত্মক কথা। তাছাড়া গোস্বামীর কাছে রাধাকৃষ্ণের ছবি। যতই তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাক ওতে বৈষ্ণব সমাজের ঘোর অনিষ্ট হয়েছে। সুতরাং তা সম্পূর্ণ বর্জন করা উচিত। আবার বলছে কিনা ভগবানকে কালী দুর্গা কৃষ্ণ বলেও ডাকা যায়। কালী-দুর্গা নামের সঙ্গে দেশপ্রচলিত পৌত্তলিকতা ওতপ্রোত ভাবে সংশ্লিষ্ট। ঐ নাম উচ্চারণ করলে সেই সব প্রতিমাকে মনে পড়ে। ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মনামের পরিবর্তে কালী দুর্গা কৃষ্ণ প্রভৃতি পৌত্তলিক নাম ব্যবহার করতে পারবে না। সুতরাং গোস্বামীমত চলতে পারে না কিছুতেই। এর প্রতিকার না হলে ব্রাহ্মধর্মের বিলক্ষণ ক্ষতি।

প্রত্যুত্তরে বিজয়ের কী বলবার আছে বলুক।

॥ ১৬ ॥

বিজয় পদত্যাগপত্র দাখিল করল। থাকব না প্রচারক।

সেই পত্রে লিখল : 'সত্যস্বরূপ জ্ঞানপ্রেমমঙ্গলময় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে দিব্যচক্ষে দর্শন করা যায় আর তাই ব্রাহ্মধর্মের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। ঈশ্বরের সত্তাসাগরে নিমগ্ন থেকে জীবন যাপন করাই একমাত্র কাজ।

ব্রহ্মলাভ শুধু মানুষের নিজের চেষ্টায় হয় না। ঈশ্বরের কৃপার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে যথাসাধ্য সাধন ভজন করাই একমাত্র পথ। আমি পরমহংস বাবাজির প্রদর্শিত যোগসাধনের পথ অবলম্বন করেছি। এই সাধনে বাহ্যিক কোনো সংশ্রব নেই, এ সম্পূর্ণ আভ্যন্তরিক আধ্যাত্মিক বস্তু। তবে ভূতশুদ্ধির জন্যে কিছুদিন প্রাণায়াম করতে হয়। কিন্তু সেটা আমাদের সাধন নয়। তাই বাইরের লোকের সামনে আমরা সাধন করি না। বাইরের লোক আসল তত্ত্বকথা কিছুই বুঝবে না, শুধু বাইরের প্রাণায়ামটুকু দেখবে। তাই দেখে যদি তাদের প্রাণায়ামে অশ্রদ্ধা হয় তাহলে তাদেরই আধ্যাত্মিক অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা।

আমরা কোনো সম্প্রদায় মানি না। যে কেউ আন্তরিক ব্যাকুল হন, হিন্দু ব্রাহ্ম মুসলমান খৃস্টান, সকলেই এ সাধন পেতে পারেন। পাপ আচার পাপ চিন্তা পাপ কল্পনা আর অহঙ্কারই এ সাধনার ব্যাঘাত।

এতে গুরুবাদের লেশমাত্র নেই। ঈশ্বরই একমাত্র গুরু আর সকলে তাঁর নির্বাচিত উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক। যেমন বৃক্ষ লতা নদী পর্বত গ্রহ নক্ষত্র নানা উপায়ে শিক্ষা দেয় তেমনি মানুষও এক অনুরূপ উপায়। মানুষের মধ্যেই যোগশক্তি প্রবলতম। তাই শক্তিশালী মানুষকে গুরু বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই। স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি তো ঈশ্বরের দান কিন্তু তাতে একটা কুটো পড়লে তা তুলে নিতে মানুষ লাগে।

গুরুজনদের শ্রদ্ধাভক্তি করা ধর্মসঙ্গত। পদধূলি নেওয়া সম্বন্ধে আমাদের কোনো নিষেধ নেই। আত্মার যে অবস্থায় পদধূলি নিতে ইচ্ছে হয় সেই বিনীত অবস্থা অত্যন্ত সুন্দর ও উপকারী। এইজন্য কারু উপকার হচ্ছে দেখলে পদধূলি নিতে বাধা দিই না। আমিও সকলের পদধূলি নিয়ে থাকি। আমাকে যিনি যখনই প্রণাম করেন, এ প্রণাম বিশ্বগুরুর প্রাপ্য এই অর্থে আমি 'জয় গুরু' উচ্চারণ করে থাকি। একটি প্রণামও নিজে পাই না, নিজে নিই না।

উচ্ছিষ্টভোজন উচিত মনে করি না, তবে বাপ-মা যদি আদর করে উচ্ছিষ্ট দেন আর যদি কোনো শ্রদ্ধেয় ধর্মাত্মার ভুক্তাবশেষকে প্রসাদ বলে মনে হয় তবে তা আহার করি। সে আহারে ক্ষতি নেই বরং উপকার আছে।

আমার ঈশ্বর সর্বব্যাপী। যদি দেবতার মন্দিরে কালী দুর্গা বা অন্য প্রতিমার সামনে আমার ব্রহ্মস্ফূর্তি হয়, আমি আত্মহারা হয়ে সেখানেই গড়াগড়ি দিই। যেখানে তাঁর দর্শন পাই সেখানেই আমি তন্ময় হই, ক্ষুদ্র স্থান-বিচার থাকে না।

কালী দুর্গা নামে ভগবানকে ডাকতে আমি কোনো দোষ দেখি না। যখন যে নামে প্রাণে আরাম পাই তখনই সে নামে ডাকি। তবে ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনার সময় ঐ সব নাম ব্যবহার করেছি বলে মনে হয় না।

রাধাকৃষ্ণ ভাব যোগপথের শ্রেষ্ঠ সহায়। এত বড় ভাব আর কোথাও দেখিনা। রাধা ভক্ত কৃষ্ণ উপাস্য। সর্ব প্রযত্নে আমি ঐ ভাবসাধনের চেষ্টা করি। যারা ঐ আধ্যাত্মিক ভাবে উপকার পায় তাদের নিয়ে আমি একত্র রাধাকৃষ্ণের গান গাই। তবে ব্রহ্মমন্দিরে ঐ নাম গ্রহণ করিনি।

যাই হোক, যদিও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আন্তরিক যোগ ক্ষুণ্ণ হবার নয়, আমি সামাজিক সম্বন্ধ প্রচারকপদ পরিত্যাগ করলাম। এখন থেকে যা ধর্ম প্রচার করব তা সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে।

বিজয়ের কৈফিয়ৎ গ্রাহ্য হল না। পদত্যাগপত্র গৃহীত হল।

কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করলেও পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করল গোসাঁইকে।

ঢাকার প্রচারনিবাসে এসে উঠল বিজয়।

রাষ্ট্র হয়ে গেল বিজয় পৌত্তলিক হিন্দু হয়ে গিয়েছে, ব্রাহ্মসমাজে তার স্থান হয় কী করে?

'সাধারণের নিকট নিবেদন' এই নামে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করল বিজয়। লিখল, আমি পৌত্তলিক হিন্দু হয়ে গিয়েছি এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্যেই তার সঙ্গে বাইরের সম্পর্ক ছিন্ন করেছি, কিন্তু মনে প্রাণে আমি এখনো ব্রাহ্ম। আমার কোনো সম্প্রদায় নেই, সব সম্প্রদায়ই আমার। আমি সকলের সেবক, সব সমাজের। যেখানে যতটুকু সত্য ততটুকুই আমার ব্রাহ্মধর্ম।

আমি জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরোধী। একমাত্র পরমেশ্বরকেই উপাসনার লক্ষ্য ও সাধন বলে জানি। তিনিই একমাত্র গুরু, তবে বিশ্ব-সংসারের আর সকল পদার্থের মত মানুষের থেকেও ধর্ম শিক্ষা করি। যারা ধর্মোপদেশ দেয় তাদের যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিত বলে মনে করি। কালী দুর্গা বা রাধাকৃষ্ণের নাম আমি সজনে কি নির্জনে কখনো জপ করি না। রাধাকৃষ্ণের পৌরাণিক অশ্লীল ভাব অত্যন্ত ঘৃণা করি কিন্তু রাধাকৃষ্ণের মধ্যে সাধক ও পরমেশ্বরের প্রেম-সম্বন্ধীয় যে আধ্যাত্মিক রূপক আছে তার ভাব অত্যন্ত উঁচু বলে মনে হয়। নিরাকার পরমব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করে যে কেউ যে নামে ডাকুক সে সেই নামে তাকে লাভ করবে। ঈশ্বরের আবার নাম কী। যে নামে ডাকুক ঈশ্বরকে বোঝালেই হল। অর্থ অন্য কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করলেই তা বর্জনীয়। সকল প্রকার অবতারবাদ, অভ্রান্তগুরুবাদ ও মধ্যবর্তীবাদে মানবাত্মার অধোগতি হয় বলে বিশ্বাস করি।'

মাঘোৎসবে সকালে কীর্তনের দল নিয়ে হরিনাথ মজুমদার এসে হাজির। চলতি নাম কাঙাল ফিকিরচাঁদ। গান বাঁধতে যেমন ওস্তাদ তেমনি গান গাইতে।

প্রচারনিবাস লোকে লোকারণ্য।

কাঙাল গান ধরেছে, 'মা নই আমি সে ছেলে। যার আছে সাধনের জোর, সে কি মা তোর ভয় করে তুই ভয় দেখালে?'

ঘরের ভিতরে বাইরে সবাই বসে, শুধু গোঁসাই দাঁড়িয়ে আছে তার আসনে। দু'গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে। বাঁ হাত বুকের উপর, ডান হাত মুদ্রাবদ্ধ হয়ে ব্রহ্মতালুতে। থেকে থেকে শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে। মাঝে মাঝে 'হরিবোল' বলে লম্ফ দিয়ে উঠছে. স্থির হয়ে দাঁড়ালেই কাঁপছে থর থর করে। পড়ে যাবার উপক্রম হলেই শ্যামাকান্ত পণ্ডিত ধরে ফেলছেন হাত বাড়িয়ে।

কতক্ষণ পরে গোঁসাই খলখল করে হেসে উঠল। এমন উদ্দাম দীর্ঘ হাসি শোনেনি কেউ কোনো দিন।

হঠাৎ ডান হাত নামিয়ে নিয়ে এসে সামনের দিকে ইঙ্গিত করে গোঁসাই বললে, 'ঐ দেখ ঐ দেখ, তোমরা সকলে দেখে নাও, পাগলা এসেছে। ঐ যে পাগলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেতে চায়। ধর ধর ধর—' 'সামনের দিকে এগুলো গোঁসাই, পরে আবার নিরস্ত হয়ে বললে, 'না, ফিরেছে। বাব্বাঃ কত বড় গরু। ওটা কেমন দেখ, কপালে একটা চোখ, সেটার জ্যোতি কত, সূর্যের মত। মত আবার কী, সূর্যই তো! উঃ, কত বড় শিং। আর আহা, ঐ দেখ নন্দী-ভৃঙ্গী. প্রথমে মনে করেছিলাম ওরা কেউ নয়, এখন দেখছি—পাগলার সঙ্গেই আসছে!' সামনের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে নমস্কার করছে আর বলছে : 'আবার দেখ আমার মা এসেছেন। আহা, কত যোগী কত ঋষি মার চার দিকে নাচছে শ্রীচৈতন্য, বাল্মীকি, নারদ, বশিষ্ঠ—বাড়ির সামনে সবটা ভরে গেল। মাবে

নিয়ে সবাই আনন্দ করছে। তামাসা দেখ, মাও নাচছেন। ঐ দেখ, ডাকছেন, মা আমাকে ডাকছেন—' মাটিতে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল গোঁসাই।

প্রণাম করে বসল স্থির হয়ে। ক্ষণে-ক্ষণে হাসছে আর কাঁদছে নিরর্গল। তারপরেই সমাধিশান্ত হয়ে গেল। এগারোটা বাজে তবু সমাধি ভাঙে না।

কে আর কত বসে থাকবে, যে যার বাড়ি ফিরে চলল। গোঁসাই নির্বিচল।

কুলদানন্দ ছিল সেখানে, তার মনে সংশয় জাগল, এ কী কান্ড! নিরাকার ব্রহ্মবাদীদের প্রধান আচার্য হয়ে তাদেরই মন্দিরে এ কী পৌত্তলিকতা! নইলে নন্দী-ভৃঙ্গী কী, নারদ-বাল্মীকিই বা কে! ব্রাহ্মরা এ সব সহ্য করছে কী করে?

ব্রাহ্ম নবকান্তবাবুর কাছে গিয়ে নালিশ করল। রজনীবাবুর কাছেও। তাঁরা বললেন, 'মাঘোৎসবটা হয়ে যাক, তারপর দেখে নেব।'

দুপুরে আবার গেল কুলদা। দেখলে সবাই পাত পেড়ে খেতে বসেছে, কিন্তু কেউ খাচ্ছে না। বারদীর কুঞ্জলাল নাগ খোল বাজিয়ে গান করছে। খোলে নানারকম আওয়াজ বেরুচ্ছে, মনে হচ্ছে একটা খোল নয়, যেন অনেক খোল একসঙ্গে বাজছে একতালে। ভাতের গ্রাস হাতে ধরা, সবাই বাহ্যজ্ঞানহীন নিস্পন্দ হয়েছে। কেউ কাঁদছে, কাঁপছে, ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে, কেউ কেউ বা উচ্ছিষ্ট পাতার উপর গড়িয়ে পড়ছে! এ কী ভুতের কান্ড! কুঞ্জলাল উন্মত্ত হয়ে লাফাচ্ছে আর খোল বাজাচ্ছে। ফিকিরচাঁদ পড়ে আছে সাষ্টাঙ্গ হয়ে। গোঁসাই তার আসনে সমাহিত।

কতক্ষণ পরে চোখ চাইল গোঁসাই। বললে, 'অতলস্পর্শ মহাসাগরে এক গণ্ডূষ মাত্র জলে গিয়ে পড়েছিলাম। সাগরের যে ঢেউ, এক ধাক্কায় আবার তীরে এনে ফেলেছে। আহা, যাঁরা এই সাগরে গিয়ে পড়েছেন, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে কত তাঁরা নাচছেন, কত তাঁরা আনন্দ করছেন—'

সন্ধ্যার সময় আবার সেই মা-মা, সেই শৈশবকাতরতা। মা, তুমি আমাকে কেন ডাকছ? তুমি আমাকে হাত ধরে কোথায় নিয়ে যাবে? ঐ মুনি-ঋষিদের মধ্যে গিয়ে কি আমি বসতে পারি? আমার সাধ্য কী সেখানে বসি। আমি যে পাপী—নিতান্ত পাপী—

বলতে-বলতে ডাকতে-ডাকতে কাঁদতে-কাঁদতে আবার সমাহিত গোঁসাই।

রাত বাড়তে লাগল, মন্দিরগৃহ ফাঁকা হয়ে গেল, তবু বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলনা, বেদীর উপর বসে রইল নিশ্চেতন। কিংবা কে জানে, চৈতন্যময়!

কিন্তু গোঁসাইয়ের বক্তব্য কী স্পষ্ট করা দরকার। কুলদা ও আরো অনেকে তাকে ধরল আপনার বক্তব্য বক্তৃতায় প্রাঞ্জল করুন। 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা' সম্পর্কে বলুন। ও সব বলতে পারব না, গোঁসাই 'না' করে দিল। তা হলে, বেশ, 'পৌত্তলিকতা ও ব্রহ্মজ্ঞান' সম্বন্ধে বলুন। সাম্প্রদায়িক ভাবের কোনো কথাই বলতে পারব না। গোঁসাই দৃঢ় থাকল।

'তা হলে ব্রহ্মোপাসনা নিয়ে বলুন।'

'বেশ, আমি ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মবাদী বিষয়ে বক্তৃতা দেব।'

সন্ধ্যায় প্রচণ্ড ভিড় হয়েছে। মন্দিরের ঘরে-বারান্দায় তিলধারণের স্থান নেই। চার পাশের মাঠও ভরে গিয়েছে। ক্যাথলিক চার্চের পাদ্রী বার্ণার্ডও এসেছে, দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে। কী না জানি বলে! কী না জানি তার ব্যাখ্যা ব্যঞ্জনা!

কিন্তু দু-এক কথা বলতে-না-বলতেই বালকের মত কাঁদতে লাগল বিজয়কৃষ্ণ : 'যে ব্রহ্মের মহিমার কণিকামাত্র বর্ণনা করতে গিয়ে, পার না পেয়ে, বেদ উপনিষদ, অনির্বচনীয় বলে ক্ষান্ত হয়েছে, সেই ব্রহ্মের কথা আমি বলব? তুচ্ছাদপি তুচ্ছ আমি, অজ্ঞান আমি—আমার মুখে আপনারা সেই ব্রহ্মের কথা শুনবেন?' বলেই আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল। কিছুতেই ভাবের আবেগ রোধ করতে পারলেনা। শেষে নিরস্ত হয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বসে পড়ল। যুক্তকরে সবাইকে বললে, 'আমাকে আপনারা আশীর্বাদ করুন। দয়া করে আমার মাথায় সকলে পদাঘাত করুন, আমার অহংকার চূর্ণ করে দিন। আমি ভয়ানক অভিমানী—তাঁর কথা বলব? তাঁর কথা বলতে আমি স্পর্ধা করি? আমি তাঁর কী জানি! আমি ছাই! আমি ছাই!'

পুরাণপুরুষের স্তব করতে গেল, কয়েকটা শেলাক বলেই কন্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল। শুধু ত্বং হি ত্বং হি বলতে বলতে চলে গেল সমাধিভূমিতে!

চন্দ্রনাথ হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গান ধরল তবু গোঁসাইয়ের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল না।

লোক উঠে যেতে লাগল। কেউ-কেউ বললে, 'বক্তৃতা শুনে যে উপকার হত তার চেয়ে ঢের বেশি উপকার হল গোঁসাইজিকে প্রত্যক্ষ করে।'

ব্রাহ্মসমাজ থেকে ভীষণ প্রতিবাদ উঠল। যে লোক পৌত্তলিকতাকে প্রশ্রয় দেয়, শাস্ত্র অভ্রান্ত বলে, হিন্দুদের আচারপদ্ধতিকে প্রশ্রয় দেয়, তাকে দিয়ে সমাজের কোনোই শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। সুতরাং প্রচারকের আসনে সে কী করে বসে?

গোঁসাই সরে দাঁড়াল। প্রচারক থাকতে চাই না। নির্জনে সাধন-ভজনে দিন কাটিয়ে দেব।

ঘরে গোঁসাই নেই, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা তাঁর শূন্য আসনকে নমস্কার করল।

মনোরঞ্জন তেজী ব্রাহ্ম, তার এ কী পৌত্তলিকতা?

কুলদা ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, 'আপনি না আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম?'

'তাতে কী?'

'তাতে কী মানে? আসনে কেউ নেই, তবু ওখানে নমস্কার করলেন কেন?'

'আমি কি আসনকে নমস্কার করলাম?' মনোরঞ্জন বললে, 'আমি

গোঁসাইকে নমস্কার করলাম। ব্রাহ্ম হয়ে কি গোঁসাইকে নমস্কার করা যায় না?'

'ওখানে গোঁসাই কোথায়? গোঁসাই তো পাশের ঘরে।'

'তা হোক। গোঁসাই স্মরণ করে আমি ওখানে নমস্কার করেছি।'

'তা হলে তো সেই বিগ্রহকেই প্রণাম করা হল। ব্রাহ্ম হয়ে আপনি তা বলতে সাহস করেন? তা হলে হিন্দুদের কুসংস্কারী বলেন কেন?'

তুমুল তর্ক চলছে, পাশের ঘর থেকে গোঁসাই বলে উঠলেন : 'শূন্য আসনের সামনে কেউ যেন না নমস্কার করেন। মিছে আলোচনা ও অশান্তি বাড়িয়ে লাভ নেই।'

আবার আরেক দিন শূন্য আসনের সামনে কুলদা দেখতে পেল এক জোড়া খড়ম। যেমন বড়ো তেমনি পুরোনো।

'এ খড়ম কার?'

মুক্তকেশী দেবী বললেন, 'ব্রহ্মচারী গোঁসাইকে দিয়েছেন।'

'কে ব্রহ্মচারী?'

'ব্রহ্মচারীকে চেন না? বারদীর ব্রহ্মচারী।'

'তার কথা গোঁসাই কী করে জানলেন?' কুলদা কৌতূহলে তীক্ষ্ন হয়ে উঠল।

'সমাধি অবস্থায় জানালেন যে একজন মহাপুরুষ বারদীতে গোপন হয়ে আছেন, তাই তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন।'

'কিন্তু খড়ম?'

মুক্তকেশী বললেন, 'ব্রহ্মচারী বললেন তিনি গোঁসাইয়ের পিতামহের খুড়ো হন। পূর্ব পুরুষের চিহ্ন বলে ঐ খড়ম তাঁকে দিয়েছেন।

'পিতামহের খুড়ো—ব্রহ্মাচারীর বয়েস কত?'

'একশো ছাপ্পান্ন বছর।'

ঢাকা ছেড়ে বিজয়কৃষ্ণ চলে এল কলকাতা। কলকাতা থেকে বর্ধমান।

বর্ধমানে দেখল পলাশ গাছে অজস্র ফুল ফুটে আছে। প্রগাঢ় রক্তিম সমারোহ।

বিজয়ের ভগবতী দর্শন হল। ভাবাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

আরেক দিন মহারাজার গোলাপবাগানে গিয়ে গোলাপবৈচিত্র্য দেখে অনুরূপ ভাবাবেগ।

বর্ধমান থেকে গোঁসাই চলে এল দ্বারভাঙ্গা। উঠল রাধাকৃষ্ণবাবুর বাড়িতে। আর সে বাড়িতেই তার ডবল নিমোনিয়া হল।

ঢাকায় খবর এসে পৌঁছুল, দুটো ফুসফুসই পচতে আরম্ভ করেছে। অবস্থা খারাপ। বাঁচবার আশা নেই বললেই চলে।

গোঁসাইয়ের ভক্ত শ্যামাচরণ বক্সি তখুনি ছুটল বারদীতে। ব্রহ্মচারীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল : 'আমার গুরুদেবকে দয়া করে বাঁচান।'

ব্রহ্মচারী হাসল। বললে, 'তা, তিনি গেলেনই বা! আমিই তো রয়েছি।'

'আমরা আপনাকে চাইনা। তাঁকে চাই।'

'গুরুর জন্যে কী স্বার্থত্যাগ করতে পারিস?'

'গুরুর জন্যে আমার অর্ধেক পরমায়ু দিয়ে দিতে পারি।'

ব্রহ্মচারী নিশ্বাস ফেলে বললে 'সময় শেষ করে এসেছিস। এখন আর কী হবে?'

শ্যামাচরণ আকুল চোখে কেঁদে ফেলল।

'তার ঘরে তো কই তাকে দেখতে পেলুম না।' বললে ব্রহ্মচারী, 'হয় হয়ে গেছে, নয়তো তার গুরু তাকে দেহ ছেড়ে থাকবার শক্তি দিয়েছেন। আচ্ছা, তুই যা। দেখি কী করতে পারি।'

ব্রহ্মচারী ঘর বন্ধ করে দিল। সবাইকে ডেকে বললে, 'যত দিন ভিতর থেকে দরজা না খুলি কেউ দরজায় ঘা দিও না বা খুলতে চেষ্টা কোরো না।'

টেলিগ্রাম পেয়ে যোগজীবন, কুঞ্জ, প্রসন্ন—সবাই রওনা হয়ে গেছে। হঠাৎ যোগজীবন আকাশপথে ব্রহ্মচারীকে দেখতে পেল।

'ঐ দেখ ব্রহ্মচারীও যাচ্ছেন দ্বারভাঙ্গায়।' বলে উঠল যোগজীবন।

আর তবে ভয় নেই।

এদিকে গোঁসাইয়ের জ্ঞান নেই। নাড়ি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ডাক্তার বললে, 'বড় জোর আর আধঘন্টা।'

রাধাকৃষ্ণবাবু একতারা বাজিয়ে সজল কন্ঠে কাতর প্রাণে ভগবানের নাম গান করতে লাগল। আর সকলে গাইতে না পেরে কাঁদতে লাগল।

কারা যেন সব এসেছে। একবার দেখা দিচ্ছে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। একজন তো বারদীর আরো দুজন সূক্ষ্মদেহী মহাপুরুষ।

গোঁসাইয়ের দেহ স্থির, অসাড়, নিস্পন্দ।

হঠাৎ কী হল কে জানে, দু একবার মাথা নাড়া দিয়েই চকিতে গোঁসাই লাফিয়ে উঠল। হরিবোল! বলে নাচতে লাগল উদ্দাম হয়ে।

এ কী হল? এ কী অসম্ভব ব্যাপার!

ডাক্তারবাবুদের ডেকে নিয়ে এস!

আর ডাক্তারবাবু। সবাই হুঙ্কারে গর্জনে মেতে উঠল হরিকীর্তনে। হরিবোল! হরিবোল! সমস্ত ব্যথা ও ব্যাধির হরীতকী—হরিবোল! হরিবোল!

ডাক্তারবাবুরা এল হন্তদন্ত হয়ে।

তারা তো হতবাক। মরে যাওয়া রুগী শুধু উঠে দাঁড়ায়নি, উদ্দণ্ড নৃত্য করছে।

আমরা কোথায় আছি! বিজ্ঞান কোথায় আছে!

দ্বারভাঙ্গায় গুরুদেব পরমহংসের সঙ্গে দেখা হল বিজয়ের। জিগগেস করল, 'আমার এ কী অবস্থা হল বলুন দেখি।'

'এ অবস্থা সাধনলব্ধ। বলতে পারো সাধনের ফল।' বললেন পরমহংস, 'তুমি হঠযোগপ্রদীপ ও বিচারসাগর বই দুখানি এনে পড়ো, দেখবে অবিকল মিলে গেছে।'

কোথায় পাওয়া যাবে বই? পরমহংস দোকানের নাম বলে দিলেন। দাম কত? তাও বলে দিলেন। আর এও বলে দিলেন, একখানা করেই আছে দোকানে।

চিহ্নিত দোকানে নির্দিষ্ট মূল্যে পাওয়া গেল বই।

'মলাট কেমন ময়লা-ময়লা লাগছে। বদলে দিন।'

দোকানদার বললে, 'ঐ একখানা করেই আছে। বদলানো যাবেনা।'

বই পড়ে দেখল, যে যে অবস্থা সে উপলব্ধি করছে সবই বর্ণিত আছে গ্রন্থে। সত্যি, আগে এ বই পড়া থাকলে ভাবত ও সব অবস্থা বই পড়ার ফল। এখন ফলের পর বই দেখলে বিশ্বাস হল ফলটা আমার করে-পাওয়া, পড়ে-পাওয়া নয়। তাই বারে বারে বলি, আগে লাভ পরে শাস্ত্র।

সিদ্ধাই বা শক্তি চেয়ো না। শক্তিলাভ অত্যন্ত তুচ্ছ। যে ঈশ্বরকে চায়, ব্যাকুল হতে ব্যাকুলতর হয়ে চায়, তার আপনিতেই শক্তি জোটে, কিন্তু তাতে সে আকৃষ্ট হয় না, তার সমস্ত লক্ষ্য ঈশ্বর, 'পরানুরক্তিরীশ্বরে'। তার বাজী-করে লক্ষ্য, দু দণ্ডের ভেলকিবাজিতে নয়।

দ্বারভাঙ্গা থেকে বিজয় চলে এল বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথ থেকে হুগলি জেলার নৈপাড়া গ্রামে। সেখান থেকে কোন্নগর।

কোন্নগরে তখন ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হচ্ছে। প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম ও ভক্ত নগেন চট্টোপাধ্যায় প্রচারকনিবাসে আছেন, সঙ্গে স্ত্রী মাতঙ্গিনী দেবী।

একদিন সন্ধের দিকে গোঁসাই এসে উপস্থিত। সঙ্গে শ্রীধর ঘোষ, শ্যামাকান্ত আর নবকুমার।

কী আশ্চর্য, কোত্থেকে একটা কুকুর এসে হাজির। দুটো পা ভাঙা, ছেঁচড়াতে-ছেঁচড়াতে এসে, কে জানে কেন, গোঁসাইকে পরিক্রমণ করল। শেষে তার পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রইল।

যথারীতি আরম্ভ হল কীতর্ন। এ কী, কীর্তনান্তে দেখা গেল, কুকুর দেহ রেখেছে।

'ওকে গঙ্গায় বিসর্জন দাও।' বললে গোঁসাই।

রাতে মাতঙ্গিনী স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন, গোপাল এসেছে, বালগোপাল। গোপালের সারা গায়ে অলঙ্কার, পায়ে নূপুর, উঠোনে ছুটোছুটি করছে। মাতঙ্গিনী তাকে ধরতে ছুটলেন সেই যশোদার মত। ধরে ক্লান্ত শিশুর মুখ চুম্বন করতে লাগলেন। কিন্তু এ কী, এ গোপাল কোথায়? কী আশ্চর্য, এ যে গোঁসাই।

ঘুম থেকে উঠে সকালে নতুন কাজললতা কিনে আনলেন মাতঙ্গিনী। কাজল তৈরি করলেন। গোঁসাইয়ের কাছে এসে বললেন, 'এস আমার গোপালকে কাজল পরিয়ে দি।' গোঁসাই বাধা দিলেন। চোখে কাজল তো এঁকে দিলেনই, মাথায় চুড়ো বেঁধে দিলেন। ছোট ধামাতে করে মুড়ি-মুড়কি বাতাসা খেতে দিলেন, তারপরে গান ধরলেন :

'দেখ সবে আসি যত নদেবাসী আমার গৌরাঙ্গ চাঁদে।
গোরা প্রভাতে উঠিয়া অঞ্চল ধরিয়া ননী দে মা বলে কাঁদে॥
ননী কোথা বা পাব?
আমি নহি আহিরিণী কোথা পাব ননী, পড়িনু বিষম ফাঁদে ॥'

গোপালকে বুকে টেনে নিলেন যশোমতী। গোঁসাই বললে, 'মা, আমাকে পরিয়ে দাও। আমি যেন বিশ্বচরাচরে সর্বত্র তোমার ভুবনমোহিনী রূপ দেখি।'

নগেনবাবুদের বাসার ঝি-র দারুণ ইচ্ছে গোঁসাইয়ের কাছ থেকে দীক্ষা নেয়। মাতঙ্গিনী গোঁসাইকে বললেন, 'তুমি তো কত পতিতকে উদ্ধার করেছ, এ দীনহীনাকেও দয়া করো।'

এক কথায় রাজি হয়ে গোঁসাই ঝিকে দীক্ষা দিল। দীক্ষা পাওয়ামাত্রই ঝি-র নিদারুণ ভাবাবেশ হল, মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল, লজ্জাসরমের ধার ধারলনা। উন্মত্তের মত ব্যবহার করতে লাগল। সন্দেহ নেই তার কুলকুণ্ডলিনীর ঘুম ভেঙেছে।

মাতঙ্গিনী গান ধরলেন :

'ভবপারে যেতে ভয় কি আছে রে।
ঐ দেখ নামতরী লয়ে হরি নাবিক সেজেছে
পারের ভয় নাই, ভয় নাই!
ঐ দেখ পতিতপাবন দয়াল হরি কাণ্ডারী সেজেছে ॥'

গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসেছে সেই ঝি। এক সাধু কাছে এসে তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল। বললে, 'মা, এই জিনিস তুই কোথায় পেলি?'

ঝি হাসতে লাগল।

'এ যে দেখি তোর উপর সদগুরুর কৃপা হয়েছে!'

কুসুম মাতঙ্গিনীর বাল্যসখী। দুজনে মিলে ভোগ রসুই করছে। রান্নার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে কীর্তন। ভাবের আবেশে ভূষিসহ খিচুড়ি পাক করেছে। আবার সোনায় সোহাগা, তাতে আবার পোড়া লেগেছে।

'আমরা কী করব', ভোগের সময় গোঁসাইকে বললে মাতঙ্গিনী, 'রান্নার সময় তুমি আমাদের বিহ্বল করলে কেন? তাই ভূষিওলা খিচুড়ি হয়েছে আর তাও পোড়া লেগেছে। এখন ভালোমন্দ জানিনা, যেমন করেছ তেমনি খাও।'

'কী বলো, এই খিচুড়ি স্বয়ং গোলোকের লক্ষ্মী রেঁধেছেন।' বললে গোঁসাই, 'এ সুধার চেয়েও সুস্বাদু।' পরম তৃপ্তিতে খেতে লাগল গোঁসাই।

কোন্নগর থেকে চলে এল শান্তিপুর। শান্তিপুর থেকে বাগেরহাট। 'মানুষের প্রাণ অনন্তকেই চায়'—বাগেরহাটে এই বিষয়ে বক্তৃতা করে সকলকে অভিভূত করল।

অন্তরে ঈশ্বরকে চিন্তা করো। সেই আন্তর চিন্তার নামই ধ্যান। তিনি আমার অন্তরে আছেন অনর্গল এই চিন্তা করতে করতেই অন্তরে ঈশ্বরপ্রকাশ ঘটে। তখন তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে হয় অনিমেষে। এই অনিমেষদর্শনই ধ্যান।

কী অপরিসীম দয়ায় তিনি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। পৃথিবীতে কোনো দয়ালু মানুষ আমাকে কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্য করলে আমি তাকে কত কৃতজ্ঞতা জানাই। কিন্তু যাঁর সাহায্য ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচতে পারি না, তাঁকে প্রাণভরে প্রণাম না করে থাকতে পারি কই? আমি পাপী তাপী অপরাধী, আমাকে লোকে ঘেন্নায় ছুঁতে পর্যন্ত চায় না, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি পরমেশ্বর আমাকে ঘৃণা করেন না, বরং আমাকে স্পর্শ করেন, নিবিড় প্রেমে স্পর্শ করেন। আমার যা কিছু আত্মগ্লানি সেও তাঁর করুণা। আমার পাপবৃত্তি ভস্মীভূত হবে বলেই এই আত্মগ্লানি। আর এই আত্ম-গ্লানিতে নির্মল হবার পরেই আত্মসমর্পণ। ঈশ্বরসহবাসই চিরন্তন যোগাবস্থা।

বিজয় তারপর বরিশালে এল। উঠল রাখালদাসবাবুর বাসায়। রাখাল-দাসের মা-মরা মেয়ে চারুকে দীক্ষা দিল। দীক্ষার পরেই মেয়ে উপরে-নিচে ছুটোছুটি করতে লাগল। কী যেন খুঁজছে, কাকে যেন ধরতে-ছুঁতে চাইছে, নাগাল পাচ্ছে না।

'এমন করছিস কেন?' রাখালদাস ব্যস্ত হয়ে জিগগেস করলে।

চারু কিছুই বলে না, কেবল য়ুটোছুটি করে বেড়ায়। মেয়েটা পাগল হয়ে গেল না কি? গোঁসাই কোথায়? গোঁসাইকে ডাকো।

গোঁসাই বাইরে কোথায় বেরিয়েছে।

চারু ক্লান্ত হয়ে তার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। দরজায় খিল চাপিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে তারস্বরে। এ কী হল? কাঁদছিস কেন? রাখালদাস দরজায় ধাক্কা মারতে লাগল। দরজা খোল লক্ষ্মীটি।

চারু দরজাও খোলে না, কান্নাও থামায় না।

গোঁসাই বাড়ি ফিরেছে। গম্ভীরমুখে বললে, 'চারু তার মাকে দেখতে

পেয়েছে। কিছু চিন্তা করবেন না। এখুনিই শান্ত হয়ে যাবে।'

শান্ত হয়ে গেল চারু। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে রাখালদাসকে প্রণাম করলে। বললে, 'বাবা, মা এসেছিলেন। শেষকালে ধরা দিলেন, আমার কাছে এসে বসলেন।'

'কিছু বললেন না?'

'বললেন, কেঁদ না, আমি এখন যাই, আবার সময়মত আসব, দেখা দেব।'

মনে হয় গোঁসাইয়ের কাছেও কেউ আসে। একা ঘরে বসে তার সঙ্গে গোঁসাই সরবে আলাপ করে। অথচ যার সঙ্গে আলাপ করে তাকে দেখা যায় না, শোনা যায় না।

'কার সঙ্গে বসে কথা কন?' রাখালদাস জিগগেস করল।

গোঁসাই হাসতে লাগল।

'কে আসে আপনার কাছে?'

'আমার গুরুদেব—পরমহংসজি।'

'কই আমরা তো দেখিনা।'

'এক-এক দিন এক-এক বেশে আসেন।' বললে গোঁসাই, 'ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করে যান।'

'শুধু ধর্ম?'

'একবার মোকামাঘাট স্টেশনে পাকা লিচু নিয়ে এসেছিলেন—' হাসল গোঁসাই।

'পাকা লিচু? সে আবার কী!'

যখন দ্বারভাঙ্গা ছাড়ে তখন যোগজীবন বললে, 'আমাদের অদৃষ্টে লিচু খাওয়া হল না। ক দিন পরেই লিচু পাকবে কিন্তু তার আগেই আমরা চলে যাচ্ছি।'

মোকামা স্টেশনে গাড়ি বদল হবে, কে একজন হিন্দুস্থানী ব্যবসায়ী এসে লিচু দিয়ে গেল।

'এ কটা রাখো তোমার পকেটে।' বললে হিন্দুস্থানী, 'নিজে খেও, আর সকলকে দিও।'

পকেটে কটা লিচুই বা ধরে, কটাই বা নিজে খাব আর কটাই বা বিলোব অপরকে। কিন্তু যোগজীবন যত খায় ততই পকেট বোঝাই হয়ে ওঠে। একে ওকে সকলকে বিলিয়েও পকেট শূন্য করা যায় না। আর, আরো আশ্চর্য, অকালেও পরিপক্ক ফল।

'এ লিচু কে দিয়ে গেল?'

'পরমহংসজি দিয়ে গেলেন।' বিজয় বললে, 'দ্বারভাঙ্গায় থাকতে লিচু খাবার ইচ্ছে হয়েছিল না? তাই দিয়ে গেলেন।'

বরিশাল থেকে মাদারিপুর। মাদারিপুর থেকে মাণিকদহ।

মাণিকদহে জমিদার বিপিন রায়ের অতিথি হল বিজয়। বিপিন রায় সপরিবারে দীক্ষা নিল।

একদিন বিজয় স্থানীয় গণ্যমান্যদের নিয়ে বসে আছে, কোত্থেকে এক পাগলী এসে বিজয়ের সামনে নাচতে লাগল আর হাততালি দিয়ে গান সুরু করল :

'দ্যাখ দ্যাখ জলের মাঝে মেঘ লুকায়ে রয়েছে, সখি,
আমার ইচ্ছা হয় যে ঐ মেঘেরে সদা হৃদয়ে রাখি।
আমি যা দেখিলাম এই চিত্রপটে
তাই দেখিলাম জল আনিতে যমুনার ঘাটে—
আমার ঘাটে-বাটে সমান হল
এখন প্রাণ বাঁচানোর উপায় কি?'

কাকিনার রাজা মহিমারঞ্জন রায় ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন, সেই উৎসবে ডাক পড়ল বিজয়ের। তখুনি চলল বিজয়। সঙ্গে শ্যামাকান্ত, নবকুমার আর মনোরঞ্জন গুহ। আরো একজন। ব্রাহ্মসমাজের সুগায়ক ব্রজ গাঙ্গুলি। ওদিক থেকে যাচ্ছে কাঙাল হরিনাথ। কাকিনা সরগরম।

বিরাট নগরকীর্তন বার করেছে রাজা। শত খোল, ততোধিক করতাল, পঁচিশ দলে বিভক্ত হয়ে বেরিয়েছে কীর্তন। গোঁসাইই কীর্তনের অগ্রনায়ক। তার উদ্দাম নৃত্যে মেদিনী কাঁপতে লাগল, উদাত্ত হরিধ্বনিতে সমাচ্ছন্ন নীলাকাশ। চারদিক থেকে অসংখ্য লোক ছুটে এসে কীর্তনে জুটে গেল। গোঁসাইয়ের পায়ে পড়তে লাগল লুটিয়ে। একী আশ্চর্য, যে শোনে সেই হরিধ্বনি তোলে, আর যেই ধ্বনি তোলে সেই নাচতে সুরু করে দেয়। এ কী অদম্য আকর্ষণ! খোলে বোলে রোলে সে এক মহামহিম হরির লুট।

উপাসনার সময় এক আধ্যাত্মিক দৃশ্য প্রকট হল গোঁসাইয়ের কাছে। দেখল শ্রীমনমহাপ্রভুকে বেষ্টন করে অবতারগণ নৃত্য করছে। বুদ্ধ মহম্মদ যীশু নানক শংকর এবং আরো অনেকে। সর্বধর্মসমন্বয়ের দৃশ্য। শুধু ভক্তিপথেই যে সমন্বয় তাই বোঝাবার জন্যেই বুঝি কেন্দ্রে গৌরহরি।

'আচ্ছা, আজ আমার উপাসনার মন বসছে না কেন? কেন ভাব আসছে না?' জিগগেস করল বিজয়, 'এখানে নিশ্চয়ই কেউ অবিশ্বাসী আছেন—'

'আমিই সেই অবিশ্বাসী।' মহিমারঞ্জনের ভগ্নীপতি বললে করজোড়ে, 'আপনি বলছিলেন, ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়, আমি মনে মনে হাসছিলাম, এ কখনো সম্ভব হতে পারে? যদি দর্শনই হবে, তখন তবে কথা বলা চলে কী করে?'

'চলেই না তো।' বললে গোঁসাই, 'দর্শন একটু ঘন হলেই স্বর গদগদ হয়, পরে ঘনতর হলে কথা বন্ধ হয়ে যায়।'

ছাত্রসমাজে একদিন বক্তৃতা দিতে হবে গোঁসাইকে। দিনক্ষণ ঠিক হয়েছে। একদল বৈষ্ণব এসে তাকে কীর্তনে ধরে নিয়ে গেল, আশ্বাস দিল, কীর্ত-

নান্তে গোঁসাইকে ছাত্রসভায় পৌঁছিয়ে দেবে! কিন্তু, ভগবানের বিধান, গোঁসাই কীর্তনে আত্মহারা হয়ে পড়ল, সভার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তবু বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলনা। সভাস্থ সকলে গোঁসাইয়ের নিন্দা করতে লাগল— কথা দিয়ে কথা রাখেনা এ কেমন কথা? কেউ বললে মিথ্যেবাদী। কেউ বা আরো কদর্য তিরস্কার।

কতক্ষণ পরেই সম্বিত ফিরে পেয়ে দ্রুত চলে এল গোঁসাই। বক্তৃতা আরম্ভ করেই বলতে লাগল : মা, এ কী, তোমার গায়ে আঘাতের চিহ্ন কেন? আমাকে যে এরা গালি দিয়েছে সেই আঘাতই কি তুমি সর্বাঙ্গে বহন করছ? এখন আমি কাঁদব, না, তোমার পুজো করব?'

নিন্দুকের দল ভয়ে-বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। অনুতপ্ত হয়ে সকলে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলে।

উৎসবের আরেক দিন বিজয় মনোরঞ্জন গুহকে বললে, 'তুমি আজ কিছু বলো।'

পাঁচ-ছ' দিন জ্বর ভোগ করে আজই একমুঠো 'পোড়ে'র ভাত খেয়েছে মনোরঞ্জন। শরীর অত্যন্ত দুর্বল, বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার মত শক্তি নেই, আর কন্ঠস্বরও নিস্তেজ। সেই কথাই সবিনয়ে বললে গোঁসাইকে।

গোঁসাই বললে, 'যা পারো বলো।'

মনোরঞ্জন তবু আপত্তি করল। 'কিন্তু কী বলব—'

'যা মুখে আসে বলবে। উঠে দাঁড়াও তো একবার।'

মনোরঞ্জন উঠে দাঁড়াল। সুস্থ সমর্থ শক্তিমানের মত দাঁড়াল। ঋজু দৃঢ় তপ্ততেজ। পা এতটুকু টলল না। ক্ষীণ কন্ঠ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। ভাষায় জেগে উঠল গম্ভীর গর্জন।

একটানা দাঁড়িয়ে তিন ঘন্টা নিরর্গল ঈশ্বরকথা বলে চলল মনোরঞ্জন। ঈশ্বরের জন্যে বলিপ্রদত্ত হবার কথা।

কে এই শক্তি জোগাল, পঙ্গুকে কে পাঠাল গিরিলঙ্ঘনে? মনোরঞ্জন নিজেই অভিভূত। কী করে এই ভগ্নদেহে এতক্ষণ ধরে বললাম আবিষ্টের মত? আর, কী বললাম!

রাজা মহিমারঞ্জন বললেন, 'থামলেন কেন? আহা, এমন বক্তৃতা আমি সারারাত জেগে শুনতে রাজি আছি।'

রাজপণ্ডিত শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কারের ছেলে কোকিলেশ্বর। কলেজের ছাত্র অথচ এ বয়সেই উদ্দাম ধর্মপিপাসা। বাপকে না জানিয়েই দীক্ষা নিলে গোঁসাইয়ের কাছে। বাড়িতে গেলে শ্রীশ্বর ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। বললে, 'তোর কী হল? তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

'কী হবে?' কোকিলেশ্বর তো অবাক : 'কেমন আবার দেখাচ্ছে?'

'তোর মুখে অপূর্ব শ্রী দেখছি।'

'সে আবার কী?'

'হ্যাঁ, ব্রহ্মজ্ঞান হলে মুখের যেমন শোভা হয়, শাস্ত্রের সেই বর্ণনার সঙ্গে তোর মুখশ্রী মিলে যাচ্ছে।' রাজপণ্ডিত ব্যাকুল হয়ে উঠল : 'তোর কী হল? কোন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তোকে কৃপা করল?'

তখন কোকিলেশ্বর দীক্ষার কথা বললে।

স্নানের আগে গায়ে তেল মাখছিল শ্রীশ্বর, উঠে পড়ল। কুলোজ্জ্বল পুত্রকে আশীর্বাদ করল, এত বড় সৌভাগ্যবান আর কে আছে। কিন্তু আমার কী হবে? বস্তুলাভের ব্যাকুলতায় তেল মাখা গায়েই বেরিয়ে পড়ল।

'এ কী, কোথায় চললেন?' ডাক দিল কোকিলেশ্বর।

'দেখি প্রভু আমাকেও কৃপা করেন কিনা।'

'সে কী, স্নান করে যান।'

'না, দেরি সইছেনা আমার।' বললে শ্রীশ্বর, 'দীক্ষার কালাকাল বা শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার নেই। যদি সদগুরু মেলে তা হলে সেই মিলনেই সর্বশুচি।'

প্রখর রোদ, তার মধ্যেই রিক্ত তৈলাক্ত গায়ে বেরিয়ে পড়ল শ্রীশ্বর। সে কী, তার পিছু-পিছু তার স্ত্রী, কোকিলেশ্বরের মা-ও চলেছে।

'গোঁসাইয়ের পায়ে গিয়ে পড়ল দুজনে। বললে, 'আমাদেরও বস্তু দিন।'

করুণার্দ্রহৃদয় গোঁসাই তাদের দীক্ষা দিল।

ধর্ম কিরূপে লাভ হবে?

গোঁসাই বললে, জীবনকে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে অভ্যস্ত করো। প্রতি-দিন নিয়মিত অল্প সময়ের জন্যে হলেও সাধন করা উচিত। ভালো না লাগলেও ওষুধ গেলার মত করলে তবে রুচি হয়। ভোরে উঠে স্নান করে একঘন্টাকাল প্রাণায়াম ও নাম। পরে একঘন্টা ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তারপর বৃক্ষলতা পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গের সেবা। নিকটে আর্ত-আতুর কেউ থাকলে তার তত্ত্বাবধান। আহারের পর নিদ্রা ঠিক নয়। দিবানিদ্রায় বুদ্ধিনাশ ও আয়ুক্ষয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে অধ্যয়ন। অপরাহ্ণে অল্প ভ্রমণ। সন্ধ্যায় নামগান, প্রাণায়াম ও নামজপ। তারপর পরিমিত আহার করে শয়ন। এতে অভ্যস্ত হলেই সহজে ধর্মলাভ।'

অন্তরের চিন্তা কুকল্পনা যাবে কিসে? কে একজন জিগগেস করলে।

'শুধু নামে। যে নাম পেয়েছে তার আর ভাবনা কী। শ্বাসে-প্রশ্বাসে ঐ নামজপই একমাত্র উপায়।'

'কিন্তু আপনার কৃপা ছাড়া কী হবে? আমাদের আর কী ক্ষমতা আছে?'

'ও সব ভাবুকতা ছাড়ো।' বললেন গোঁসাইজি : 'অধিক ভক্তি দেখালে নিজের ক্ষতি হয়। কৃপার কথা অনেক পরে। যতদিন মান-অপমান সুখ-দুঃখ কাম-ক্রোধ আছে, ততদিন নিজের চেষ্টা করতে হবে। এই চেষ্টাই

সাধন—নাম করা। আমি পারিনা, তোমার কৃপাই সম্বল, এ সব কথা ভাবুকতা মাত্র। যতদিন মানুষের নিজের ইচ্ছা চেষ্টা ও ক্ষমতা আছে ততদিন ও সব কৃপার কথা কিছু না। নিজেকেই পরিশ্রম করতে হবে—আপ্রাণ পরিশ্রম।'

॥ ১৮ ॥

কাকিনা থেকে বিজয় চলে এল কামাখ্যায়। 'রক্তপাষাণরূপিনী'র পীঠস্থানে।

অম্বুবাচীর রাত্রি। অন্ধকারে তীরবেগে মন্দিরের দিকে ধাবিত হল বিজয়। মন্দিরের ধারে সশস্ত্র প্রহরী, কিন্তু কেন কে জানে, বিজয়কে বাধা দিতে চাইল না।

মুখে জলদগম্ভীর বম্‌ বম্‌ ধ্বনি, বিজয় পীঠস্থান পরিক্রমণ করল। পরে প্রণাম করল সাষ্টাঙ্গ হয়ে।

আর যেই প্রণাম করল, মনে হল, পিচকিরির ধারার মত কি-এক তরল বস্তু মাটি ফেটে নির্গত হচ্ছে। ভাসিয়ে দিচ্ছে সর্বাঙ্গ। বিজয় লক্ষ্য করে দেখল এ দিব্য রক্ত। 'যোনিপীঠং কামগিরৌ।'

গেল উমানন্দ ভৈরব দর্শন করতে। কামাখ্যাগিরির শিখরে ভুবনেশ্বরের মন্দিরে। অদূরে বশিষ্ঠাশ্রমে। পরিচয় হল অচলানন্দ তীর্থাবধূতের সঙ্গে।

অবশেষে ঢাকায় ফিরে এল। ধরল ম্যালেরিয়ায়। ডাক্তাররা বলল, পদ্মায় কিছুদিন নৌকোয় বাস করুন।

সপরিবার নৌকোয় আছে বিজয়।

ছোট মেয়ে প্রেমসখী বললে, 'তুমি তো গঙ্গার ব্রতকথা বলো, তেমনি এই পদ্মায় কোনো কথা নেই?'

'কই শুনিনি তা!

'আচ্ছা, বাবা, এই পদ্মাটা গঙ্গা হয়ে যেতে পারে না?'

'তা পারে।'

'পারে?' প্রেমসখী উৎসাহিত হয়ে দিদি শান্তিসুধাকে ডাক দিল : 'ও দিদি শোন, বাবা বলছেন, এ পদ্মানদীটা গঙ্গা হয়ে যেতে পারে।'

শান্তিসুধার বেশি বুদ্ধি, সে বললে. 'জল দেখে কী করে বুঝবে গঙ্গার জল! গঙ্গা কি স্বয়ং দেখা দেবেন?'

'দেবী স্বয়ং দেখা দেবেন। কেন দেবেন না? মা পদ্মা তাই গঙ্গা।' শান্তিসুধাকে লক্ষ্য করল বিজয় : 'একটা নৈবেদ্য তৈরি করে নিয়ে আয়।'

শান্তিসুধা নৈবেদ্য তৈরি করে আনল। দে আমার হাতে দে। নৈবেদ্যের পাত্র বিজয় নিল হাত বাড়িয়ে। তারপর জলের দিকে তাকিয়ে গঙ্গাস্তব করতে লাগল :

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিবিহারিণি বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে।

যেদিকে স্থিরলক্ষ্য হয়ে তাকিয়ে ছিল সেইদিককার জল হঠাৎ উদ্বেলিত হতে সুরু করল। কিছুক্ষণ পরে সেই উদ্বেলিত জলের মধ্য থেকে একখানা পরমসুন্দর রমণীর অলঙ্কারমণ্ডিত হাত উঠল। নৈবেদ্যের পাত্র সেই উত্থিত হাতে দিয়ে দিল গোঁসাই।

পাত্রসহ হাত জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিস্ময়ে দু-বোন কাঠ হয়ে রইল! সন্দেহ কী, পদ্মাই গঙ্গা হয়ে গিয়েছে।

'শ্রদ্ধা করে সেবা পূজো করলে বিগ্রহ জীবন্ত হন।' বলছেন গোঁসাইজি : 'কথা কন, হাত বাড়িয়ে খাবার চান। কোনো প্রকার অনাচার অত্যাচার হলে বলে দেন। ওরা আমার পুজো করে কিন্তু খাবার দেয় না। কত বাড়ির বিগ্রহ আমার কাছে এসে নালিশ করে যায়। তখন তাদের আবার খবর পাঠাই।'

নবদ্বীপে মহেন্দ্র ভট্টচাজের বাড়িতে গৌরাঙ্গপ্রতিষ্ঠা হবে, সশিষ্য গোঁসাইজিকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছে।

প্রতিষ্ঠান্তে, সকালে গোঁসাইজি চা খাচ্ছেন, বালক গৌরাঙ্গ কাঁদতে-কাঁদতে এসে তাঁকে বললে, ওরা আমাকে প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু আমাকে নূপুর-বালা দেয়নি।

গোঁসাইজি বালককে আশ্বাস দিলেন : 'দেবে। আমি যাচ্ছি, বলে দেব —দেবে।'

মহাপ্রভুর মন্দিরে কীর্তন করলেন গোঁসাইজি, দুপুর পর্যন্ত চলল সেই কীর্তন। রোদ চড়ে গিয়েছে, পথের তপ্ত বালি আগুন হয়ে উঠেছে, সেই পথ মাড়িয়ে মহেন্দ্রের উৎসব-বাড়িতে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়ালেন একেবারে নবগৌরাঙ্গের মুখোমুখি। বললেন স্নেহার্দ্রকণ্ঠে : 'আহা, এত গরম বালির উপর দিয়ে কি লাফিয়ে-লাফিয়ে আসতে হয়? হাঁপাসনে, চুপ কর, আমি বলে দেবখন, সোনার বালা-নূপুর গড়িয়ে দেবে।' তবু বুঝি কান্না থামেনা গৌরহরির। গোঁসাইজি হাত নেড়ে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'ওরে থাম, কাঁদিসনে, দেবে, এক্ষুনি দেবে।'

কী ব্যাপার? সকলে এগিয়ে এসে দেখল জীবন্ত বালকের মত বিগ্রহের দু-চোখ জলে ছল ছল করছে। কাঁদছে বিগ্রহ! আর সেই উত্তেজনায় বুকের মালাগুলোও কাঁপছে মৃদু-মৃদু। কেন. কাঁদছে কেন গৌরাঙ্গ?

'কাঁদছে কেন!' গোঁসাইজি নাটমন্দিরের সাজসজ্জার আড়ম্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ সব ঝাড়লণ্ঠন ফানুসের কী দরকার ছিল? যাকে যা

দিয়ে সাজানো দরকার তা দেবে না, বাজে জিনিসে খরচ করবে! বলে রাখছি', গোঁসাইজিও ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে কাঁদতে লাগলেন : 'যে ছেলেকে স্থান দিয়েছ তাকে যদি সোনার বালা-নূপুর না দাও, তা হলে ঘরের সমস্ত হাঁড়ি-কুঁড়ি ভেঙে চুরে জলে ভাসিয়ে দেবে দেখো।'

বিজয় তারপর একদিন চাঁচুরতলা কালীবাড়ি দেখতে গেল।

তার সঙ্গে আরো অনেকে মন্দিরে গিয়ে দেখল, জগদ্ধাত্রী বসে আছেন।

পুরোতকে জিগগেস করতে বললে, 'মন্দিরে তো কোনো মূর্তি নেই, ঘটস্থাপন আছে মাত্র।'

সে কী? সকলে আবার মন্দিরে গিয়ে দেখল, সত্যিই তো, মূর্তি কোথায়, একটি ঘট শুধু বসানো আছে।

'এখানে কীর্তন হয়?' জিগগেস করল বিজয়।

পুরোত বললে, 'আমরা জীবনে কখনো কীর্তন শুনিনি।'

অনেক দূরে বাড়ি, চাল-কলা যা পেয়েছিল তাই গামছায় বেঁধে মন্দিরে একটু আলো দেখিয়ে, বেলা থাকতে-থাকতে চলে গেল পুরোত।

কেন কে জানে, বিজয় সকলকে বললে, এস আমরা একটু বসে যাই। স্থানটি ভারি মনোরম।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে, সন্ধেসন্ধি, কোত্থেকে একদল কীর্তুনে এসে হাজির।

'তোমরা কারা? তোমাদের কে ডেকেছে?' স্থানীয় লোকেরা জিগগেস করল সবিস্ময়ে।

'আমাদের কেউ ডাকেনি। আমরা অমনি এসে পড়েছি।'

'অমনি এসে পড়েছ?'

'হ্যাঁ, আমরা আমাদের আখড়ায় বসে গান করছিলাম,' দলের অধিকারী বললে, 'হঠাৎ সকলের মনে হল মায়ের বাড়ি গিয়ে গান করি। মায়ের বাড়িতে বসে গান করলেই প্রাণ ঠান্ডা হবে।'

গান ধরল কীর্তুনেরা।

অঙ্গনে কি একটা গাছের থেকে 'ঢেপের খই'-এর মত ছোট ছোট শাদা ফুল টুপটাপ ঝরে পড়তে লাগল। সমস্ত জায়গায় ফুলে ফুলময় হয়ে গেল।

'কী ফুল?'

কেউ বলতে পারল না। এমন সুন্দর গন্ধ, গন্ধের থেকেও মিলল না পরিচয়।

গাছটাকে চেন না কেউ?

চিনি বই কি। একটা বুনো গাছ। জন্মে কোনো দিন ফুল ফোটায়নি। আজ, কেন কে জানে, অজস্র ঝরিয়ে দিয়েছে।

শুধু ফুলই ফুটছে না, গাছের ডালে বসে কী একটা পাখিও গান

গাইছে।

এমন মিষ্টি আওয়াজ কোন পাখির?

কে জানে কী। জীবনে আমরা শুনিনি এমন স্বর। কোত্থেকে, কী দেখে উড়ে এসেছে কে বলবে?

নৌকোতেই আছে, চলো তবে এবার একদিন বারদী যাই, লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে দেখে আসি।

যেন বিদুরের কুটিরে শ্রীকৃষ্ণ এসেছে—তেমনি আনন্দে আত্মহারা লোকনাথ। ওরে আমার 'জীবনকৃষ্ণ' এসেছে! তাকে আমি এখন কী দিই, কী খাওয়াই, কোথায় বসাই!

আর গোঁসাই দেখল এ কে অমর্ত মহাপুরুষ যাঁর প্রতি রোমকূপে দেবতার প্রকাশ!

নিভৃতে দুজনের কি কথা হল তা কে বলবে।

নৌকো ছেড়ে ঘর নিল বিজয়। কোথায় তার ঘর? প্রচারক আশ্রমেই স্থান পেয়েছে আপাতত।

চৈত্রের সন্ধ্যায় হঠাৎ কালবোশেখির ঝড় উঠল। এমন ঝড় ও-অঞ্চলে এক শতাব্দীতেও কেউ দেখেনি। মানুষ-ওড়ানো ঝড়। একটা লোককে গাছের উপর তুলে দিয়েছে, আরেকটাকে নদীর ওপার থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এপারে একটা দোতলা বাড়ির ভিতরের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে, তার গায়ে একটাও আঁচড় লাগেনি। একটা আড়াইমনি সিন্দুক উড়িয়ে নিয়ে পাঁচ-ছ মিনিটের দূর পথের এক ঘরে এমন নিটোল ঢুকিয়ে দিয়েছে যে এখন তাকে না ভেঙে দরজা দিয়ে বার করা যাচ্ছে না। একটা লোহার থামকে উপড়ে নিয়ে সেই গর্তেই মাথার দিকটা নিচে দিয়ে উলটো করে পুঁতে রেখেছে। এক বাড়ির মাচা থেকে কলসী-ভর্তি মুড়ি আরেক বাড়ির মাচাতে নিয়ে বসিয়েছে—কলসীর মুখের সরা তো সরেইনি, একটি মুড়িরও নড়চড় হয়নি। এক হাত লম্বা বাঁশের বাঁখারি একটা শুপুরি গাছকে এফোঁড় ওফোঁড় করে বিঁধে রয়েছে, প্রকাণ্ড পালোয়ানেরও সাধ্য নেই হাতের জোরে টেনে সে বাঁখারিটাকে খুলে নেয়।

কী ঝড়! কী ঝড়! যেন বিশটা কালো এঞ্জিন আগুনের গোলা ছুঁড়তে-ছুঁড়তে সশব্দে ছুটছে। কত গাছ পড়ছে কত বাড়ি উড়ছে লেখা-জোখা নেই। কত মানুষ আর পশুও যে চক্ষের নিমেষে বলি হয়ে যাবে তার হিসেব কে করে।

আসন ছেড়ে গোঁসাই বাইরে এসে দাঁড়াল। আর্তস্বরে ডাকতে লাগল মহাকালীকে : জয় মা কালী, জয় মা কালী, দয়া করো দয়াময়ি, প্রসন্ন হও। আবার ডাকতে লাগল মহাবীরকে : জয় মহাবীর, জয় মহাবীর, ও সব অগ্নি-গোলা আমার বুকে নিক্ষেপ করো। আর সকলকে বাঁচাও।

দু'তিন মিনিটের মধ্যেই ঝড় শান্ত হল। কিন্তু এর মধ্যে যা হয়ে

গেল তা ভয়ঙ্কর হয়েও মনোহর। প্রচণ্ড তাণ্ডবের মধ্যেও যেন ছন্দ আছে, মাত্রা আছে, লাস্য আছে, প্রাবল্যের মধ্যেও দেখা গেল লাবণ্য। তার অর্থ কী? তার অর্থ অন্ধ জড়শক্তি ভগবৎ-ইচ্ছার চৈতন্যে নিয়ন্ত্রিত হল। সর্ব-নাশ যতটা বিস্তীর্ণ ও গভীর হতে পারত তা হল না।

একদিন সকালে প্রচারক-আশ্রমের ঘরের বারান্দায় এসে গোঁসাই দেখল দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। যখন ভিতর থেকে বন্ধ তখন নিশ্চয়ই কেউ ঘরে আছে। মেয়েদের নাম ধরে ডাকতে লাগল গোঁসাই, কোনো সাড়া নেই। করাঘাত করল, করাঘাতও নিরুত্তর। এই অবেলায় সকলে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? নইলে কোথায় গেল? উচাটন হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে গোঁসাই, হঠাৎ দরজা কে খুলে দিল!

দেখল ঘরের মধ্যে সবাই রয়েছে।

'বাইরে থেকে এত ডাকাডাকি করছি কেউ শুনতে পাও না?'

'কী আশ্চর্য, বিন্দুমাত্র শুনিনি তো।' মেয়েরা হতবাক।

'শোনোনি, দরজা তবে খুলে দিল কে?'

'সত্যিই তো, কী আশ্চর্য, আমরা তো কেউ খুলে দিইনি, আমরা তো ওদিকে কাজে কর্মে তন্ময় ছিলাম—'

'তাহলে কি দরজা নিজের থেকেই খুলে গেল?' বলে অদৃশ্য কাকে দেখে গদগদ কণ্ঠে বলে উঠল গোঁসাই : 'মা গো, এই বুঝি তোর সেই রাম-প্রসাদের বেড়া বাঁধা?' বলেই কাঁদতে লাগল বালকের মত।

ঢাকার ব্রাহ্মরা গোড়ায় গোঁসাইয়ের প্রতি অনকূল থাকলেও ইদানীং তারাও বিরক্ত হয়ে উঠছে। ব্রাহ্মসমাজে হরিনাম চালাচ্ছেন, চলুক, কিন্তু তাই বলে কালী, মহাবীর, রাধা-কৃষ্ণ—এসব কী উৎপাত! আর, গানও যা হচ্ছে তা মোটেই রুচিকর নয়। 'জলে ঢেউ দিও না গো সখি, আমি কালো-রূপ নিরখি।' এসব নিতান্ত নিম্নস্তর! তারপরে এটা—'তারে দিয়ে প্রাণ কুলমান চরণ পেলাম না সজনি, আমি হলেম গৌরকলঙ্কিনী'—এ তো একে-বারে নিতাইগৌর পর্যন্ত নিয়ে এল। আর এসব গানেই গোঁসাই ডগমগ! ব্রাহ্ম সমাজের বারোটা বাজিয়ে দিলে!

তারপর বেদীতে বসে এসব আবার কী প্রলাপোক্তি!

'ঐ দেখুন মা আসছেন। হাতে প্রসাদের থালা। রোজ লুকিয়ে আমাকে প্রসাদ খাওয়াও, আর এদের কেন দাও না? সকলেই তো তোমার ছেলে, তবে সকলকে দাও না কেন? একলা আমাকে দিলে আমি আর নেব না প্রসাদ। এরা যে উপবাসী থাকে। যদি না দাও, তোমার সকল কথা ফাঁস করে দেব। কী ভাবে চললে তোমার প্রসাদ পাওয়া যায়, সকলকে বলে দেব। তখন তুমি কী করবে? আপনারা সবাই শুনুন, আপনাদের বলে দিচ্ছি। তিনটি নিয়মরক্ষা করে চললেই মায়ের প্রসাদের অধিকারী হবেন। মা তখন রাজী না হয়ে পারবেন না। শুনুন, বলে দিচ্ছি—তিনটি নিয়ম। প্রথম

যখন যা কিছু গ্রহণ করবেন, আহার করবেন, মাকে নিবেদন করে নেবেন। দ্বিতীয় নিয়ম, অনিবেদিত বস্তু কখনো গ্রহণ করবেন না, আর তৃতীয় নিয়ম, কারু কুৎসা-নিন্দা করবেন না—কখনো না, কখনো না। ঐ দেখুন, মা আমার মুখ চেপে ধরছেন—বলতে দিচ্ছেন না—হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরছেন। জয় মা, জয় মা—'

চারদিকে কান্না ও ভাবের ধুম পড়ে গেল। কিন্তু এই কি ব্রাহ্মরীতি? নবদীক্ষিত কুলদারই এতে বেশি আপত্তি!

তা ছাড়া এসব কী! প্রচারক-নিবাসে গাঁজারও ধোঁয়া উঠছে।

কে এক জটিল উদাসী সাধু এসেছে গোঁসাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে, এখন দিব্যি গাঁজায় দম মারছে। কী আশ্চর্য, গোঁসাই দেখে-শুনেও কিছু বলছে না।

দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি। কুলদা তেড়ে গেল। সাধুকে দেখতে বেশ তেজস্বী, ভজনানন্দী, কিন্তু তাই বলে সমাজগৃহে অনাচার!

শূন্যে সিঁড়ি অনুমান করে ত্বরান্বিত পা ফেলতে গিয়ে পড়ে গেল কুলদা। এমন পড়ল তিন দিন বিছানা থেকে উঠতে হল না।

গোঁসাই শান্তিপুরে এসেছে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা ঢাকায়, এমনি একদিন ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের কর্তা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় গোঁসাইয়ের উপর নোটিশ জারি করল, প্রচারক-নিবাসে থেকে ইচ্ছেমত বক্তৃতা বা উপাসনা করা চলবে না। কতগুলি আবশ্যিক নিয়ম তাকে মানতেই হবে। রোগের প্রতিকারার্থে ছাড়া তামাক ও নস্যির বাইরে আর কোনো মাদক দ্রব্য প্রচারগৃহে গ্রহণ বা সেবন করা চলবে না। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার যে দেশীয় রীতি প্রচলিত আছে, তার বাইরে প্রণামকে প্রসারিত করা যাবেনা, অর্থাৎ চলবেনা সাষ্টাঙ্গ, কিংবা চরণধারণ। যাতে পৌত্তলিক বা অপবিত্র ভাবের উদয় হতে পারে প্রচারগৃহে থাকতে পারবেনা এমনি মূর্তি বা চিত্রপট। ইত্যাদি ইত্যাদি।

গোঁসাই তক্ষুনি সহধর্মিণী যোগমায়াকে চিঠি লিখল : তুমি সবাইকে নিয়ে পত্রপাঠ প্রচারক-নিবাস ত্যাগ করবে এবং যে কোনো একটা ভাড়াটে বাড়িতে উঠে যাবে। টাকার কথা ভাববে না। যিনি এত দিন চালিয়ে এসেছেন তিনিই চালাবেন।

শ্যামসুন্দরকে উদ্দেশ করে বললে, 'শুকনো মরুভূমির মধ্য দিয়ে এত দীর্ঘ পথ তুমি আমাকে টেনে নিয়ে এলে!'

শ্যামসুন্দর হাসল : 'কে কাকে টানল, কেন টানল, তার আমি কী জানি!'

সমাজের কর্তৃপক্ষকে সরকারী ভাবে প্রতিবাদ জানাল গোঁসাই। আমার বিশ্বাস, আমার প্রণালীতেই সার্বভৌমিক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্মের প্রচার হচ্ছে।

যোগমায়া একরামপুরে এক বাড়ি ভাড়া করে উঠে গেল।

প্রচারক-নিবাস থেকে বিচ্যুত করেও সমাজ কর্তৃপক্ষ গোঁসাইকে রেহাই দিল না। আগের কার্যকলাপের জন্যে কৈফিয়ৎ তলব করল।

বারদীর ব্রহ্মচারী গোঁসাইকে চিঠি পাঠাল, ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করো। আরেক দিন স্বপ্নযোগে দেখা দিলেন অদ্বৈত। বললেন, সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়বুদ্ধি ছেড়ে দাও। নিজের গুরু পরমহংসজিকে আহ্বান করল গোঁসাই। তিনিও ছাড়তে বললেন।

গোঁসাই ব্রাহ্মসমাজ থেকে সর্বসম্পর্ক ছিন্ন করে নিল। 'কিন্তু,' শেষ চিঠিতে জানাল শেষ কথা : 'আমি যা প্রচার করছি তাই চিরন্তন ব্রাহ্মধর্ম।'

একরামপুরের বাড়ির কাছেই কদম গাছ। প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র এই বৃক্ষমূলে আশ্রম স্থাপন করে কিছুকাল সাধন-ভজন করেছিলেন, সেই থেকে এ স্থানটির নাম বীরভদ্রের আসন বলে চলে আসছে।

ঘরে বসে আছে গোঁসাই, দূর থেকে কীর্তনের খোল-করতাল শুনতে পেল। শোনামাত্রই তালে তালে মাথা নাড়তে লাগল। এই নামধ্বনি শুনতে পেলে আর কথা নেই, শুধু উন্মনা নয় বিহ্বল হয়ে পড়ে। রাত্রে যে ঘুম হয় এও গোঁসাইয়ের কষ্ট। ভগবৎপ্রেমরসে সব সময়েই থাকতে চায় জাগ্রত, উদ্দণ্ড-উদ্দাম। তর্কে-বাদানুবাদে কত সময় অপচয় হয়ে গিয়েছে, কত সময়, ঘুমিয়ে। বলছে, 'আগে-আগে রাত জেগে সাধন করবার জন্যে কত চেষ্টা করেছি, সময়-সময় অভিভূত হয়ে পড়েছি। এখন শুতে হবে এ কথা ভাবলেই কান্না পায়।'

কীর্তন কদমতলার কাছে আসতেই গোঁসাই লাফিয়ে উঠল, আর বলা নেই কওয়া নেই, দলের মধ্যে ঢুকে নাচতে লাগল।

দল এগিয়ে চলল, গোঁসাইও এগিয়ে চলল।

যার কীর্তন, বিহারী মালাকার, একেবারে তার বেনেটোলার বাড়িতে গিয়ে থামল। থেমেই বেহুঁস হয়ে পড়ল।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে গোঁসাই জিগগেস করলে, 'এ কী, এ কদমতলা না? আমি এখানে এলাম কী করে?'

সামনেই রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। মাটিতে পড়ে গোঁসাই তখুনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল। বিহারী মালাকার যুক্তকরে বললে, 'প্রভু, আজই আমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হল। মনে বড় সাধ ছিল, আপনার চরণধূলি পড়ে আমার মন্দিরে। বলতে গিয়েছিলাম কিন্তু মুখ ফুটে বলতে সাহস পেলাম না। আপনি অন্তর্যামী, আপনি দয়াল, আপনি আমার আকাঙ্ক্ষা জেনে নিয়ে তা পরম করুণায় পূর্ণ করলেন।' বলে গোঁসাইয়ের পদতলে লুটোপুটি খেতে লাগল।

বিগ্রহের সামনে গোঁসাইয়ের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত—কুলদা ভাবল, এ কোন ব্রাহ্মধর্ম! মনে মনে বললে, হায় ভগবান, আমাকে তুমি এ দৃশ্য দেখালে কেন?

অথচ ভাবুকতার তার নিজেরই কত শাসন।

রাধাকৃষ্ণের একখানি পট নিয়ে কে একটি যুবক এসেছে গোঁসাইয়ের কাছে, বারে-বারে পায়ে লুটিয়ে পড়ছে, আর পট দেখিয়ে বারে-বারে বলছে, 'গোঁসাই, বলে দাও, আহা কী সুন্দর মূর্তি, বলে দাও, কী করে পাব? আমি আর কিছুই চাই না, শুধু বলে দাও, কী করে পাব?'

গোঁসাই বললে, 'স্থির হও।'

কিন্তু যুবক আরো উদ্দাম হয়ে উঠল। কী সুন্দর মূর্তি, আহা, কী সুন্দর!

'বটে? চালাকি?' গোঁসাই গর্জন করে উঠল : 'আর কিছু চাও না? নবাবের বাগানে নির্জনে সুন্দরী যুবতী পেলে চাও কিনা বলো। এখানে চালাকি করছ?'

যুবকের মুখ ম্লান হয়ে গেল। কতক্ষণ পরে চলে গেল নিঃশব্দে।

বলো, গান ধরো :

'হরি বলব মুখে যাব সুখে ব্রজধাম।
কলিতে তারক ব্রহ্ম হরিনাম॥'

॥ ১৯ ॥

একরামপুরের বাসাতেই আশ্রয় নিল গোঁসাই। বললে, এবার ধুলট করব।

সে আবার কী?

মাঘী সপ্তমী তিথিতে অদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব। সেই উপলক্ষ্যে শান্তিপুরে ধুলট হয়। দোলে যেমন ফাগ ওড়ে ধুলটে তেমনি ধুলো। কীর্তনের সময় ভাবোন্মত্ত হয়ে রাস্তা থেকে ধুলো কুড়িয়ে উড়িয়ে বেড়ানোর নামই ধুলট।

নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে। সেদিন ধুলট হয় অম্বিকা কালনায়। আর মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়েছিলেন মাঘী পূর্ণিমায়, কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছ থেকে। সেদিন ধুলট হয় নবদ্বীপে।

এবার আমরা ঢাকায় মাঘী সপ্তমীতে অদ্বৈতের ধুলট করব।

সকাল আটটায় নগরকীর্তন বেরুল। অগ্রনায়ক স্বয়ং গোঁসাই। কীর্তনের গান হল :

'হরি বলব মুখে যাব সুখে ব্রজধাম
কলিতে তারকব্রহ্ম হরিনাম ॥
এ নাম, শিব জপেছেন পঞ্চমুখে
নারদ করেন বীণায় গান।
এবার গুরু নামে দিয়ে ডঙ্কা
রাধানামে দাও বাদাম ॥'

শ্রীহট্ট থেকে এক অন্ধ বাবাজি এসেছে। কণ্ঠে যেমন সুর তেমনি সুধা।

সে, গান ধরেছে 'নগর ভ্রমণ করে আমার গৌর এল ঘরে, আমার নিতাই এল ঘরে।'

রাস্তায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে গোঁসাই ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল। পরে উঠে দুই হাতে ধুলো নিয়ে চারদিকে ছুঁড়তে লাগল প্রমত্তের মতো আর বলতে লাগল : 'জয় সীতানাথ, জয় সীতানাথ!' এ ধুলো গায়ে লাগতেই বিপুল জনতা প্রবল আবেগে আলোড়িত হল। তারাও রাস্তায় ধুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে ছুঁড়তে লাগল মুঠো-মুঠো। সকলেরই মুখে উন্মত্ত হুঙ্কার। হরিবোল, হরিবোল। এখান-ওখান থেকে কত লোক এসে যে যোগ দিল তার ইয়ত্তা নেই। যেখান দিয়ে কীর্তন যাচ্ছে তার দুপাশের লোক, স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-বুড়ো সবাই ভাববিহ্বল হয়ে পড়ল। কে কার নিষেধ শোনে! সমস্ত ধুলায় ধুলাকার।

মিছিল মোটেই তাড়াতাড়ি এগোতে পাচ্ছে না। কী করে পারবে? গোঁসাই বারে বারেই নামমদিরায় ঢলে ঢলে পড়ছে, সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ-সাত মিনিটের পথ চলতে তিন ঘণ্টা। পথ নিয়ে কথা নয়, পথের সম্বল নাম নিয়ে কথা।

সূত্রাপুর, ফরাসগঞ্জ, বাঙলাবাজার, পটুয়াটুলি, শাঁখারিবাজার আর লক্ষ্মীবাজার ঘুরে বিকেলের দিকে ফিরে এল একরামপুর। অন্ধ বাবাজি এবার নেচে-নেচে গান ধরল : 'নগর ভ্রমণ করে আমার গৌর এল ঘরে, আমার নিতাই এল ঘরে।'

কিন্তু আমাদের অশ্বিনীর এ কী অবস্থা হল? তার উপায় করে দিন।

চৌদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে অশ্বিনীকুমার মিত্র, জগন্নাথ স্কুলে পড়ে। কী তার মতি হল, ধুলট উৎসবে যোগ দিলে। সারাক্ষণ মেতে রইল ভাবাবেশে। এখন থেকে-থেকে সে রাস্তায় ছুটে যাচ্ছে, আর কেঁদে-কেঁদে একে-ওকে জিগগেস করছে, আমার কৃষ্ণ কই? আমার কৃষ্ণ কোথায় লুকোল? আমার কৃষ্ণকে এনে দে। নয়তো আমাকে কৃষ্ণের কাছে নিয়ে চল।

'কদ্দিন হয়েছে এ অবস্থা?'

'ছ সাত দিন হল, আপনার সেই কীর্তনে যোগ দেবার পর থেকে।' অশ্বিনীর আত্মীয়-অভিভাবকেরা সকাতরে অনুনয় করতে লাগল : 'এখন এর একটা বিহিত করুন।'

'আর কী ভাবান্তর হয়েছে?'

'একটা প্রাচীন ভাঙা মন্দিরের কাছে গিয়ে বসে আর সন্ধে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আপন মনে গান গায়। যত রাজ্যের শুক পাখি ছিল ও-এলেকায়, ওর সামনে বসে অনড় হয়ে গান শোনে।'

'আহা, কী সুন্দর ভাব।'

'এখন আপনি এ পাগলামির প্রতিকার না করে দিলে তো ছেলেটা বাঁচে না।'

'ভক্ত বৈষ্ণবদের মাঝে থাকলে এ ছেলেটির ভাবের আদর হত।' বললে গোঁসাই, 'যা হোক, এক কাজ করুন। কোনো যাজনিক ব্রাহ্মণকে নেমন্তন্ন করে এনে খাওয়ান আর তার ভুক্তাবশেষ ছেলেটিকে খাইয়ে দিন, তা হলে ছেলেটির ভাব ছুটে যাবে।'

যেমন বলা তেমনি করা। আর অমনি অশ্বিনী স্বাভাবিক হয়ে গেল।

আরো একটি ছেলের খবর এসেছিল গোঁসাইয়ের কাছে। আপনার সেই কীর্তন শুনে অবধি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। দশ-বারো ঘণ্টা হয়ে গেল, এখনো সংজ্ঞাশূন্য।

'চলো তাকে দেখে আসি।।'

গোঁসাই ছেলেটির বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল। স্পর্শ করল ছেলেটিকে। ছেলেটি চোখ চাইল। হাসল। উঠে বসল।

'শুধু কি আমরা কীর্তন করেছি?' গোঁসাই বললে, 'দেখলাম দলে-দলে দেবতারা আকাশ থেকে নেমে এসেছেন, আমাদের সঙ্গে তাঁরাও কীর্তন করছেন।'

একটি গৃহস্থবধূ এসেছে গোঁসাইয়ের কাছে। বললে, 'আপনি তো সবকিছু করতে পারেন, আমার অবস্থাটা খুলে দিন না।'

গোঁসাই মৃদু হাসল। বললে, 'সময় হলে হবে, অকালে কিছুই হয় না।'

'বেশ তো, সময়টাই পরিপূর্ণ করে দিন না।'

'তা হয় না। সময় তার নিজের নিয়মেই পরিপূর্ণ হবে।' বললে গোঁসাই, 'ডিম পাড়লেই ছানা বেরোয় না। পাখি আগে তাতে তা দেয়, অসময়ে ডিমে চঞ্চুর আঘাত করে না। ভগবানের কৃপাবলে পাখি ঠিক বোঝে কখন সময় হয়েছে, তখন চঞ্চুর আঘাত করে। তবেই বাচ্চা বেরোয় আর বেঁচে থাকে। সাধন সম্বন্ধেও তাই। সময় পরিপক্ব হলেই অবস্থা লাভ হয়, অসময়ে হয় না।'

শান্তিপুরের লালবিহারী বসু, বয়সে বালক, কিন্তু জাতিস্মর। আট বছর বয়সে ধর্মের তৃষ্ণায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। বহু বিচিত্র সাধু-সন্তের সঙ্গ করেছে। যে কাউকে অগ্রণী দেখেছে, হোক না সে বাবাজি সন্ন্যাসী বা ফকির-দরবেশ, সকলের কাছ থেকেই দীক্ষা নিয়েছে। যার যেমন উপদেশ, করেছে সাধন-ভজন। কঠোরে-কঠিনেও পেছপা হয়নি। কিন্তু কোথাও যেন সেই পরমা নির্বৃতিকে খুঁজে পায়নি। ঘুরতে-ঘুরতে শেষে চলে এসেছে বিজয়কৃষ্ণের কাছে। বিজয়কৃষ্ণ ইছাপুরায় চলেছে, সেখানেও লালবিহারী তার সঙ্গী।

ইছাপুরায় হরিচরণ চক্রবর্তীর বাড়িতে মহাপ্রভুর উৎসব। সেই উপলক্ষেই বিজয়ের আসা।

উঠোনের উত্তরপ্রান্তে মহাপ্রভু প্রতিষ্ঠিত। অঙ্গনে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে বিজয়। যুক্তকরে তৃষিত চোখে তাকিয়ে আছে। সহসা ভাবাবেশে

তার সর্বশরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। তাই দেখে সোল্লাসে কীর্তন সুরু করে দিল বৈষ্ণবেরা।

তালে-তালে কয়েকবার তুড়ি দিল বিজয়, তারপর কী হল কে জানে, লাফিয়ে উঠল, পাশে দাঁড়ানো লালবিহারীর হাত ধরে উদ্দন্ড নাচতে লাগল। ও মা, তারপর এ কী দৃশ্য! দুজনে মল্লের মতো যোদ্ধৃভাবে আস্ফালন করছে। একজন আরেকজনকে আক্রমণ করছে, আরেকজন হটে গিয়ে আবার ধাবমান হচ্ছে প্রতি-আক্রমণে। এমনি চলেছে দুর্দান্ত যুদ্ধনৃত্য। সঙ্গে-সঙ্গে উচ্চন্ড কীর্তন।

'কি শুনি কি শুনি সিংহরব রে নদীয়ায়।
জগা বলে মাধা ভাই, পালাবার আর স্থান নাই,
সংসার ঘেরিল হরিনাম রে (নদীয়ায়)!
শ্রীচৈতন্য মহারথী, নিত্যানন্দ সারথি,
শ্রীঅদ্বৈত যুদ্ধে আগুয়ায় রে (নদীয়ায়)!'

লালবিহারী বিজয়ের পায়ের কাছে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। কয়েকবার উচ্চে হরিধ্বনি করে গোঁসাইও সংজ্ঞাহীন।

হরিচরণ আর কুলদা একখানা কাপড় দিয়ে গোঁসাইয়ের পা দুখানি ঢেকে রাখল। যাতে ব্যাকুল জনতা না স্পর্শলালায়িত হয়ে গোঁসাইকে অসুস্থ করে ফেলে।

কিন্তু বিজয়ের বাসায় এ কে মুসলমান ফকির? গৌর-নিতাইয়ের গান গাইছে, গান গাইছে রাধাকৃষ্ণের। গুরুভক্তি, গুরুমাহাত্ম্যের কথা শোনাচ্ছে! সাঙ্কেতিক ফকিরি ভাষায় আলাপ করছে গোঁসাইয়ের সঙ্গে।

সকলে হতবাক।

যেমন অনাহূত এসেছিল তেমনি অযাচিত চলে গেল।

গোঁসাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। দেখ তো ফকিরসাহেব কোন দিকে যান।

কোন দিকে! সবাই দ্রুতচকিত বেরিয়ে এল রাস্তায়। এদিক ওদিক দু'দিকই খুঁজতে লাগল তীক্ষ্ন চোখে, ফকির নিরুদ্দেশ!

'একজন মহাপুরুষ এসেছিলেন।' বললে গোঁসাই।

তাতে আর সন্দেহ কী। ঘর থেকে বেরুতে-না-বেরুতেই স্থূলদেহে অদৃশ্য হয়ে গেলেন!

'কত মুসলমানই তো রাস্তা দিয়ে চলে যায়, এ-স্থানে এ-ভাবে কে আর আসে! শুধু আসে না, গৌর-নিতাই রাধাকৃষ্ণের গান গায়। দেখলে, সকল ধর্মের সকল উপাস্য দেবতাকেই কেমন অকৃত্রিম ভক্তি! আর গুরুতে কেমন নিষ্ঠা! কত মহাত্মা যে ছদ্মবেশে চলাফেরা করছে, এখানেও আসছে-বসছে তা কে বলবে। চিনতে হয়, মানুষ চিনতে হয়!

'মানুষ চেনবার উপায় কী?' এক ভক্ত জিগগেস করলে।

'মানুষ চেনবার উপায়,' বললে বিজয়কৃষ্ণ, 'নিজেকে ছোট আর অন্যকে

বড় মনে করা। নিজেকে অধম আর অন্যকে অধমতারণ বলে ভাবা। রাস্তায় মুটে-মজুরকেও মহাপুরুষ ভেবে নমস্কার করা। এরূপ ভঙ্গিতেই যথার্থ মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভ ঘটে।'

লালবিহারী একবার এক মসজিদের সামনের চত্বরে বসে ক'জন সতীর্থের সঙ্গে ধর্মালাপ করছিল, মসজিদের ইমাম তা শুনতে পেয়ে আপত্তি জানাল। স্পষ্ট উর্দুতে লালবিহারী বললে, 'ঈশ্বরের কথা তাঁর মন্দিরের সামনে বললে দোষ কী।'

ইমাম বললে, 'আমাদের কোরানে নিষেধ আছে।'

কোরানের আরবী আয়ৎ বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করল লালবিহারী, তারপর উর্দুতে ব্যাখ্যা করল : 'যে ঈশ্বর-অবিশ্বাসী নাস্তিক, কোরান তাকেই কাফের বলেছে, হিন্দুমাত্রকেই নয়।'

ইমাম মৌলভীকে ডেকে আনল।

একাধিক আরবী আয়ৎ আউড়ে গেল লালবিহারী। পার্শি টিকা উল্লেখ করল আর ব্যাখ্যা করল প্রাঞ্জল উর্দুতে। শুধু নাস্তিকেরাই কাফের পদবাচ্য। প্রতিমার মাধ্যমে হিন্দু তো ঈশ্বরকেই মানছে, ঈশ্বরকেই ডাকছে, তবে সে কাফের হয় কী করে? কোরান তাকে কাফের বলে না।

একটি হিন্দু বালকের কোরানে গভীর জ্ঞান দেখে মৌলভী বিস্ময় মানল। ভাবল ছদ্মবেশে এ পীর ছাড়া কেউ নয়। তাকে সেলাম করল, ইমামকেও বললে সেলাম করতে।

লালবিহারীর অনেক যোগৈশ্বর্য হয়েছে। ওসব নিয়ে নাড়াচাড়া করতে তার বিশেষ আগ্রহ। মন্দ কী, যদি একটু শক্তি-টক্তি দেখিয়ে লোককে তাক লাগিয়ে দেওয়া যায়!

কিন্তু বিজয়ের তাতে ঘোর আপত্তি। বললে, 'যার ভাণ্ডারে স্পর্শমণি আছে তার কেন ক্ষুদ্র কাঁচখণ্ডের প্রতি লোভ হবে?'

ঢাকার পূর্বাঞ্চলে গেণ্ডারিয়ার নির্জন প্রান্তে একটি আশ্রম তৈরি হল। উঠল একটি ছোট মাটির ঘর, 'ভজন কুটির', গোঁসাইয়ের নিসঙ্গ সাধনের জন্যে। আশ্রম বলতে দু'কুটুরির একটি বাসগৃহ, একটি রান্নাঘর, আরেকটি ভাঁড়ার ঘর। আর একটি আমগাছ। আশেপাশে জঙ্গলের জটিলতা।

সেই আশ্রমে এসে রয়েছে, গোঁসাই, তার সহধর্মিণী যোগমায়া, পুত্র যোগজীবন, কন্যা শান্তিসুধা আর প্রেমসখী, শিষ্য শ্যামাকান্ত ও নবকুমার আর লালবিহারী ও শ্রীধর ঘোষ। আর এক সর্পমূর্তি যোগীপুরুষ।

সেই সাপ কখনো আসনের নিচে বসে থাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে, কখনও মাথার উপর ফণা তুলে আনন্দ জানায়। অন্য কোনো সাপকে ঢুকতে দেয় না। কটা ইঁদুর যদি আসতে চায় তো আসুক কিচিমিচি করুক।

বিজয় সাপের জন্যে দুধ-কলা রাখে আর ইঁদুরের জন্যে রুটির টুকরো।

ভজন-কুটিরের উত্তর দেয়ালের বাইরের গায়ে গোঁসাই খড়ি দিয়ে নিজের

হাতে একটি নিশান আঁকল আর তার উপরে লিখল : ওঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ। আর ভিতরের দেয়ালের গায়ে লিখল সাতটি উপদেশ : (১) এইছা দিন নেহি রহেগা (২) আত্মপ্রশংসা করিও না (৩) পরনিন্দা করিও না (৪) অহিংসা পরমো ধর্মঃ (৫) শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর (৬) শাস্ত্র ও মহাজনদের আচরণের সহিত যাহা মিলিবে না তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর (৭) নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ।

যেদিন প্রথম আশ্রম-প্রবেশ হল সেদিন খোলে-করতালে কীর্তনে বিপুল উৎসব হল। এক ধামা বাতাসা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল গোঁসাই, পরে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে ছড়িয়ে দিল চারদিকে।

প্রকাশ্যে এই প্রথম হরির লুট গোঁসাইয়ের।

পরদিন আবার আশ্রম-সঞ্চার উৎসব হল। সেদিনও গৌরকীর্তন, নামগান, সেদিনও হরির লুট। হিন্দু ব্রাহ্ম বৈষ্ণব তো কতই এসেছে, এসেছে মুসলমান ফকির। তাই আনন্দ অধিকতর। আনন্দ অদ্ভুততর।

অনেক রাতে বাড়ি ফিরছে কুলদা, সঙ্গে ব্রাহ্ম গুরুভাই শ্যামাচরণ বক্সি। কুলদাকে শ্যামাচরণ বললে নিম্নস্বরে, 'আমি ব্রাহ্ম সমাজের লোক, তাই প্রকাশ্যে ঠাকুরের চরণামৃত নিতে সাহস পাই না। কিন্তু প্রত্যেক রাত্রে শোবার সময় মাথার কাছে একটি খালি বাটি রাখি আর মনে-মনে প্রার্থনা করি যেন তাতে তিনি চরণামৃত রেখে যান।'

কুলদা শ্যামাচরণের মুখের দিকে তাকাল। আশা করল শুনতে পাবে যে খালি বাটি খালিই থাকে।

'আশ্চর্য,' শ্যামাচরণ বললে তদ্গত হয়ে, 'প্রতিদিনই শেষ রাত্রে উঠে দেখি সে বাটিতে চরণামৃত। এক-আধ দিন নয়, প্রত্যহ।'

'আর কেউ জানে?' সন্দিগ্ধ সুরে প্রশ্ন করল কুলদা।

'আর কেউ জানেনা। এই প্রথম আপনাকে বললাম। আপনি যদি ইচ্ছে করেন দেখতে পারেন পরীক্ষা করে।'

'তার মানে খালি বাটি চরণামৃতে ভরে উঠবে?'

'নিশ্চয়ই উঠবে। একবার দেখুন না ওঠে কিনা। কী, দেখবেন পরখ করে?'

কুলদা গম্ভীর হয়ে বললে, 'যা কখনো হতে পারে না তার আবার পরখ করব কী?' ভাবল বক্সির নিশ্চয়ই মতিভ্রম হয়েছে, নয় তো আর কোনো রহস্য আছে অন্তরালে। আজগুবি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী?

বিষম অসুখে পড়েছে কুলদা। প্রায় মনোবিকারের অবস্থা।

কাউকে বলাও যায় না এ বিকারের প্রতিকার কী? মনে পড়ে একবার শ্যামাচরণ বলেছিল, গুরুর চরণামৃত নিলে শারীরিক ও মানসিক দুই বিকারেরই শান্তি হয়। একবার দেখি না, ধরি না গোঁসাইকে। ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষা তো কুলদা তাঁরই কাছে পেয়েছে।

মন্দ কি, গুরুর চরণামৃত রাখি না সংগ্রহ করে। বিদেশে বিভুঁয়ে কখন কী ভাবে গুরুসঙ্গবিচ্যুত হয়ে থাকতে হয় কে বলতে পারে। বিপাকে-উৎপাতে কখন বিপর্যস্ত হই তার ঠিক নেই। কার মধ্যে কী আছে কে জানে। গোঁয়ারের মত সব নস্যাৎ না করাই ভালো।

আশ্রমে এসে দেখল ঘরে বিস্তর লোক। গোঁসাইয়ের সঙ্গে একটু নির্জন হই কী করে?

মনের অনুক্ত অভিলাষটি শুনতে পেয়েছে গোঁসাই। বাইরে বেরিয়ে এসেছে। আর কথা নেই, নির্জনে ধরেছে কুলদা, প্রণাম করে পাদোদক গ্রহণ করেছে।

'আমার যেন গুরুতে, সত্যবস্তুতে নিষ্ঠা হয়।'

'নিশ্চয়ই হবে। শোনো,' গোঁসাই আরো সন্নিহিত হল : 'চরণামৃত গোপনে ব্যবহার করবে, তবেই ফল পাবে। লোকের সামনে কখনো নেবে না, আর কাউকে জানতেও দেবে না।'

না, কাউকে জানতেও দিই না কী ভাবে চলছে এ আশ্রম, কে চালাচ্ছে। কোনো নির্দিষ্ট আয় নেই, চাঁদার খাতা নেই, নেই বা দীক্ষান্তিক দক্ষিণা। তবু যে আসছে, সেই আহার করে যাচ্ছে। কোথাও কোনো অভাব ঘটছে না। না অন্নের, না আনন্দের।

দীক্ষার পর এক শিষ্য কটা টাকা দিতে চাইল গোঁসাইকে।

করজোড় করল গোঁসাই। বললে, 'আমি ক্ষুদ্র জীব, আমাতে সব দোষই সম্ভব। আমার কোনো ব্যবহারে এমন যদি কিছু প্রকাশ পেয়ে থাকে যে আমি যাঞ্চা করছি, তাহলে আমার ত্রুটি হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি অর্থের প্রত্যাশায় দীক্ষা দিই না। দীক্ষার বিনিময়ে যিনি টাকা দেন ও যিনি টাকা নেন, দুজনেই নরকস্থ হন।'

গুরুদত্ত মন্ত্রের কি কোনো দাম হয় যে টাকায় তার বেচাকেনা হবে?

আশ্রমে এসে কী দেখছ? কী শিখছ?

দেখছি, আশ্রমের সমস্ত কাজ ঘড়িধরা। চা খাওয়া থেকে সুরু করে পাঠ পুজো কীর্তন সাধন ভজন আহার—সমস্ত কাঁটায়-কাঁটায়। শিখছি সময়নিষ্ঠাই ধর্মের প্রথম পাঠ।

আশ্রমে নিত্য পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান। দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, প্রাণীযজ্ঞ আর মনুষ্যযজ্ঞ। দেবযজ্ঞ মানে উপাসনা, প্রার্থনা, হোম, পুজো, গুরুদত্ত নামসাধন। ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ মানে শাস্ত্রপাঠ সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ। পিতৃযজ্ঞ মানে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণ। প্রাণীযজ্ঞ বা ভূতযজ্ঞ মানে পশু-পাখিদের খাওয়ানো, বৃক্ষলতার জল দেওয়া। আর মনুষ্যমাত্রকেই যথাসাধ্য কিছু দান করার নামই মনুষ্যযজ্ঞ বা নৃযজ্ঞ। এক কথায় অতিথিসেবা।

দিন এইভাবে কাটিয়ে অপরাহ্নে সমবেত জিজ্ঞাসু লোকদের সঙ্গে ধর্মালাপ। তারপর সন্ধ্যায় কীর্তন। শোনো গোঁসাইয়ের কণ্ঠ কী অমৃত-

নির্ঝর!

'মন রে, সদাই হরিবোল, মধুর হরিনামের নাই তুলনা।
যদি বিষয়েতে সুখ হত রে, তবে লালাজি ফকির হত না ॥
নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে, তারে যমদূত ছুঁতে পেল না,
মধুর হরিনাম রে—
নামে জগাই-মাধাই তরে গেল রে! ভবে অপার নামের মহিমা।
হরিনামের গুণে রে
নামে রূপ-সনাতন ফকির হল রে, কি দিব নামের তুলনা ॥'

এক দিন সশিষ্য ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে উপস্থিত হল গোঁসাই। গোঁসাইকে দেখে আনন্দের ঢেউ পড়ে গেল। ভাবোচ্ছ্বাস কেউ রুখতে পারল না। মহোৎসাহে সুরু হল সংকীর্তন।

গোঁসাইয়ের সঙ্গে শ্রীধর এসেছে। শ্রীধর ঘোষ, ফরিদপুর জেলায় ভাঙ্গার কাছাকাছি সদরদি গ্রামে বাড়ি। সামান্য লেখাপড়া শিখে কিছুকাল পুলিসের চাকরি করেছিল। শিশুকাল থেকেই প্রবল ধর্মস্পৃহা, যুগের হাওয়ায় পড়ে ব্রাহ্ম হয়েছিল। কিন্তু মহতের আশ্রয় ছাড়া কোনো উপলব্ধিই স্থায়ী হবে না, তাই বেরুল গুরুর সন্ধানে। এল দক্ষিণেশ্বরে, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

'আমি সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেতে এখানে এসেছি, আমাকে দীক্ষা দিন।'

'সদগুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হলে সেই বিজয়ের কাছে যা।' বললেন রামকৃষ্ণ।

শ্রীধর সটান চলে এল ঢাকায়, প্রচারক-নিবাসে, গোঁসাইয়ের থেকে দীক্ষা নিল।

এখন ব্রাহ্ম সমাজে কীর্তনে উত্তাল মেতে গিয়ে শ্রীধর বলতে সুরু করল : 'ঐ দ্যাখ—ঐ দ্যাখ' বলে আকাশের দিকে হাত তুলে লাফাতে লাগল।

ব্রাহ্ম চন্ডীচরণ কুশারী খেপে গেল। শ্রীধরের সামনে এসে চিৎকার করতে লাগল : 'ঐ দ্যাখ, ঐ দ্যাখ কী করে? ব্রহ্ম জগৎময়, ব্রহ্ম জগৎময়।'

প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চাটুজ্জে বেদীতে উপাসনায় বসলেন। বললেন, 'উপাসনা সাকারই করো বা নিরাকারই করো, এই শুধু দেখবে ইষ্ট দেবতাকে যথার্থ ব্যাকুলতার সঙ্গে ডাকছ কিনা।'

এ উপদেশ শুনে ব্রাহ্মরা চটে গেল। ভাবল, গোঁসাই এসে ছুঁয়ে দিয়ে গিয়েছে।

যেমন পাগল শ্রীধর তেমন পাগল সতীশ। সতীশ মুখুজ্জে। ঢাকা বাঘিয়াগ্রামে বাড়ি, বি-এ পর্যন্ত পড়েছে। উপবীত ত্যাগ করে ব্রাহ্ম হয়েছে। পরে আবার দীক্ষা নিয়েছে গোঁসাইয়ের কাছে।

সাধন-ভজনেও দেহের কাম বশীভূত হচ্ছে না, সতীশের এই এক উদ্দাম যন্ত্রণা। সাধন-ভজনে উৎপাত থেকে নিষ্কৃতি তো ঘটলই না, বরং, সত্য কথা বলতে গেলে, উত্তেজনা আরো বেড়ে চলল। ঠিক করল, সাধন আর করব

না, যাব না গোঁসাইয়ের কাছে।

পাশের ঘর থেকে গোঁসাই হঠাৎ ডাকল সতীশকে। বললে, 'আমার মাথায় একটু তেল দিয়ে দাও তো।'

'না, তা আমি পারব না।' সতীশ স্পষ্ট স্বরে বললে।

'রাগ করছ কেন? আমার মাথা যে জ্বলে গেল।'

গোঁসাইয়ের কোনো কালেও মাথায় তেল দেওয়ার অভ্যেস নেই, তবু আজ এ কী আচরণ।

এক গণ্ডূষ তেল নিয়ে গোঁসাইয়ের মাথায় রগড়াতে লাগল সতীশ।

'দাও দাও, ভালো করে দাও, আমার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

থরথর করে কাঁপতে লাগল সতীশ।

'যতটা তেল আছে সবটা বেশ করে ধীরে-ধীরে বসিয়ে দাও।'

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখছে সতীশ। একে-একে সব অপসৃত হয়ে যাচ্ছে সমুখ দিয়ে। যে সব নারীমূর্তিকে এতদিন লোভনীয় মনে হত, এখন সবাইকে দেখাচ্ছে কী আতঙ্ককর। যে দৃশ্যে কামনা জাগত তাই এখন বিতৃষ্ণা জাগাচ্ছে। কোথায় রক্তমাংসের সমাহার, এ এক বিনগ্ন কঙ্কাল!

'সব তেলটা শুষেছে?'

'হ্যাঁ, শুষেছে।'

'তবে, যাও, এবার তোমার ছুটি।'

'যাব?' চমক ভাঙল সতীশের। তাকিয়ে দেখল গোঁসাইয়ের মাথায় এক বিন্দু তেল নেই। যেমন শুকনো ছিল তেমনি শুকনো। সতীশের সমস্ত যন্ত্রণা গোঁসাই নিজে মাথা পেতে টেনে নিয়েছে। শুষে নিয়েছে সমস্ত দুষ্কাম।

॥ ২০ ॥

শান্তিসুধার বিয়ে হল জগবন্ধু মৈত্রের সঙ্গে। আর জগবন্ধুর বোন বসন্ত-কুমারীর সঙ্গে বিয়ে হল যোগজীবনের।

এদের চেয়ে ঢের-ঢের ভালো পাত্র-পাত্রী জোটানো যেত। পরিবারের অনেকেই প্রতিবাদ করল। কিন্তু গোঁসাই নিজের নির্বাচনে নির্বিচল। জগবন্ধুর আগেই দীক্ষা হয়েছিল তার কাছে। জগবন্ধুর সমস্ত কিছুই তার জানা।

সবচেয়ে বড় কথা, গুরু পরমহংসজির আদেশ।

আর, জেনে রাখো, দুটো বিয়েই হবে ব্রাহ্মমতে রেজেষ্ট্রি করে।

'কেন, এখন আর অন্য মতে কেন?' ঢাকায় নামকরা উকিল ঈশ্বর ঘোষ আপত্তি করল। বললে, 'হিন্দু বিয়েতে ঋষিদের গন্ধ আছে, সুতরাং হিন্দু-

মতে হলেই ভালো।'

গোঁসাই বললে, 'না। ব্রাহ্মণের একটি সংস্কারও যোগজীবনের হয় নি। আর জগবন্ধু নানারকম অনাচার করেছে। এদের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া কঠিন, আর তার এখন সময় কই? কাজে কাজেই ব্রাহ্ম মতই প্রশস্ত।'

বিয়েতে অনেক সাধু সন্ত মহাপুরুষ এসেছে। এসেছে ব্রাহ্ম ভক্তের দল। আর এসেছে ধামরাই-এর অন্ধ সাধক পরশুরাম। 'আকাশগঙ্গা'-র রঘুদাস বাবাজি।

পরশুরাম জাতে তাঁতী, তেজারতি কারবার করে অবস্থা বড় করে ফেলেছে। আট ছেলে, সকলেই রোজগেরে। ছয় মেয়ে, প্রত্যেকেরই ভালো ঘরে বিয়ে হয়েছে। আর কী চাই। সুখে সৌভাগ্যে পরশুরাম গমগম করতে লাগল।

কিন্তু এমনই নিয়তির পরিহাস, সংসারে শোক দেখা দিল। অল্প সময়ের মধ্যে দেখতে-দেখতে আট-আটটা ছেলে মরে গেল একে-একে। ছটা মেয়ের মধ্যে পাঁচটাই পঞ্চত্ব পেল। আর যেটা বাকি রইল সেটা বিধবা হল। কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হল পরশুরাম। তাকে একা ফেলে স্ত্রী-ও পিটটান দিলে।

বিধবা কন্যাকে কাছে ডাকল পরশুরাম। বললে, আমার কাছে থাক।

সেই মেয়ে প্রাণপণ যত্নে বাপের সেবা করতে লাগল। দুর্বৃত্ত দেনদাররা ভাবল, বুড়োর সব টাকাই বুঝি মেয়েটা গ্রাস করবে। তাই সকলে তার উপর অকথ্য অত্যাচার চালাল। নিঃসহায় বিধবা আত্মহত্যা করল।

অন্ধের শেষ নড়িটাও ভেঙে গেল।

তবু, এততেও রেহাই নেই। পাপিষ্ঠেরা পরশুরামের ঘরে ডাকাতি করল। তার সিন্দুক ভেঙে সমস্ত দলিলপত্র খত-তমশুক নিয়ে গেল চুরি করে। নগদ টাকা যা ঘরে ছিল তার একটা কর্পদকও রেখে গেল না।

শূন্য ঘরে অন্ধ পরশুরাম হাহাকার করতে লাগল।

তার দুর্দশা দেখে প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণের দয়া হল। আশ্চর্য, দয়া বলে কোনো বস্তু আছে নাকি পৃথিবীতে! ব্রাহ্মণ বললে, আমার বাড়ি চলুন। আমি যদি দু-মুঠো খেতে পাই, আপনাকে দেব এক মুঠো।

পরশুরামকে ব্রাহ্মণ তার ঘরে নিয়ে এল। কিন্তু দুর্বৃত্তেরা শাসাতে লাগল ব্রাহ্মণকে : 'ঐ নির্বংশকে বাড়িতে স্থান দিলে আপনিও নির্বংশ হবেন। আর আপনার সঙ্গে আমাদের যদি সংস্রব ঘটে আমরাও নির্বংশ হব। ওকে এখুনি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিন, নইলে সবাই মিলে আপনাকে একঘরে করব।'

ব্রাহ্মণ বললে সব পরশুরামকে। পরশুরাম বললে, 'ঠিকই তো, আমার জন্যে আপনি কেন বিপন্ন হবেন? আমাকে আপনি মাধবের মন্দিরে রেখে আসুন।'

গ্রামের আরাধ্য দেবতা মাধব। তারই মন্দিরচত্বরের এককোণে ব্রাহ্মণ পরশুরামকে রেখে এল। যারা মাধবকে ভোগ দিতে আসে তারাই প্রসাদের কিছু অংশ দেয় পরশুরামকে আর তাই খেয়ে পরশুরামের দিন কাটে।

আর কী করে পরশুরাম? আর তো তার করবার কিছুই রাখেননি ঠাকুর। তাই সে দিবারাত্র 'মাধব' 'মাধব' জপ করে।

একদিন স্বয়ং মাধব তার সামনে এসে দাঁড়াল।

'পরশুরাম, আমাকে তুমি দেখবে?'

'কে তুমি?'

'আমি মাধব। যাকে তুমি অহর্নিশ ডাকছ সে।'

'তোমাকে বলিহারি!' বললে পরশুরাম, 'তোমাকে যে দেখব, আমার চোখ কই?'

'তুমি আমার দিকে মুখ তুলে তাকাও, দেখতে পাবে।'

নত মুখ ধীরে ধীরে তুলল পরশুরাম। এ কী, সত্যি যে সে দেখতে পাচ্ছে। শুধু মর্মচোখে নয়, চর্মচোখে। তার সামনে মন্দিরের বিগ্রহ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসছে।

সত্যি, না, স্বপ্ন দেখছে পরশুরাম?

পরশুরাম চোখ কচলাল। এখনো ঠিক দেখতে পাচ্ছে মাধবকে। দেখতে পাচ্ছে সমস্ত বস্তুতে মাধব।

আগে শুধু 'মাধব' 'মাধব' বলত, এখন বলতে লাগল, দয়াল মাধব, দয়াল মাধব।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে খুঁজতে খুঁজতে পরশুরাম গোঁসাইয়ের আশ্রমে এসে উপস্থিত হল। বললে, 'আমি এখানে থাকব।'

'কেন, এখানে কেন?' জিগগেস করল কুলদা।

'আজ্ঞে, জানতে পারলাম, মাধব গেণ্ডারিয়ায় আছেন।'

'গেণ্ডারিয়ায় আছেন! কই মাধব?'

আশি বছরের বুড়ো পরশুরাম হাসতে লাগল। বললে, 'ঐ যে আমার মাধব। আমার দয়াল মাধব।' বলে বিজয়কৃষ্ণকে দেখিয়ে দিল।

আর রঘুবর বাবাজি?

তার বিপরীত কাহিনী। তার কাহিনী সর্বার্পণ শরণাগতির নয়, তার কাহিনী অহঙ্কারের।

ফল্গুর অপর পারে রামগয়া পাহাড়ের নিচে বাবাজির এক গুরুভাই থাকে। মৃত্যুকালে গুরুভাই রঘুবরকে ডেকে পাঠাল। বললে, আমার স্ত্রী আর নাবালক ছেলে দুটিকে তুমি দেখো।

গুরুভাই মরে গেলে তার অনুরোধ ঠেলতে পারল না রঘুবর। দেখল দারুণ দুরবস্থার মধ্যে রেখে গেছে স্ত্রী-পুত্রকে। দু-বেলা দুটি অন্নের পর্যন্ত সংস্থান নেই। রঘুবরের দয়া হল। ভাবল, আমি ছাড়া কে ওদের

দেখবে?

প্রত্যহ দুবেলা নিজে রান্না করে রঘুবর। দুক্রোশ হেঁটে নিজে গিয়ে খাবার পোঁছে দিয়ে আসে। হায়রানির একশেষ। শেষে ভাবলে, ওদেরকে আশ্রমে নিয়ে আসি। এখানে থাকলে গরম গরম খেতে পায়। আমার পরিশ্রমটা কমে।

গুরুভাইয়ের স্ত্রী ও ছোট ছেলে দুটিকে আশ্রমে আশ্রয় দিল রঘুবর। আমি না হলে ওদের কে দেখবে! কে একটু সেবা স্নেহ করবে।

পাহাড়ে এসেই বড় ছেলেটি মারা গেল। ছোটটার প্রতি আরো আকৃষ্ট, আসক্ত হল রঘুবর। ভাবতে লাগল, ওর ভবিষ্যতে কী হবে! কে ওকে মানুষ করবে?

আগে কত শত টাকা প্রণামী পড়ত, স্ত্রীলোকটিকে আনা অবধি কম পড়তে লাগল। তেমন একটা ভাণ্ডারাও কেউ দেয় না।

সবাই উল্টা বুঝল। ভাবল, বাবাজি ছেলেটার জন্যে টাকা জমাচ্ছে। দানে-ধ্যানে তার আর মতিগতি নেই।

'ছেলে আর তার মাকে আশ্রমে রাখবেন না।' বাবাজির এক শিষ্য এসে বললে, 'শহরে কোনো বাড়িতে রেখে দিন। নইলে বিপদের সম্ভাবনা।'

'মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুর কাছে আমি প্রতিশ্রুত, যতদূর সাধ্য ওর স্ত্রী-পুত্রকে নিরাপদে রাখব।' বললে বাবাজি, 'তাতে যদি আমার কোনো বিপদও আসে, ভয় করব না।'

'লোকেরা বলাবলি করছে ওদের ভরণপোষণের জন্যে আপনি বিস্তর টাকা জমিয়েছেন। শেষে আশ্রমে না ডাকাত পড়ে।'

'পড়তে দাও। দেখি কার ঘাড়ে কটা মাথা।'

ক-দিন পরে সত্যি-সত্যিই আশ্রমে ডাকাত পড়ল। মার-মার রব তুলে সুরু করল লুটপাট। একটা লাঠি হাতে করে বার হল বাবাজি। দোহাত্তা পিটিয়ে ভাগিয়ে দিল ডাকাতদের।

ডাকাতেরা আরেক দিন চড়াও হল। এবার দলে আরো ভারী হয়ে। এবারও বাবাজি লাঠি ঘুরোতে ঘুরোতে সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। কিন্তু হঠাৎ লাঠির ঘা পাথরে পড়ে লাঠি দু-টুকরো হয়ে গেল। আর যায় কোথা! ডাকাতেরা পাকড়াও করল বাবাজিকে। মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলল। পায়ে একটা গামছা বেঁধে টেনে হিঁচড়ে পাহাড়ের উপর তুলল আর বুকের উপর একটা পাথর চাপা দিয়ে সরে পড়ল।

সকালবেলা শূন্য আশ্রম দেখে যাত্রীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল, বাবাজি কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে পেল তাকে পাথরের নিচে, অজ্ঞান, মুমূর্ষু। অনেকে মিলে পাথরটা সরিয়ে ফেলে বাবাজিকে এনে আশ্রমে, মহাবীরের কাছে ফেলে রাখল। ভাবল প্রাণ নেই। গেল পুলিশে খবর দিতে।

হাড়-পাঁজরা টুকরো-টুকরো, বাবাজি হঠাৎ গা-নাড়া দিয়ে মহাবীরের

উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ল। মাটিতে মাথা ঠুকতে-ঠুকতে বলল, 'জয় মহাবীর, জয় মহাবীর। যেমন অপরাধ করেছি তেমনি দণ্ড পেয়েছি। তুমি দয়াল, তুমি বড় দয়াল।'

পুলিশ-সাহেব এসে বাবাজির জবানবন্দি নিলে। ডাকাতদের মধ্যে কাউকে চেনেন?

'সবাইকেই চিনি।'

'নাম বলুন।'

'মাপ করবেন। যা শাস্তি দেবার ভগবানই দেবেন। আমি কেন আর স্পর্ধা করি?'

পুলিশ-সাহেব অনেক সাধাসাধি করল, বাবাজি মুখ খুলল না।

তারপর একদিন চলে গেল পাহাড় ছেড়ে।

পরের উপকার করতে গিয়ে, অহঙ্কারে, বাবাজির পতন হল। এখন মুষ্টিভিক্ষার জন্য দ্বারে-দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে সব অলৌকিক প্রভাবের লেশমাত্র আর অবশিষ্ট নেই।

যোগজীবনের বিয়েতে আচার্যের কাজ করলেন প্রচারক নগেন চাটুজ্জে। আর শান্তিসুধার বিয়েতে সমাজের সম্পাদক রজনী ঘোষ।

বিবাহ সভায় বক্তৃতা দিল গোঁসাই। যোগজীবনকে আদেশ করল এক বছর ব্রহ্মচর্য পালন করতে। শান্তিসুধাকেও নানা উপদেশ দিল।

'তুই রাজরাণী হতে চাস, না, আমাদের ফকিরি খাতায় নাম লেখাবি?' গোঁসাই জিগগেস করল মেয়েকে, 'ঠিক করে বল। যদি ঐশ্বর্য চাস আমি তোকে দেব অতুল বৈভব, কিন্তু তাতে তোর ধর্মলাভে দেরি হবে! আর যদি—'

সিদ্ধান্ত করতে এক মুহূর্ত দেরি হলনা শান্তির। বললে, 'ধর্মলাভে বিলম্ব আমার সহ্য হবে না। আমার ঐশ্বর্যে কাজ নেই। তুমি তোমাদের ফকিরি খাতাতেই আমার নাম লেখাও।'

মেয়ে কী বলে! এমন সাধা লক্ষ্মী কি কেউ পায়ে ঠেলে? উপস্থিত সকলে অবাক মানল।

কিন্তু গোঁসাইয়ের আনন্দ আর ধরে না। শান্তির সুধার মতই মেয়ের এ কথা। বললে, 'তাই হোক। ভোগৈশ্বর্য পেলেনা, পেলে ফকিরির সাম্রাজ্য।'

বিয়ের পরদিন সকালেই শ্রীকীর্তন সুরু হল। নামমদিরায় বিভোর হয়ে গোঁসাই নাচতে লাগল। কেন কে জানে, হঠাৎ সেখানে সহধর্মিণী যোগমায়া দেবী এসে উপস্থিত হল। কেন কে জানে, দাঁড়াল স্বামীর পাশ ঘেঁষে।

কে অমনি ধ্বনি তুলল : 'জয় রাধারাণী জয় ব্রজেন্দ্র নন্দন।'

ভাবে-প্রেমে দুজনেই সমাহিত।

চিন্তাহরণ মুখুজ্জে তখুনি গান ধরল:

ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়ে গোঁসাই রামপুরহাটে গেল।

উৎসবের আয়োজন হয়েছে, কিন্তু গোঁসাই অসুস্থ। সবাই বলাবলি করতে লাগল, নগেন চাটুজ্জে যদি এসময় আসত। বেশ তো, তাঁকে লেখ না আসতে। তাই লেখা হল—দয়া করে যদি আসেন।

উত্তরে নগেন জানাল, সে অক্ষম, তার এখন সময় হবে না।

'ভাবছ কেন?' বললে গোঁসাই, 'নগেন ঠিক আসবে।'

'কী করে আসবে? চিঠিতে জানিয়েছে তার পক্ষে আসা এখন অসম্ভব।'

'না, না, আমি যে দেখলাম হাওড়া স্টেশনে এসে ও ট্রেনের টিকিট কাটল!'

সবাই হেসে উঠল। কোথায় রামপুরহাট, কোথায় হাওড়া স্টেশন!

'ও ট্রেনে উঠল। এই ট্রেন ছেড়ে দিল।' তন্দগতের মত গোঁসাই বললে। কেউ কেউ গেল রেল-স্টেশনে, সত্যি কী ব্যাপার!

আর কী! ঠিক এসে গিয়েছে নগেন। বাক্স-বিছানা নিয়ে নামছে প্ল্যাটফর্মে।

'বা, এই যে লিখলেন, আসতে পারবেন না, অনেক কাজ পড়ে গিয়েছে, সময় নেই এক ফোঁটা—'

নগেন হাসল। বললে, 'কাজকর্ম হঠাৎ চুকে গেল, সময় এসে গেল হাতে—বেরিয়ে পড়লাম।'

'বেশ করেছেন। আমরা জানতাম আপনি আসবেন, তাই তো স্টেশনে এসেছি আপনাকে নিয়ে যেতে।'

'তাই দেখছি।'

রামপুরহাট থেকে বিজয় গেল শান্তিপুরে। কতদিন মাকে দেখিনি। দেখিনি বিরলবাহিনী নিরাবিলা গঙ্গাকে।

দুপুরে ভাগবত পড়ছে গোঁসাই, অন্যান্য শিষ্য-ভক্তের সঙ্গে মহেন্দ্র মিত্রও শুনছে। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে। দারুণ গ্রীষ্মে ঘামছে সর্বাঙ্গে। পাঠ বন্ধ করে গোঁসাই পাখা নিয়ে মহেন্দ্রকে হাওয়া করতে লাগল। ঘুমের পরম আরামে তলিয়ে গেল মহেন্দ্র। পাঠ বন্ধ, পাঠের চেয়েও মধুর এই ভক্তসেবা, এই শিষ্যস্নেহ।

জ্যোৎস্নারাতে ছাদে আসন করে বসেছে গোঁসাই। ধ্যান করছে। ভাইপো জগবন্ধু দেখল কোত্থেকে একটা সাপ এসে গোঁসাইয়ের মাথার উপর ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। কী সর্বনাশ। জগবন্ধু চেঁচাতে চেয়েও চেঁচাতে

পারল না। তাড়াতাড়ি চলে গেল কাকিমার কাছে। শিগগির আসুন, কাকার মাথার উপরে সাপ ফণা নাচাচ্ছে।

যোগমায়া এতটুকু বিচলিত হল না। বললে, 'ভয় নেই। কামড়াবে না, শুধু খেলা করবে।'

'খেলা করবে! বলেন কী, কত পোষা সাপ সাপুড়েকে পর্যন্ত কামড়ে দেয়।'

'ও দেবে না। ও হয়তো ওঁর গা জড়িয়ে শুয়ে থাকবে।' যোগমায়া আশ্বস্ত করল।

ক দিন পরে গোঁসাই চলে এল কলকাতা। সুকিয়া স্ট্রিটে ছোট একখানি দোতলা বাড়ি ভাড়া করে রইল।

খবর পেয়ে কুলদা দেখা করতে এল।

'এখন কোত্থেকে আসছ?' জিগগেস করল গোঁসাই।

'অযোধ্যা থেকে।'

বলে দিয়েছিল গোঁসাই, কাশী বৃন্দাবন অযোধ্যাদি তীর্থে মহাপুরুষেরা ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায়। তাদের চেনা শক্ত। হয়ত বেশবাস দেখে ভাবলে মুটে মজুর কিন্তু আসলে হয়তো সাধুসন্ত।

'কোন কোন সিদ্ধপুরুষকে দেখলে?'

কুলদা প্রথমে ল্যাঙ্গা বাবার কথা বললে। সরযূর ধারে ফয়জাবাদ ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছি এক নির্জন মাঠে আসন করেছেন। শীতে-গ্রীষ্মে বসে আছেন স্থির হয়ে। সরযূ থেকে ছোট একটা খাঁড়ি বেরিয়ে আসনকে বেষ্টন করে আবার সরযূতে গিয়ে পড়েছে। শীর্ণ-শুষ্ক খাল, হঠাৎ একবার জলোচ্ছ্বাস দেখা দিল। জল বাড়তে বাড়তে বাবাজির আসন প্রায় ধরো-ধরো হল। মায়ি, ইধর মত আও। খালকে উদ্দেশ করে বারে বারে বলতে লাগল বাবাজি। অবাধ্য খাল নিষেধ মানলনা, এগিয়ে চলল।

বাবাজি বিরক্ত হয়ে বললে, 'ক্যা? য়্যাসা! যাও, বন্ধ হো যাও।' খালের স্রোত পলকে বন্ধ হয়ে গেল। শুকিয়ে গেল আস্তে আস্তে।

মাঠে গোলন্দাজ সৈন্যেরা গোলাবাজি করবে, বাবাজিকে নোটিশ দেওয়া হল। সরে যাও। শুধু তোমাকে নয়, আশেপাশের সমস্ত গ্রামবাসীদেরই নোটিশ দেওয়া হয়েছে, দুচার দিন ফারাক থাকো, গুলি-গোলার চাঁদমারি হবে।

গ্রামবাসীরা যাক, আমি যাচ্ছি না। আমার আসন অচঞ্চল।

এই বাবা, হঠ যাও। এইখানে গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি হবে। মাথার খুলি উড়ে যাবে তোমার!

বাবাজি কথা কানেও তুলল না।

সে কী, আমাদের গোলাবাজি বন্ধ করে দেবে নাকি?

'নেহি, বাচ্চা, তু খেলা কর। হামরা আসন সিদ্ধ হ্যায়, ছোড়নে নেহি

সেকতে।' বাবাজি বললে শান্তস্বরে।

'মারা যাবে যে।'

'কুচ হোগা নেই। তু খেলা কর।'

অনেক ভয় দেখানো হল তবু বাবাজি নড়ল না। চূড়ান্ত নোটিশ পড়ল, যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাবাজি না সরে, কৃতকর্মের জন্যে সরকার দায়ী হবে না।

বাবাজি যেমন স্থির, তেমনি। হিমালয় নড়ুক, আমি নই।

চালাও গুলি-গোলা। দেখি কতক্ষণ ঠিক থাকে।

মাঠ ভরা আগুন, তার উত্তরে বাবাজির সামান্য ধুনি। মাঠময় এত চাঞ্চল্য, তার উত্তরে বাবাজির স্থিরাসনের দৃঢ়তা।

কর্ণেল ক্লি থেকে-থেকে দূরবীন দিয়ে দেখছে সাধু কী করছে, এখনো আস্ত আছে কিনা। না কি পালিয়েছে।

দেখল, বসেই আছে। শুধু বাঁ হাতটা ঢালের মত সামনে ধরা। যেন ঐ হাত দিয়েই সমস্ত গুলি-গোলা ঠেকাচ্ছে, কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না।

ক্লি তো স্তম্ভিত। এ যে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করা কঠিন।

'বাবাজির কাছে আশীর্বাদ চাইলে?' গোঁসাই জিগগেস করল।

'চাইলাম। তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, আরে, তোম তো ভগবানকি আশ্রয় লিয়া হ্যায়। তোমরা গুরুজি বহুৎ দয়াল, বহুৎ দয়াল। মালিক তো ওহি হ্যায়। বিশ্বাস-ভক্তি দেনেওয়ালা ওহি হ্যায়। পুরা বন যায়ে গা।'

'আর কাকে দেখলে?'

পতিতদাস বাবাজিকে দেখলাম। কথায় কথায় কাঁদেন, চারদিকে শুধু ভগবানের কৃপা দেখেন। তান্ত্রিক সাধক, অথচ মহাপ্রেমী। জিগগেস করলাম আমার কল্যাণ কিসে হবে? বাবাজি বললেন, 'সব তো পূরণ হো গিয়া। দুর্লভ সদগুরুকা আশ্রয় মিলা। ওহি কালাকো ধ্যান কর।'

আরো দেখলাম গোপালদাস বাবা, প্রায় দেড়শো বছর বয়েস, একটা অন্ধকার গোফার মধ্যে পড়ে আছে, কতকাল আছে কেউ বলতে পারে না। নমস্কার করে আশীর্বাদ চাইতেই করজোড়ে বললে, রামজি বড় দয়াল, উনহিকা নাম লেকে উনহিকা স্থানমে পড়া রহা হ্যায়। অব যো করে রামজি। বাচ্চা বহুৎ ভাগমে রামজিকা আশ্রয় পায়া। আব আনন্দ করো।

আর নামজপে নিমজ্জিত তুলসীদাসকে দেখলাম। হাতে মালা, কিন্তু মন যেন অন্য কোথাও নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে। কত লোক ভিড় করে বসেছে কিন্তু বাবাজির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা দেখতে এসেছে বাবাজিকে, নিস্তব্ধ নীরবতাকে। বাবাজি মাঝে মাঝে চমকে উঠছে আর স্নেহনেত্র নিক্ষেপ করছে। যেন সবাইকে বলছে, নামকে দেখ, নামের নিস্তরঙ্গ মহা-সমুদ্রকে দেখ।

শেষ সাধু যাকে দেখলাম সে অন্ধ। অগাধ পণ্ডিত, বহুশাস্ত্র কণ্ঠস্থ। কিন্তু শাস্ত্রে নয়, শ্রুতে নয়, মেধায় নয়, শুধু কঠোর সাধন আর তীব্র বৈরাগ্যেই খুলে যাবে অন্তশ্চক্ষু, সমস্ত কিছুকেই আবির্ভূত দেখতে পাবে—ইহকাল পরকাল, সর্বভুবন সর্বজ্যোতির্মণ্ডল।

কীর্তনীয়া রেবতীমোহন এসেছে। আর কথা নেই। গান ধরো।

রেবতী গান ধরল :

'তব শুভ সম্মিলনে প্রাণ জুড়াব, হৃদয়স্বামী,
কবে বসিব একান্তে প্রাণকান্ত তোমারে নিয়ে আমি।
মধুর বৃন্দাবনে গোপীজনগণসনে
তোমার নিত্যপদ সেবি কৃতার্থ হইব আমি।
হৃদয়ে ধরি শ্রীপদ বিপদ ঘুচাব হে
আমার পাপ-পরিতাপ যাবে, জুড়াব তাপিত প্রাণী ॥
অখিল লীলারসে ডুবাব মানস হে,
আমি সকলি ভুলিব, কেবল হৃদয়ে জাগিবে তুমি।
(আমার আঁধার ঘরের মাণিক হয়ে)
পিরীতির সেজ হৃদয়ে বিছাব হে
রসে মিশামিশি হয়ে, হব আমি-তুমি, তুমি-আমি ॥'

গোঁসাই চোখ বুজে শুনছিল তন্ময় হয়ে, হঠাৎ তার সর্বশরীরে পুলকের তরঙ্গ উঠল। উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ গৌর হয়ে গেল, মুখ অরুণাভ। উঠে দাঁড়াল, নাচতে লাগল ব্রজাঙ্গনার ভঙ্গিতে। গোঁসাইয়ের ভাবে সবাই মোহিত হয়ে গেল, কাঁদতে লাগল কেউ-কেউ।

দেখ দেখ প্রভুর দীর্ঘাকৃতি স্থূলতনু কেমন খর্ব ও লঘু হয়ে গিয়েছে, তিনি সুন্দরী গোপনারী হয়ে গিয়েছেন। শ্রীঅঙ্গের স্ত্রী-ভঙ্গিটি দেখ। কখনো ডান হাত কপালে রেখে লজ্জায় চোখ ঢাকছেন, কখনো বাঁ হাত কটিতে রেখে হেলছেন দুলছেন, কখনো কোঁচার খুঁটটি মাথায় তুলে দিয়ে ঘোমটা টানছেন। কখনো বা আঁচল থেকে তুলে-তুলে ধনরত্ন বিলিয়ে দিচ্ছেন এমন অভিনয় করছেন। স্পর্শমণির ছোঁয়া লেগে সবাই যেন সোনা হয়ে যাচ্ছে, আর এ যেন কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ি নয়, এ যেন বৃন্দাবন-বিলাস।

গিরিশ ঘোষ 'চৈতন্যলীলা' দেখতে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। সশিষ্য গোঁসাই তাই একদিন গেল স্টার-থিয়েটারে। প্রেক্ষাগৃহের প্রথম সারিতে বসল সকলে।

গান সুরু হল :

'কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ কাননচারী
মাধব মনমোহন, মোহনমুরলীধারী।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার।

ব্রজকিশোর কালিয়হর কাতরভয়ভঞ্জন
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা-হৃদি-রঞ্জন।
গোবর্ধন ধারণ, বনকুসুমভূষণ
দামোদর কংসদর্পহারী
শ্যামরাসরসবিহারী ॥
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার ॥'

গোঁসাই আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। 'জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন' বলে উদ্দণ্ড নৃত্য সুরু করে দিল। শিষ্যরাও হরিধ্বনি করতে লাগল। দর্শকদেরও কেউ কেউ যোগ দিল কীর্তনে।

'থেমে যাও, থেমে যাও, বসে পড়ো—' পিছনের দর্শকেরা কোলাহল করে উঠল।

কে কার কথা শোনে। রঙ্গমঞ্চ থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও প্রতি-ধ্বনিত হল : হরিবোল, হরিবোল! সমস্ত নাট্যালয় দেবমন্দির হয়ে উঠল।

এ যেন আরেক চৈতন্যলীলা। অভিনয় নয়, বাস্তব রূপায়ন।

অমৃত বোস বললে, 'বইয়েই পড়েছিলাম চারশো বছর আগে মহাপ্রভুর কীর্তন-তরঙ্গে ভারতবর্ষ প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। সেই তরঙ্গ কী, আজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। আমাদের রঙ্গভূমি দেবভূমিতে পরিণত হল।'

কিন্তু সংসারভূমি বড় কঠিন।

চার মাসের জন্যে বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, ফুরিয়ে গেল চার মাস। সস্তায় চলনসই একটা বাসা নাও। কোথায় বাসা? একটা খোলার ঘর পেলেও হয়। তাই দেখ না। শুধু একটু মাথা রাখবার মত জায়গা।

দারুণ অনটনে দিন যাচ্ছে। যোগমায়া শুচ্ছে ছেঁড়া মাদুরে, বাহুই তার উপাধান। আর গোঁসাইয়ের সম্বল একখানা মাত্র দিশি কম্বল। আর উপাধান বলতে চাদরে-মোড়া একটি শাস্ত্রগ্রন্থ।

ভক্ত-শিষ্য কুঞ্জ গুহ একটা বালিশ এনে দিল।

আরেক ভক্ত বৃন্দাবন বিদ্রূপ করে উঠল : 'উনি সন্ন্যাস নিয়েছেন আর তুমি ওঁকে ঘুমের আরামের জন্যে বালিশ দিচ্ছ। বেশ, তা হলে একখানা তোষকও এনে দাও—আর, আর একটা ছাতা—'

লজ্জায় মরে গেল কুঞ্জ। ভাবল গোঁসাই বুঝি ফেলে দেবে বালিশ। ভক্তের আকৃতি উপেক্ষা করবে। কিন্তু না, বৃন্দাবন যাই বলুক, শোবার সময় সেই বালিশ নিজের বালিশের নিচে টেনে নিল গোঁসাই। নিজের আরামের জন্যে নয়, ভক্তের আরামের জন্যে।

হঠাৎ একদিন সকালবেলা শ্রীধরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গোঁসাই। বললে, 'মায়ের অসুখ খুব বেড়েছে, আমি শান্তিপুর চললাম। তুমি বাড়িতে গিয়ে খবর দাও।'

শ্রীধর গিয়ে খবর দিতেই সকলেই অবাক হয়ে গেল। তবে মায়ের যখন

অসুখ তখন আমরাই বা এখানে থাকি কেন? যোগজীবনের সঙ্গে যোগমায়াও শান্তিপুর রওনা হল। সঙ্গে নিজের মা মুক্তকেশী চলল।

স্বর্ণময়ী তখন ভয়ঙ্কর উন্মাদ। মাঝে মাঝে শান্ত হন যখন বিজয়কে দেখেন। কিন্তু পাগলকে নিয়ে সংসারে অশান্তি দেখা দিল। ঘর-দোর নোংরা করে রাখে, কে তাড়াতাড়ি অত পরিষ্কার করে! গোঁসাই বললে, আমি সব পরিষ্কার করব। এই নিয়ে আবার গোলমাল।

হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে পড়ল গোঁসাই। স্ত্রীকে বললে, 'আমাকে আটটা টাকা দাও, আমি এখুনি কাশী চললাম।'

থ হয়ে গেল যোগমায়া। বললে, 'আমাকেও তা হলে সঙ্গে নাও।'

'টাকা দাও শিগগির, নইলে এই লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ট্রাঙ্ক ভেঙে ফেলব।' গোঁসাই উগ্রমূর্তি ধরল।

'খুলে নাও টাকা।' চাবি ফেলে দিল যোগমায়া : 'বেচারা ট্রাঙ্কটাকে ভেঙো না।'

টাকা নিয়ে একলা রানাঘাটের দিকে যাত্রা করল গোঁসাই। নদী পার হবার সময় পাটনির হাতে একটি টাকা দিয়ে বললে, 'একটু পরেই একটি বাবাজি আমার খোঁজ করতে এখানে আসবে। তাকে টাকাটি দিয়ে বোলো যেন সে কাশী যাবার বন্দোবস্ত করে। সেখানে গেলেই আমার সঙ্গে তার দেখা হবে।'

বাড়ি এসেই শ্রীধর শুনল কাশী যাবার নাম করে গোঁসাই বেরিয়ে পড়েছে। তখুনি খেয়াঘাটের দিকে ছুটল সে প্রাণপণে।

'আপনিই কি সেই বাবাজি?' পাটনি বললে তখন গোঁসাইয়ের কথা।

'হ্যাঁ, আমিই তার খোঁজ করছি—'

'তবে এই টাকাটি নিন, রানাঘাটে চলে যান।'

তা তো যাব কিন্তু এক টাকায় তো কাশী হবে না। আর কাশী না গিয়ে প্রভুছাড়া হয়ে থাকব কী করে?

রানাঘাট স্টেশনে যাত্রী-বোঝাই ট্রেন দাঁড়িয়ে। ছাড়ো-ছাড়ো অবস্থা! কিন্তু কোথায় গোঁসাই?

'এই যে, আমি কাশী যাচ্ছি।' ট্রেনের কামরার ভিতর থেকে গোঁসাই চেঁচিয়ে উঠেছে : 'তুমি কলকাতা চলে যাও। সেখান থেকে টাকা জোগাড় করে একেবারে কাশী। গেলেই আমার সঙ্গে সেখানে দেখা হবে।'

কাশীতে অগস্ত্য কুণ্ডের কাছে মানিকতলার মাতাজির ভাড়াটে বাড়িতে আস্তানা নিল গোঁসাই। আশে-পাশের বাঙালিবাবুরা, উকিল আর অধ্যাপক, তাকে নিয়ে উপহাস করতে লাগল। হিন্দু ছিল ব্রাহ্ম হল, পরে সন্ন্যাসী, এখন পরম বৈষ্ণব। সর্ব বাণিজ্যের ব্যাপারী এ আবার কেমনতরো সাধু?

কৃষ্ণানন্দ স্বামীর কাশীতে তখন খুব নামডাক। সবাই তাকে ধরল ধর্মসভা করে নতুন সন্ন্যাসীকে ডেকে আনা হোক। দেখি তত্ত্বকথা কী

বলে!

শরীর অসুস্থ, তবুও সভায় গেল গোঁসাই। তত্ত্বকথা পরে হবে, আগে কীর্তন হোক।

কীর্তন আরম্ভ হতেই গোঁসাই হরিনামের সিংহনাদ করে উঠল। সুরু করল উদ্দণ্ড নৃত্য। কিসের তত্ত্বকথা! মহাভাবের বন্যায় সমস্ত বাক্য-কাব্য ভেসে গেল। কিসের অস্বাস্থ্য। নামরসায়নে সর্ব ক্লেশকষ্টের আরোগ্য হয়ে গেল।

ভাবাবেশে মাটিতে আছড়ে পড়ল গোঁসাই। সমাধিতে ডুবে গেল।

স্বয়ং কৃষ্ণানন্দ এসে গোঁসাইয়ের পায়ের ধুলো নিল। দেখাদেখি বাঙালিবাবুরাও—উকিল আর অধ্যাপক।

বিশ্বনাথের আরতি দেখতে গিয়েছে গোঁসাই। কত সন্ন্যাসীই তো আসে, কেউ বিশেষ লক্ষ্য করেনি। কিন্তু হঠাৎ বোম-ভোলা বলে কে হুঙ্কার করে উঠল। সবাই তাকিয়ে দেখল সেই নিরীহ সাধুটি আরতির তালে-তালে নাচতে আরম্ভ করেছে। এমন নাচ কেউ কোনোদিন দেখেনি। নাচতে দাও, জায়গা দাও নাচতে। পাণ্ডারা নাচের অবাধ সুবিধে করে দিল, হটিয়ে দিল জনতা। আরো জোরে, আরো বেশি ভাব দিয়ে স্তব পড়ো, যত বেশি স্তবের আবেগ তত বেশি নাচের গৌরব।

ভাবাবেশে মূর্ছা হল গোঁসাইয়ের। তখন তাকে ছোঁবার জন্যে হুলস্থুল।

আরেকদিন আরতি দেখতে-দেখতে গোঁসাই বালকের মত কাঁদতে লাগল। প্রথমে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে, শেষে একেবারে তারস্বরে। চোখ হতে জল পিচকিরির ধারার মত দীর্ঘ রেখায় ছিটকে বিশ্বনাথের সামনে গিয়ে পড়ছে। এমন অদ্ভুত কান্না কেউ কোনোদিন দেখেনি। বৈষ্ণবগ্রন্থে পড়া গেছে এমন কাঁদতে জানত শুধু মহাপ্রভু। তবে এ কে নবীন সন্ন্যাসী? ছদ্মবেশে কে তবে এই মহাজন?

সমস্ত কাশী মেতে উঠল। বাঙালিটোলার বাবুরাও মারতে লাগল উঁকিঝুঁকি।

দুর্গাবাড়িতে ভাস্করানন্দ স্বামী আছে, গোঁসাই দেখা করতে গেল।

'ও দিকে যাবেন না।' চেলাচামুণ্ডাদের একজন বাধা দিল গোঁসাইকে : 'স্বামীজি এখন ধ্যানে আছেন।'

বেশ, যাব না—অদূরে একটা গাছের নিচে বসে পড়ল গোঁসাই। চোখ বুজল।

আরে, এও দেখি ধ্যান করে।

কতক্ষণ পরে ধ্যান ছেড়ে এগিয়ে এল ভাস্করানন্দ। আনন্দ হ্যায়, আনন্দ হ্যায়, বলতে বলতে গোঁসাইয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। যেই গোঁসাই প্রণাম করতে যাবে অমনি ভাস্করানন্দ তাকে বুকে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন

করে ধরল, দু-জনেই ডুবে গেল ভাবসমাধিতে।

তারপর চলো সাধু দ্বারকাপালের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি।

নির্জন বাগানে ছোট একটি কুটিরে বসে অহোরাত্র ভজন করে সাধু। কুটিরের দরজা বাইরে থেকে তালা-বন্ধ, লোকে যাতে বোঝে ঘরে কেউ নেই, থাকলেও এখন অনুপস্থিত। ছোট একটি জানলা আছে, সেটিই আগম-নির্গমের রাস্তা। সেটি বন্ধ থাকলেই একেবারে নিশ্ছিদ্র অব্যাহতি।

গোঁসাই কাউকে না পেয়ে দেয়ালে নিজের নাম-ঠিকানা লিখে রেখে এল।

পরদিন দ্বারকা নিজে এল গোঁসাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। এত বড় একটা পণ্ডিত সাধু, থুথুরো বুড়ো, সে এই সন্ন্যাসীর টানে তার অসঙ্গের গর্ত ছেড়ে এত দূর চলে এসেছে! উকিল-মাস্টারদের মাথা ঘুরে গেল। তা হলে এ গোঁসাই সামান্য নয়।

কাশী ছেড়ে এবার তবে অযোধ্যা।

'আচ্ছা, মাঠ্যকরুনের সঙ্গে ঝগড়া করেই কি আপনি শান্তিপুর ছাড়লেন?' কুলদানন্দ জিগগেস করলে।

'না, আমি নিজের ইচ্ছায় কিছু করিনি।' বললে গোঁসাই, 'আমাকে পরমহংসজি ডাক দিলেন। ঝগড়ার সময় বললেন, 'কাশী চলে যাও। কাশীতে যদি আমার দেখা না পাও তা হলে অযোধ্যায়। অযোধ্যায় দেখা না পেলে বৃন্দাবনে। সমস্ত আমার গুরুর ইঙ্গিতে।'

কার সঙ্গে ঝগড়া? যোগমায়া ছেলেকে নিয়ে চলে এসেছে কাশী। আর তুমি যদি অযোধ্যা যাও আমিও তোমার সঙ্গী হব।

ফয়জাবাদে এসেই ল্যাঙ্গা বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেল গোঁসাই।

আনন্দে বিহ্বল হয়ে বাবা বললে, 'এখানে এক রাত্রি থাকো।'

'কোথায় থাকব?'

'কেন, ছাপ্পরের মধ্যে।'

সরযূর অনাবৃত চড়াতে কতগুলি ভাঙা ছাপ্পর, দুদিকে দুটিমাত্র বেড়া, সামনে-পিছনে খোলা—চমৎকার ব্যবস্থা বটে। নিদারুণ শীত, সম্বল একখানি করে কম্বল। গোঁসাইয়ের সঙ্গী-সাথিরা পরস্পরের দিকে বিমর্ষ চোখে তাকিয়ে রইল।

'মোটা চালের ভাত আর রসুন দেওয়া ডাল খেতে দেব', ল্যাঙ্গা বাবা হাসল : 'কোনো কষ্ট হবে না।'

আশ্চর্য, কারু এতটুকু কষ্ট হল না। শীত কী বস্তু, তাই কেউ অনুভব করতে পেল না। ল্যাঙ্গা বাবা নিজের সাধনশক্তিতে সমস্ত উত্তপ্ত করে রেখেছেন।

'তাঁর কী সাধন?' কে একজন জিগগেস করল।

'শবসাধন।' বললে গোঁসাই, 'এসব সাধনপন্থীরা সাধারণত খুব উগ্র

হয়, কিন্তু ল্যাঙ্গ্যা বাবা খুব শান্ত।'

তারপর অযোধ্যায় এসে পৌঁছুতেই গোঁসাইয়ের উপর পরমহংসের আদেশ হল বৃন্দাবনে গিয়ে নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মত এক বৎসর বাস করো। লীলাতত্ত্ব না দেখে কখনো কোনোদিন আসন ছাড়বে না।

যোগমায়াকে বললে, যোগজীবনকে নিয়ে ঢাকায় ফিরে যাও।

পতিসেবা ছেড়ে দূরে সরে যেতে যোগমায়ার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কে জানে কেন আদেশ হয়েছে, ফিরে গেল ঢাকায়।

কিন্তু কত দিন থাকবে একাকিনী?

॥ ২২ ॥

বৃন্দাবনে গোপীনাথবাগে দাউজির মন্দিরে এসে উঠল গোঁসাই। সেখানে মিলল গৌরদাসের সঙ্গে।

কাটোয়ায় বাড়ি, পূর্বনাম গৌর শিরোমণি। স্মৃতি পুরাণ ষড়দর্শন নানা শাস্ত্রে কৃতবিদ্য। হঠাৎ কী হল, ভক্তির পথ ধরে চলে এল বৃন্দাবন।

কী হল?

কাটোয়ায় এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে ভাগবত পাঠ হচ্ছে। অনেক গণ্যমান্য পণ্ডিত শ্রোতাদের মধ্যে শিরোমণি বসে।

ভক্ত পাঠক পাঠের আগে গৌরবন্দনা পড়তে লাগল।

সর্বত্রই এই প্রথা, কিন্তু শিরোমণি চটে উঠল। প্রশ্ন করল : 'আপনার ভাগবতে এইসব লেখা আছে?'

'তার মানে?'

'তার মানে আপনার সামনে ভাগবত খোলা, আপনি তার দিকে চোখ রেখে পড়ছেন, মুখস্ত বলছেন না। তার মানে, ওসব আছে ভাগবতে?'

'আছে বৈকি।' বুকভরা সাহস নিয়ে বললে পাঠক।

'আছে? অনর্পিতচরীং আছে?' শিরোমণি আগুন হয়ে উঠল : 'মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পাননি?'

'বা, মিথ্যে বলতে যাব কেন?' ভক্ত পাঠক জোর দিয়ে বললে, 'আছে ভাগবতে।'

'কোন জায়গাটায় আছে একবার দেখান দেখি।' অনেককে নিয়ে শিরোমণি ঝুঁকে পড়ল ভাগবতের উপর।

গ্রন্থের প্রতি দুলাইনের মধ্যেকার ফাঁক দেখিয়ে পাঠক বললে, 'এই শাদা জায়গাটা দেখুন। এইখানেই তো—দেখছেন?'

'দেখছি।' শিরোমণি হেসে উঠল : 'এ তো শাদা জায়গা। এখানে গৌরবন্দনা কোথায়?'

'এই যে এখানে।' আবার শ্লোকের দুছত্রের মাঝেকার শূন্য জায়গা নির্দেশ করল পাঠক : 'এই যে।'

'এখানেও শাদা।'

'আপনার দৃষ্টিশক্তি নেই, কী করে দেখবেন?' পাঠক হতাশ মুখে বললে, 'দৃষ্টি পরিষ্কার করে আসুন। পরে দেখবেন।'

'শালগ্রাম সামনে রেখে ভাগবত স্পর্শ করে মিথ্যে কথা বলতে আপনার এতটুকু বাধল না? আপনি ব্রাহ্মণ?' শিরোমণি বিষিয়ে উঠল।

'আমি ব্রাহ্মণ তো বটেই, আর সত্যবাদী ব্রাহ্মণ।' পাঠকও সতেজে বললে, 'আপনি কোনো সিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মার কাছ থেকে দীক্ষা নিন, পরে আমি যে নিয়ম বলে দেব সেই নিয়মে এক সপ্তাহ চলুন। তারপর অষ্টম দিনে এখানে আসুন, তখন আপনাকে ঠিক দেখিয়ে দেব ভাগবতের প্রতি দুছত্রের ফাঁকে স্পষ্ট গৌরবন্দনা।'

'তখনো যদি দেখাতে না পারেন?'

'তখনো যদি দেখাতে না পারি তবে সকলের সামনে শপথ করছি, আমার জিভ কেটে ফেলব।'

'ঠিক মনে থাকে যেন।'

শিরোমণি মহা তেজস্বী লোক, তখুনি সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির কাছে গিয়ে দীক্ষা নিল। দীক্ষা নিয়ে এসে পাঠকঠাকুরের কাছ থেকে জেনে নিল নিয়মাবলী। নিয়মমাফিক চলল এক সপ্তাহ। পরে উপনীত হল যোদ্ধৃভঙ্গিতে।

'কী, এবার ভাগবতে গৌরবন্দনা দেখাতে পারবেন তো?

'নিশ্চয়ই পারব।' পাঠকঠাকুর ভাগবত মেলে ধরলেন : 'এবার দৃষ্টি করুন।'

এ কী, মুগ্ধ বিস্ময়ে নিষ্পলক চোখে শিরোমণি দেখল ভাগবতের শ্লোকের প্রতি দু ছত্রের মধ্যে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে গৌরবন্দনা লেখা রয়েছে।

মাটিতে আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল শিরোমণি। সর্বস্ব ছেড়ে পদব্রজে চলল বৃন্দাবনে।

সেই থেকেই ব্রজবাসী। নাম নিয়েছে গৌরদাস।

গৌরে-গোঁসাইয়ে ভীষণ ভাব। দুজনেই মহাপ্রেমিক। মহাবৈষ্ণব।

বৈষ্ণব তো, গোঁসাই ভেক ধরেনি কেন? আগে ব্রাহ্মসমাজে ছিল, এখন গৈরিক ধরেছে, দণ্ডকমণ্ডলু ধরেছে, জটা রেখেছে—এ কী অভিনয়! তার উপর গলায় তুলসী আর রুদ্রাক্ষ দু' রকমেরই মালা। আর কপালে ও কোন দেশী তিলক! গোঁড়া বৈষ্ণবসমাজ গোঁসাইয়ের উপর খেপে গেল।

গোঁসাই তাদের চাইল বোঝাতে। কিন্তু তারা বুঝতে রাজী নয়।

ভেক ধরতে হবে এমন কথা কোন শাস্ত্রে লিখেছে? আর গৈরিক বসন আর দণ্ড-কমণ্ডলু তো স্বয়ং মহাপ্রভুই ধরেছেন। তাঁর দ্বারা কি কোনো

অশাস্ত্রীয় কাজ সম্ভব? হরিভক্তিবিলাসেই তো আছে তুলসী আর রুদ্রাক্ষ একত্র ধারণ করা চলে। প্রভু নিত্যানন্দের গলায় তো ছিল রুদ্রাক্ষ। আর এ তিলক আমার সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতীক। এতে বিষ্ণুচক্র আছে, শিবশূল আছে, আছে খৃস্টক্রশ আর মহম্মদ অর্ধচন্দ্র। আমি বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের নই, আমি সকলের।

বন্ধু গৌরদাসের আপত্তি তিলক সম্পর্কে। আর কোনো কারণে নয়, নিছক নতুনত্বের কারণে। বললে 'আপনি যা বলবেন বা করবেন তাই লোকে শাস্ত্রসদাচার বলে মানবে, নির্বিচারে অনুসরণ করবে। তার ফলে আরেকটা সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে। আপনি দলসৃষ্টির বিরুদ্ধে, এই তিলকে আপনিই দলসৃষ্টি করে বসবেন। সুতরাং প্রার্থনা করি শাস্ত্রবিধিমতই তিলক ধারণ করুন।'

কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে। তাই গোঁসাই বললে, 'ভেবে দেখি।'

দামোদর পুজুরির কুঞ্জে আছে গোঁসাই, নিঃসঙ্গ নির্জন স্তব্ধ রাত্রি, অদ্বৈত আচার্য কজন সঙ্গী নিয়ে গোঁসাইয়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তোমার তিলককধারণের কোনো দরকার নেই। তবে যদি একান্তই ইচ্ছে হয়, আমি যেমন তিলক করেছি, চেয়ে দেখ আমার দিকে, তেমনি করে পরো।'

'দাড়ান, আপনার মতই তিলক করছি।'

ধুনির ভস্ম আর কমণ্ডলুর জল নিয়ে কপালে তিলক কাটল গোঁসাই। দেখুন ঠিক হয়েছে?

'ঠিক হয়েছে।' বলে অদ্বৈত সদলে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

সেই তিলক নিয়ে গৌরদাসের কাছে এসে হাজির হল গোঁসাই।

গৌরদাস তো অবাক। এ তিলক আপনি কোথায় পেলেন?

গোঁসাই বললে কী হয়েছিল। গৌরদাস ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। তবে আর কী! এই যথার্থ হয়েছে।

তবু গোঁড়া বৈষ্ণবের দল মানতে চায় না। গেরুয়া কেন, রুদ্রাক্ষ কেন, কেন দণ্ড-কমণ্ডলু। নিমাই-নিতাইয়ের ছিল বলে ওঁরও থাকবে—উনি কে? ঠিক হল গোঁসাইকে অপমান করা হবে। গোবরগোলা জল তার মাথায় ঢালবে।

ষড়যন্ত্রের নেতা গোবিন্দজিউর সেবায়েত। সে রাত্রে স্বপ্ন দেখল। দেখল এক প্রচণ্ড বরাহ তার বুকের উপর চড়ে বসেছে। গর্জন করে বলছে, 'তোদের এত বড় স্পর্ধা, তোরা গোঁসাইকে অপমান করবি? জানিস ও কে?'

'কে?'

'তোরা যে গোবিন্দজিকে পুজো করিস ও সেই গোবিন্দ।' বললে বরাহ, 'শিগগির যা, তার পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে নে, নইলে তোদের দুর্দশার অন্ত থাকবে না।'

বুকে দন্তচিহ্ন রেখে বরাহমূর্তি অদৃশ্য হল। ভয়ে কাঁপতে লাগল

সেবায়েত। ষড়যন্ত্রীরাও ম্লান হয়ে গেল। এখন উপায়? পায়ে পড়ে মুখে ক্ষমা চাইতে না পারো, গোঁসাইয়ের গলায় গোবিন্দের প্রসাদী মালা অর্পণ করো। আর বোঝো এই ক্ষমাবতার কে! কে এই দয়ানিধি!

পরদিন গোবিন্দমন্দিরে যাচ্ছে, গোঁসাইকে গোবিন্দের মালায় ভূষিত করল সেবায়েত।

মধুর মুখে হাসল গোঁসাই। কেন এ দৃশ্যান্তর কে বলবে।

গৌরদাস এসে বসল গোঁসাইয়ের কাছে। বললে 'আজ দয়া করে ক-জন বৈষ্ণব আমার কাছে এসেছিলেন—'

গৌরের মুখের দিকে উৎসুক চোখে তাকাল গোঁসাই।

'কোথায় শ্যামা পুজো হবে, জিগগেস করতে এসেছিলেন, সেখানে তাঁদের যোগদান করা সঙ্গত হবে কিনা।'

'আপনি কী বললেন?' গোঁসাই কৌতূহলী হল।

'বললাম হবে।'

'মানলেন তাঁরা?'

'বুঝিয়ে দিলাম। প্রশ্ন করলাম, আপনারা কার ভজনা করেন? কৃষ্ণচন্দ্রের। এই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় কী? গোপীর অনুগত হয়ে ভজনা। গোপীর অনুগতি! বেশ, ভালো কথা। গোপীরা কী করে কৃষ্ণকে পেয়েছিল? বনে গিয়ে কাত্যায়নীর পুজো করে। কী, তাই নয়? তাই যদি হয় তবে কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্যে বৈষ্ণবের শ্যামাপুজোয় বাধা নেই। বরং শ্যামাপুজো বৈষ্ণবের বিহিত পুজো।'

'ঠিক বলেছেন।' আশ্বস্ত হল গোঁসাই।

চলো এবার তবে কৃষ্ণকীর্তন নিয়ে নগরপরিভ্রমণে বেরোই। প্রেমাবেশে গগন-ভুবন প্লাবিত করি।

'হাড়াবাড়ি'র দিকে কীর্তন যাচ্ছে, গোঁসাই বিভোর হয়ে নাচছে। এ কী, সঙ্গে-সঙ্গে ঐ গাছটাও নাচছে! নাচছে মানে গোঁসাইয়ের তালের সঙ্গে তাল রেখে দোলাচ্ছে ডালপালাগুলো। ভালো করে তাকিয়ে দেখ, হয়তো কোনো বানরের কাণ্ড। না, না, বানর কী, কোথাও একটা পাখি পর্যন্ত নেই। গাছই নাচছে। শাখাগুলি একবার উঁচুতে তুলছে আবার নামাচ্ছে নিচুতে। একেবারে নিখুঁত ছন্দ, নিখুঁত ভঙ্গি। যেমনটি নেচেছিল ঝাড়িখণ্ডে, মহাপ্রভুর বৃন্দাবনযাত্রায়। ভাগবত বৃক্ষ বুঝি চিনতে পেরেছে গোঁসাইকে।

বৃন্দাবনে কুলদানন্দ এসেছে। তাকে নিয়ে গোঁসাই একদিন চলল কালীদহের দিকে। একটি প্রাচীন গাছের নিচে এসে বললে, 'এটি সেই কেলিদম্বের গাছ। [illegible] সময় এই গাছের থেকেই কৃষ্ণ যমুনায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। ভালো করে চেয়ে দেখ এই গাছে আপনা-আপনিই রাধাকৃষ্ণ নাম লেখা হয়ে রয়েছে।'

সকলেই দেখল গাছের গুঁড়িতে ও শাখা-প্রশাখার শত-শত নাম লেখা—

বাংলায় আর সংস্কৃতে।

'ছুরি দিয়ে কেটে কেটে পান্ডারা লেখে নি তো? সন্দেহের সুরে জিগগেস করল কুলদা।

'কিছু কিছু তারাও কোন না করেছে! সে তো দেখামাত্রই বোঝা যায়।' বললে গোঁসাই। 'কিন্তু স্বাভাবিক নাম ছিল বলেই তো তাদের করা। আর নকল করতে গিয়েই তারা মূল বস্তুতে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। পয়সা রোজগারের ফিকিরে এই অপচেষ্টা ঘোরতর অপরাধ।

'কোন লেখাটাকে আপনি স্বাভাবিক বলবেন?' কুলদা বললে, 'ছুরিতে কাটা অক্ষরও তো বেশিদিন জীবন্ত গাছে থাকলে স্বাভাবিকের মতই দেখাবে।'

'তা ঠিক। আচ্ছা এক কাজ করো।' গাছের আরো কাছাকাছি হল গোঁসাই। বললে, 'গাছের কতগুলো ছাল শুকিয়ে আলগা হয়ে ফুলে রয়েছে, তার মধ্যে লক্ষ্য করো। ওখানে তে আর ছুরি দিয়ে লেখা চলবে না।'

একটা আলগা ডাল টেনে ছিঁড়ে ফেলল কুলদা।

গোঁসাই যন্ত্রণায় শিউরে উঠল : 'উঃ, এ কী করলে।'

কী করল কে জানে, কুলদা ছালের ভিতরের দিকটা দেখল মনোযোগ করে। সন্দেহ কী, সেখানেও রাধাকৃষ্ণ লেখা। শুধু সেখানে কী, মগডালে যেখানে কেউ ছুরি চালাতে পারবে না, সেখানেও।

'কত দেবদেবী ঋষি মুনি বৈষ্ণব মহাপুরুষ বৃন্দাবনের ধুলো পাবার আশায় বৃক্ষলতা হয়ে আছেন। কিংবা আছেন বৃক্ষ আশ্রয় করে।'

এতদূর বিশ্বাস করবার অধিকার থাক বা নাই থাক, সকলের সঙ্গে ঠাকুরের সঙ্গে, কুলদা বৃক্ষকে প্রণাম করল।

'একদিন বেড়াতে-বেড়াতে যমুনাতীরে নির্জনে একটি বৃক্ষের নিচে গিয়ে বসেছি,' বললে গোঁসাই, 'সর সর করে একটা শব্দ আমার কানে আসতে লাগল। চেয়ে দেখি আমার সামনে একটা গাছ কাঁপছে। গাছের দিকে চেয়ে রইলাম একদৃষ্টে। এ কি, গাছ কোথায়? গাছ নেই, একটি পরম সুন্দর বৈষ্ণব মহাত্মা সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দ্বাদশাঙ্গে তিলক গলায় কন্ঠি তুলসীর মালা, হাতেও জপমাল্য। তিনি আমাকে তাঁর পরিচয় দিলেন, বললেন এখানে বৃক্ষরূপে আছি। বলে অন্তর্হিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে বৃক্ষ আবার প্রকাশিত হল।। কজন বৈষ্ণবকে বলতে গেলাম এ কথা, তারা বিশ্বাস তো করলই না বরং উপহাস করতে লাগল।'

'আর আপনার গৌরদাস?'

'তাঁকে গিয়ে বলতে তিনি বিশ্বাস তো করলেনই, রজে পড়ে গড়াগড়ি করে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, এসব কথা যাকে-তাকে বলবেন না, উপহাস করবে।'

'কিন্তু কেন, মহাত্মারা এখানে বৃক্ষরূপে থাকেন কেন?' ঝাঁকা করে জিগগেস করল কুলদা।

'বৃন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম। এখানে নিত্য লীলা হচ্ছে। সেই লীলা নিরুদ্বেগে দর্শন করবার জন্যে মহাপুরুষেরা বৃক্ষরূপ ধরে আছেন। বৃক্ষরূপেই ভজন করছেন আনন্দে।'

'সাধারণ লোকে তো তা জানেনা। তারা যদি বৃক্ষের উপর কোনো অত্যাচার করে বসে?'

'এই জন্যে তো ব্রজে বৃক্ষলতার উপরেও হিংসা নেই।'

'কিন্তু কেউ যদি অত্যাচার করে?'

'বৃক্ষের অনিষ্ট হয়। এমন কি বৃক্ষ মরে যায়।'

কাছেই একটি কুঞ্জে অনেকদিনের একটি সুন্দর নিম গাছ ছিল, কুঞ্জের বৈষ্ণব বাবাজি অগাধ যত্নে তার সেবা করতেন। ঘন পত্রপুঞ্জে কী শীতল স্নেহছায়া। হলে কী হবে, একদিন একটি যুবতী রজঃস্বলা অবস্থায় বৃক্ষটিকে আলিঙ্গন করে ধরল। রাত্রে বাবাজি স্বপ্ন দেখলেন, এক বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী তাকে বলছে, তোমার কুঞ্জে বৃক্ষ আশ্রয় করে এত কাল বেশ আরামে ছিলাম, কাল তোমাদের বৈষ্ণবী অশুচি কাম-কলঙ্কিত অবস্থায় বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরেছে, তাই আমার আর এখানে থাকা চলল না। আমি চললাম।

পরদিন সকালে উঠে বাবাজি দেখলেন—নিমগাছটি শুকিয়ে গিয়েছে। এতবড় সতেজ-সমৃদ্ধ গাছ ক্ষণকালের কামস্পর্শেই মারা গেল।

বৃন্দাবনেই মহাপ্রভুর সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ হল গোঁসাইয়ের। যমুনাতীরে একাকী বেড়াচ্ছে, গোঁসাই দেখল একজন উজ্জ্বলগৌর দীর্ঘকায় মহাপুরুষ মাটি থেকে আধ হাত উঁচু শূন্যের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন। গোঁসাই তার পরিচয় জানতে চাইল। মহাপুরুষ বললেন, 'আমি নিমাই পণ্ডিত।'

গোঁসাইয়ের মুখে কথা নেই, দুচোখে শুধু আকুল অশ্রুবর্ষণ।

সেই কথাই আবার গৌর দাসকে এসে বলছে। শুনে গৌর দাস কাঁদতে লাগল, বললে, 'আপনিই একমাত্র অধিকারী। আপনি ছাড়া আর কে দেখবে।'

কুঞ্জে এক বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী ছিল, তারাও শুনল।

'এ বলে কী? বৈষ্ণবী স্তম্ভিত হবার ভাব করল।

বৈষ্ণব বিদ্রূপ করে উঠল : 'এ সব বায়ুর কাজ।'

অবিশ্বাস করতে হয় করো কিন্তু বিদ্রূপ করা কেন?

বৈষ্ণবের শূলবেদনা দেখা দিল আর তিন দিনেই তার সকল যন্ত্রণার অবসান হয়ে গেল।

কৃষ্ণদাস এসেছে। রোজ আসে, তার অবারিত দ্বার। রাত্রে খাবার আগে গোঁসাই একখানা রুটি রেখে দেয়, সেইটে নেবার জন্যে সকালে আসে। গোঁসাইয়ের কাছে বসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

যদি রুটি দিতে দেরি হয় তা হলে তুমুল করে কৃষ্ণদাস। ঠাকুরের হাত-পা ধরে টানাটানি করে, কখনো কোলে কখনো একেবারে ঘাড়ের উপর

উঠে বসে। খাবার না পাওয়া পর্যন্ত গোঁসাইকে বসতে দেবে না আসনে।

গোঁসাইয়ের বড় আদুরে কৃষ্ণদাস। খুব শান্ত না হোক, ভারি চালাক-চতুর।

কৃষ্ণদাস না হয় ছোট বানর, একটা বুড়ো বানরও আছে। যেমন বিজ্ঞ তেমনি ভক্ত। যখন ভাগবত পাঠ হয় তখন গালে হাত রেখে শোনে আর গোঁসাইয়ের দিকে তাকায়। পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসন ছাড়ে না। পাঠের সময় যদি কেউ খাবার ছুঁড়ে দেয় তা ছোঁয় না, পাঠ শেষ হলে তবে তাতে মনোযোগ করে। অন্যান্য কুঞ্জে বানরদের কী উৎপাত কিন্তু বুড়োর ভয়ে এখানে কারু সাধ্য নেই কিছু গোলমাল করে। দেখতে বেশ বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায়। নিঃসন্দেহে দলপতি।

শত কাজ থাকলেও ভাগবত শোনা বন্ধ নেই বুড়োর। আর যে জায়গায় একবার বসেছে প্রত্যহ ঠিক সেই জায়গাটুকুতেই তার বসা চাই।

একদিন কোথাকার একটা বানর এসে আশ্রমের ঘটি নিয়ে উধাও হল।

গোঁসাই বুড়োকে সম্বোধন করে বললে, 'তোমার দলেরই হবে হয়তো, একটি এসে আমাদের ঘটিটা নিয়ে গেছে। সবার খুব অসুবিধে হচ্ছে। পারবে এনে দিতে?'

বুড়ো তখুনি গাছের ডালে উঠল, দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখতে লাগল। দু তিন লাফে একটা বাড়ির ছাদে গিয়ে পড়ল। সেখান থেকে কুড়িয়ে আনল ঘটি। যে বানর ঘটিটা নিয়েছিল সে তো বুড়োকে দেখে সাত যোজন দূরে।

গোঁসাই বুড়োকে লক্ষ্য করে বললে, 'ইনি কোনো বৈষ্ণব মহাত্মা। ব্রজবাস আকাঙ্ক্ষা করে বানরদেহ ধারণ করে আছেন।'

নারায়ণস্বামী গোস্বামী কেশীঘাটে থাকে, সিদ্ধ সাধু বলে খুব তার নামডাক। একদিন গোঁসাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে বললে, 'সাধন-ভজন করে কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন? আমার কাছে আসুন, আমি একদিনেই আপনাকে ভগবান দেখিয়ে দেব।'

'আমিও পাব দেখতে?' বিনয়লাবণ্যে বললে গোঁসাই।

'নিশ্চয়ই পাবেন। কেন পাবেন না? কাল সন্ধের সময় আসুন।'

পরদিন সন্ধ্যায় ঠিক গেল গোঁসাই। নারায়ণস্বামী একখানি আসন দেখিয়ে বললে, 'এখানে বসুন।'

বসল গোঁসাই।

'চোখ বন্ধ করুন।'

কতক্ষণ পরে নারায়ণস্বামী বললে, 'এবারে চোখ মেলুন। ভগবান প্রকাশিত হয়েছেন।'

গোঁসাই চোখ মেলে দেখল চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি দাঁড়িয়ে।

কিন্তু কই, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দেখে প্রাণে যেমন আনন্দ হয় তেমনি এখন

হচ্ছে না কেন? কেন প্রেমস্রোতে ভেসে যাচ্ছি না?

তারপর, এ কী, বিগ্রহ কাঁপছে কেন? বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে কেন?

'পুড়ে মরলাম, পুড়ে মরলাম।' বিগ্রহ আর্তনাদ করে উঠল : 'আমাকে এ কার কাছে নিয়ে এসেছিস? তার মন্ত্রতেজে পুড়ে মরলাম।'

নারায়ণস্বামী বিজয়কে ধমকে উঠল : 'আপনি ইষ্টমন্ত্র জপ করছেন নাকি?'

'আমি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ইষ্টমন্ত্র জপ করি, তা আমি বন্ধ করি কী করে?' বললে গোঁসাই, 'আর ইনি যদি ভগবানই হবেন তবে মন্ত্রকে তিনি ভয় করবেন কেন? ভগবানকে লাভ করবার জন্যেই তো মন্ত্র।'

নারায়ণস্বামী অধোমুখে বসে রইল।

'এসব ভৌতিক কাণ্ডে থেকো না।' বললে গোঁসাই, 'প্রতারণা কদিন চলবে? প্রেতকে বিষ্ণুমূর্তি ধরাতে শেখালে, কিন্তু সে মূর্তিতে শ্রীবৎসচিহ্ন কই? শোনো, প্রতারণা ছাড়ো, দিনরাত্রি নাম নাও।'

নারায়ণস্বামী ক্ষমা চাইল। বললে, 'আর করব না এ বুজরুকি। মার্জনা করুন আমাকে। কাউকে বলবেন না আমার এ পাপকথা।'

কিন্তু সেদিন সত্যি-সত্যি এক ভূত এসে ধরল গোঁসাইকে। যন্ত্রণায় ছটফট করে মরছি, আমাকে বাঁচান।

কোন পাপে আপনার এই দণ্ড?

মন্দিরে পূজারি ছিলাম। ঠাকুরের সব টাকা নিজে খেয়েছি, ঠাকুরকে দিইনি।

কী হলে আপনার শান্তি হবে?

আমার শ্রাদ্ধ হয়নি। আমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়ে দিন।

শ্রাদ্ধ হয়নি কেন?

আমার দেড় হাজার টাকা আমার ভাইপোর কাছে গচ্ছিত ছিল। সে সে টাকা ফুঁকে দিয়েছে। আমি মেরেছি ঠাকুরের টাকা, ও মারল আমার টাকা।

গোঁসাই বললে, 'আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনি শুধু নাম করুন। হ্যাঁ নাম, হরিনাম। হরিনামেই সমস্ত অরিষ্টের শান্তি। সমস্ত জ্বালার প্রশমন।'

॥ ২৩ ॥

আদৌ শ্রদ্ধা। সর্বপ্রথমেই শ্রদ্ধা, শাস্ত্রে ও সদাচারে বিশ্বাস। তারপরেই সাধুসঙ্গের অধিকার। সাধুসঙ্গ থেকে আকাঙ্ক্ষা জাগে আমিও অমনি জীবন লাভ করি। তখন শুরু হয় ভজনক্রিয়া। ভজনের ফলে অনর্থনিবৃত্তি,

সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার অবসান। সেই থেকে নিষ্ঠা রুচি ভক্তি। তার-পরেই ভাব। সর্বশেষে প্রেম।

প্রকৃত সাধুর লক্ষণ কী?

বলছেন বিজয়কৃষ্ণ, 'প্রকৃত সাধু কখনো আত্মপ্রশংসা করে না। পরনিন্দা করে না। কোনোরকম বুজরুকি দেখায় না। কারু বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে কথা বলে না। কাউকে নিজের মতে টানতে চেষ্টা করে না। সর্বদা ভগবানে নির্ভর করে থাকে। অনাহারে প্রাণ গেলেও কারু কাছে কিছু যাঞ্চা করে না। কায়মনোবাক্যে শাস্ত্র ও সদাচারের মর্যাদা রক্ষা করে চলে। সর্বজীবে দয়া করে, মানুষ পশুপাখি কীটপতঙ্গ তো বটেই, বৃক্ষলতার দুঃখেও সহানুভূতি করে, অন্যের সমস্ত অবস্থা নিজের বলে অনুভব করে, কারুরই উদ্বেগের কারণ হয় না। আর সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে, কখনো কোনো কারণে চঞ্চল হয় না।'

আশ্চর্য জায়গা এ বৃন্দাবন।

ময়ূর-ময়ূরী খেলা করছে, আনন্দে নাচছে পেখম মেলে। মানুষ দেখেও ভয় নেই এতটুকু। হরিণ তো একেবারে নিঃসঙ্কোচ, মানুষকে মানুষই মনে করে না। কেন অমন হবে না? বৃন্দাবনে যে হিংসা নেই। কোথাও একটা কাক দেখা যাচ্ছে না। আমিষ ভক্ষণ নেই বলে কাকও দেশান্তরী। সব গাছেরই ডালপাতা নিম্নমুখী। কোথাও পাতার শিরায় শিরায় দেবনাগরী অক্ষরে রাধাকৃষ্ণ লেখা। গাছের গায়ে কোথাও 'র', কোথাও বা 'কৃ' মাত্র হয়ে আছে, পরে ধীরে ধীরে পুরো নাম স্পষ্ট হবে।

আর পাখি দেখেছ? রাধাশ্যাম পাখি?

কোন উত্তর দেশ থেকে উড়ে আসে আর রাধাশ্যাম রাধাশ্যাম বলে ডাকে।

একবার এক ব্রজবাসী দুটো পাখি ধরল। একটা উড়ে গেল। অন্যটাও উড়ে যায় সেই ভয়ে সেটাকে খাঁচায় পুরল। ব্যস, সে পাখির আর ডাক নেই। চাঞ্চল্য নেই। খেতে দিলেও কিছু খায় না, চায় না মুখ তুলে। কী হল রাধাশ্যামের?

পরদিন সকালে ঝাঁকে-ঝাঁকে রাধাশ্যাম পাখি ব্রজবাসীর কুঞ্জে এসে হাজির। সমস্বরে তাদের ডাক শুধু রাধাশ্যাম, রাধাশ্যাম। সে আর কলস্বর নয়, আর্তনাদ।

পড়শিরা সবাই তিরস্কার করল ব্রজবাসীকে। রাধাশ্যামকে কখনো খাঁচায় পোরে? শিগগির ছেড়ে দাও, নইলে তোমার সর্বনাশ হবে।

ব্রজবাসী ভয় পেল। খুলে দিল খাঁচার দরজা। বন্দী পাখি মুক্তি পেল। নিমেষে বন্ধ হল কোলাহল।

পুলিশ সাহেব ঘোড়ায় চড়ে যমুনা পার হয়ে চলেছে বেলবাগের দিকে। মতলোব সেখানকার জঙ্গলে পাখি শিকার করবে। বৃন্দাবনে শিকার করা সরকারের বারণ, সেটা সাহেব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। বৃন্দাবনে কাউকে

আঘাত করতে নেই, গ্রামের লোক অনেক নিষেধ করল, কিন্তু একে ইংরেজ, তায় পুলিশ, সমস্ত উড়িয়ে দিল।

একটা বুনো শুয়োর দেখে ঘোড়া ভীষণ ঘাবড়ে গেল। সাহেবকে মাটিতে ফেলে দিয়ে চার পা তুলে ছুট দিলে। আর দেখতে হলনা, সাহেবকে শুয়োর টুকরো টুকরো করে ফেলল।

কেমন, তখন বলেছিলাম না? বৃন্দাবনে হিংসা করেছ কি মরেছ।

কুঞ্জের একটি গাছকে কুঞ্জের কর্তা কেটে ফেলবে ঠিক করল। কাঠের দরকার।

রাত্রে কর্তা স্বপ্ন দেখল একটি বৈষ্ণববেশধারী ব্রাহ্মণ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে, 'আমি তোমার কুঞ্জে ঐ বৃক্ষরূপে অনেকদিন ধরে আছি। শুধু বৃন্দাবনের রজলাভের জন্যে। তুমি গাছটাকে কেটে ফেললে আমি নিরাশ্রয় হয়ে যাব। আমার আর রজলাভ হবে না।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করি না।' স্বপ্নের মধ্যেই কর্ত্তা বললে।

'বেশ, তোমার বিশ্বাসের জন্যে কাল সকালে গাছের নিচে আমি একবার দাঁড়াব। ইচ্ছে করলেই আমাকে দেখতে পাবে।'

ঘুম ভাঙতেই কর্তা সেই গাছের কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল একটি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে আছে।

চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে চাইল না। ভাবল কে না কে দাঁড়িয়ে আছে।

যেমন সংকল্প করেছিল, গাছ কেটে ফেলল। দেখিনা কী হয়।

যারা স্বপ্নকে অমূলক ভেবে গাছের গায়ে কুড়ুল চালিয়েছিল তারা আগে মরল। পরে কয়েক দিনের মধ্যে একে-একে মরল কর্তার স্ত্রী পুত্র কন্যা। কর্তা দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত। কত আলোচনা কথকতা করত, হাবা হয়ে গেল।

'মশাই, দেশে থাকতে বৃন্দাবনের কত মাহাত্ম্যের কথা শুনেছি', এক বাঙালি ভদ্রলোক বললে এসে গোঁসাইকে, 'কিন্তু কই কিছুই তো দেখতে পেলাম না।'

'কী দেখতে পেলেন না?'

'রজের কত গুণ শুনেছিলাম, কিছুই তো বুঝতে পারলাম না।'

'আপনি একবার রজে পড়ে দেখুন দেখি।'

'এই তো পড়লাম।' ভদ্রলোক নিচু হয়ে রজে মাথা ঠেকাল : 'কই, কী হল? কিছুই হলনা।'

'গায়ের জামাটা খুলে ফেলুন দেখি।'

'খুলে ফেলব?' ভদ্রলোক দোনামনা করতে লাগল।

'হ্যাঁ, খুলে ফেলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে রজে একবার গড়াগড়ি দিন', গোঁসাই বললে, 'তারপর দেখুন কী হয়?'

'কী আবার হবে! কিছু হবে না।' ভদ্রলোক গায়ের জামা খুলে ফেলল। যা থাকে অদৃষ্টে, রজে লুটিয়ে পড়ল, গড়াগড়ি খেতে লাগল।

ও মা, কতক্ষণ পরেই ভদ্রলোক হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল। আমার এ কী হল? আমি তো ঘোর অবিশ্বাসী। আমার এ কী আনন্দ! আমার এ কী রোমাঞ্চ! আনন্দরোমাঞ্চ তো আমি কাঁদছি কেন? জয় রাধারাণীর জয়!

সতীশ মুখুজ্জে, জামালপুর স্কুলের শিক্ষক, উপবীত ত্যাগ করে ব্রাহ্ম হয়েছিল। বাপের মৃত্যু-সংবাদ শুনে বৃন্দাবনে এসে মিলল গোঁসাইয়ের সঙ্গে। ঝগড়া করতে লাগল।

গোঁসাই বললে, 'তোমার পিতার প্রেতাত্মা সর্বদা তোমার উপর রয়েছে, তাই এই অশান্তি।'

'কী করে এই অশান্তি যাবে?'

'শাস্ত্রমত শ্রাদ্ধ করলে যাবে।'

'শাস্ত্রমত করব কী করে? পৈতে কই?'

'আবার উপবীত গ্রহণ করো।' গোঁসাই বললে গম্ভীরস্বরে!

সতীশ হাসল। বললে, 'যা একবার ছেড়েছি তা আবার নিই কী করে?'

'না, নাও। উপবীতের অনেক গুণ।'

'বাজে কথা। যদি গুণই থাকত তবে আর তা ত্যাগ করা যেত না। গুণ ছিল না বলেই—'

'গুণ ছিল না যেহেতু তেমন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে পাওনি। তেমন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে পেলে আর ছাড়তে পারতে না।'

'ছাড়বার মালিক তো আমি, ব্রাহ্মণ কী করবে?' সতীশ আবার হাসল।

'বেশ, আমি তোমাকে দিচ্ছি', গোঁসাই হুঙ্কার করে উঠল : 'দেখি কেমন ওটা তুমি ত্যাগ করতে পারো।'

একটা পৈতে গোঁসাই নিজের হাতে করে সতীশকে পরিয়ে দিল। সতীশ তখুনি তা ছিঁড়তে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য, তার হাত বেঁকে গেল, উপবীত স্পর্শ করতে পারলনা। আবার চেষ্টা করল, আবার বেঁকে গেল হাত। এ কী দুর্বলতা! সতীশ সর্বশক্তিতে ধরতে গেল উপবীত, হাত অসহ্য ব্যথা করে উঠল, যন্ত্রণায় বেরিয়ে এল আর্তনাদ।

না, থাক। ছিঁড়ব না, ছাড়ব না। শ্রাদ্ধ করব।

আর যন্ত্রণা নেই। বুঝতে পারল সূত্রের মাহাত্ম্য। গোস্বামী-প্রভুর পায়ে প্রণত হল সতীশ। ঘোর দুঃস্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারেনি আর উপবীতত্যাগের কথা।

'আমাদের খুব কষ্ট।'

তোমরা কারা? গোঁসাই ফিরে তাকাল।

'আমরা কতগুলি প্রেতাত্মা। কিছুতেই আমরা মুক্তি পাচ্ছি না। আপনি

যদি দয়া করেন—' ছায়ামূর্তিগুলি গোঁসাইকে ঘিরে ধরল।

'আমি কী করতে পারি?'

'আপনি শুধু যমুনায় নামুন। আমরা জানি কিসে আমরা উদ্ধার পাব।'

যমুনায় নামতে আর দোষ কী। গোঁসাই যমুনায় ডুব দিয়ে সিক্ত গায়ে উঠে এল। প্রেতাত্মারা তার পাদোদক লেহন করল। সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের ঘুচে গেল প্রেতত্ব। জ্যোতির্ময় দেহ ধরে আকাশে অন্তর্হিত হল।

আরেকদিন যমুনায় স্নান করতে যাচ্ছে গোঁসাই দেখল চড়ায় একখণ্ড অস্থি পড়ে আছে। কুড়িয়ে নিয়ে দেখল অস্থির গায়ে 'হরে কৃষ্ণ' দেবনাগরী অক্ষরে আঁকা হয়ে আছে। সন্দেহ নেই, এই অস্থি কোনো এক উচ্চস্তরের মহাজন বৈষ্ণবের। সকলকে দেখাল গোঁসাই। দেখ কী অপূর্ব কীর্তি। শ্বাসে-প্রশ্বাসে এ মহাপুরুষের নাম অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই নাম রক্তে মিশে শিরায়-শিরায় প্রবিষ্ট হয়ে মেদ মাংস ভেদ করে অস্থি স্পর্শ করেছিল। দেখ নামের কী নিদারুণ শক্তি! শ্যামের নাম হাড়ে এসে বাসা বেঁধেছে।

বৈষ্ণবের দল কীর্তন লাগাল। অস্থিকে সমাধি দিল।

গোপীনাথজির মন্দিরে কীর্তন-মহোৎসব হচ্ছে, গোঁসাই নর্তনোন্মত্ত, দেখা গেল যোগজীবন ছুটে আসছে। আসছে দু হাত প্রসারিত করে গোঁসাইকে আলিঙ্গন করবার জন্যে। গোঁসাই উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি করে উঠল। যোগজীবন ভাবাবেশে মূর্ছিত হল।

ঢাকা থেকে চলে এসেছে যোগজীবন। একা নয়, সঙ্গে মা আর ছোট বোন কুতু, প্রেমসখী।

যোগমায়াকে দেখে গোঁসাই কি খুব প্রসন্ন নন? যোগমায়া চলে এলে গেণ্ডারিয়া আশ্রম কে দেখবে? শাশুড়ি ঠাকরুন অসুস্থ, যোগজীবনের স্ত্রী ছেলেমানুষ, এই অবস্থায় চলে আসা কি ঠিক হয়েছে?

তবু ব্রজপরিক্রমায় গোঁসাই যোগমায়াকে ডেকে নিল।

জন্মাষ্টমীর পরে দশমী তিথি থেকে পরিক্রমণ সুরু। বৃন্দাবন থেকে প্রথম এল মথুরায়। মথুরায় ভূতেশ্বর মহাদেব, জন্মস্থলী, ধ্রুবটিলা, বিশ্রামঘাট দেখল। পরদিন তালবন মধুবন কুমুদবন দেখে শান্তনুকুণ্ড। এইখানেই গঙ্গাদেবীকে আরাধনা করে শান্তনু ভীষ্মকে পেয়েছিল। জলাশয় ভরে পদ্ম ফুটে আছে, মাঝখানে উঁচু টিলা আর তার উপরে মন্দির। মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ। জীবন্তসদৃশ বিগ্রহ, দেখলেই মনে হয় এখুনিই কথা কয়ে উঠবে।

কে এক গোপাঙ্গনা ফল আর দধি-দুধ নিয়ে এসেছে। এ কার জন্যে? আর কার জন্যে! আমার কৃষ্ণ-রাখালের জন্যে। গোপবালা গোঁসাইকে স্বহস্তে খাইয়ে দেয়, কতক্ষণ ধরে পথ চেয়ে বসে আছি শূন্যমনে। মাঠে-মাঠে কোথায় খেলা করছিলি এতক্ষণ?

সেখান থেকে বেহুলাবন।

এক বৃদ্ধা গোঁসাইয়ের সঙ্গ ধরল।

'কে মা তুমি?' জিগগেস করল গোঁসাই।

'আমি শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্তা, তাহোক, আমি তোমার সঙ্গে ঘুরব।'

'তুমি যে মা খুব অসুস্থ, জরাজীর্ণ, কী করে হাঁটবে?'

'তুমি শুশ্রূষা করবে।' বৃদ্ধা সস্নেহে বললে, 'তুমি সঙ্গে থাকলে আমার আর ভয় কী।'

'চলো।'

বেহুলাবনে রাত কাটিয়ে চলল রাধাকুণ্ডের দিকে। জয় রাধে শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণপ্রাণবল্লভে।

পথে রাঢ়গ্রাম অতিক্রম করে প্রথমে সূর্যকুণ্ডে উপস্থিত হল। অদ্বৈত আচার্য ভারতবর্ষের চারধাম ঘুরে এই কুণ্ডে এসে বিশ্রাম করেছিলেন। তাঁর বংশধর বিজয়কৃষ্ণ এই কুণ্ডে স্নান করে তীরে বসে স্মরণ করল পূর্বকথা। সেখান থেকে দ্বিপ্রহরে রাধাকুণ্ডে এসে পেঁাছুল। রাধাকুণ্ডে ও শ্যামকুণ্ডে দুকুণ্ডেই স্নান করল নতুন করে। প্রদক্ষিণ করল। দেখল রঘুনাথের ভজন-কুটির। আর এই দেখ কবিরাজ গোস্বামীর কুঞ্জ, এইখানে বসেই তিনি চৈতন্যচরিতামৃত লিখেছিলেন।

তারপর সদলে গিরিগোবর্ধন চলে এল। দলছাড়া হয়ে একা হয়ে গেল গোঁসাই। হঠাৎ পর্বতের নির্জনে একটা গোফার কাছে এসে দেখল একটা কঙ্কাল তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এগিয়ে গেল গোঁসাই। দেখল কঙ্কালের চোখ দুটো জ্বলছে আর মুখগহ্বরে জিভ নড়ছে। এ কী রকম কঙ্কাল! কঙ্কাল তো চোখ আর জিভ জীবন্ত কেন?

কঙ্কাল কথা কয়ে উঠল। বললে, চোখ রেখেছি রূপ দেখতে, লীলা দেখতে, আর জিভ রেখেছি হরিনাম করতে।'

'কত কাল আছেন এমনি?' জিগগেস করল গোঁসাই।

'চারশো বছরেরও বেশি।' বললে কঙ্কাল, 'মহাপ্রভুকে দেখেছি, নিত্যা-নন্দকে দেখেছি। দেখেছি অদ্বৈতকে, হরিদাসকে। গৌরাঙ্গলীলাদর্শনের পর আরেক অবতারলীলা দেখবার আশায় বসে আছি।' বলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল গোঁসাইকে।

বছরের মধ্যে একদিন একবার সেই কঙ্কাল উচ্চঘোষে হরিবোল বলে ওঠে—সে ধ্বনি সাত-আট মাইল দূর থেকে শোনা যায়।

দলের সঙ্গে এসে মিলল বিজয়কৃষ্ণ। গোবর্ধন প্রদক্ষিণ করতে বেরুল। পথিমধ্যে 'দাউজি'র পদাঙ্ক দেখল। কেউ কেউ বললে শিশু বলরামের পদচিহ্ন এত প্রকাণ্ড হয় কী করে? গোঁসাই বললে, না, এ গৌরপদচিহ্ন। হ্যাঁ, পাষাণের বুকেও পা রাখতে কুণ্ঠা করেন নি গৌরহরি। নীলাচলে জগন্নাথমন্দিরেও তাঁর পদচিহ্ন পাবে। আর দানঘাটে এই যে দেখছ প্রস্তর-খণ্ড, এইখানে শ্রীকৃষ্ণ বসেছিল আর তাই ধরে কত কেঁদেছিলেন মহাপ্রভু।

এখন আবার কাঁদতে বসল বিজয়কৃষ্ণ।

সেখান থেকে বলদেবকুণ্ড হয়ে গোবিন্দকুণ্ড। এই গোবিন্দকুণ্ডেই মাধবেন্দ্র পুরী গোপালদেবের মন্দির স্থাপন করেছেন। নিকটেই তাঁর সমাধি। কাছাকাছি এক মন্দিরে রাধিকাপ্রসাদ দাস নামে এক বৈষ্ণব মহাজন বাস করছেন। গোবর্ধনে একাসনে চল্লিশ বছর সাধন করে সিদ্ধ হয়েছেন! গোঁসাইকে দেখেই সানন্দে বলে উঠলেন, 'আমাকে কৃপা করে একবার দর্শন দিলেন, আরো একবার দেবেন। সেই আশায় দেহ ধরব।'

কী এক অপূর্ব দর্শন হল গোঁসাইয়ের। রজে লুণ্ঠিত হল। কতক্ষণ পরে দেখল লোকসমাগম হচ্ছে। ভাব সম্বরণ করে উঠে পড়ল।

গোবর্ধন পরিক্রমা শেষ করে দেখতে চলল মানসী গঙ্গা। সেখান থেকে যশোদাকুণ্ডু, হরদেবজি, গুলালকুণ্ড, সাক্ষীগোপাল আর রূপসরোবর। শেষে অলকাগঙ্গা।

অলকাগঙ্গায় যোগমায়া দেখতে পেল এক বৃহৎকায় হনুমান যাত্রীদের সঙ্গে ঘুরছে।

'ইনি কে?' জিজ্ঞেস করল গোঁসাইকে।

'ইনি মহাবীর। অলক্ষ্যে যাত্রীদের রক্ষক হয়ে চলেছেন। যার অন্তশ্চক্ষু খুলে গেছে সেই শুধু দেখতে পায় তাঁকে।'

সেখান থেকে আদিবদ্রী হয়ে কাম্যবনে গেল সকলে। কাম্যবন থেকে বিমলাকুণ্ড, লুকলুকিকুণ্ড। লুকলুকিকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলত। সেখান থেকে লঙ্কাকুণ্ড হয়ে চরণপাহাড়ী।

চরণপাহাড়ীতে পাথরে গরু বাছুর মানুষের অসংখ্য পদচিহ্ন। ত্রিজগন্মানসাকর্ষী শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে প্রগাঢ় প্রেমে পাহাড় দ্রবীভূত হত, আর যারা তখন পাহাড়ে থাকত তাদের পায়ের চিহ্ন বসে যেত পাথরে। তখন আর পাথর কোথায়, তখন মোম। বাঁশি নীরব হলে গলা মোম আবার শক্ত পাথর হয়ে উঠত, কাঁচা পায়ের দাগ পাকা হয়ে যেত। দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এ সব পদচিহ্ন মানুষের খোদা নয়। কতগুলি পদচিহ্নে স্পষ্ট ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ। সন্দেহ কী, সেগুলি বৃন্দাবনচন্দ্রের। গোঁসাই পদচিহ্নগুলি পরীক্ষা করে দেখছে আর যেখানেই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পাচ্ছে পড়ে পড়ে প্রণাম করছে। আর কাঁদছে। কী আনন্দ এই প্রণামে, এই প্রেমে, এই প্রেমাশ্রুতে।

সেখান থেকে চলো যাই কদমখণ্ডী। দোনা বা ঠোঙার গাছ দেখে আসি। একবার বন্ধুদের নিয়ে খেলতে-খেলতে বৃন্দাবনবিহারী তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিল।' কদমগাছের কাছে প্রার্থনা করেছিল, দুধ খাব, পানপাত্র পাঠাও। বলতে বলতে গাছের অনেক পাতা নিজের থেকে সঙ্কুচিত হয়ে দোনা বা ঠোঙার আকার ধারণ করল। দুধ খাওয়া হয়ে গেলে গাছের পাতা আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল।

খুঁজে-খুঁজে সকলে হয়রান, দোনার গাছ কই? একটা কদম গাছকে

প্রণাম করে সবাই প্রার্থনা করল, সেই গাছ দেখাও। অমনি সেই গাছে পাতায়-পাতায় দোনা বা ঠোঙা ফুটে উঠল।

চলে এল মানগড়ে। সেখানে সারি-সারি অনেক নূপুরের গাছ। যশোদা-দুলালের ইচ্ছে হল ব্রজবালকদের সঙ্গে নাচে, কিন্তু নূপুর কই? বৃক্ষকে বললে, নূপুর ফোটাও। বকফুলের ছড়ার মত ছড়া বের হল বৃন্ত থেকে, ছড়ার অগ্র ও অন্তভাগ জুড়ে গেল মুখোমুখি। ভিতরের বীজগুলো পেকে আলগা হয়ে খসে পড়ল ভিতরে আর হাওয়ার দোলায় বাজতে লাগল ঝুমুর-ঝুমুর। স্বভাবশিশুদের ঐ স্বভাবনূপুর।

তখন থেকে একটা ময়ূর সঙ্গ নিয়েছে। গোঁসাই যদি কোথাও বসে, শিখী নৃত্য করে। যদি চলে শিখীও পিছু ধরে। গোঁসাইয়ের মনোরঞ্জন করবার জন্যেই তার আসা। বহুদূর এসে পরে সে অদৃশ্য হল—সে ময়ূর না কে, আর দেখা হল না।

চলে এল নন্দঘাট, রামঘাট, বলরামকুণ্ড, পাণিগ্রাম। অবশেষে ভাণ্ডীর-বন। সেখানে পেঁাছে গোঁসাই হঠাৎ 'শ্রীদাম' 'শ্রীদাম' বলে চেঁচিয়ে উঠল। 'আমি আছি' 'আমি আছি' উঠল এই প্রতিধ্বনি। কিছুই হারায়নি, সবাই আছি, সব কিছুই আছে।

সেইখান থেকে লোহবন। লোহবন থেকে নন্দের রাজধানী মহাবন। মহাবনে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে ব্রহ্মাণ্ডঘাট। এই ব্রহ্মাণ্ডঘাটেই শ্রীকৃষ্ণ মা-যশোদাকে মুখমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়েছিল। তারপর দধিমন্থনের স্থান দেখল, সেখান থেকে যমলার্জুন হয়ে চলে এল নতুন গোকুলে। তারপর যমুনা পার হয়ে আবার মথুরা।

দ্বাদশী তিথিতে গোঁসাই আবার বেরুল। এবার ব্রজমণ্ডল নয়, এবার শুধু বৃন্দাবন পরিক্রমা। কেশীঘাট, জ্ঞানগোখুরী, রাধাবাগ হয়ে রাজঘাটে উপস্থিত হল। পরে ক্রমে ক্রমে দাবানলকুণ্ড, কালীয় হ্রদ, কিশোরঘাট, শৃঙ্গারঘাট। শৃঙ্গারঘাটে প্রভু নিত্যানন্দ বিগ্রহ দর্শন করল। সেখান থেকে বস্ত্রহরণ ঘাট, গোবিন্দঘাট ও ভ্রমরঘাট দেখে কেশীঘাটে ফিরে এল।

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে বিজয়কৃষ্ণ যোগমায়াকে বললে, 'তুমি এবার ঢাকায় ফিরে যাও।'

'তা কী করে হয়? স্বামীই স্ত্রীর চরম আশ্রয়, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব?' যোগমায়া দৃঢ় হল।

'তবে আলাদা বাড়িতে গিয়ে থাকো। আমার কাছে তোমার থাকা হবে না।'

'না, না, আমি তোমার কাছেই থাকব।'

'আমি যে আশ্রম নিয়েছি তুমি আমার সঙ্গে থাকলে সে আশ্রমের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। এ কুঞ্জে তোমার স্থান নেই।' বিজয়কৃষ্ণ কঠিন হল : 'তবু যদি তুমি জেদ করো, আমি অন্যত্র চলে যাব, উত্তরকুরুতে চলে যাব।'

যোগমায়া স্তব্ধ হয়ে গেল। আলাদা একটা ঘরে রাত কাটাল। যোগজীবনকে বললে, যত শিগগির সম্ভব তুই কুতুকে নিয়ে ঢাকায় চলে যা।

ভোর হতে যোগমায়া নিরুদ্দেশ।

কোথায় আর যাবে, যমুনায় স্নান করতে গিয়েছে হয়তো। যোগজীবন শ্রীধর সতীশ কুলদা কত ঘাটে-অঘাটে খোঁজাখুঁজি করল, সন্ধান পেলনা। দিন গিয়ে সন্ধ্যা হয়ে এল তবু ফিরলনা যোগমায়া।

সন্ধ্যায় 'হরিবংশ' পাঠ করতে বসেছে কুলদা, পুঁথির মধ্যে দেখতে পেল একটা চিরকুট। তাতে যোগমায়ার নিজের হাতে লেখা : 'আমি চললাম, আমার কেউ অনুসন্ধান কোরো না।'

'তবে আর সন্দেহ নেই', যোগজীবন কেঁদে উঠল : 'মা যমুনায় ডুবে আত্মহত্যা করেছেন।'

কুলদা বললে, 'ঠাকুরকে তো জানাতে হয়। শ্রীধর, তুমি গিয়ে বলো।'

শ্রীধর বললে, 'আমার সাহস হয় না। তুমিই যাও।'

কুলদা গোঁসাইয়ের কাছে গিয়ে বসল। অনেকক্ষণ পর গোঁসাই চোখ মেলল। কুলদা বললে, 'মা ঠাকরুনকে পাওয়া যাচ্ছে না। কুঞ্জ থেকে একলা তো কোনোদিন যান না কিন্তু জানিনা আজ কোথায় চলে গেছেন। সারা বৃন্দাবন আমরা খুঁজেছি, কোথাও সন্ধান পেলাম না।'

গোঁসাই নির্বিচল রইল। সহজ সুরে বললে, 'কোথায় আর যাবেন। যমুনাতীর দেখেছ?'

'কোথাও দেখা আর কিছু বাকি নেই।'

গম্ভীর হয়ে গেল গোঁসাই। জিগগেস করল, 'তুমি আজ পাঠ শুনতে যাবে?'

'যাব।'

'যখন যাবে কুতুকে হাতে ধরে নিয়ে যেও।' গোঁসাইয়ের স্বরে কেমন যেন একটু উদ্বেগ ফুটে উঠল : 'যখন পাঠ শুনতে বসবে কুতুকে কাছে বসিও। সর্বদাই দৃষ্টি রেখো ওর উপর। ওকে আবার নিয়ে না যান।'

কেমন ভয় হল কুলদার। কিন্তু কুতুর এতটুকু ভয় নেই, উদ্বেগ নেই, বিমর্ষতা নেই। সে যেমন হাসি-গল্পে ছিল তেমনি হাসি-গল্পেই আছে।

এ অন্তর্ধানের কী রহস্য তা কে বলবে।

॥ ২৪ ॥

'কুতু, তোর কি মার জন্যে কষ্ট হয়?'

'বা, কষ্ট হবে কেন? মা যে পাঠ শুনতে আসেন। মাকে দেখতে পেলে আর কষ্ট কোথায়?'

পাঠ শুনতে আসেন! সবাই নিদারুণ অবাক মানল। কই আর তো কেউ দেখতে পায় না তাকে।

কুতুর চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হল : 'আজও তো এসেছিলেন।'

'কোথায় বসেছিলেন?' জিগগেস করল গোঁসাই।

'আমার পাশটিতে।'

'কেমন দেখলি?'

'এই শরীরে নয়।' কুতু গম্ভীর হল।

কী ব্যাপার? কুলদা নিভৃতে গিয়ে ধরল গোঁসাইকে।

কী আর ব্যাপার! আমার পরমহংসজি সূক্ষ্ম শরীরে এসে তাঁকে নিয়ে গেছেন।

'কিন্তু মা তো আর সূক্ষ্ম শরীরে যাননি?' কুলদা অভিভূত হল : 'পরমহংসজি স্থূল শরীর নিয়ে গেলেন কী করে?'

'যোগীরা সবই পারেন।' বললে গোঁসাই, 'ইচ্ছেমাত্র স্থূলকে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মকে স্থূল করতে পারেন। দেহের পঞ্চ ভূতকে পঞ্চভূতে মিলিয়ে স্থূলকে সূক্ষ্মে পরিণত করে মুহূর্তমধ্যে তাঁকে নিয়ে গিয়েছেন।'

'কোথায় নিয়ে গিয়েছেন?'

'মানসসরোবরে।'

'তিব্বতের মানসসরোবরে?'

'সে তো মানতলাও।' সে মানসসরোবরে নয়। বললে গোঁসাই, 'এ মানসসরোবর অনেক দূরে, হিমালয়েরও উপরে। কৈলাস যাবার পথে।'

'সেখানে কি আমি যেতে পারি না?'

'এই শরীরে কী করে যাবে? অনেক যোগৈশ্বর্য হলে তবে যাওয়া যায়।'

কিন্তু দামোদর পূজারি দাউজির যা ভোগ লাগাচ্ছে তার প্রসাদে স্থূল শরীরই টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠছে। শুকনো খরখরে আটার রুটি আর কুমড়ো-সেদ্ধ। অথচ গোঁসাইয়ের সেবায় যে টাকা আসে তার সমস্তই দামোদরকে দাউজির ভোগে ব্যয় করতে দেওয়া হয়। পাথরের ঠাকুর, তার কুমড়ো-সেদ্ধতে অরুচি নেই, কিন্তু গোঁসাইয়ের শিষ্যরা এই অত্যাচার সহ্য করতে আর রাজি হল না।

গোঁসাইয়ের শরীরও কেমন দিন-দিন কাহিল হয়ে যাচ্ছে।

'তোমার ভোগ তো আর গেলা যায় না।' দামোদরকে গিয়ে ধরল চেলারা।

দামোদর বিরক্ত হয়ে বললে, 'ভকতকা লোভ নেহি চাহি!'

কুমড়ো সেদ্ধ না দিয়ে কুমড়োর চোকলা সেদ্ধ দিতে লাগল দামোদর। বললে, যা টাকা আসছে তাতে ওর বেশি পোষায় না।

বটে? হিসেব দাও। নয়তো এবার থেকে টাকা পয়সা নিজেদের হাতে

রেখে নিজেরাই ভোগের ব্যবস্থা করব।

দামোদর তখন নিজে বাজারে গেল। বাছা-বাছা পোকাধরা শুকনো বেগুন আর 'বারো মিশালি' শাক কিনে আনল। তাই সেদ্ধ করে ভোগ লাগাল। উল্লাস করে বললে, 'ক্যায়সা খিলায়া।'

সবাই গিয়ে তখন গোঁসাইকে ধরল। এর একটা বিহিত করুন।

গোঁসাই মিষ্টি হেসে বললে, 'দাউজি জাগ্রত দেবতা। তিনিই বিহিত করবেন।'

তোমরা পাষণ্ড! তোমরা আবার গোঁসাইকে লাগাতে গিয়েছ। তাঁর ক্লেশ তোমাদের একটু প্রাণে লাগে না? বলছি বাঙলা মুলুকে চিঠি পাঠাও, আরো টাকা আনাও, তা নয়, উলটে যত সব ঘোঁট পাকানো। ভজন ছেড়ে যত সব ভোজনবাদী হয়ে উঠেছ।

দামোদর মালা নাড়ে আর বুলি ঝাড়ে।

কিন্তু পাথরের দেবতাও বুঝি আর নিশ্চল থাকতে প্রস্তুত নয়।

দু গালে হাত বুলুতে-বুলুতে দামোদর এসে হাজির। মুখখানি কাঁদো-কাঁদো।

'কী হল?' জিগগেস করল গোঁসাই।

'বাবা, দাউজি হামকো বহুত মারা হায়।'

'কেন, মারলেন কেন?'

দামোদর তখন স্বপ্নবৃত্তান্ত বললে।

শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে আছে, দাউজি এসে দামোদরকে চেপে ধরল। দুই গালে চড় মারতে লাগল। তাতেও হল না। সর্বাঙ্গে মারতে লাগল। চড় কিল ঘুষি।

কী করেছি?

কী করেছিস? পাষণ্ড, ভালো করে ভোগ দিচ্ছিস না। সব নিজে খাচ্ছিস, আমার গোঁসাই শুকিয়ে যাচ্ছে, তোকে আজ কিলিয়েই শেষ করব।

দেব, দেব, ভালো করে খেতে দেব।

তখন দাউজি ছেড়ে দিল। দেখুন গাল দুটো ফুলে রয়েছে। সর্বাঙ্গে ব্যথা।

গোঁসাই বললে, 'তুমি ভাগ্যবান। দাউজি তোমাকে শাসন করেছেন। আর কী, প্রাণ ঢেলে সর্বস্ব দিয়ে দাউজির সেবা করো, তিনি তোমার কোনো অভাব রাখবেন না।'

স্বপ্নের প্রহার শরীরে ফোটে—সকলে দেখে অবাক হয়ে গেল। অবাক হয়ে গেল ভোগের ব্যবস্থা দেখে। এখন থেকে পেট ভরে দুটি খেয়ে 'হরেকৃষ্ণ' বলা যাবে।

কুতুবুড়ি এসে বললে, 'মা আজ আসবেন।'

'কী করে বুঝলে?'

'জানিনা। আমি যেন দিনের বেলাতেও স্বপ্ন দেখি।' গোঁসাইয়ের কাছে এসে কুতু বললে, 'আমার এমন কেন হয় বাবা?'

'কী হয়?'

'মনে হয় যা কিছু দেখছি শুনছি করছি, সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন।'

'তোর খুব সৌভাগ্য তুই ঠিক-ঠিক দেখছিস।' গোঁসাই বললে, 'সমস্তই মিথ্যে সমস্তই স্বপ্ন। পরিচ্ছন্ন জ্ঞানে এ জানতে পারলেই তো হয়ে গেল।'

সন্ধের কিছু আগে বৃদ্ধা অনঙ্গ বৈষ্ণবী এসে হাজির। ওগো মা-গোঁসাই যে আমাদের ঘরে।

কোত্থেকে এলেন? কার সঙ্গে এলেন?

তা কে জানে।

যোগজীবন ছুটল মাকে দেখতে। ছুটল শ্রীধর আর সতীশ।

কী আশ্চর্য, দেবী ফিরে এসেছেন। যোগজীবন মায়ের পায়ে পড়ল। মা গো,.ঘরে চলো।

যোগমায়া ফিরে এল। পরনে গেরুয়া বসন। গোঁসাইকে প্রণাম করল। পাশে বসে বাতাস করতে লাগল। যেন আগে যেমন ছিল তেমনিই আছে। গোঁসাই একবার জিগগেস করল না, কোথায় ছিলে, কী করে ফিরে এলে?

কিন্তু যোগজীবন পেড়াপেড়ি সুরু করল—বলো, কী করে অদৃশ্য হয়ে গেলে?

'পরমহংসজি এসেছিলেন।' বললে যোগমায়া, 'সঙ্গে পাঁচজন মহাপুরুষ। সবাই ছ-সাত হাত লম্বা। মাথায় পাগড়ি বাঁধা। আমাকে বললেন, যমুনায় স্নান করবে চলো। যমুনায় স্নান করতে নামলাম। তারপর কী করে কী হল কিছুই বুঝতে পারলাম না। দেখলাম একটা পাহাড়ের উপরে আছি। সে যে কী আনন্দের স্থান কী বলব! ফিরে আসতে ইচ্ছে করে না, শুধু কুতুর কথা মনে করেই মাঝে মাঝে উতলা হয়ে উঠি।' কুতুকে কাছে টেনে নিল যোগমায়া।

'বৃন্দাবন থেকে আর উনি নড়বেন না কোথাও।' বললে গোঁসাই, 'তাই ওঁকে এখানে আসতে বারণ করেছিলাম।'

পাঁজি দেখে দিন ঠিক করল যোগমায়া। নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবের দিন মাঘী ত্রয়োদশী তিথিটি শুভ। সকালে তার দেহে বিসূচিকা প্রবেশ করল আর সন্ধ্যায় সে প্রবেশ করল নিত্যলীলায়।

ব্যাধির প্রকোপে দেহ অবসন্ন হয়ে এসেছে, পাশে বসে আছে গোঁসাই, হঠাৎ পরমহংসজি আবির্ভূত হলেন। গোঁসাইকে বললেন, 'তুমি কুঞ্জ ছেড়ে বাইরে কোথাও যাও। তুমি এখানে থাকলে ওকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। দেহত্যাগ হয়ে গেলে পর এস।'

কিন্তু যোগমায়া ছেড়ে দিতে রাজি নয়। গোঁসাই উঠি-উঠি করছে দেখে

হাত ধরল। তুমি চলে যেও না।

কিন্তু পরমহংসজির আদেশ। জোর করেই উঠে পড়ল গোঁসাই। কুঞ্জ ছেড়ে চলে গেল অন্যত্র।

যোগমায়ার দেহাবসান হল।

গোঁসাই ফিরে এসে দেখল, সবাই কাঁদছে. বেশি কাঁদছে কুতুবুড়ি, যেন শোকে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটা তো শোকের ব্যাপার নয়, এটা উৎসবের ব্যাপার।

যোগজীবনকে লক্ষ্য করে বললে, 'মৃতদেহ এখানে এতক্ষণ রেখেছিস কেন? যা যমুনার তীরে নিয়ে সংস্কার করে আয়।'

যোগমায়ার দেহ কেশীঘাটে নিয়ে যাওয়া হল।

আসনে প্রশান্ত মূর্তিতে স্থির হয়ে বসল গোঁসাই। শুধু কুতুবুড়িরই বিন্দুমাত্র স্থৈর্য নেই, আর্তনাদ করে কাঁদছে।

'আর্তনাদ করে কাঁদা ভালো, তাতে শোক পাতলা হয়ে যায়।' বললে গোঁসাই। কুতুকে কাছে ডাকল, পিঠে রাখল সান্ত্বনার হাত।

হাত রাখতেই যন্ত্রণায় চমকে লাফিয়ে উঠল কুতু। সত্যি সে শোকে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে—হাত রাখতেই তার পিঠে আগুনে-পোড়া ফোস্কার মত পাঁচটা আঙুলের দাগ বসে গেছে।

'এ হচ্ছে ভক্ত-বিচ্ছেদের জ্বালা।' বললে গোঁসাই, 'মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর রূপ সনাতনের এরকম হয়েছিল। বাইরে কারো কোনো শোক নেই দেখে অনেকের সন্দেহ হয়েছিল এরা কেমন ভক্ত। একদিন বৃক্ষতলে বসে ভাগবত পাঠ হচ্ছে, অনেকে শুনছে। গাছের একটা শুকনো পাতা হাওয়ায় উড়ে এসে রূপ গোস্বামীর গায়ে পড়ল। গায়ে পড়েই দপ করে জ্বলে উঠল। পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তখন সকলে বুঝল কাকে বলে বিরহদহন!'

ঢাকায় কুঞ্জ ঘোষকে চিঠি লিখল গোঁসাই :

'গত ১০ই ফাল্গুনে সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী তাঁহার চির প্রার্থনীয় সিদ্ধদেহ লাভ করিয়াছেন। অবিশ্বাসী লোকে ইহাকে মৃত্যু বলে, কিন্তু একবার বিশ্বাস নয়নে চাহিয়া দেখ। যোগমায়া আজ সখীবৃন্দের মধ্যে কি অপূর্ব শোভা সৌন্দর্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী শান্তিসুধাকে বলিবে যে, যেন শোক না করে, ইহা শোকের ব্যাপার নহে, বহু সৌভাগ্যে মনুষ্য ইহা প্রাপ্ত হয়। আগামী ২১শে ফাল্গুন এখানে তাঁহার নামে মহোৎসব হইবে। তাহার পর আমরা ঢাকায় যাত্রা করিব।

শ্রীমতী শান্তিসুধা যদি শ্রাদ্ধ করিতে চায় তবে আনন্দ-উৎসব করিয়া যেন দুঃখী কাঙ্গালীদিগকে খাওয়ায়।

মা, শান্তি, শোক করিও না, আনন্দ করো। যত শীঘ্র পারি আমরা ঢাকা যাইতেছি।'

উৎসবশেষে গোঁসাই বৃন্দাবন ছেড়ে হরিদ্বার এল। যোগমায়ার একখানা

অস্থি বৃন্দাবনে সমাহিত করা হয়েছে, আরেকখানা ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে এসে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিল। তৃতীয়খণ্ডটি গেণ্ডারিয়া আশ্রমে সমাহিত করে তার উপরে সমাধিমন্দির স্থাপিত করতে হবে।

সে বছর কুম্ভমেলা, লক্ষ-লক্ষ সাধু আর ধর্মার্থীর সমাগম হয়েছে হরিদ্বারে। ব্রহ্মকুণ্ডের কাছে এক পাণ্ডার বাড়িতে আছে গোঁসাই। সঙ্গে যোগজীবন, শ্রীধর, শ্যামাকান্ত, আরো অনেকে। হরিদ্বার আর হরিদ্বার নেই, হরিঘর হয়ে উঠেছে।

কনখলে সাধুদর্শন করছে গোঁসাই, দূর থেকে একজন বৈষ্ণব বাবাজি গোঁসাইকে লক্ষ্য করে গেয়ে উঠল :

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে
ঐ দেখ তারা দুভাই এসেছে রে।
যারা প্রেমে জগৎ ভাসাইল
যারা নামে জগৎ মাতাইল
তারা দুভাই এসেছে রে ॥

গোঁসাই উদ্দণ্ড নৃত্য করতে সুরু করল। মুহূর্তে চারদিকে ভাবের প্রবল স্রোত উদ্বারিত হল—কেউ ঐ কীর্তনে যোগ দিল, কেউ বা তুলল তারক ব্রহ্ম হরিনামের জয়ধ্বনি। নানা দেশের নানা দলের নানা সাধু—যারা সমবেত হয়েছিল—তারা বিস্ময় মানল, এমন নাচ এমন ভাব এমন দৃশ্য দেখিনি তো কোনোদিন। কে এ উজ্জ্বলন্ত পুরুষ। চলো কাছে গিয়ে দেখি। প্রাণ-মন-চক্ষু সার্থক করি।

রাধাকুণ্ডবাসী বেনীমাধব পাণ্ডা কাছে গিয়ে দেখল গোঁসাইয়ের বুকে স্বর্ণাক্ষরে হরিনাম প্রস্ফুটিত।

লক্ষসাধুর মধ্যে কজন বা তত্ত্বদর্শী। গোঁসাই ঘুরে ঘুরে শুধু তিন-জনকে আবিষ্কার করল। একজনকে জিগগেস করল, 'এত কঠোরতা করছে তবু সাধুদের তত্ত্বলাভ হচ্ছেনা কেন?'

সাধু হিন্দিতে বললে, 'আমি কীটানুকীট আমি কী করে বলব?'

'না, আপনি বলতে পারবেন।'

শেষকালে সাধু বললে, 'আজকাল সাধুরাও ভগবান চায়না। মান মর্যাদা মোহন্তগিরি চায়। আর কেবল সম্প্রদায় আর মতামত নিয়ে মাতা-মাতি করে। কিন্তু ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।'

একদিন নিমাই-নিতাই অদ্বৈতের কথা হচ্ছে হঠাৎ এক গুজরাটি প্রাচীন সাধু গোঁসাইকে লক্ষ্য করে বললে, 'প্রায় চারশো বছর আগে আমাদের দেশে এক বাঙালি সাধু গিয়েছিল, তার নাম কমলাক্ষ।'

'চারশো বছর আগে!' সবাই চমকে উঠল : 'আপনার তখন বয়েস কত ছিল?'

'আমার বয়েস তখন কত আর হবে! পনেরো-ষোলো।'

গোঁসাই জিগগেস করল : 'সেই সাধুর বাড়ি কোথায় ছিল?'

'বলেছিল নদীয়া শান্তিপুর। তাঁর একখানা গীতা আমার কাছে আছে।'

সেই কমলাক্ষই তো অদ্বৈত।

'কী উপায়ে এত দীর্ঘজীবন লাভ করেছেন?'

'হঠযোগে।' প্রাচীন সাধুটি উঠে দাঁড়াল। বললে, 'নির্জনে চলো, তোমাকে প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিচ্ছি! এমন সাধু আছে যারা আমারও বয়োজ্যেষ্ঠ।'

কিন্তু শুধু দীর্ঘজীবন লাভ করলেই কি ঈশ্বর মিলবে?

তিনটে স্কুলে-পড়া ছেলে সন্নেসী হতে এসে এক সাধুর খপ্পরে পড়েছে। বাইরের ভেক দেখে ভেবেছিল এ না জানি কত বড় মহাপুরুষ! বললে, আমরা ভগবানের জন্যে ঘর ছেড়েছি, আমাদের দীক্ষা দিন।

সাধু সানন্দে দীক্ষা দিল ও ছোকরা তিনটেকে কৌপীন পরিয়ে চাকরের কাজে লাগাল। কেউ বাসন মাজো, কেউ লাকড়ি ফাড়ো, কেউ জল টানো। কখনো বা গা-হাত পা টেপো। খাটতে-খাটতে ছেলে তিনটে রোগা হয়ে গেল। অসুস্থতায়ও রেহাই নেই। কাজ না করলে প্রহার পড়তে লাগল। যাতে পালিয়ে না যায় তার জন্যে দলের আর-আর পাষণ্ডদের নিযুক্ত করলে। বিপন্ন ছেলেগুলো চারদিকে অন্ধকার দেখল।

কেউ খবর দেয়নি, সহসা গোঁসাই একদিন সেই আশ্রমে এসে উপস্থিত হল। ছেলেগুলো যেন দুস্তর সমুদ্রে ভেলা পেল। কেঁদে পড়ল গোঁসাইয়ের কাছে। আমাদের উদ্ধার করুন।

গোঁসাই সাধুকে বললে, বাচ্চা কটাকে ছেড়ে দিন।

সাধু তেড়ে এল, ঠেসে গালাগাল দিল গোঁসাইকে। বললে, 'এ লোক মেরা চেলা হুয়া হ্যায়, মন্ত্র লিয়া হ্যায়, এ লোগোঁকো কভি নেহি ছোড়েঙ্গে।'

এই কথা? গোঁসাই পুলিশকে খবর দিল। পুলিশ এসে উদ্ধার করল ছেলেগুলোকে। গোঁসাই বললে, 'মায়ের ছেলে মায়ের কাছে ফিরে যাও।'

আরেক দিন মেলার মধ্যে গিয়েছে একটি নেংটি-পরা পাহাড়বাসী সন্ন্যাসী গোঁসাইকে দেখতে পেয়ে দূর থেকে ছুটে এগিয়ে আসতে লাগল। ভিড়-ভাড় কিছু মানছে না, একে-ওকে ঠেলে ধাক্কা মেরে পথ করে নিচ্ছে আর মুখে উন্মত্ত চিৎকার—আজ মেরা মিলা রে মিলা! আজ আমি পেয়ে গেছি রে পেয়ে গেছি।

কী পেয়েছ? কাকে মিলেছে?

পাহাড়বাসী সাধু কোনো উত্তর করে না, গোঁসাইকে ঘিরে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নাচতে লাগল : মেরা মিলা রে মিলা! আজ আমি পেয়ে গেছি রে পেয়ে গেছি।

প্রদক্ষিণ করছিল, নাচছিল, হঠাৎ আর সাধুকে দেখা গেল না। হারাধন

পেয়ে আবার কোথায় নিঃস্ব হয়ে হারিয়ে গেল। কেউ সন্ধান পেল না।

আরেক সাধু গোঁসাইকে দেখে টলতে-টলতে এগিয়ে আসতে-আসতে স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে পড়ল। কাঁদতে লাগল আকুল চোখে। গদগদ স্বরে বলল,, 'সব মেরা আজ পূরণ হো গিয়া, আজ হাম ধন্য হো গিয়া। আমার সমস্ত আজ পূরণ হয়ে গিয়েছে, আমি কৃতার্থ হয়েছি।'

শ্রীধর সেই সাধুকে নমস্কার করে বললে, 'মহারাজ, আশীর্বাদ করুন।'

সাধু বললে, 'তোমাদের মহাভাগ্য, তোমরা ভগবানের সঙ্গ পেয়েছ। আর কী চাও? সব চেয়ে যা দুর্লভ তাই পেয়ে গেছ। সব সময় পিছু থাকো। সঙ্গ কখনো ছেড়ো না। ধন্য হয়ে গেছ, কৃতকৃতার্থ হয়ে গেছ।'

এ সব সাধুরা লোকালয়ে থাকে না, পাহাড়ে জঙ্গলে সাধন ভজন করে, অথচ গোঁসাইকে দেখে এমন করছে যেন গোঁসাই সকলের কত অন্তরঙ্গ।

কুম্ভমেলা যেখানেই হোক, হরিদ্বারে কি প্রয়াগে, নাসিকে কি উজ্জয়িনীতে, এত সাধু-সমাগম হয় কেন? শুধু স্নানের জন্যে?

গোঁসাই বললে, 'আরো এক উদ্দেশ্য আছে। সাধুদের সাধন-ভজনে যে সমস্ত সঙ্কট ও সংশয় দেখা দেয় তারই নিরাকরণের জন্যে এই সাধুসভা। কখনো কখনো উপযুক্ত উপদেশ বা শিক্ষা লাভের জন্যেও নানা জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা চলে। কোন অঞ্চলে কী রকম ধর্মভাব চলছে তারও খবর নেওয়া হয়। কোন অঞ্চলের ভার কোন মহাত্মার উপর দেওয়া হবে তারও সিদ্ধান্তের দায়িত্ব এই সভায়। এবার যেমন, চুরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের ভার রামদাস কাঠিয়া বাবাকে দেওয়া হয়েছে।'

'আর বাঙলা দেশের ভার?'

গোস্বামী-প্রভু কিছু বললেন না, ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন।

২৫

হরিদ্বার থেকে গোঁসাইজি ফিরে এলেন গেণ্ডারিয়া।

কোলে ছেলে, নাম দাউজি, শান্তিসুধা এসে কেঁদে পড়ল : 'বাবা, মা কই?'

'তোমার মাকে বৃন্দাবনে রেখে এলাম।' গোঁসাইজি বললেন স্নিগ্ধকণ্ঠে, 'তিনি এলেন না, ওখানেই থেকে গেলেন। ভয় কী, আমরা একদিন সবাই যাব সেই বৃন্দাবনে।'

শান্তিসুধা ভেঙে পড়ল।

গোঁসাইজি তাকে স্পর্শ করলেন। সেই স্পর্শে সমস্ত তাপদাহের নিবৃত্তি হল, শান্তিসুধা শান্তশীতল হয়ে গেল। মৃত্যু নেই সর্বত্র মধু, শোক নেই সর্বত্র সুধা।

কুলদানন্দ গোঁসাইজির কাছ থেকে ব্রহ্মচর্যের প্রথম দীক্ষা নিয়েছিল বৃন্দাবনে। এক বছরের জন্যে। বৎসর পূর্ণ হতে এসেছে গেণ্ডারিয়ায়, দ্বিতীয় বৎসরেও দীক্ষা পায় কিনা।

'শিখামাত্র অবশিষ্ট রেখে মস্তক মুণ্ডন করো।' বৃন্দাবনে থাকতে বললেন গোঁসাইজি, 'তারপর ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে এসে আমার সামনে পূর্ব-মুখ হয়ে আসনে বসো, আমি তোমাকে এক বছরের জন্যে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দেব।'

যথাদিষ্ট আসনে বসে হু-হু করে কাঁদতে লাগল কুলদা। পারব কি ব্রত রাখতে?

'নিষ্ঠাই ব্রহ্মচর্যের মূল। যে সব নিয়ম বলে দিচ্ছি গভীর নিষ্ঠায় সেগুলি রক্ষা করে চলবে। নিয়মগুলি শুনে রাখো।'

ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে সাধন করবে! শৌচের পর আসনে বসে গায়ত্রী জপ করবে। তারপর গীতা অন্তত এক অধ্যায় পড়বে। পাঠান্তে আবার সাধন করবে। স্নানান্তে আবার গায়ত্রী জপ আর তর্পণ।

স্বপাকে অথবা সদব্রাহ্মণ দিয়ে রান্না করিয়ে খাবে। বেশি ঝাল অম্ল মিষ্টি মধু ও ঘি খাবেনা। আহার পরিমিত ও শুদ্ধ হবে। আর যা খাবে তাই ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করে খাবে। আহারান্তে কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম করবে। শোবেনা, ঘুমুবেনা দিনের বেলায়। বিশ্রামান্তে ভাগবত, মহাভারত বা রামায়ণাদি পড়বে। পাঠের পর নির্জনে কিছুক্ষণ ধ্যান করবে। বিকেলে, যদি ইচ্ছে করে, একটু বেড়াবে।

সন্ধ্যায় আবার গায়ত্রী জপ। পরে যেমন সাধন করো তেমনি করবে। খুব ক্ষুধাবোধ হলে সামান্য জলযোগ করবে। দুবেলা অন্নগ্রহণ করবে না।

নিতান্ত সামান্য বসন পরবে। সামান্য শয্যায় শোবে। বসন আর শয্যা নির্দিষ্ট রাখবে। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ করবে, সাধুদের উপদেশ সশ্রদ্ধ হয়ে শুনবে।

পরনিন্দা করবেনা, পরনিন্দা শুনবেনা। যে স্থানে পরনিন্দা হচ্ছে সে স্থান ত্যাগ করবে। কোনো সাম্প্রদায়িক ভাব রাখবে না, যে যেভাবে সাধন করছে তাকে সেইভাবে সাধন করতে উৎসাহ দেবে।

কারু মনে কষ্ট দেবে না। সকলকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করবে। মানুষ পশু পাখি বৃক্ষলতা সকলেরই যথাসাধ্য সেবা করবে। নিজেকে অন্যের চেয়ে ছোট মনে করে অন্যকে মর্যাদা দেবে। প্রত্যেকটি কাজ বিচার করে করবে। বিচার করে করলে কোনো বিঘ্ন হবে না।

সর্বদা সত্য কথা বলবে, সত্য ব্যবহার করবে। অসত্য কল্পনা মনে আসতে দেবে না। কথা কম বলবে।

যুবতী স্ত্রীলোক স্পর্শ করবে না। দেবস্থানে পথেঘাটে অজ্ঞাতে স্পর্শ হয়ে গেলে গ্রাহ্য করবে না। সর্বদা শুচিশুদ্ধ হয়ে থাকবে। পবিত্র স্থানে

পবিত্র আসনে বসবে। নিজের যা কাজ তা অতি গোপনে করে যাবে।

এ সব নিয়ম রক্ষা করে চলতে পারলে আগামী বছর আরো নিয়ম বলে দেব।

দ্বিতীয় বৎসরের জন্যেও কুলদাকে ব্রহ্মচর্য দিলেন গোঁসাইজি। নিজের হাতে সাজিয়ে দিলেন নীলকণ্ঠ বেশে। এ বৎসরে তোমার বিশেষ নিয়ম, জিজ্ঞাসিত না হলে কথা বলবে না। জিজ্ঞাসিত হলেও প্রয়োজনবোধে উত্তর দেবে। উত্তর সংক্ষিপ্ত হবে। আর তুমিও প্রয়োজনীয় বিষয়েই কেবল জিজ্ঞাসা করবে। সর্বদা পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে দৃষ্টি রাখবে। অন্ধকারেও তাই। তারপরে নিত্য হোম আর গায়ত্রী!

'ব্রহ্মচর্য কি এক বছর করে নিতে হয়?'

'তার কোনো নিয়ম নেই। ব্রহ্মচর্যের মোট কাল বারো বৎসর! তবে এবারও তোমাকে এক বছরের জন্যে দিলাম। বেশিদিনের জন্যে দিতে সাহস হয় না যদি নিয়ম ভেঙে ফেল। নিয়ম ভেঙে গেলে বিষম দোষ। নিয়ম রেখে চলতে পারলে পরের বছর আবার দেব।'

ভজন কুটিরের গর্তের মধ্যে একটা সাপ এসে ঢুকেছে। গোঁসাইজি তাকে দুধ-কলা খেতে দেন। মাঝে মাঝে সাপ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে গোঁসাইজির জটা বেয়ে একেবারে মাথার উপর উঠে বসে আবার নিজের থেকেই নেমে যায়। সাপ যে বিষধর তাতে সন্দেহ কী। কুঞ্জ ঘোষ একদিন একটা সুন্দর রক্তপদ্ম নিয়ে এসেছিল, দিয়েছিল গোঁসাইজিকে, গোঁসাইজি সেটিকে তার গ্রন্থের উপর রেখেছিলেন। রাত্রে বেরিয়ে সাপ সেই ফুলটিকে জড়িয়ে ধরল। দেখা গেল বিষস্পর্শে সেই রক্তপদ্ম কালো হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু সাপের আলিঙ্গন সত্ত্বেও গোঁসাইজির গাত্রবর্ণ যেমন উজ্জ্বল তেমনি উজ্জ্বল।

'সাপ আপনার গায়ে-মাথায় ওঠে কিন্তু আমাদের তো ধারে কাছেও আসে না। এর রহস্য কী?' একজন ভক্ত জিগগেস করল।

'নামের সঙ্গে স্বাভাবিক প্রাণায়ামের ক্রিয়া যখন চলতে থাকে তখন শরীরের মধ্যে একটা অব্যক্ত মধুর ধ্বনির সৃষ্টি হয়।' বললেন গোঁসাইজি, 'সেটা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান থেকে শোনা যায়। সে ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে সাপ মাথায় চড়ে বসে। সাপ বুঝতে পারে এ দেহে হিংসার স্থান নেই, তাই নিশ্চিন্ত হয়ে বিশুদ্ধ গান শুনতে উঠে পড়ে গায়ের উপর।

'এ সাপ কে?'

'একজন ফকির সাধক।' গোঁসাইজি বললেন, 'কালবশে দেহ নষ্ট হয়ে যাবার পর সর্পদেহ ধরে সাধন করছে। আমাকে বললে, মনোমত আসন পাচ্ছি না, তাই সাধনার ব্যাঘাত হচ্ছে। আপনি যদি কৃপা করে আমাকে আশ্রয় দেন আমি রক্ষা পাই। সেই থেকে ওকে থাকতে দিয়েছি ভজন কুটিরে।'

দুটো কোলাব্যাঙ আসে। গোঁসাইজির আসনের কাছাকাছি এসে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থাকে। শত গোলমালেও নড়ে না। অব্যক্ত স্বর করে গলা ফুলিয়ে। তারপর স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে যেন সমাধি হয়েছে।

আর কুকুর কালু তো আছে চেয়ারে শুয়ে। তারই জন্যে তার নাম চেয়ারম্যান।

একটি গরু আছে আশ্রমে। দেখতে রাঙা বলে নাম ছিল 'রাঙী—'রাঙী' শেষে দাঁড়াল 'রানী'তে। গরু গর্ভ ধরেনি কোনোদিন অথচ প্রয়োজন-মত দোহন করলেই দুধ দেয়। আরো এক আশ্চর্য গুণ, কেউ মন্দ অভিসন্ধি নিয়ে আশ্রমে ঢুকলে রানী তাকে তেড়ে যায়। সেবার একটা কীর্তনের দল এসেছে আশ্রমে, বিকৃত স্বরে সুরু করেছে কীর্তন। কারু কাছেই হৃদকর্ণ রসায়ণ বলে লাগছেনা, তবু কীর্তন, উচ্চবাচ্য করতে পারছেনা কেউ। রানীর কাছে অসহ্য লাগল। সে সহসা দড়ি ছিঁড়ে ঊর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে কীর্তনের দলকে আক্রমণ করল। দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। বন্ধ হল কীর্তন।

এ আবার কে এল আশ্রমে। রানী যে তাকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। শিঙ বাগিয়ে চাইছে আক্রমণ করতে। কী ব্যাপার?

লোকটা পালিয়ে যাবার পর গোঁসাইজি বললেন, 'রানীর পূর্বজন্মের স্মৃতি আছে। ঐ লোকটি পূর্বজন্মে কসাই ছিল তাই গোজন্মের সংস্কার-বশে ক্রোধে ওকে তাড়া করেছিল।'

আশ্রমে একটি আমগাছ আছে, তারই নিচে গোঁসাইজি অনেক সময় পূজা পাঠ সাধন ভজন করেন। একদিন দেখা গেল সে গাছে পিঁপড়ে জমেছে, কোত্থেকে ভ্রমরের দল শাখায়-শাখায় সুরু করেছে সুরগুঞ্জন।

কী ব্যাপার? গাছ হতে মধু ঝরছে। হরিনাম শুনে শুনে কঠিন বৃক্ষ-পঞ্জর থেকেও আনন্দরস উথলে উঠেছে।

'আমগাছ থেকে যে মধুক্ষরণ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ?' গোঁসাইজি শিষ্য ভক্তদের জিগগেস করলেন।

শিশিরবিন্দুর মত গাছ থেকে ঝরে পড়েছে ফোঁটা ফোঁটা। যেখানে পড়ছে পিঁপড়েরা ভিড় করছে, ছুটে আসছে মৌমাছি। গাছের নিচে শুকনো ঘাস ভিজে উঠেছে। তুলসী গাছগুলোও নিষিক্ত!

'কী, মধু বলে বুঝতে পারছ?'

আমগাছের পাতায় জিভ ঠেকাল শ্রীধর। বললে, 'সত্যিই তো, বেশ মিষ্টি।' আরেক পাতা দস্তুরমত চাটল অশ্বিনী : 'সত্যিই তো, মধু, স্পষ্ট মধু।'

কুলদা অসন্দিগ্ধ হতে চায়। গাছের দুটো পাতা সে সহসা টেনে ছিঁড়ে নিল।

গোঁসাইজি শিউরে উঠলেন : 'উঃ, এ কী করলে? ওভাবে কি পাতা ছিঁড়তে আছে?'

ছিঁড়েছি তো ছিঁড়েছি। পাতা দুটো হাতে নিতেই দেখা গেল তাতে তরল আঠার মতন কী মাখানো আছে। কুলদা একটা পাতা লেহন করল জিভ দিয়ে। মধু, মধু, নিদারুণ মিষ্টি। আরেকটা পাতা টুকরো করে ছিঁড়ে উপস্থিত দশ-বারো জনের মধ্যে বিলিয়ে দিল। সবাই দেখল আম পাতার মধুর স্বাদ।

'বৃন্দাবনে দেখেছি নিমগাছ থেকে মধু ঝরছে।' বললেন গোঁসাইজি, 'দেখলাম তার নিচে বসে একজন অকিঞ্চন ভক্ত ভজন করছেন।'

'সব গাছ থেকেই মধু ঝরে?'

'যে সব গাছের নিচে বহুদিন ধরে হোম যজ্ঞ সাধন ভজন তপস্যা হয়, কিংবা যে সব গাছের নিচে ভক্ত মহাত্মাদের আসন থাকে সে সব গাছ মধুবর্ষী মধুময় হয়ে যায়।' বললেন গোঁসাইজি, 'ভক্তির সঙ্গে পুজো করলে জলও মধুময় হয়। একবার শান্তিপুরে গঙ্গাজলে দেখলাম মধুপোকা—জল তুলে নিয়ে খেয়ে দেখলাম, মিষ্টি। শোননি সেই বেদমন্ত্র—ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমানেন্না বনস্পতির্মধুমান অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। কী মানে? বায়ু মধু বহন করছে। সমুদ্রগুলি মধু ক্ষরণ করুক, আমাদের ওষধিগুলি মধুময় হোক। রাত্রি ঊষা পার্থিব ধূলি ও আকাশ মধুময় হোক। মধুময় হোক আমাদের পিতৃগণ, আমাদের সূর্য ও বনস্পতি। আমাদের ধেনুগণ মধুমতী দুগ্ধবতী হোক।'

শুধু তাই নয়, কুলদা ও অন্যান্য ভক্তরা লক্ষ্য করে দেখল, গাছের গায়ে চটা উঠে নানা জায়গায় ওঁকার ফুটেছে, কোথাও বা দেবদেবীর মূর্তির আভাস। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রোদ অথচ গাছের তলাটি কী ঠাণ্ডা! উদয়াস্ত শীতল ছায়া বিছানো। সর্বত্র শান্তি আর স্নিগ্ধতা।

'আমার মাথাটা একবার দেখ তো।' গোঁসাইজি বললেন কুলদাকে, 'বড্ড পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে।'

প্রভুর জটা থেকে অনেক সময় উকুন ও ছারপোকা বার করেছে কুলদা—পিঁপড়ের কথা এই নতুন শুনছে। মাথায় হাত দিয়ে দেখে ভিজে চপচপ করছে। এ তো ভেজার অবস্থা নয়। তাছাড়া মাথা ভরা অদ্ভুত সুগন্ধ।

'এ কিসের গন্ধ?' অবাক হয়ে জিগগেস করল কুলদা।

'বুঝতে পাচ্ছিস না এ পদ্মগন্ধ। এ গন্ধেই পিঁপড়ে এসেছে।'

'কিন্তু চুলের গোড়ায় এসব কী? সাদা সাদা পাতলা মোমের মত দেখছি—'

'হ্যাঁ, মোম। জমাট হয়ে রয়েছে।'

'ঘাম জমে হয়েছে?'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'ঘাম জমে কি মোম হয়? ও মধু।'

'মানুষের শরীর থেকে কি মধুক্ষরণ হয়?'

'হ্যাঁ, গাছের যেমন হয় তেমনি মানুষেরও।'

শিষ্য মহাবিষ্ণু জ্যোতি গোস্বামী প্রভুকে নিয়ে গান বেঁধেছেন :

অপরূপ শ্রীগুরুরূপ হৃদয়ে সদা ভাব না রে
ভবন বন সমান হবে, শমন ভয় আর রবে না রে।
তরুণ-রবি-কিরণ দুটি চরণ পাশে পরকাশে,
ধন্য সে জন ও-চরণ (যার) হৃদি-সরসে সদা ভাসে,
কোটি জন্মের পাপ নাশে, ও রাঙা-পদ-পরশে
মজ ও পদে মন-ভৃঙ্গ রস-রঙ্গ ছাড় না রে ॥
কটিতে ঝাঁপি কৌপীন বহির্বসন শোভে সুন্দর
দণ্ড-কমণ্ডলু করে শোভে কিবা মনোহর
জিনি মদমত্ত কুঞ্জর, গমন কিবা মন্থর,
মধুর হাস মধুর ভাষ, মধুমাখা সব ব্যবহারে ॥
সুবিশাল বক্ষে শোভে সপ্ত-লহরী মাল
ঊর্দ্ধ তিলক-রেখা ভালে কিবা শোভে ভাল
মৌলী রচিত চূড়া, যেন শ্যামের মোহন চূড়া
কিংবা ফণিফণা যেন ধরে গঙ্গাধর শিরে ॥
পৃষ্ঠে দোলে বেণী—যেন ভানু রাজনন্দিনী
প্রেম-নীরে ভাসে সদা, শ্রীমুখ-কমলখানি
আনন্দময় সব, আনন্দ-রস-খনি
মগন দিবা-রজনী কিবা আনন্দ সায়রে ॥'

কুঞ্জ ঘোষের বাড়িতে রক্তবৃষ্টি হল, গোঁসাইজি তাকে কালীপুজো করতে বললেন। তোমার শাশুড়ি কালীকে ঝাঁটা মেরেছে তাই এই উৎপাত।

বৃদ্ধা শাশুড়ি বললে, 'আমি কৃষ্ণ ভজনা করি, কালী আমার কাছে আসে কেন? তাই ঝাঁটা ছুঁড়ে মেরেছি।'

ঠিক করনি। তারই জন্যে এই রক্তবৃষ্টি।

কালীপুজো করল কুঞ্জ। গোঁসাইজির নির্দেশে আখ আর কুমড়ো বলিদান হল। করজোড়ে দাঁড়িয়ে দেবীকে দর্শন করলেন গোঁসাইজি।

বললেন, দেখলাম মা কালী নৈবেদ্যের থালাটি মাথায় নিয়ে বসে আছেন। পরে দেখলাম রামচন্দ্রকে কাঁধে নিয়ে মহাবীর দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর দেখলাম, বিষ্ণু দাঁড়িয়ে গরুড়ের স্কন্ধে। তারপর দেখি মহাদেবের উপরে কালীমূর্তি। শেষে দেখলাম বলদেবের বুকের উপর রাধাকৃষ্ণ। মায়ের অনন্ত ভাব, কে বোঝে?'

কে বোঝে!

গোঁসাইজি অসুখে পড়লেন। সামান্য সর্দি থেকে রোগ গিয়ে দাঁড়াল নিমোনিয়ায়। বড় ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ ঘোষকে ডাকা হল। সে বললে, দুটো

ফুসফুসই ধরে গিয়েছে, বাঁচবার আশা নেই।

ষোল দিন কেটে গেছে, জীবনদীপ প্রায় নির্বাপিত, গোঁসাইজি বললেন, 'দই খাব।'

সর্বনাশ! ডাক্তার বললে, তাহলে এ মুহূর্তেই শেষ।

ডাক্তারের নিষেধ শুনলেননা গোঁসাইজি। জোরজার করে দই খেলেন।

পরের দিনেই অন্ন পথ্য।

॥ ২৬ ॥

গেন্ডারিয়াতে শঙ্খঘন্টা কাঁসর বেজে উঠল।

কী ব্যাপার?

নাম-ব্রহ্মের মন্দির স্থাপিত হল। যোগমায়া দেবীর সমাধি-মন্দির।

যোগমায়া দেবীর দেহরক্ষার পর বৃন্দাবনেই গোঁসাইজির কাছে নিত্যানন্দ প্রভু প্রকাশিত হয়ে আদেশ করেছিলেন গেন্ডারিয়া আশ্রমে যোগমায়া দেবীর অস্থি সমাধিস্থ করে তার উপর মন্দির তুলে নাম-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করো। নাম-ব্রহ্মই কলির একমাত্র দেবতা।

কী—কে নাম-ব্রহ্ম?

গোঁসাইজির চোখের সামনে আকাশপটে স্বর্ণাক্ষরে প্রস্ফুটিত হল 'ওঁ হরি। নাম-ব্রহ্ম। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥'

যোগমায়া দেবীর পুণ্যাস্থির সমাধির উপর মন্দির উঠল। বেদীর উপর রাখা হল তাঁর ব্যবহৃত আসন ও শয্যা, শাঁখা ও সিঁদুরের কৌটো, আর তাঁর ফটো ও নাম-ব্রহ্মের পট।

মহাষ্টমীর দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা। সারাদিন যোগযাগ ভোগ চলল. সন্ধ্যা হতেই সুরু হল কীর্তন।

'নাচে আর হরি বলে গৌর নিতাই,
আমার গৌর নিতাই, নাচে অদ্বৈত গোঁসাই,
নাচে হরিবোল, হরিবোল বলে রে
তোরা দেখবি যদি ত্বরায় আয়, দরশনের সময় যায়—
যারা জেতের বিচার নাহি করে, যারে তারে প্রেম বিতরে।
এমন দয়াল ঠাকুর আর দেখি নাই—'

কীর্তনান্তে গোঁসাইজি নিজে হরির লুট দিলেন।

'তোরা কে নিবি লুটে নে, নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে।
হাটের রাজা নিত্যানন্দ, পাত্র হলেন শ্রীচৈতন্য
মুন্সিগিরি দিলেন অদ্বৈতেরে,

হরিদাস খাজাঞ্চি হয়ে লুট বিলালো নগরে ॥'

কলিহত দুর্বল জীবের জন্যে সহজসাধ্য পূজা এই নাম-ব্রহ্মের পূজা। ভক্তিই এ পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। আর কিছু নয়, দিনান্তে ভক্তিভরে একটি প্রণামই যথেষ্ট।

'হরি' এই কথাটিই শুধু হরিনাম নয়। যে নামে পাপহরণ করে তাই হরিনাম। কালী কৃষ্ণ রাম দুর্গা সবই হরিনাম। গায়ত্রীও হরিনাম।

ঈশ্বরের নাম অক্ষর নয়, স্বয়ং ঈশ্বরই নাম। তিনি শক্তি, নামও শক্তি। নামস্পর্শমাত্র প্রাণে যদি প্রেম ভক্তি পবিত্রতা না জাগে বুঝবে তা ঈশ্বরের নাম নয়, কটি অক্ষরমাত্র।

হরিনামে প্রেম-লাভের ক্রম কী? প্রথম পাপবোধ, দ্বিতীয় পাপকর্মে অনুতাপ, তৃতীয় পাপে অপ্রবৃত্তি, চতুর্থ কুসঙ্গে ঘৃণা, পঞ্চম সৎসঙ্গে অনুরাগ, ষষ্ঠ নামে রুচি ও গ্রাম্য কথায় অরুচি, সপ্তম ভাবোদয় আর অষ্টম প্রেম।

কী ভাবে নাম করলে নামের ফল সহজে পাওয়া যায়? তৃণের মত নীচ হয়ে, বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হয়ে, নিজের অভিমান ত্যাগ করে মান্য ব্যক্তিকে মান দিয়ে—আর এই অবস্থা লাভ করতে হলে দরকার সৎসঙ্গ, ধর্মগ্রন্থপাঠ, গুরু-আজ্ঞা-পালন আর ভক্তসেবা।

কাম আর প্রেমে পার্থক্য কী?

কাম নষ্ট হোক একথা ঠিক নয়। কাম থাকুক, কিন্তু ত্রিগুণের অতীত হয়ে। শারীরিক গুণের সঙ্গে মিশে থাকলেই কাম আর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেই প্রেম। তখন প্রেম আত্মার অংশ, তার মানেই আত্মা!

মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় একমাস পর গোঁসাইজি হঠাৎ একদিন খুব ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন : 'মাকে দেখতে কাল ভোরেই আমি শান্তিপুর যাব।'

কেন, কী হল, মা কোনো খবর পাঠিয়েছেন না কী, কাউকে কিছু ভাঙলেন না। তবে বুঝি স্বর্ণময়ী মৃত্যুশয্যায় তাই গোঁসাই শেষ দেখা দেখতে ছুটেছে।

কজন ভক্ত-শিষ্যও গোঁসাইজির সঙ্গী হল।

বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে স্বর্ণময়ী যেন বিজয়েরই অপেক্ষা করছিলেন, ছেলেকে দেখে অভাবনীয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন : 'এ কী, তুই? তুই এলি?'

'বা, না এসে করি কী!' গোঁসাইজি মায়ের পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন : 'তুমি যে বিজয়, বিজয় বলে আমাকে ডাকলে? কী, ডাকো নি? ডাক শুনেই তো চলে এলাম। কী হয়েছে তোমার মা?'

স্বর্ণময়ীর গায়ে প্রহারের দাগ। বললেন, 'আমাকে ওরা মেরেছে।'

ব্যাপারটা বুঝে নিতে দেরি হল না গোঁসাইজির। স্বর্ণময়ীর উন্মাদ-রোগ সম্প্রতি বেড়ে গিয়েছিল ও যে আত্মীয়টি তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করছিল

সে পাগলামি সহ্য করতে না পেরে নিদারুণ প্রহার করে বসেছিল। প্রহারের ফলে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন স্বর্ণময়ী, কিন্তু মূর্ছা যাবার আগে প্রহারের প্রথম প্রতিক্রিয়ায় তিনি অনুপস্থিত ছেলেকে পরিত্রাতারূপে ডেকে উঠেছিলেন : বিজয়, বিজয়! আর শান্তিপুরের ডাক গেণ্ডারিয়ায় বসে শুনেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ।

মাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে চলে এলেন গোঁসাই। বললেন, 'আর তোমাকে কাছছাড়া করব না।'

আজ রাসযাত্রা। গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরকে আগে দর্শন করি, কেমন না জানি আজ সেজেছেন, তার মাথার চূড়ো না জানি কেমন ঝিলিক দিচ্ছে!

মন্দির-প্রাঙ্গণে এসে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে গোঁসাই শ্যামসুন্দরের দিকে তাকালেন। নয়নের নিমেষ আর পড়ল না, কাঁদতে লাগলেন অঝোরে! আমি তোমাকে মানিনি কিন্তু তুমিও আমাকে ছাড়োনি। কেবল ঘোরালে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবার নিয়ে এলে স্বস্থানে।

বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে গোঁসাইজি রাসযাত্রা দেখলেন। কত বিগ্রহ, কী বিচিত্র বেশভূষা, সাজসজ্জার কী সমারোহ! ভগবৎবুদ্ধিতে নিজের নিজের বিগ্রহকে যারা প্রাণের সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়ে সাজিয়েছে ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে সেসব ভক্তদেরও দেখ!

গোঁসাই বললেন, 'ঢাকার জন্মাষ্টমী, বৃন্দাবনের দোল, অযোধ্যার ঝুলন আর শান্তিপুরের রাস দেখবার জিনিস। কোথাও এর তুলনা নেই। এসব উৎসবে যারা যোগ দেয় তাদের মনে অশান্তি বলে কিছু থাকে না।'

অবিশ্বাসেই অশান্তি। অবিশ্বাস কেন? অবিশ্বাসের মূলে স্বার্থবুদ্ধি, পরনিন্দা, হিংসাদ্বেষ। এসব থেকেই নানা দুর্গতি উপস্থিত হয়। এজন্য ধার্মিকের একটি প্রধান লক্ষণ, প্রাণান্তেও পরনিন্দা করেন না। আত্মপ্রশংসা বিষতুল্য মনে করেন। হিংসা হৃদয়ে স্থান পায় না। ভগবানের কাছে অবিশ্বাস হলেই অসন্তোষ।

এক ভদ্রলোকের বাড়িতে নীলকন্ঠের যাত্রা হচ্ছে, শিষ্য-ভক্তদের নিয়ে গোঁসাইজি সেখানে উপস্থিত হলেন। গণ্যমান্য গোস্বামীরাও এসেছেন। আসর খুব জমজমাট।

কিন্তু কী হল?

নীলকন্ঠ না কোকিলকন্ঠ! গান শুনে গোঁসাইজির ভাবসাগর উথলে উঠল, সমস্ত সাত্ত্বিকচিহ্ন প্রস্ফুটিত হল, তিনি আবেশে ঢলে ঢলে পড়তে লাগলেন। নীলকন্ঠকে তখন দেখে কে, সে প্রবলতর উৎসাহে মেতে উঠল কীর্তনে। ভাবসংবরণ করতে না পেরে গোঁসাইজি লাফিয়ে উঠলেন ও উচ্চে হরিনাম তুলে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে লাগলেন। যাত্রা ফেলে নীলকন্ঠ তখন গোঁসাইজিকে আরতি সুরু করল। দেখতে দেখতে শিষ্যভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল ভাবস্রোত।

যাত্রার মধ্যে এসব কী অবান্তর প্রসঙ্গ। গোস্বামীরা বিরক্ত হয়ে বললে, 'এসব কী অযথা গোলমাল। এসব বন্ধ করে দাও।'

নীলকণ্ঠকেই উদ্দেশ করে বলছে। তোমার ওসব আরতির গান তো পালার বাইরে।

'আমার খুশি মত আমি গাইব।' নীলকণ্ঠ কঠিন হল : 'আমার মধ্যে যদি এখন আরতির ভাব এসে থাকে আমি ভক্ত মহাপুরুষের আরতিই করব।'

'কিন্তু তোমার ঐ ভক্ত মহাপুরুষের যাত্রায় কোনো পার্ট আছে?'

'নেই, তাই যাত্রা বন্ধ।' নীলকণ্ঠ রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'যেখানে মহাভাবের আদর নেই, ভক্ত মহাপুরুষকে যেখানে মর্যাদা দেওয়া হয় না সেখানে আমি গান করি না।'

গান বন্ধ করে দিল নীলকণ্ঠ।

কীর্তন করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলেছেন গোঁসাইজি। ভাবাবেশে নৃত্য করতে করতে পড়ে গিয়েছেন মাটিতে। উদ্ধত কতগুলো যুবক তাই দেখে বিদ্রূপ করে উঠল। বলল, সমস্ত ঢং, ভণ্ডামি।

দাঁড়াও, ভাব বার করছি। রাস্তার পাশেই একটা কামারশালা ছিল, সেখানে ঢুকে তারা একটা লোহার শলাকে আগুনে পুড়িয়ে আনল। চারপাশে শিষ্য-ভক্তদের ভিড়, মাঝখানে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন গোঁসাইজি, একটা ছোকরা সেই তপ্ত লোহার শলা তাঁর গায়ে চেপে ধরল। দেখি কেমন ভাব! দেখি ভাব এবার তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে কিনা।

না, প্রভু যেমন স্থির হয়ে পড়েছিলেন তেমনি স্থির হয়ে রইলেন। যেমন করছিল, ভক্তদল হরিধ্বনি করতে লাগল।

এ কী ভয়াবহ ব্যাপার!

গোঁসাইজি নড়লেন না, তাঁর গায়ে তপ্ত লোহার দাগ পর্যন্ত পড়ল না। এমন কী দেহ, আগুনের দাহিকাশক্তি লোপ পেয়ে গেল।

ছোকরারা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল। ওরাও লাগল হরিনাম করতে। বুঝল যিনি আগুনে দগ্ধ হন না, যাঁর স্পর্শে আগুন পর্যন্ত শীতল হয়, তিনি নরদেহে ভগবান ছাড়া আর কী!

সেদিন গোঁসাইজি বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূরে চলে এসেছেন। জায়গাটা নির্জন, শুধু একটি জীর্ণকুটির দাঁড়িয়ে আছে।

গোঁসাইজি বললেন, 'সেই বাবাজিটি আর নেই।'

'কার কথা বলছেন?'

'এখানে আগে একজন ভজনানন্দী বৈষ্ণব বাবাজি থাকতেন, আমি তাঁকে মাঝে মাঝে শ্যামসুন্দরের প্রসাদ এনে দিতাম। আনন্দ করে খেতেন আমার হাত থেকে।'

'সে কত দিনের কথা?'

'অনেকদিন। আমার ছেলেবেলা।' গোঁসাইজি একটু হাসলেন : 'আমার বয়স তখন ন বছর।'

'আপনার সঙ্গে আলাপ হল কী করে?'

'বলি সে কথা।' গোঁসাইজি বলতে লাগলেন : 'আমাদের বাড়িতে সেদিন কী এক সমারোহের ব্যাপার, বাবাজিও এসেছেন প্রসাদ নিতে। কিন্তু তিনি বাড়ির মধ্যে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে না বসে বসেছেন বাইরে, দোরগোড়ায়। তিনি খাবার চাইলেন—একবার নয়, দু-তিন বার। তাঁকে বলা হল, অপেক্ষা করুন, ব্রাহ্মণদের আগে হয়ে যাক, পরে আপনাকে দেয়া হবে।'

'পরে কেন?'

'আর বোলোনা, বাবাজি ছিলেন অব্রাহ্মণ, হীনজাতি।'

'হীনজাতি! বৈষ্ণবে আবার জাতি কী!'

'সেই তো কথা।' বিজয়কৃষ্ণ উদ্দীপ্ত স্বরে বললেন, 'সেদিনের সেই ন' বছরের বালকের কন্ঠে সেই প্রতিবাদই তো মুখর হয়ে উঠল। আমি বললাম, একজন বৈষ্ণব ক্ষুধার্ত হয়ে খাবার চাচ্ছেন—প্রচুর খাবার তো রয়েছে, দিয়ে দিলেই হয়—তার মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ-শূদ্র কী! ক্ষুধার কাছে আবার জাত কিসের।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী! আমি নিজেই উদ্যোগী হয়ে এগুলাম। বাবাজি বসুন, আমি দিচ্ছি আপনাকে। কিন্তু কোথায় বাবাজি! খাবার নিয়ে এসে দেখি বাবাজি নেই, ওই চলে যাচ্ছেন। খাবার রেখে ছুটলাম তার পিছনে, ধরে ফেললাম। কত সাধ্যসাধনা করলাম, কিছুতেই ফিরলেন না। বললেন, কুটিরে ফিরে যাচ্ছি, গোপালজি যদি আজ না খাইয়ে রাখেন, না খেয়েই থাকব।'

'চমৎকার!'

'আমি কায়দা করে বাবাজির ঠিকানাটি যোগাড় করে নিয়েছিলাম, খাবার নিয়ে বাবাজির সেই কুটিরে এসে হাজির হলাম। বললাম, বাবাজি আপনার প্রসাদ।'

বালকবয়সেই কী দয়া, কেমন পরসেবা বৈষ্ণবসেবায় তৎপর! সেই দয়ার শরীরের আশ্রয়-পাওয়া ভক্ত-শিষ্যের দল মুগ্ধকন্ঠে বলে উঠল : 'অপূর্ব।'

'তারপর যদ্দিন বাড়িতে ছিলাম খিদে পেলেই আমার বাবাজির কথা মনে হত। শ্যামসুন্দরের প্রসাদ চেয়ে এনে বাবাজিকে দিয়ে যেতাম।'

পথের দিকে তাকিয়ে ভক্ত-শিষ্যরা বললে, 'বলেন কী, এ তো প্রায় দেড় মাইল রাস্তা—'

'তা হোক।' দয়াভরা উদার চোখে বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'কিন্তু বাবাজিকে না খাওয়ালে আহারে আমার রুচি হত না। কিন্তু আজ কোথায় সেই বাবাজি!'

একদিন একটি আকুল আন্তরিক আর্তি প্রকাশ করেছিলেন বাবাজি, তাইতেই সে নিত্য প্রসাদ ভোজনের অধিকারী হল। প্রসাদ ভোজন প্রকান্ড ভাগ্যের কথা। কিন্তু রান্না করে অন্ন ঠাকুরের কাছে ধরে দিলেই তা প্রসাদ হয় না। এমনও হতে পারে ঐ অন্নে ঠাকুরের প্রবৃত্তি হল না। গ্রহণ করলেন না তিনি। তাহলে আর প্রসাদ হল কী করে। ঠাকুরই যদি প্রসন্ন না হন তাহলে সে অন্ন প্রসাদ না হয়ে প্রমাদ হয়ে ওঠে।

শ্যামাক্ষেপা গন্ধ শুঁকে ঠিক বলে দিতে পারত রান্নার কোথায় কোন রাঁধুনির কী অনাচার ঘটেছে। খোঁজ নিয়ে দেখা যেত অভিযোগ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কী, ঠিক বলেছি তো? তাই ঠাকুর আজ এ অন্ন সেবা করেন নি, অনাহারে রয়েছেন। তখন আবার নতুন করে শুদ্ধমত রান্না করো।

একদিন সকলে মিলে বাবলায় গেলেন, অদ্বৈত প্রভুর মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বসলেন প্রাঙ্গণে।

'স্থির হয়ে বসে নাম করো।' বললেন বিজয়কৃষ্ণ, 'তাহলেই বুঝবে স্থানমাহাত্ম্য।'

স্থির হয়ে বসে সকলে নাম করতে লাগল। কতক্ষণ পরে শুনতে পেল দূর থেকে এক সংকীর্তনের দল এদিকে এগিয়ে আসছে, খোল করতালের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গোঁসাইজি এখানে এসেছেন জেনেই হয়তো এই আয়োজন।

এগিয়ে আসছে ক্রমশ। বাদ্যধ্বনি স্পষ্টতর হচ্ছে।

চলো আমরাও গিয়ে কীর্তনে যোগ দিই। আবাহন করে নিয়ে আসি।

গোঁসাইজিকে একা রেখে আর সকলে এগিয়ে গেল। কিন্তু এ কী আশ্চর্য, যতই তারা গোঁসাইয়ের থেকে দূরে যাচ্ছে ততই কীর্তনের ধ্বনি মৃদু হয়ে আসছে। কোন দূর পথে পাড়ি জমাল কীর্তনের দল? আরো কিছু দূর এগুলো ভক্তশিষ্যরা—এ কী, আর শব্দ নেই। সমস্ত বাদ্যধ্বনি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

ফিরে এসে তারা চুপচাপ বসল গোঁসাইয়ের পাশে। বললে সব গোঁসাইকে।

গোঁসাইজি বললেন, 'বোসো স্থির হয়ে। নাম করো। স্থির হয়ে বসে নাম করলেই সংকীর্তনে ভালো করে যোগ দিতে পারতে। এ সাধারণ কীর্তন নয়, মহাপ্রভুর কীর্তন।'

সকলে অবাক হয়ে গেল।

'ছেলেবেলায় বাবলায় এসে আমিও অমনি কীর্তন শুনতাম।' বললেন গোঁসাই, 'আর কোথায় কীর্তন, কোনদিকে, এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতাম। এ কীর্তন যে কিভাবে শোনা যায় তখনো আমার কাছে ব্যক্ত হয়নি। সঙ্গ ধরে থাকো, স্থির হও আর নাম করো, তবেই এ অপ্রাকৃত কীর্তন শুনতে পাবে।'

কী কুবুদ্ধি হয়েছিল দূরে সরে গিয়েছিল তাদের গোঁসাইজিকে ফেলে। তাঁর কৃপাশক্তিতে একবার শোনা গিয়েছিল কীর্তন, তাঁর কৃপাশক্তিতে কতবার আবার শোনা যাবে।

শান্তিপুর থেকে কলকাতা ফিরলেন গোঁসাই। মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে একটা বাড়িতে এসে উঠলেন। দর্শনার্থীর ভিড়ে ভরে গেল ঘরদোর।

স্যালভেশান-আর্মি বা মুক্তিফৌজ নিয়ে একখানা বই লিখেছে শ্রীচরণ চক্রবর্তী, ব্রাহ্মসমাজের প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক, বর্তমানে গোঁসাইজির শিষ্য। এই ফৌজের অধ্যক্ষ জেনারেল বুল। এদের কাজ কী? দুঃস্থ-দুর্গতের সেবা। এরা কাঙাল বেশে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। রাস্তার নিরাশ্রয় অন্ধ খঞ্জ রুগ্ন আতুর পরিত্যক্তদের তুলে নিয়ে আসে, স্বাস্থ্যকর বাসস্থানে রেখে সযত্নে শুশ্রূষা করে। শুধু সেবা আর চিকিৎসাই দেয় না, ভালোবাসাও দেয়।

স্বার্থহীন ভালোবাসার কথা শুনে গোঁসাইজি কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'পরদুঃখে যাঁদের প্রাণ কাঁদে তাঁরা সাকার তীর্থ। তাঁদের দর্শনেও লোকে পবিত্র হয়। চলো তাঁদের দেখে আসি।'

কালবিলম্ব নয়, দুপুরবেলাতেই মুক্তিফৌজের আস্তানায় গিয়ে হাজির হলেন। তীর্থদর্শনের সুযোগ কে উপেক্ষা করবে? ঐখানে যে ভগবান প্রকাশিত—দয়ারূপে, সেবারূপে, অহেতুক পরহিতরূপে। চলো যাই চিত্তের প্রসন্ন নিবেদন, পরম প্রণামটি রেখে আসি।

॥ ২৭ ॥

ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন এসেছে।

বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে উদার বন্ধুতায় সম্বর্ধনা করলেন। 'আসুন আসুন, কী মনে করে?'

বিদ্যারত্ন গম্ভীর স্বরে বললে, 'আপনাকে আমার নির্জনে কিছু বলবার আছে।'

'বেশ তো বলুন।'

ঘরে যারা উপস্থিত ছিল বারান্দায় চলে গেল।

নির্জন দেখে বিদ্যারত্ন বললে, 'গঙ্গোত্রী গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে কিছুদিন ছিলাম হিমালয়ের উপরে। ব্যাসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি আপনার কাছ থেকে আমাকে গৈরিক বস্ত্র নিতে বললেন। বললেন যেন বাকি জীবন আপনার উপদেশ মত চলি। দয়া করে আমাকে গৈরিক বস্ত্র দিন।'

গোঁসাইজি তাঁর একখানা বহির্বাস বিদ্যারত্নকে দিলেন।

'আর উপদেশ!'

'এই গৈরিক বস্ত্রই মূর্তিমন্ত উপদেশ।' বললেন গোঁসাইজি, 'সত্যকে লক্ষ্য রেখে সরল ভাবে চলাই গৈরিকবস্ত্র।'

বেশ শীত পড়েছে। ঠাণ্ডা ঘরে আসনে একটানা বসে থাকার দরুনই হয়তো গোঁসাইয়ের পায়ে বাত ধরেছে। বৃন্দাবন একটা উলের ট্রাউজার কিনে এনে গোঁসাইকে বললে, এটা পরুন, আরাম পাবেন।

গোঁসাই রাজি হননা পরতে।

বৃন্দাবন পিড়াপিড়ি করতে লাগল। 'আপনার জন্যে কিনে আনলাম আর আপনি একটুও গায়ে ঠেকাবেন না?'

আচ্ছা দাও। গোঁসাইজি পরলেন ট্রাউজার। পাঁচ সাত মিনিট গায়ে রেখে ফিরিয়ে দিলেন বৃন্দাবনকে। বললেন, 'তুমি পরো, তুমি পরলেই আমার পরা হবে।'

কোথায় ট্রাউজার মাথায় বেঁধে রাখবে, তা নয়, পা ঢুকিয়ে দিয়ে কোমরে আঁটল বৃন্দাবন। পরমূহূর্তেই কাঁপতে লাগল। এ কী, সমস্ত শরীরে যে আমার বিদ্যুৎ-তরঙ্গের শিহরণ হচ্ছে। তাকাল গোঁসাইয়ের দিকে। এ কী, অচেতন বস্তুতেও বিদ্যুৎশিহরণ!

তাড়াতাড়ি ট্রাউজার ছেড়ে ফেলল বৃন্দাবন।

নগেন চাটুজ্জের স্ত্রী মাতঙ্গিনীকে গোঁসাই 'আনন্দময়ী' বলেন, 'মা আনন্দময়ী।' গোঁসাইয়ের আহারান্তে রাত্রে একদিন এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, এস তোমাকে গান শোনাই। তানপুরা বাজিয়ে গান শোনাতে বসলেন মাতঙ্গিনী। আর সে কী গান! সে তো গান নয় অমৃতনির্ঝর। যে শুনল সেই কাঁদল, ভাবে বিভোর হয়ে গেল, রাত ভোর হয়ে গেলেও কেউ ঘুমুতে গেল না।

আর গোঁসাই মাঝে মাঝে ভাবাবেশে হুঙ্কার ছাড়তে লাগলেন। তাঁর শব্দের সেই শক্তি সকলকে ভাবোদ্দীপ্ত করতে লাগল। সে বুঝি গানের চেয়েও শক্তিশালী।

সত্য কীভাবে লাভ হয়!

'গণ্ডির মধ্যে থাকলে জীবনে সত্য লাভ হবেনা।' বললেন বিজয়কৃষ্ণ, 'সত্য অনন্ত, সত্যের ভাব অনন্ত, সত্যের রূপ অনন্ত। সর্বসংস্কার বর্জিত হলেই সত্যে সন্ধিৎসু হওয়া চলে।'

আর ব্রহ্মচর্য কী!

'আনুগত্যই ব্রহ্মচর্য।'

বিজয়কৃষ্ণ কালীঘাটে গেলেন। কালীকে মালা-ডালি দিয়ে মা, মা বলে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে কেউ চাপতে পারলনা চোখের জল।

'মার কত দয়া! সকলকেই মা দয়া করছেন।' বললেন বিজয়কৃষ্ণ, 'আমার

মায়ের দয়ার তল নেই সীমা নেই। মা, মা,—'

এস বাবা, এস, আমার জন্ম আজ সার্থক হল।' এক বৃদ্ধা কাঙালিনী ঠাকুরের পায়ের কাছে বসে পড়ল, একটি পয়সা দিতে হাত বাড়াল, বললে, 'আমার কাছে এই একটিমাত্র পয়সা আছে, এটি তুমি নাও।'

বিজয়কৃষ্ণ পয়সাটি হাতে নিয়ে মাথায় রাখলেন, মহেন্দ্রকে দিয়ে বললেন, 'এটি রাখুন। কারু অযাচিত দান অগ্রাহ্য করতে নেই।'

নমস্কার করে কোথায় কোন পথে চলে গেল ভিখারিনী কেউ জানল না।

'উনি কে?' শিষ্য জিগগেস করল।

'মায়ের সঙ্গিনী। মা-ই পাঠিয়ে দিয়েছেন অভ্যর্থনার জন্যে।'

মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের বাসা ছেড়ে শ্যামবাজারের তে-মাথার উপর একটা তেতলা বাড়ির উপর তলায় উঠে এলেন গোঁসাই।

রামকুমার বিদ্যারত্ন এসে বললে, 'কালীকৃষ্ণ ঠাকুর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'আমার সঙ্গে। কেন?'

'জানেন তো উনি প্রতি মাসে হাজার হাজার টাকা দান করেন—'

'আমাকেও কিছু দিতে চান বুঝি?'

'হ্যাঁ, লক্ষ টাকা।'

'বলো কী!' প্রভুর দু-চোখে জল এসে গেল।

'হ্যাঁ, তিনি আপনার সমস্ত খবর রাখেন।' রামকুমার বললে, 'আপনার উপর তাঁর অটল শ্রদ্ধা। যদি একবার আপনি ওঁর বাড়ি গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করেন তাহলেই ঐ টাকাটা আপনাকে উনি অর্পণ করেন! আমাকে তাই বলে দিলেন অনেক করে।'

গোঁসাই হাত জোড় করে ভগবানকে প্রণাম করলেন। অশ্রুসজল কণ্ঠে বললেন, 'ঠাকুর মশাইকে বলবেন আমার এখানে যা যথার্থ প্রয়োজন ভগবান তা কড়ায় গণ্ডায় হিসেব করে প্রত্যহ পাঠিয়ে দেন। একটি কানাকড়িরও অভাব রাখেন না। ভগবানের নাম নিয়ে তাঁর দ্বারে দীনহীন কাঙাল হয়ে যেন পড়ে থাকতে পারি তাঁকে এই আশীর্বাদ করতে বলবেন—'

রামকুমার অভিভূতের মত তাকিয়ে রইল।

নবীন ঘোষ সরকারী ডাক্তার। চাকরিতে থাকলে যথাবিহিত ধর্ম করা যাবে না এই যন্ত্রণায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন. গোঁসাইজির কাছে দীক্ষা নিয়ে পরমবৈষ্ণব হয়ে গিয়েছেন, এখন তাঁর দিন-রাত মানেই একটানা সাধন-ভজন।

নিয়মিত আহ্নিক সেরে অবসরক্ষণটি বেছে নিয়ে রোজ তিনি চন্দন তুলসী হাতে গোঁসাইয়ের কাছে আসেন ও পুজো করেন। বলেন. আপনি আমার ইষ্ট, আমার পুরুষোত্তম।

প্রথম দিন যখন আসেন চন্দন তুলসী গোঁসাইয়ের পায়ে দিতে চেয়েছিলেন। গোঁসাই বললেন, 'না, তুলসী পায়ে দেবেন না, আমার মাথায় দিন।'

যথাদিষ্ট তুলসী দিতেই মুহূর্তমধ্যে গোঁসাইজি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

এই বিজয়কৃষ্ণই তো একদিন ব্রাহ্মভক্তদের পায়ের ধুলো দিতেন বলে কেশবচন্দ্রের প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু আজ? আজ তো তিনিই ইষ্টের আসনে বসে পুজো নিচ্ছেন। কোনো কোনো ব্রাহ্ম হয়তো টিপ্পনী কাটল।

হ্যাঁ, তিনি তো আজ ব্রাহ্মনিয়মে অনুশাসিত নন, তিনি আজ সনাতন হিন্দুধর্মের সম্পূজিত গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। তিনিই আজ গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। অক্ষর পরমব্রহ্ম।

'এ কী, নোংরা কাপড়ে ঠাকুরকে খাবার দিচ্ছেন?' গুরুভাই বৃন্দাবন রাত্রিবাস কাপড়ে গোঁসাইকে খাবার দিতে যাচ্ছে দেখে নবীন ঘোষ তিরস্কার করে উঠলেন।

বৃন্দাবন থমকে গেল। খাবার দিল না গোঁসাইকে।

পরে বৃন্দাবন জিগগেস করল গোঁসাইকে, 'এটা কি ডাক্তারবাবু ঠিক করলেন?'

সব শুনে গোঁসাইজি বললেন, 'তাঁর ভাবের দিক থেকে তিনি ঠিকই করেছেন। তুমি তোমার ভাবমত কাজ করলেনা কেন? তুমি তো ঠকে গেলে।'

'কী জানি। শেষে আপনি যদি না খান!'

'আমি না খেলেও তুমি ছাড়বে কেন?' করুণাসুন্দর চোখে গোঁসাইজি হাসলেন : 'তুমি আমার মুখ টিপে জোর করে খাইয়ে দেবে। তোমার ভালোবাসার কাছে কিসের শুচি-অশুচি?'

ভালোবাসাই তো নিয়ম ভুলিয়ে দেয়। আচারের বিচার করতে দেয় না।

একটি নামহীন গরিব ভক্ত দু-আনামাত্র জোগাড় করেছে। ইচ্ছে হয়েছে গোঁসাইজিকে কিছু খাবার খাওয়াবে। কিন্তু দু আনায় কী কিনবে কিছু ঠাহর করতে পারছে না। এ-দোকান ও-দোকান ঘুরছে তবু কিছুই মনোমত হচ্ছে না। হয় মনে হচ্ছে নিতান্ত বাজে, নয়তো নিতান্ত তুচ্ছ। এ কি কখনো দেয়া যায়, কিংবা এই এতটুকু? সকাল সাতটা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত ঘুরছে পথে-পথে, দোকানে-দোকানে, তবু সুরাহা নেই। আর, এমন আশ্চর্য, সংকল্পও ত্যাগ করতে পারছে না। শেষকালে, যা থাকে অদৃষ্টে, দু আনার খাবার দিন তো, বলে দাঁড়াল শেষ দোকানীর দুয়ারে। কী দোকানী দিল চেয়েও দেখল না, ঠোঙাটি হাতে করে গোঁসাইজির বাসার সিঁড়ির নিচে দাঁড়াল কুণ্ঠিত হয়ে। সমস্ত মুখে সন্দেহ আর ভয়, এই ক্ষীণ উপচার প্রভু নেবেন কিনা।

অকস্মাৎ তেতলার ঘরে গোঁসাইজি তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন ভক্তের কাছে। 'ওগো আমার জন্যে কী এনেছ! কী এনেছ!' মুখে এই গদগদ ভাষ : 'ওগো শিগগির আনো, শিগগির। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

ভক্তের হাত থেকে নিজেই ঠোঙাটি তুলে নিলেন। খেতে লাগলেন তৃপ্ত মুখে। চোখ ছলছল করে উঠল। দেখল ভক্তও অবিরল কাঁদছে। খাবারের প্রায় সবটাই খেয়ে বাকিটা ভক্তকে খেতে দিলেন। বললেন, 'চমৎকার খাবার। চমৎকার খাবার।' বলে ভক্তের চোখের জল মুছে দিলেন স্বহস্তে।

নির্ধারিত সময়ে গোঁসাইয়ের আহার। কিন্তু ভক্তের অনুরাগ তাঁকে যেন নিয়মে ধরে রাখতে পারল না, করুণাধারায় নিম্নে টেনে নিয়ে গেল।

'কিন্তু ওরা যে আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে ছাড়বে দেখছি।' একদিন মগ্নাবস্থায় বললেন গোঁসাইজি।

'কারা তাড়াবে?'

'নবীন বাবুরা।'

'কেন আমরা কী করলাম!' নবীনবাবু ধরে পড়লেন।

'এত অঢেল খরচ করছ! দিনরাত এত ভক্ত সমাগম, পঞ্চাশ-ষাট জন তো এখানেই রয়েছে, সকলের খাওয়াবার ভার নিয়েছ।' গোঁসাইজি কাতর-স্বরে বললেন, 'আর কিছুদিন আমি এখানে থাকলে তোমরা যে একেবারে রাস্তায় দাঁড়াবে।'

'টাকা বুঝি আমাদের!' বললেন নবীন ঘোষ, 'সব আপনার টাকা। আপনার টাকা আপনারই প্রয়োজনে লাগছে। আমরা তো শুধু হাতে করতে পেয়ে ধন্য হচ্ছি। আপনি থাকতে কে আমাদের রাস্তায় দাঁড় করায়।'

শ্যামবাজারের বাসায় পাগলী মা স্বর্ণময়ী এসে হাজির।

এসেই প্রথমে রান্নাঘরে ঢুকলেন। ভক্ত মেয়েরা রান্না করছিল, তাদের লক্ষ্য করে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন : 'তোরা কে? তোরা এখানে কেন! গোঁসাই বাড়ির রান্নাঘরে শুদ্দুর! তোরা তো এঁটো মুক্ত করবি আর বাসন মাজবি। তোরা রান্নার কী জানিস! যদ্দিন বিজয়ের একটা বিয়ে না দেব আমি নিজেই রান্না করব। তোরা দূর হ।'

সকলকে তাড়িয়ে দিলেন স্বর্ণময়ী। ফেলে দিলেন সব কুটনো-বাটনা। নিজেই খোসাশুদ্ধ তরকারী কুটলেন, রাখলেন সব আধসেদ্ধ করে। আধোয়া চাল ফুটিয়ে পিণ্ড পাকালেন। ডাল আর জল আলাদা হয়ে রইল।

বিজয়কে খেতে দিয়ে স্বর্ণময়ী জিগগেস করলেন, 'বল দিকিনি কেমন রেঁধেছি।'

হাসিমুখেই গোঁসাই বললেন, 'ঠিক যেন জগন্নাথের ভোগ! কিন্তু' আশ্রমবাসীদের লক্ষ্য করলেন 'ওরা সব কেমন খাচ্ছে?'

'ওরা সব পাতে ফেলে রেখেছে।' ঝামটা দিয়ে উঠলেন স্বর্ণময়ী : 'ওরা

খাবে কী! ওদের কি ভক্তি আছে? আমরা হলুম শান্তিপুরের গোঁসাই, আমাদের হাতে দেবতারা খায়! আমরা তেল-ঘিও দিই না বাটনা-কুটনোরও ধার ধারিনা—যা সাদা জলে সেদ্ধ করে দি, তারই কত স্বাদ!'

'জগন্নাথের রান্না তো সাদা জলেই হয়।'

রান্নাবান্না ভাঁড়ারের ভার নিয়ে স্বর্ণময়ী বিপর্যয় কান্ড সুরু করলেন। একদিনের জিনিস অন্য দিনের জন্য রাখবেন না কিছুতেই, সেদিনই সব খরচ করে ফেলবেন। যা কিছু উদ্বৃত্ত চাল ডাল তরকারি থাকবে সব নতুন করে রান্না করে কাঙাল দুঃখীদের ডেকে এনে খাওয়াবেন। আশ্রমে কিছুই সঞ্চিত হতে দেবেন না।

'সবারই তো খাওয়া হয়ে গিয়েছে, আবার কেন রান্না করলেন?' কেউ হয়তো বাধা দিতে চাইল।

স্বর্ণময়ী মুখিয়ে উঠলেন : 'তোরা কি মানুষ না পশু? ভগবান এক-মুঠো দয়া করে দিলে তার থেকে একগ্রাস অন্যকেও দিতে হয়। ভগবানের দান যার প্রয়োজন তারই জন্যে, সকলের জন্যে, পুঁজি করবার জন্যে নয়।'

'কিন্তু একটু হিসেব করে না চললে চলবে কী করে,' শেষ পর্যন্ত বৃন্দাবন এল শাসন করতে।

স্বর্ণময়ী বললেন, 'দেখ আমরা গোঁসাই বাড়ির বউ, আজকের যা এল তো হল, কালকে—কালকে গোবিন্দ আছেন।'

গোঁসাইয়ের জন্যে এক সের দুধ বরাদ্দ করা আছে। সেই দুধই স্বর্ণময়ী সকলকে এক হাতা করে বিতরণ করেন। বিজয়ের জন্যেও এক হাতা।

বাসার ঝি কাজ সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাচ্ছে, স্বর্ণময়ী তাকে আট-কালেন। জিগগেস করলেন, 'এত শিগগির পালাচ্ছিস যে?'

'মা, ছেলেটার বড্ড অসুখ, তার জন্যে একটু দুধ জোগাড় করতে হবে। তাই একটু সকাল-সকাল বেরুচ্ছি দেখি পাই কিনা।'

'আচ্ছা, দাঁড়া।' স্বর্ণময়ী টের পেয়েছেন কে একজন লুকিয়ে বিজয়ের জন্যে বাড়তি দুধ জোগাড় করেছে সেই বাড়তি দুধের সমস্তটাই ঝিয়ের হাতে তুলে দিলেন। বললেন, 'এই নিয়ে যা। কোথায় খুঁজে মরবি, পাস কি না পাস তা কে জানে।'

'এ তুমি কী করলে।' একটি ভক্ত মেয়ে আপত্তি করল : 'দুধ না পেলে তোমার ছেলের যে কষ্ট হয়, তা তুমি জানো না?'

'যা, সব জানি।' রুখে উঠলেন স্বর্ণময়ী : 'অসুখ হলে ঝিয়ের ছেলের কষ্ট হয় না? বিজয়ের তো তবু তোরা দশজন আছিস, দরকার হলে দশদিকে ছুটোছুটি করবি, কিন্তু ঝিয়ের ছেলের কে আছে, কে তার জন্যে করতে যাবে?'

ভক্ত মেয়েও ছাড়ে না, স্বর্ণময়ীও গলা চড়ান। শেষে এসে ছেলেকেই সালিশ মানলেন। জিগগেস করলেন, 'বিজয়, তোর সঙ্গে সর্বদা থেকেও এদের

এমন বুদ্ধি হল কেন? ওদের কি দয়ামায়া বলে কিছুই থাকতে নেই?'

গোঁসাইয়ের দুচোখ জলে ভরে উঠল। বললেন, 'আমার মায়ের মত এত দয়া আর কারুতে দেখলাম না।'

কিন্তু কলকাতায় থাকবার দিন সংক্ষিপ্ত হয়ে এল। খবর এল যোগজীবনের স্ত্রী বসন্তকুমারী কঠিন জ্বরবিকারে ভুগছে।

খবর শুনেই ছেলেকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিলেন গোঁসাই। বললেন, 'যা, স্ত্রীর সেবা কর গে। চিকিৎসার কোনো ত্রুটি রাখিসনে। চিকিৎসাতেই দৈহিক ভোগের প্রায়শ্চিত্ত হয়। যা, আমিও শিগগির যাচ্ছি।'

কদিন পরে গোঁসাইজিও যাত্রা করলেন।

গোয়ালন্দে স্টিমারে উঠে গোঁসাই বললেন, 'গঙ্গার প্রবলতর ধারাটিই পদ্মা। ওর হাওয়ায় শরীরের জড়তা দূর হয়ে যায়, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সতেজ হয়ে ওঠে। জলের অশেষ গুণ। পদ্মার বিস্তৃতি দেখলে চিত্তে আপনিই প্রশান্তি জাগে।'

ডেকে আসন করে বসেছেন গোঁসাই, ধ্যানের গাঢ়তায় ঢলে ঢলে পড়ছেন। একটা সাহেব দূর থেকে দেখতে পেয়ে ভেবেছে বুঝি মাতালের কাণ্ড। কাছে এসে রসিকতা করে জিজ্ঞেস করছে, 'ক্যা জী, দারু পিয়া? কেৎনা পিয়া?'

'হাঁ সাব, দারু পিয়া, বহুত পিয়া।'

'ক্যায়সা দারু পিয়া?'

গোঁসাইজি হাসিমুখে বললেন, 'তুমহারা যীশুখৃস্ট যো দারু পিতে থে হামতো আভি ওহি দারু পিয়া।'

সাহেব হকচকিয়ে গেল। টুপি তুলে গোঁসাইকে সেলাম ঠুকে স্বস্থানে প্রস্থান করল।

গ্যাণ্ডেরিয়ার আশ্রমে পেঁছে দেখলেন বসন্তকুমারীর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

বসন্তকুমারী জিগগেস করল, 'বাবা, আর কত দুঃখ দেবে?'

'মা, তোমার ক্লেশের অবসান হল বলে।' গোঁসাইজি আশ্বাস দিলেন।

'এ কষ্ট আর তো দেখা যায় না।' স্বয়ং ডাক্তারই অনুনয় করল গোঁসাইকে, 'তিনদিন যাবৎ শ্বাস চলছে, এখন যবনিকাপাত হয়ে গেলেই পারে।'

'হবে। একটু শুধু বাকি আছে। বুড়োঠাকরুন মাঝে মাঝে বউমাকে গালিগালাজ করতেন তারই জন্যে বুড়োঠাকরুনের উপর বউমার এখনো একটু বিরক্তি ভাব আছে সেটুকু কেটে গেলেই আর বাধা থাকবে না।'

'সে ভাব যাবে কিসে?'

'যদি বুড়োঠাকরুন একটু হঠাৎ দয়া করে বসেন।'

সঙ্গেসঙ্গেই বুড়োঠাকরুন কাঁদতে কাঁদতে বধূর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'বউ, আমি যদি কিছু অন্যায় করে থাকি, মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, আমাকে ক্ষমা করো।'

বসন্তকুমারী পরমতৃপ্তিতে হাসল। বুড়োঠাকরুনের গলা জড়িয়ে ধরে

বললে, 'দিদিমা, আপনি তো কোনো অপরাধ করেন নি। অপরাধ আমার হলে আমাকেই আপনি ক্ষমা করুন।'

ধীরে ধীরে চোখ বুজল বসন্তকুমারী। শ্বাস মৃদু হতে হতে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বসন্তকুমারীর অকাল মৃত্যুতে সবাই বিষন্ন কিন্তু যোগজীবন নির্বিকার। 'এবার সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হলাম। এখন থেকে ঠাকুরের সঙ্গে নিরুদ্বেগে থাকতে পারব।'

একটু কি নিষ্ঠুর ঠেকল গোঁসাইয়ের কাছে? একদিন নিরালায় যোগজীবনকে পেয়ে গোঁসাইজি বলে উঠলেন : 'ওরে যোগজীবন, জেনে রাখিস ব্রহ্মা মহেশ্বরও বড়জোর সাময়িক একটা আনন্দের ঢেউ প্রাণে তুলে দিতে পারেন, প্রারব্ধের ভোগ নষ্ট করে দিতে পারেন না। সে শুধু এক-জনেরই হাতে।'

স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করল যোগজীবন। রুদ্ধদ্বার ঘরে স্বয়ং গোঁসাইজি মন্ত্রপাঠ করলেন। বসন্তকুমারী দুটি হাত বাড়িয়ে পতিদত্ত পিণ্ড গ্রহণ করল।

॥ ২৮ ॥

গোঁসাই-প্রভু মৌনাবলম্বন করলেন।

মৌনীবাবার চিঠি এসেছে। লিখেছেন, 'নির্জন পাহাড়ে-পর্বতে এতকাল সাধন-ভজন তপস্যা করে কাটলাম, কিন্তু আসল বস্তু কোথায়? নিদ্রা জয় করেছি, সারাদিনে আধপোয়া দুধ আমার একমাত্র আহার। চব্বিশ ঘন্টা মৌনে একাসনে বসে আছি। সবই তো হল কিন্তু যার জন্যে এলাম সে কোথায়? কোথায় তার সন্ধান? সকলে বলে, সদগুরুর আশ্রয় নাও, নইলে আর এক পা-ও অগ্রসর হতে পারবেনা। কৃপা করে আপনি আমাকে উপদেশ করুন, কী করে আমার ব্রহ্মদর্শন হবে?'

কে এই মৌনীবাবা?

মৌনীবাবার পূর্বাশ্রমের নাম প্যারীলাল ঘোষ। আগে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক ছিলেন, গোঁসাইজির সঙ্গে প্রচারের উদ্দেশ্যে এককালে গিয়েছিলেন হিজলে-কাঁথি। সেখানে সেবার কী কাণ্ড!

বেড়াতে-বেড়াতে দুজনে এক দীঘির পারে এসে দাঁড়ালেন, বিজয়কৃষ্ণ আর প্যারীলাল। জলে অসংখ্য রক্তকমল ফুটে আছে। পদ্মের দিকে অনিমেষে তাকিয়ে আছেন বিজয়, খানিক পরে দেখলেন পদ্মের উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন কামিনী। এই সেই 'কমলে-কামিনী'—শ্রীমন্ত সওদা-গরের দৃষ্ট দেবী-প্রতিমা।

দেবীচরণলাঞ্ছিত সেই পদ্মটি ধরবার জন্যে বিজয়কৃষ্ণ জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সাঁতার কেটে এগুলেন পদ্মের দিকে। যেই পদ্মটি ধরলেন তাঁর

বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হল। উপায়? প্যারীলাল তখুনি লাফিয়ে পড়ল, বিজয়কৃষ্ণকে ধরে টেনে নিয়ে এল পারে। দেখ দেখ বিজয়ের মুঠোর মধ্যে সেই পদ্মটি ধরা।

প্যারীলালেরও দেবীদর্শন হল। তার সেই দেবীদর্শন বিজয়কে দর্শন করে। স্পর্শে কী এক প্রচণ্ড শক্তি বিজয় সঞ্চারিত করে দিয়েছে। পারে এসে বিজয় সুস্থ হলেও প্যারীলাল মূর্ছিত।

সেই থেকে প্যারীলালের মনে তীব্রতর বৈরাগ্য উপস্থিত হল। ব্রাহ্ম-সমাজের ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে সে আর ধরে রাখতে পারল না। নির্জন তপস্যার আকাঙ্ক্ষায় চলে গেল সে ওঙ্কারনাথে, নর্মদাতীরে। সেখান থেকেই তার চিঠি : কী করে ঈশ্বর দর্শন করব?

গোস্বামী-প্রভু নিজ হাতে উত্তর লিখলেন :

'বাইরে ধর্মলাভের জন্যে যা প্রয়োজন সবই হয়েছে, সাক্ষাৎভাবে জীবন্ত সদগুরুর নিকট দীক্ষিত না হলে ঈশ্বরদর্শনে অধিকার হয় না। ধ্রুব পাঁচ বছরের শিশু, বনে বনে পদ্মপলাশলোচন বলে কাঁদলেন, তবু গুরুকরণ না হওয়া পর্যন্ত দর্শন পেলেন না। যীশু জন দি ব্যাপটিস্টের কাছে দীক্ষিত, চৈতন্য ঈশ্বরপুরীর কাছে। আমি নিশ্চয় বুঝেছি গুরুকরণ ছাড়া ব্রহ্মদর্শন হয় না।

আহার যাবে, নিদ্রা যাবে, মৌনী হবেন, লোকে সাধু বলে ভক্তি করবে, তাতে প্রকৃত বস্তু লাভ হবে না। যদি ব্রহ্মদর্শন করতে চান তবে অন্তরের সমস্ত পূর্ব সংস্কার দূর করুন। গুরুকরণেই সমস্ত বাসনা দূরীভূত হবে আর তখনই দর্শন সম্ভব।

এখন, এ অবস্থায়, অন্তরে যে বাসনা আছে তা পাবেন, ব্রহ্ম পাবেন না। ধর্মপ্রচার প্রভৃতি বাসনাও ছাড়তে হবে। নিজের ইচ্ছেয় কোনো কার্য করবেন না। যতক্ষণ নিজের ইচ্ছে আছে ততক্ষণ ব্রহ্ম-সহবাস অনেক দূর।

আপনার পত্র পেয়ে সুখী হলাম। মানুষ নিজের চেষ্টায় যতদূর করতে পারে তাই আপনি করেছেন। এখন গুরুকরণ ছাড়া অগ্রসর হতে পারবেন না। ভগবান সমস্ত কাজ নিয়মে করেন। বাহ্যজগতে কোনো কাজ যেমন অনিয়মে চলে না, সেরূপ অন্তর্জগতেও নিয়ম ছাড়া চলে না। ব্রহ্মদর্শনের পক্ষে সদগুরুর আশ্রয় গ্রহণ অব্যর্থ নিয়ম। আপনাকে বড় ভালোবাসি, তাই এত লিখলাম।'

প্যারীলালের—মৌনীবাবার কোথায় সেই সদগুরু?

কয়েক বছর পর গোঁসাইজি যখন প্রয়াগে এসেছেন কুম্ভমেলায় যোগ দিতে তখন মৌনীবাবার আরেকখানা চিঠি এসে পৌঁছুল। সে চিঠি আর্তি দিয়ে ভরা এক অকূল আকুলতার চিঠি।

'তিনিই বর্তমানে আমাকে এই অবস্থায় এনেছেন। তিনিই আমার সম্পূর্ণ রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, বিধানকর্তা, শিক্ষাদাতা, উপদেষ্টা—এক

কথায় তিনিই আমার সর্বস্ব প্রতিদিনের ঘটনাদ্বারা তাই জানাচ্ছেন। আমার ফলাকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ করেছেন। আমার জন্যে তপস্যাস্থান প্রস্তুত করে দিয়েছেন। নিজে প্রত্যহ আমার জন্যে আধসের দুধ আর আধপোয়া চিনি আমার স্থূল শরীর রক্ষার্থে প্রেরণ করেন এবং এই আহারই আমার পক্ষে উপযুক্ত করেছেন। আমার হৃদয়ের অপবিত্রতা দিন দিন অপসারিত করছেন। আমার নিদ্রা প্রায় পূর্ণরূপে হরণ করেছেন। বদ্ধ পদ্মাসন আমার আসন করে দিয়েছেন। আমার মনের উদ্বেগও আর নেই, কেবল ভক্ত সঙ্গে প্রেমতরঙ্গে মেতে তাঁর নাম-গান করবার প্রবৃত্তি, ধর্ম প্রচার করবার প্রবৃত্তি আর এই পাঁচ বছর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁর যে অপূর্ব করুণা লাভ করেছি তা বলবার প্রবৃত্তি আমার মনকে চঞ্চল করছে। আপনি বলে দিন আমার প্রতি আমার পিতার আদেশ কি? কি হলে আমি তাঁতে নিমগ্ন হয়ে যেতে পারব? আপনি ধ্যানযোগে আমার মঙ্গলামঙ্গল সমস্তই জানতে পারছেন। আপনি ছাড়া আর কারু উপর বিশ্বাস আনতে পারছি না। এ পর্যন্ত ভগবানের কৃপা ছাড়া গুরুরূপে আর কাউকেও গ্রহণ করিনি, পিতা স্বয়ং না দিলে গ্রহণ করতেও ইচ্ছা নেই। এই পাঁচ বছর আপনার জন্যে কেঁদেছি, কিন্তু কোথায়, সন্তানকে তো দেখা দিলেন না।

এখন আবার আপনার চরণে পড়ে কাঁদছি, কি হলে হৃদয়মাঝে ভগবানকে দেখতে পাব তা বলে দিন। কত মহাত্মা মহাপুরুষের কাছে নিত্য চোখের জল ফেলেছি, কথাও বলেননি, আপনার কাছেও কত কাঁদলাম, আপনিও নীরব। বুঝেছি পিতার দয়া না হলে কেউই দয়া করে না। মূল প্রস্রবণ থেকে যতক্ষণ দয়ার স্রোত না আসে ততক্ষণ সমস্ত স্রোতই বন্ধ থাকে। আমার শরীরের যে অবস্থা, তাতে দেশে-দেশে গুরু-গুরু করে বেড়াতে পারব না। আপনি যদি না দেবেন তবে এ স্থানেই দেহরক্ষা করে পিতার রাজ্যে চলে যাব।

অধিক লেখা বাহুল্য। মৌনব্রতও প্রায় আড়াই বছর গ্রহণ করেছি। গীতাজি, ব্রাহ্মধর্ম, উপনিষদ এবং বাইবেল পাঠ্য, একবার দুগ্ধপান, একবার মলত্যাগ এবং শৌচাদি কর্ম ভিন্ন আর কর্ম নেই। শয়ন করে নিদ্রা যাওয়া প্রায় পরিত্যাগ করেছি। সমস্তই পিতা করছেন কিন্তু যার জন্যে এ সমস্ত, তিনি কোথায়? তিনি কোথায়? ইতি আপনার—অনুগত সন্তান, প্যারীলাল —মৌনীবাবা।'

মৌনীবাবার চিঠি আদ্যন্ত পড়লেন গোঁসাই। বললেন, 'মৌনীবাবা অত্যন্ত পীড়িত, এখানে আসবার তাঁর ক্ষমতা নেই। আমাকেই ওঙ্কারনাথে যেতে হবে।' বলে চোখ বুজে স্থির হয়ে রইলেন।

ওঙ্কারনাথে যাবেন! সে কবে?

পরদিন ভক্তসেবক জিগগেস করল, 'ওঙ্কারনাথে কী করে যাবেন?'

গোস্বামী-প্রভু মৃদু হাসলেন, বললেন, 'তার যাবার দরকার নেই।

মৌনীবাবার দীক্ষা হয়ে গিয়েছে।'

বিঘ্ন কী? বিঘ্ন এই যে নামে রুচি হয় না। চারদিকে দুঃখকষ্ট রোগশোক অভাব দারিদ্র্য—সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বসেই নাম করতে হবে। প্রহ্লাদচরিত্রই তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। আহার্যে বিষ, আগুনে সমুদ্রে হস্তীপদতলে নিক্ষেপ—চারদিকে বিপক্ষ, অস্ত্রাঘাত, দৌর্জন্য—সহায় কেবল হরিনাম।

গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'প্রথমে যন্ত্রণায় শুকিয়ে-শুকিয়ে নীরস হবে। বিষয়রস একবিন্দু থাকতে ব্রহ্মানন্দ আসে না।'

'বিষয়রস যাবে কিসে?' কে একজন প্রশ্ন করল।

'শুধু নাম করে, শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করে।'

বালক নরেন ঘোষ প্রভুতে খুব অনুগত, বয়সে অল্প হলেও অনেক জ্ঞান ধরে! দিব্যকান্তি, বচনে সুধা ঢালা, ভক্তিতে ভরপুর। যা প্রশ্ন করে প্রভু তাই গম্ভীর মুখে উত্তর দেন।

'আপনাকে যখনই স্মরণ করি আপনি বুঝতে পারেন?' প্রশ্ন করল নরেন।

'পারি।' উত্তর দিলেন গোস্বামী।

'গুরু কি সর্বত্র বিদ্যমান?'

'হ্যাঁ, সর্বত্র।'

'আচ্ছা, আপনার কাছে সাধন নিলে নাকি রিপুর উত্তেজনা বাড়ে?'

'যেমন নির্বাণকালে আগুনের তেজ বাড়ে।'

'রিপুর উত্তেজনা বাড়লে উপায়?'

'নামের উত্তেজনা বাড়ানো। নামের কাছেই কাম জব্দ।'

'দেখুন, কেউ-কেউ আপনার নিন্দে করে।' বালক বললে কাতর মুখে, 'শুনলে আমার বুক ফেটে যায়, কিন্তু কী ভাবে এর প্রতিকার করব বুঝতে পারি না।'

গোঁসাইজি বললেন, 'চুপ করে শুনে যাবে, জিহ্বাগ্রেও প্রতিবাদবাক্য আনবে না। যদি একান্তই অসহ্য হয় স্থানান্তরে চলে যাবে। শুধু নামাশ্রয় করে থাকবে। যে নামাশ্রয়ী তার কেউ ক্ষতি করতে পারে না। না, সাপ-বাঘও নয়, প্রেত-পিশাচও নয়।'

'আচ্ছা, শ্রীচৈতন্য কে?' বালকের সরল অথচ অগাধ প্রশ্ন : 'তিনি কি স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ?'

'হ্যাঁ, তিনিই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি নারায়ণ, যোগমায়া অবলম্বন করে মানুষরূপে পৃথিবীতে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।'

'নিত্যানন্দ কে?'

'অংশাবতার। বলরাম।'

'অদ্বৈত কে?'

'অংশাবতার। মহাবিষ্ণু। দুইজনেই গৌরাঙ্গলীলার সাথী।'

'গৌরাঙ্গলীলাই বোধহয় শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তখন দুই অংশাবতার আর স্বয়ং অবতীর্ণ।'

'হ্যাঁ,' বললেন গোস্বামী-প্রভু, 'এমন লীলা আর হয়নি।'

'কিন্তু পৃথিবীর কতটুকু জায়গা জুড়ে!'

'সে লীলার শেষ এখনো হয়নি। দেখছ সকল সম্প্রদায়েই এখন কেমন মৃদঙ্গ বাজছে। সমস্তই মৃদঙ্গময় হয়ে যাবে।'

'আপনি একবার আমাদের দেশে চলুন।'

'ভগবান যখন নেবেন তখন যাব।'

বালকের বাড়ি বানরিপাড়া, বরিশাল। বাড়ির লোক যখন জানল নরেন বিজয়কৃষ্ণের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে এসেছে, সবাই ক্ষেপে গেল। যেহেতু বিজয়কৃষ্ণ একদা ব্রাহ্ম ছিলেন সেহেতু ঘোষ পরিবার তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ ছিল না। নরেনের উপর নিগ্রহ সুরু করল। চরমতম হল যখন বিজয়কৃষ্ণের ফটো নরেনের ঘর থেকে সরিয়ে নিল। শুধু তাই নয়, ভেঙে দিল টুকরো টুকরো করে।

কান্নায় ভেঙে পড়ল নরেন। প্রভুকে বললে, 'আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।'

নরেনের কলেরা হল।

মৃত্যুকালে প্রভু সন্ন্যাসীরূপে দেখা দিলেন।

'জয়গুরু। জয়গুরু।' উচ্চে ধ্বনি তুলে চিরতরে নীরব হয়ে গেল নরেন।

তখন শোকে সমস্ত পরিবারের টনক নড়ল। বাপ নারায়ণ ঘোষ পাগলের মত হয়ে গেলেন। পিতৃব্য যোগেন ঘোষ প্রভুর চরণে গিয়ে পড়ল। বললে, 'আমরা অবিশ্বাসী, আমরা আপনার মহিমা বুঝতে পারিনি, আমাদের মার্জনা করুন। পাষণ্ডদের শাস্তি দেবার জন্যেই আপনি কেড়ে নিয়েছেন নরেনকে। আপনার চরণে আমাদের শুধু এই ভিক্ষা, একবার তাকে দর্শন করিয়ে দিন।'

গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'তা হয় না। আপনাদের এখন শোক সংবরণ করা দরকার। তাকে দেখলে আপনাদের শোক আরো বেড়ে যাবে। যাকে আর ফিরে পাবেন না তাকে আর অনুসন্ধান কেন?'

এক বাউল আসে আশ্রমে। অহঙ্কারের স্তূপ। কুতর্কের কণ্টক।

'জানেন আমার কুড়ি-পঁচিশ হাজার শিষ্য।'

'হবে।'

'তারা সকলেই আমাকে অবতার বলে।'

'ভালো কথা।'

'কিছু না জেনে শুনেই যে বলে তা বলা যায় না।'

'না, তা কি করে বলা যায়?'

'আপনার দৃষ্টি অনেক পরিষ্কার হয়েছে।' বাউল এগিয়ে এল : 'আপনি আমার মধ্যে কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন?'

'কই, বিশেষ কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।' গোঁসাইজি বললেন।

'দেখতে পাচ্ছেন না? তাহলে আপনার দৃষ্টি এখনো পরিষ্কার হয়নি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ চান? এই দেখুন।' বাউল আরো এগিয়ে এসে তার নাকের ডগায় একটি ছোট্ট তিল দেখাল। বললে, 'কী, পেলেন তো প্রমাণ?'

গোঁসাইজি স্তব্ধ হয়ে রইলেন। কিন্তু আশপাশের লোক উচ্চ হাস্য করে উঠল। বাউল লজ্জিত মুখে প্রস্থান করলে।

বাউল ক্ষান্ত হয় তো তার শিষ্য ক্ষান্ত হয় না।

'তোমার বুঝি শহরে কলকে মিলল না তাই এই জঙ্গলে আশ্রম খুলে বসেছ!' গোস্বামী-প্রভুর উপর সে মুখিয়ে এল : 'বেহ্মজ্ঞানী আবার সাধু সেজেছ। অদ্বৈতবংশের কুলাঙ্গার, পৈতে ফেলে জাতিধর্মভ্রষ্ট হয়ে লোকের সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছ! গোঁসাইরা কে কবে পৈতে ফেলেছে?'

চোখ বুজে বসে ছিলেন গোঁসাইজি, হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। প্রচণ্ড স্বরে ধমকে উঠলেন : 'পৈতে নেই বলছ, সোনার পৈতে আছে। দশ গণ্ডা পৈতে এখুনি বের করে দিতে পারি। কিন্তু তুই কী করে দেখবি? তুই যে অন্ধ।'

যদুবাবু নামে একটি সাধু প্রকৃতির লোক সেখানে বসে ছিলেন। হঠাৎ এ দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন : এ কি রে! আর সঙ্গে-সঙ্গেই পড়লেন মূর্ছিত হয়ে।

আর সেই বাউল শিষ্য সোজা ছুটে পালাল।

জদুবাবু গৃহে স্থানান্তরিত হয়েছেন, সমস্ত আশ্রমে শান্তি ফিরে এসেছে. সবাই প্রভুকে জিগগেস করলে, 'আপনার এ রুদ্র রূপের কারণ কী?'

গোস্বামীজি হাসলেন, বললেন. 'ও আমি নয়, আরেকজন। ভগবানের আশ্রিতজনের উপর কোনো প্রকার অত্যাচার অপমান হলে মহাপুরুষেরা তা সহ্য করেন না, গুরুতর শাসন করেন। যখন ঐ লোকটা এসেছিল তখন একজন মহাপুরুষ আসনের কাছে বসে ছিলেন। তিনিই দৃপ্তকন্ঠে আমার মুখ দিয়ে ঐ লোকটাকে শাসন করেছিলেন, তাঁর একটা কথাও আমার নয়।'

পরদিন যদুবাবু এলে তাকে জিগগেস করা হল : আপনি কী দেখলেন?

'ওরে বাবা, সে কী ভীষণ মূর্তি! লোকটা যখন গোঁসাইকে গালাগালি করছিল দেখলাম এক গৌরবর্ণ তেজস্বী ব্রাহ্মণ গোঁসাইয়ের ডান দিকে এসে দাঁড়িয়েছে আর প্রচণ্ড কন্ঠে বলছে, পৈতে নেই, সোনার পৈতে আছে। তুই দেখবি কী করে, তুই যে অন্ধ। এ দাউ-দাউ করে জ্বলা আগুনের মত লোকটা কোথেকে এল! দেখে শুনে আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম!'

স্বর্ণময়ীর পাগলামি দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। সেদিন আশ্রমের আমতলায় বহু গণ্যমান্যের সমাগম হয়েছে, গোস্বামী-প্রভু সকলের সঙ্গে ধর্ম প্রসঙ্গ করছেন, হঠাৎ সেখানে পাগলী গান গাইতে গাইতে এসে পরিধানের

বস্ত্র মাথায় বেঁধে নাচতে সুরু করলেন। প্রভুর হর্ষোৎফুল্ল চোখ ছল ছল করে উঠল। আর দেখ কী অপূর্ব দৃশ্য, ভক্তিগদগদ ভাবে প্রভু উলঙ্গ মায়ের নৃত্যের সঙ্গে তুড়ি দিয়ে তাল দিচ্ছেন!

কতক্ষণ পরে স্বর্ণময়ী চলে গেলেন অন্য দিকে। সকলেই এই দৃশ্য দেখে অবাক। গণ্যমান্যদের মধ্যে ছিলেন হরিনারায়ণ রায়, বললেন, 'এই একটি ঘটনা দেখেই আমি গোঁসাইকে চিনে নিলাম। আর কোনো সংশয় বা পরীক্ষা করবার প্রবৃত্তি রইল না। মানুষ কখনো কি এরকম করতে পারে?'

কুলদানন্দকে প্রায়ই তাড়া করেন স্বর্ণময়ী। 'যেমন পেট ভরে খাস না, ভালো জিনিস খাস না, মহাপ্রাণীকে কষ্ট দিস, মৃত্যুকালে মহাপ্রাণী তোর মুখে লাথি মেরে চলে যাবে। ব্রাহ্মণের ছেলে, সারাদিন উপোস করে থাকিস? আমার ছেলের অকল্যাণ হবে। যাঃ, আশ্রম থেকে চলে যা।'

শেষে নিজেই তিনি চলে গেলেন।

বলে গেলেন তাঁর শ্রাদ্ধ যোগজীবন করবে।

আর সেই উপলক্ষে গোস্বামী-প্রভু চলে এলেন কলকাতা।

॥ ২৯ ॥

কলকাতায় মেছুয়াবাজার স্ট্রিটে অভয়নারায়ণ রায়ের বাড়িতে উঠলেন। গঙ্গাতীরে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে যোগজীবন যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ করলে। গোঁসাইও তিন গণ্ডূষ জল দিলেন মাকে।

বাসায় ফিরে আসতেই ভক্ত মুকুন্দ দাসের কীর্তন সুরু হয়ে গেল। মহাভাবে বিভোর গোঁসাই ঊর্ধ্বে হাত তুলে হুঙ্কার করে উঠলেন : 'জয় শচীনন্দন! জয় শচীনন্দন! কলি-জীবের আর ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।'

স্বর্ণময়ীর মৃত্যুতে অনেক পারলৌকিক তত্ত্ব প্রকাশ পেল গোঁসাইয়ের কাছে, তাই তিনি এবার ব্যক্ত করলেন।

'মা বিধুর কোলে দুধ খাচ্ছিলেন, এমন সময় আমাকে ডাকলেন। গিয়ে দেখি এখন বাইরে নেওয়া দরকার। বাইরে নিয়ে গিয়ে শোয়ালাম মাকে। মুখে সুন্দর শোভা ফুটল, মনে হল সমস্ত কষ্ট চলে গিয়ে শান্তি নেমে এসেছে। চারদিকে হরিনাম হচ্ছে, আমার দিকে তাকালেন। কেলে কুকুর এসে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল মাকে।'

'তারপর কী হল? দেহত্যাগের পর ঠাকুরমা কী করলেন? সাধারণ মানুষই বা দেহত্যাগের পর কী করে?' ভক্তশিষ্যের দল জিগগেস করল।

গোঁসাইজি বলতে লাগলেন, 'মৃত্যুর তিন ঘন্টা আগে আত্মা দেহ থেকে

বেরিয়ে এসে ঘরের মধ্যে ঘুরতে থাকে। দেহ ঘর থেকে বাইরে আনলে আত্মা ঊর্ধ্বে দৃষ্টি করে। দেখে তার পূর্বপুরুষেরা এসেছে। আত্মা যদি পুণ্যবান হয় পূর্বপুরুষেরা তাকে পিতৃলোকে বা মাতৃলোকে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে নিয়ে তারা একবছর আনন্দ করে। এক বছর পরে যার যেমন কর্ম তেমনি অবস্থা লাভ করে। ঐ এক বছর শ্রাদ্ধের ফলভোগ করে। পাপীদের কিন্তু ঐ এক বছরও পাপযন্ত্রণার থেকে নিস্তার নেই।'

'পরলোকে গিয়েও কি জীবাত্মার ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে?'

'আছে বৈ কি। জীবের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ—তিনি দেহেই ক্ষুধা তৃষ্ণা বর্তমান। স্থূল দেহ খাদ্যদ্রব্য প্রত্যক্ষ ভাবেই গ্রহণ করে, প্রতি গ্রাসেই তার পুষ্টি তুষ্টি ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়ে থাকে। সূক্ষ্ম দেহে কেবল আহার্য বস্তু দর্শন-মাত্রই তৃপ্তি হয়। কারণ-শরীর নিজে কিছু করতে পারে না, তাই কোনো ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ যদি আহার্য বস্তু নিয়ে নিজের জঠরাগ্নিতে হোম করে তবেই তার ক্ষুন্নিবৃত্তি।'

এদিকে বাড়িতে এত বেশি ভক্ত অতিথির সমাগম হয়েছে যে তাদের জঠরাগ্নির হোম বুঝি হয় না।

বাড়ির মেয়েরা বলাবলি করছে, 'কী হবে? আজকের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। এদিকে ভাঁড়ারে চাল বাড়ন্ত।'

কথাটা গোঁসাইয়ের কানে গেছে। তিনি মেয়েদের ডেকে বললেন, 'দেখ গে জালায় চাল আছে।'

'আমরা দেখে এসেছি, চাল নেই।' মেয়েরা বললে অপ্রতিভ হয়ে।

'আরেকবার গিয়ে দেখ।'

ঠাকুর বলেছেন তাই মেয়েরা দেখতে গেল। কিন্তু ও হরি, এ যে দেখি আদ্ধেক জালাই ভর্তি। এত চাল এরই মধ্যে এল কী করে? কোন পথ দিয়ে? কে নিয়ে এল? পেল কোথায়? কোন বাজারে?

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক নগেনবাবুর স্ত্রী বললে, 'সেবায় আমাদের গোয়াবাগানের বাসায় গোঁসাই তাঁর ভক্তদের নিয়ে উপস্থিত। দিন-রাত মহোৎসব চলল। এক খোরা দই, তাই দিয়ে তিন দিন মহোৎসব, কিন্তু দই ফুরোল না। গোঁসাইকে জিগগেস করলাম, এ কেমনতরো? তিন দিনেও যে দই ফুরোয় না। গোঁসাই বললেন, এ স্বয়ং মধুসূদন জোগাচ্ছেন, এ ফুরোবে কেন?'

কিন্তু বালিকা সত্যদাসীর এ কী কাণ্ড?

সত্যদাসী অভয়বাবুর ভাগ্নী, যুক্তবর্ণ পড়তে পারে না, অথচ বিশুদ্ধ সংস্কৃতে স্তব পড়ে, আবৃত্তি করে। পূর্বজন্মে কোন এক পাহাড়বাসী মহাপুরুষের কৃপা পেয়েছিল, সেই কৃপায় এ জন্মে মাঝে মাঝে তার গুরুস্মৃতি ঘটে। তখন গুরুর আসন সামনে রেখে সে পুজো করে। পুজো করতে করতে কখনো তার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। যখন স্তবস্তুতি করে তখন আসনে কখনো কখনো গুরুর পায়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

সেই সত্যদাসী গোঁসাইজিকে বললে, 'আপনি আমাকে দীক্ষা দিন।'

'সে কী, তোমার তো গুরু আছেন।'

'হ্যাঁ, তিনিই বললেন আপনার কাছ থেকে দীক্ষা নিতে। আমি তাঁকে বললাম, আপনি থাকতে অন্যের দ্বারস্থ হব কেন? তিনি বললেন, হতে হবে, তাই ভগবানের বিধান।'

গোঁসাইজি হাসলেন, বললেন, 'তোমার গুরুর আদেশ আমার শিরোধার্য। দেব তোমাকে দীক্ষা।'

দীক্ষা দেওয়ার সময় দেখা গেল সত্যদাসী আসন থেকে কিছুটা উপরে উঠে শূন্যে বসে আছে।

আরো অনেক সব অলৌকিক অবস্থা হয় সত্যদাসীর। তার বাপ-মা অভিভাবকেরা মনে করে এ সমস্ত ব্যাধি, চিকিৎসার জন্যে তারা ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়।

'ব্যাধি কে বলে? এসব দিব্য লক্ষণ।' বললেন গোঁসাই, 'একে যদি ব্যাধি বলা হয় তবে তাতে মহাপুরুষদেরই অবজ্ঞা করা হয়।'

নগেনবাবুর স্ত্রী মাতঙ্গিনী দেবী আবার বললেন, 'বাঁশবেড়ে ব্রহ্মমন্দিরের উৎসব উপলক্ষে যে কীর্তন হয়েছিল তাতে গোঁসাই যে নেচেছিল শূন্যে উঠে নেচেছিল।'

কিন্তু, ওসব থাক, আসল কথা হচ্ছে মনের স্থৈর্য। মনের একাগ্রতা।

'কিন্তু কী করে মন স্থির হবে? কী করে একাগ্র হব?' ভক্তের দল আবার গোঁসাইকে ঘিরে ধরল।

'ভগবান আছেন এটি একটি জ্বলন্ত বিশ্বাসে জাগ্রত রাখো।' বললেন গোঁসাইজি, 'তারপর স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন—এই তিন উপায় অবলম্বন করো। প্রথমে স্মরণ—সর্বস্থানে সর্বঘটনায় স্মরণ; দ্বিতীয় মনন, মনকে সর্বসময়েই সংযুক্ত করে রাখা, চোখ ফিরিয়ে না নেওয়া, আলো দেখলে সাপ যেমন আর চোখ ফেরাতে পারে না; তৃতীয় নিদিধ্যাসন, গরুর মতন জাবর কাটা, স্মরণে-মননে যা স্বাদ পেয়েছে বারে বারে তা সম্ভোগ করা। এই তিন একত্র হলেই একাগ্রতা।'

'কিন্তু মনের উপর কর্তৃত্ব আসেনা কেন?'

'কী করে আসবে? সব সময়ে মনে যে সঙ্কল্প বিকল্প হচ্ছে। এতেই তো মনের চঞ্চলতা, তাতেই আসেনা কর্তৃত্ব। এই সঙ্কল্প বিকল্পের কারণ দুটি ইন্দ্রিয়—জিহ্বা আর উপস্থ। উপস্থ লোকে অনায়াসে দমন করতে পারে কিন্তু জিহ্বাকে বশে আনাই কঠিন। কেউ নিন্দে করল কটু কথা বলল, জিহ্বা তক্ষুনি প্রতিবাদ করে বসল। নিন্দা প্রশংসায় চঞ্চল হবে না—জিহ্বাকে বশীভূত রাখা কি সামান্য কথা?'

'বশীভূত কী করে করি?'

'সাধুসঙ্গ করো, সর্বদা নিত্যানিত্যবিচার করো অর্থাৎ সংসারের অসারতা

চিন্তা করো, আর,' গোঁসাইজির কন্ঠ গাঢ় হয়ে উঠল, 'আর সর্বক্ষণ ভগবানের নাম জপ করো।'

শ্রাদ্ধ শেষে গোঁসাই আবার ফিরলেন ঢাকায়। বেশি দিনের জন্যে নয়, আবার চলে এলেন কলকাতায়, উঠলেন সুকিয়া স্ট্রিটে রাখাল রায় চৌধুরীর বাড়ি।

পোস্ট অফিসের ডেপুটি কনট্রোলার জেনারেল, উমাচরণ দাস এসে হাজির। বললেন, 'সেবার আপনি বলেছিলেন আমার বাড়িতে একদিন পায়ের ধুলো দেবেন। অনুমতি করুন, একদিন আপনাকে নিয়ে যাই। কবে যাবেন বলুন?'

'যেদিন বলবেন সে দিনই যাব।' এক বাক্যে রাজি হলেন গোঁসাই।

হ্যাঁ, সেবার কথা দিয়েছিলেন, কথার খেলাপ করবেন না। সত্য কথাই তো কলির ধর্ম।

সেবার সেই আশ্বিনের ঝড়ের কথা মনে নেই? দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে কথা দিয়েছিলেন সপ্তাহে দু-দিন, বুধবার আর রবিবার, সমাজের উপসনায় যোগ দেব। শুধু বিজয় নয়, কেশবসহ আরো কজন ব্রাহ্ম স্বীকার করে এসেছিল।

সেই প্রলয়ংকর ঝড়ে কে পথে বেরুবে? গাছ পড়েছে, পোস্ট উপড়েছে, নদী ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসেছে নৌকো। রাস্তায় এক গলা জল, যানবাহন নিশ্চিহ্ন।

বিজয় একবার ছাদে উঠেছিল আকাশ দেখতে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আজ বুধবার। আর কথা নয়, কোমর বেঁধে বাড়ির বার হয়ে গেল। রাস্তায় নদী বইছে, তাতে কী, সাঁতরে পার হয়ে যাব। মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে তাতে কী, যতক্ষণ আমি না মৃত হই জল ঠেলে এগিয়ে চলি।

ঠিক সমাজে গিয়ে পেঁাছুল বিজয়। বাড়ি-ঘর ভেঙে-চুরে গিয়েছে তবু বিজয়ের ব্রতভঙ্গ হয়নি।

আর কেউ গিয়েছিল?

'না, আর কেউ যায়নি। যখন ভাঙা ঘরে উপাসনা সেরে ফিরে আসছি দেখি কেশববাবু পাল্কিতে করে যাচ্ছেন।'

তখন একসঙ্গে গিয়ে আবার উপাসনা করল দু-জনে। সর্বভাবেই সংকল্প রক্ষা করল বিজয়।

উমাচরণ দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে দিল। আর সেই নির্দিষ্ট দিনক্ষণে নিতে এল গোঁসাইকে।

উমাচরণের বাড়ি পৌছুতে না পেঁাছুতে প্রবল জ্বর হল গোঁসাইয়ের। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এলেন। তিন দিন তিন রাত রইলেন প্রায় বেহুঁসের মত, প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি। পরে আবার আপনা আপনিই জ্বর ছেড়ে গেল।

'এ জ্বর ভোগের হেতু কী?' জিগগেস করল ভক্ত।

'গুরুবাক্যলঙ্ঘন।' গোঁসাইজি বুঝিয়ে বললেন, 'ঐ সময় পরমহংসজি একটা নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত আসন ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু উমাচরণবাবু এসে অনুরোধ করায় দ্বিধায় পড়লাম, এখন কী করি? নিজের বাক্য রক্ষা করে সত্যপালন করি, না, পরমহংসজির আদেশ পালন করে ঐ বাক্য অগ্রাহ্য করি। ভাবলাম সত্যপালন করাই বুঝি ঠিক হবে। না, গুরুদেব বুঝিয়ে দিলেন গুরুবাক্যলঙ্ঘন করে সত্যপালনও অপরাধ।'

মহরমের মিছিল যাচ্ছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছেন গোঁসাই। হাসেন হোসেন বলে বুক চাপড়ে কাঁদছে লোকেরা আর তাদের পিপাসাশান্তির জন্যে রাস্তায় জল ঢালছে। বেদনায় দ্রবীভূত হলেন গোঁসাই। বললেন, চলো আমরাও গিয়ে জল দিই।

কিন্তু যার বাড়িতে আছে সে রাখালবাবুকেই মেরে বসল মহেন্দ্র।

গোঁসাই ভিতর বাড়িতে গেছেন, এই ফাঁকে মহেন্দ্র তাঁর ঘর পরিষ্কার করতে লেগেছে। আসনের ধারের ফুল-পাতা ফেলে দিয়ে আসনের কিছুটা তুলে তার নিচেটা ঝাঁট দিতে যাচ্ছে, রাখালবাবু রুখে এলেন : 'এ কী করছেন? ঝাঁটা যে ঠাকুরের আসনে লগেবে।'

মহেন্দ্র রাখালের কথা গ্রাহ্যই করলনা।

'সে কী মশাই, শুনছেন না নাকি? আসনে যে ঝাঁটা লাগছে।' মহেন্দ্রের হাত থেকে রাখাল ঝাঁটাটা কেড়ে নিতে চাইল।

এতবড় স্পর্ধা! ক্রোধান্ধ মহেন্দ্র ঝাঁটা দিয়ে কয়েক ঘা বসিয়ে দিল রাখালকে।

রাখাল একেবারে স্তব্ধ। লাখুটিয়ার জমিদার, কত তার প্রবল প্রতাপ, একটা কড়ে আঙুলও তুলল না। মহেন্দ্র তো ঠাকুরেরই ভক্ত, তার অমর্যাদা ঘটাল না। কে জানে কেন এই প্রহার, কে জানে এই প্রহারে কোন অপরাধের স্খালন হল।

গোঁসাই শুনে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। বললেন, 'মহেন্দ্রবাবুর আচরণ অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। রাখালবাবু ইচ্ছে করলে অনায়াসে দারোয়ান দিয়ে অপমান করতে পারতেন, কিন্তু তা করেন নি। এতে বোঝা যাচ্ছে রাখালবাবু কত মহৎ, কী অমানুষিক তাঁর সহিষ্ণুতা!'

গোঁসাইকে মেনে রাখালবাবু আগে ব্রাহ্মমত ধরেছিলেন, এখন আবার সেই গোঁসাইকে মেনেই আরেক রকম হয়েছেন। এখন রোজ সকালে গায়ত্রী জপ করেন, পিতৃপুরুষের তর্পণও তাঁর নিত্যক্রিয়া।

একদিন গোঁসাইকে বললেন, 'কী দেখলাম বলুন তো।'

'কী দেখলে?'

'দেখলাম অন্তরীক্ষে একটি জ্যোতির্ময় গোলাকার চক্র।'

'হ্যাঁ, ওটা দেবতার ছাঁচ।' বললেন গোঁসাই, 'বিশেষ ভাবে স্থিরদৃষ্টিতে

তাকালে ওর মধ্যে দেবতার মূর্তি দেখা যায়।'

'আর দেখুন তো, সাধনকালে মাঝেমাঝে ধূপধূনা গুগগুলের গন্ধ পাই। এর অর্থ কী?'

'এর অর্থ আপনার কাছে কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে।' বললেন গোঁসাই, 'কোনো মহাপুরুষ এলে ওরকম সুগন্ধ পাওয়া যায়। ওটা তাঁদের গাত্রগন্ধ। কিন্তু শুনুন, এ কথা কাউকে প্রকাশ করবেন না। প্রকাশ করলে আর আসবেন না তাঁরা। ওঁদের আসতে দিন, ঐ গন্ধই ক্রমে ক্রমে আনন্দলোকে নিয়ে যাবে আপনাকে।'

'আচ্ছা, আপনার প্রতি আমার সঙ্কোচভাব যায় না কেন?' শিষ্য শ্যামাকান্ত একদিন জিগগেস করলেন গোঁসাইকে।

'নিজেকে যেমন পাপী মনে করেন আমাকেও তেমনি পাপী মনে করবেন, তাহলেই আর সঙ্কোচভাব থাকবে না।' গোস্বামী-প্রভু বলতে লাগলেন তন্ময়ের মতো : 'যেমন নন্দ-যশোদা গোপালকে দেখতেন তেমনি চোখে দেখবেন। শ্রীমতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ অনুগ্রহ দেখালে শ্রীমতী গর্বিতা হলেন, ফলে অন্তর্হিত হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তখন সখীদের নিয়ে শ্রীমতী কাঁদতে বসলেন, শ্রীকৃষ্ণকে তখন প্রকাশিত হতে হল। প্রকাশিত হয়ে করলেন রাস-লীলা। তখন শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীমতীকে দেখে সখীরা আত্মহারা, আবার সখীদের পাশে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে শ্রীমতী আত্মহারা। গুরু-শিষ্য সমান, গুরু-শিষ্য একত্র হয়ে কাঁদলেই ভগবান প্রকাশিত হন। তখন গুরু শিষ্যকে ভগবানের পাশে দেখে কৃতার্থ, আর শিষ্যও গুরুকে ভগবানের পাশে দেখে আপ্তকাম।'

আরেকজন সমবেত ভক্তদের দেখিয়ে বললে, 'এরা কি সবাই আপনার শিষ্য?'

'আমরা সবাই এক—সকলেই ধর্মার্থী হয়ে একত্র বাস করছি।'। বললেন গোঁসাই, 'ভগবানই একমাত্র গুরু। তিনিই একজনের মধ্য দিয়ে অন্যকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এই জন্যে গুরু যদি মনে করে আমি গুরু আর এ আমার শিষ্য তা হলেই গুরুর পতন।'

প্রতাপ মজুমদারের ছোট ভাই এসে হাত পেতেছে গোঁসাইয়ের কাছে। মানে কিছু পয়সা চায়।

গোঁসাই তাকে দিলেন কিছু পয়সা। প্রণাম করে লোকটা চলে গেল হৃষ্ট মনে।

রাখালবাবু বললেন, 'এ পয়সা দিয়ে তো ও মদ খাবে।'

'জানি।'

'জানেন? কী আশ্চর্য, জেনে শুনে একটা মাতালকে প্রশ্রয় দিলেন?'

সহানুভূতি-মাখানো সুরে প্রভু বললেন, 'ওর মদ যে এখন দারুণ প্রয়োজন। মদ না পেলে যে ওর এখন জীবনধারণ কষ্টকর হবে। একটা অভ্যাস করে

ফেলেছে, এখন আর তার কী করা!'

রাখালবাবু বুঝে উঠতে পারলেন না এ রহস্যের ব্যাখ্যা কী!

গোঁসাই তখন গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমি যদি ওকে পয়সা না দিতাম, ও চুরি করত। চুরির পাপ থেকে ওকে রক্ষা করলাম।'

ভবানীপুরে মনোরঞ্জন গুহের ছেলের অন্নপ্রাশনে গোঁসাই নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। আর এসেছে এক বামাচারী সাধু।

সাধুকে খেতে দেওয়া হয়েছে, সে বললে, 'ক্রিয়া না করে ভোজন করা যাবে না।'

'বেশ তো ক্রিয়া করে নিন।' সবাই বললে সাধুকে।

'ক্রিয়া করতে হলে কারণ লাগবে।'

সকলে বিরক্ত হল। এখানে কারণ মিলবে কোথায়? মদের আমদানি হলে ক্ষেপে যাবে অতিথিরা।

গোঁসাইজি শুনলেন। মনোরঞ্জনকে বললেন, 'এ সাধু অভ্যাগত। দেবতার মত এঁকে সেবা করবে। যা উনি চান তাই এনে দেবে।'

'উনি যে মদ চান।'

'হ্যাঁ, মদ নিয়ে এসেই এঁর চিত্ত বিনোদন করবে।'

গুরু-আজ্ঞা মানল মনোরঞ্জন। তন্ত্রমতে সাধু ক্রিয়া করলেন। ক্রিয়ার শেষে ফুল্ল মনে বসলেন ভোজনে।

হঠাৎ মাঝরাতে উঠে গোঁসাই কুলদাকান্তকে বললেন, 'দারুণ খিদে পেয়েছে, শিগগির কিছু খেতে দাও।'

কুলদা সামনে খাবার নিয়ে এল। তাই খেয়ে আবার শুয়ে পড়লেন গোঁসাই।

কী রহস্য তা কে জানে!

জানে শুধু সেই মাদারিপুরের শিষ্যটি যে প্রভুকে দর্শন করবার জন্যে গৃহ থেকে যাত্রা করেছে। প্রতিজ্ঞা করেছে গুরুদেবের দর্শনের আগে জল গ্রহণও করবে না। সারাদিন স্টিমারে অভুক্ত কাটিয়ে ঘোর সন্ধ্যায় গোয়ালন্দে পৌঁচেছে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় সমস্ত দেহ ভেঙে পড়ছে তবু প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হচ্ছে না। রাত দশটায় গোয়ালন্দ থেকে কলকাতার ট্রেন ছাড়ল, ট্রেনের কামরার একটা বেঞ্চির উপর শুয়ে শিষ্য ক্ষুধার যন্ত্রণায় ককাতে লাগল, তবু, না, কিছু খাব না। প্রাণ যদি যায় তো যাবে, প্রভুকে দর্শনের আগে দেহের আবার খাদ্য কী!

মধ্যরাত্রে শিষ্যের হঠাৎ মনে হল, ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছু নেই, সমস্ত দেহে অগাধতৃপ্তি, দু চোখ ভরে সুস্থ শান্ত সুনিদ্রা।

কে ক্ষুধামোচন করল? কে এনে দিল উপশম?

পরদিন মধ্যাহ্নে শিষ্য এসে হাজির। প্রভুকে দর্শন করে প্রণাম করে দাঁড়াতেই প্রভু তাকে তাঁর প্রসাদের থালা এগিয়ে দিলেন।

কী আশ্চর্য, প্রভুর কৃপায়, এখন, হ্যাঁ, এখুনিই শিষ্যের প্রথম ক্ষুধাবোধ হচ্ছে।

যাঁর ক্ষুধা তাঁরই তৃপ্তি।

॥ ৩০ ॥

গোঁসাই প্রভু বললেন, আমি এবার কুম্ভমেলায় যাব।

'সেখানে কেন?' ভক্ত জিগগেস করল।

'অতি প্রাচীন কজন মহাপুরুষ এবার কুম্ভমেলায় আসবেন, তাদের দেখতে যাব।'

গ্যাণ্ডেরিয়ার আশ্রমে এসে কুলদানন্দ দেখল সমস্ত নিঝুম। যে আশ্রম সর্বদা ভজনে-কীর্তনে মুখরিত ছিল তা এখন প্রায় জনমানবশূন্য। সমস্ত আকাশ বাতাস দীনমলিন।

গোঁসাই কোথায়?

গোঁসাই প্রয়াগে গিয়েছেন, ত্রিবেণী সঙ্গমে।

'আপনি এলেন, আমাদের গোঁসাই কই?' পাড়ার স্ত্রী-পুরুষ ছুটে এল কুলদাকে দেখে : 'গোঁসাই কবে আসবেন?'

'গোঁসাই ছাড়া আমাদের দিন যে কাটে না।'

'গোঁসাই ভালো আছেন তো?'

'বৃন্দাবনে কি আর ফিরবেন না শ্রীকৃষ্ণ?'

কুলদানন্দ বললে, 'আমি যাইনি প্রয়াগে। এবার যাব। তোমাদের কাছে প্রভুর সংবাদ এনে দেব।'

নিষ্প্রাণ আশ্রম, নিস্তেজ জীবনযাত্রা। সকালবেলা দেবী যোগমায়ার একবার পুজো হয়, ঠাকুরের ভজনকুটিরে একটু ধুপধুনো জ্বলে, সন্ধ্যায় নিয়ম রক্ষার আরতি। আরতির সময় কেউ বিশেষ আসে না। যদি বা কেউ আসে আমতলায় মন্দিরের রোয়াকে বা পুকুরের ধারে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে যায়। সকলের মুখ বিষণ্ণ, দৃষ্টি উদাস, মন-প্রাণ স্বস্তিহীন।

যে গাছের নিচে গোঁসাই রোজ দাঁড়াতেন, পত্রমর্মরে তার অন্তরের কথা শুনতেন, সেই গাছ পাতা ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। যেখানে পাখিদের জন্যে চাল ছড়িয়ে দিতেন সেখানে ঘাস গজাচ্ছে। এখন চাল ছড়িয়ে দিলেও পাখিদের আর দেখা নেই। গাছেও আর পাখি বসে না। যেখানে নামগান নেই সেখানে পাখিরা কার কাকলি করবে? গাছ নেই পাতা নেই চাল নেই পাখি নেই।

কুলদানন্দ প্রয়াগ চলল। কুঞ্জ আর অশ্বিনী সঙ্গী হল।

এলাহাবাদ স্টেশনে নেমে তিনজনে একটা গাড়ি নিল। গাড়োয়ান

জিগগেস করল, 'কোথায় যাব?'

অশ্বিনী কুঞ্জকে ঠেলা মারল : 'বল না কোথায় যাবে?'

'তুই বল না—' কুঞ্জ পালটা গ‍ুঁতো মারল।

'আহা, গোঁসাই কোথায় আছেন তা বলবি তো?

'তোকেও তো তাই বলতে বলছি গোঁসাই কোথায় আছেন—'

এ নিয়ে তুমুল ঝগড়া। এ বলে তুই বল, ও বলে তুই বল। এ বলে তোর বলতে বাধা কী, ও বলে তোরই বা কোন বাধা?

ঝগড়ার কিনারা হয় না দেখে কুলদা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

'একি তুই নেমে যাচ্ছিস কেন?' অশ্বিনী চেঁচিয়ে উঠল : 'গোঁসাই কোথায়!'

'গোঁসাই সর্বত্র।' বলে কুলদা রাস্তার পাশে একটা গাছের নিচে আসন করে বসল।

'শালারা সব হস্তিমূর্খ।' তড়পে উঠল অশ্বিনী : 'গোঁসাইয়ের কাছে যাবে বলে বেরিয়েছে অথচ তাঁর ঠিকানা জেনে আসেনি।'

'তুইও তো তো বেরিয়েছিস তুই কেন আনিস নি?' পালটা হুঙ্কার ছাড়ল কুঞ্জ।

'বা, আমি তোর সঙ্গে এসেছি, আমি কী জানি। তুই যেখানে যাবি আমিও সেইখানে যাব।'

'চমৎকার। এদিকে আমিও তো তোর উপরে ভার দিয়ে বসে আছি। তুই যেখানে নিয়ে যাবি নিশ্চিন্ত মনে সেইখানে গিয়ে উঠব।'

'এখন কী করা! ও-ওতো ঠিকানা জানে না, দিব্যি গাছতলায় গিয়ে বসেছে।'

'না, না, বসতে দেওয়া হবে না, চল রাস্তা ধরে বেরিয়ে পড়ি। পথই আমাদের পথ দেখাবে।'

গাছতলা থেকে তুলে নিল কুলদাকে। চলো রাস্তায় জিগগেস করতে-করতে পেয়ে যাব ঠিকানা।

'চলো আমরাই তাঁকে খ‍ুঁজছি না, তিনিও আমাদের খ‍ুঁজছেন।' কুলদা উঠে পড়ল।

কিন্তু রাস্তায় কাকে জিগগেস করবে? শীতের রাত, দশটা প্রায় বাজে, রাস্তায় লোকজনই বা তেমন কোথায়? যেকজন বা প্রশ্ন শুনে দাঁড়ায় কোনো হদিস দিতে পারে না।

অজানা পথ, শীত, ঘাড়ে বোঝা, নিরুদ্দেশের মত চলতে লাগল সবাই।

'আর কত হাঁটব? আর কত?'

হঠাৎ রাস্তার দক্ষিণ দিকের একটা বাড়ি থেকে কে বলে উঠল : 'ব্রহ্মচারী, আমি এইখানে।'

এ কী, গোঁসাইপ্রভুর কন্ঠস্বর!

দরজা খুলে গেল। মিলে গেল ঠিকানা। মিলে গেল ঠাকুর। আর কী, প্রণাম করো, পেট পুরে ভোজন করো, তারপর সুখে নিদ্রা দাও।

পরদিন বিকেলে গোঁসাই-প্রভু সবাইকে নিয়ে চললেন গঙ্গাতীর। আর এই তো ত্রিবেণী—গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলনক্ষেত্র। গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী যমুনা পূর্ববাহিনী আর সরস্বতী অন্তঃসলিলা। দুই নদীর মাঝখানে বিস্তীর্ণ চড়া, সেখানে যত রাজ্যের সাধু সন্ন্যাসী এসে ভিড় করেছে। বৈষ্ণবরাও এসেছে দলে-দলে। নানকসাহী উদাসীরাও কম যায় না। শুধু তাই? এসেছে কবীর-পন্থী, গোরোখনাথী, নির্বাণী, নিরঞ্জনী। কেউ কুঁড়েঘর বানিয়েছে, কেউ আছে তাঁবুতে, কেউ বা শুধু ছাতার নিচে, আবার কেউ বা সম্পূর্ণ অনাবৃত হয়ে, ধুনি জ্বালিয়ে। কেউ গৈরিকধারী, কারু বা শুধু কৌপীন আর বহির্বাস, কেউ বা শুধু ভস্মের আচ্ছাদনে। যেন বসে গেছে নৈমিষারণ্যের ঋষিসভা।

গোঁসাই-প্রভু শিষ্যদের নিয়ে নাম গান করতে এগোতে লাগলেন।

'নাম-ব্রহ্ম নাম-ব্রহ্ম নাম-ব্রহ্ম বল ভাই।
হরিনাম বিনা জীবের আর গতি নাই ॥'

কে এই পুরুষোত্তম? সাধুদের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে গেল। হরিনামের এমন সিংহনাদ তারা কেউ শোনেনি। সবাই তাঁর পদধুলি নেবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। এমনটি বুঝি আর কেউ আসেনি এবার।

হঠাৎ একজন খর্বাকৃতি জ্যোতিষ্মান মহাপুরুষ ছুটে এল গোঁসাইয়ের কাছে, 'আও মেরে প্রাণ' বলে গোঁসাইকে জড়িয়ে ধরল। মহাপুরুষের সর্বাঙ্গে মহাভাববিকার দেখা দিল, সুরু হল অশ্রুবর্ষণ।

ক্ষণকাল পরে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হলেন মহাপুরুষ আর নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

'উনি কে?' জিগগেস করল মহেন্দ্র।

গোঁসাইজির দুচোখ ছলছল করে উঠল। বললেন, 'উনি আমার গুরুদেব, পরমহংসজি।'

'পরমহংসজি তো গৌরবর্ণ কিন্তু তাঁকে তো শ্যামবর্ণ দেখলাম।'

'তিনি অন্যদেহ আশ্রয় করে প্রচ্ছন্নভাবে এসেছিলেন।'

পরদিন গোঁসাইজি বেণীমাধব দর্শন করলেন। এক টাকার বাতাসা কিনে ভোগ দেওয়ালেন। বললেন, 'এইখানে কিছুদিন ছিলেন মহাপ্রভু। আর ঐ যে দশাশ্বমেধ ঘাট দেখছ ঐখানে তিনি রূপ গোস্বামীকে দশ দিন ধরে শিক্ষা দিয়েছিলেন।'

গোসাইজি ঠিক করেছেন বাড়িতে আর থাকবেন না, চড়ায় গিয়ে থাকবেন আর সাধুসন্তদের ভাণ্ডারা দেবেন।

গোয়ালিয়রের প্রাক্তন মন্ত্রী দীনকার রাও তাঁবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। চড়ায় খাটানো হয়েছে। তিরিশ-চল্লিশজন ভক্ত শিষ্য থাকতে পারবে। শুধু মেয়েরাই বাড়িতে থাকবে। আসা-যাওয়া করবে।

কিন্তু এতগুলো ভক্ত শিষ্যের চলবে কী করে? তারা খাবে কী?

'আমি ভিক্ষে করে খাওয়াব।' বললেন গোঁসাই-প্রভু, 'খাওয়াবার ভার আমার উপর।'

প্রথম দিনেই প্রায় পৌনে দুশো টাকা মিলে গেল। সবাই ভাবল এ নিয়ে দিনকতক বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যাবে, কিন্তু গোঁসাইজি বললেন, 'মনে রাখবে আমার আকাশবৃত্তি। দিনের জিনিস দিনেই ব্যয় করে ফেলব, পরের দিনের জন্যে সঞ্চয় করে রাখব না।'

সাধুদের মধ্যেই আবার কত ভিক্ষুক। মহারাজ, দুরোজ কিছু খাইনি। মহারাজ, ধুনির কাঠ নেই। কেউ বললে, জল খাবার লোটা নেই। কেউ বললে গাঁজা কিনতে পাচ্ছি না, ভজন বন্ধ হবার উপক্রম। কেউ বললে, প্রচণ্ড শীতে মারা যাচ্ছি, একটা করে কম্বল কিনে দিন।

সব টাকা সন্ধ্যের আগেই নিঃশেষ করে দিলেন গোঁসাই।

কিন্তু দেখি কাল তিনি কেমন করে খাওয়ান!

ভোরবেলা এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক হাজির। 'স্বামীজি, যদি কৃপা করে আদেশ করেন সেবার জন্যে কিছু পাঠিয়ে দিই।'

গোঁসাইজি সম্মতি দিলেন। দুটো মুটের মাথায় প্রচুর জিনিস এসে উপস্থিত ছিল। চাল ডাল আটা ঘি থেকে সুরু করে দুধ দই মিষ্টি মায় তামাক টিকে পান শুপুরি।

গোঁসাইজি বলে দিলেন, 'আজকের মত রেখে বাকি সমস্ত কাঙালীদের বিলিয়ে দাও। আকাশবৃত্তির কথা ভুলো না। একটা জিনিসও যেন কালকের জন্যে না থাকে।'

দেখি কাল কে পাঠায়! কাল কী করে খাওয়ান সবাইকে।

কালকের কথা কালকে।

চলো মাধোদাস বাবাজিকে দেখে আসি।

মাধোদাসের আশ্রমে মহাপ্রভুর মন্দির। গোঁসাই গিয়ে দাঁড়াতেই মাধোদাস সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়লেন। গোঁসাই মহাপ্রভুর সামনে সাষ্টাঙ্গ হলেন ও সাধুর পদধূলি নিলেন। দুজনে বসলেন বারান্দায়। মাধোদাস বললেন, 'আপনি যে আজ এখানে আসবেন তা অমি জানতাম।'

'কী করে জানতেন?'

'পুজোর সময় মহাপ্রভু আমাকে বলে দিলেন, বিজয় আজ আমাকে দেখতে আসবে। ওর জন্যে আমার প্রসাদ রেখে দিস।'

'কই দিন।' গোঁসাই হাত পাতলেন।

মালপো আর লাড্ডু প্রসাদ এনে দিলেন মাধোদাস। গোঁসাই নিজে কিছু নিয়ে বাকিটা ভক্তদের বিলিয়ে দিলেন।

'আমরা চড়ায় যাচ্ছি, আপনি আশীর্বাদ করুন।'

সাধু হাসলেন. বললেন, 'বীজ তুমিই বুনেছ, এখন গাছ হোক ফুল-ফল

ধর্ক, সব তোমার।'

'এই মাধোদাস কে?' জিগগেস করল মহেন্দ্র।

'আমার গ্রুভাই। তিরিশ বছর ঐ নির্জনে বসে ভজন করছেন।' বললেন গোসাইজি, 'কোথাও যান না। কেউ তাঁর খবর রাখে না।'

গোঁসাইয়ের তাঁবুর বাইরে প্রশস্ত দরজায় লেখা হল : হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।' শুধু তাই নয়, ভিতরে বেদী স্থাপন করে তার উপর বসানো হল গৌর-নিতাইয়ের বিগ্রহ।

কীর্তন লাগাও।

কিন্তু কীর্তন কি আজ জমছে না? কারু মন কি আজ উদাসী হয়ে রয়েছে?

'ভগবানের দিকে চোখ রেখে গান করো।' বললেন গোঁসাইজি, 'আর তাঁর দৃষ্টির এক কণা করুণা যদি পাও দিক-দেশ ভেসে যাবে।'

অন্যান্য সাধুরাও এসে জড় হতে লাগল।

গোঁসাইজি হঠাৎ হুঙ্কার করে উঠলেন : অবধূত! অবধূত!

অমনি কোত্থেকে এক উলঙ্গ সন্ন্যাসী এসে হাজির, মুণ্ডিত মাথা, গায়ে ভস্মপ্রলেপ। এসে দু-হাত তুলে গোঁসাইয়ের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। যে যে অবস্থায় ছিল সে ঠিক সেই অবস্থায় নিশ্চল হয়ে রইল। সকলের হাত পা অনড় কিন্তু খোল করতাল আপনা আপনি বাজতে লাগল। সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ বিগ্রহের মালা এনে গোঁসাইয়ের গলায় পরিয়ে দিলেন। তারপর ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে মিশে গেলেন কেউ দেখল না।

গোঁসাইজি বললেন, 'নিত্যানন্দ প্রভু অন্যদেহে প্রকট হয়ে এসেছিলেন। সংকীর্তনের সময় গৌর-নিতাই কী ভাবে দাঁড়াতেন সেই সচ্চিদানন্দ রূপ আমার দর্শন হল।'

ক্ষ্যাপাচাঁদ অর্জুন দাস বললে, 'আমি কী জানি কেন তাঁর পা টিপে দিলাম।'

প্রথম দিনই দেখা গেল বালির উপর পড়ে আছে ক্ষ্যাপাচাঁদ। কে এ? 'অসাধারণ মহাপুরুষ।' বললেন গোঁসাই, 'সারা গা থেকে শুভ্র রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে। দেহমুক্ত ব্যোমচারী।'

বাইরে চেহারা দেখে তেমন কিছু মনে হবার উপায় নেই। কালো কদাকার কুলি-মজুরের মত দেখতে। ছেঁড়া মাফলারের টুকরো দিয়ে কৌপীন করা। জটা নেই তিলক নেই মালা নেই বিভূতি নেই—কোনো সংস্কারেরই ধার ধারে না। সম্পত্তি বলতে একটা মাত্র লোহার কড়া, তাতেই পান, আহার ও শৌচ-ক্রিয়া চলে। গোঁসাই বলেন, 'জড়োন্মত্ত পিশাচবৎ। আসলে ত্রিকালজ্ঞ। শুধু জ্ঞানমার্গে নয় রাগমার্গেও এঁর অবস্থা অসাধারণ। পঞ্চভাবের যে কোনো ভাব ইচ্ছামাত্র সম্ভোগ করতে পারেন।'

গোঁসাইজির দেখা পাবার পর থেকে ক্ষ্যাপা গোঁসাইজির সঙ্গলিপ্সু। দিনমানে যেখানে থাকুক সন্ধ্যা হলেই গোঁসাইজির তাঁবুতে বসে সে আড্ডা জমায় আর ছুটি নেয় ভোর রাতে। গোঁসাইকে দোঁহা পড়িয়ে শোনায়। রোজ প্রায় কুড়িটি দোঁহা পড়ায়, নিত্য নতুন দোঁহা, আর দোঁহার শেষ পাদে বলে, কহে অর্জুন, শোন ভাই সাধু।

শুধু দোঁহা? যে কোনো শাস্ত্র-পুরাণের একটি চরণ পাঠ করো, অর্জুন দাস আগে পিছে দশ বারোটি চরণ অনর্গল বলে যাবে।

বাঙলা না পড়েও মহাপ্রভুর সমস্ত তত্ত্ব তার জানা। 'বৈষ্ণবসাধনের কথা আপনি কী করে জানলেন?'

'ধ্যানমে মিলা।'

আর তার কী প্রেম! মানবপ্রেম—ঈশ্বরপ্রেম!

কেউ কাউকে মারলে সে আঘাত নিজের প্রাণে অনুভব করে অর্জুন দাস আর বালকের মত কাঁদে। আর সকল মানুষের মধ্যেই তার ইষ্টদেবের প্রকাশ এই উপলব্ধিতে যে-কাউকে সে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরতি করে।

একদিন ক্ষ্যাপা দেখল পোল-বরাবর রাস্তা দিয়ে পুলিশ সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে। কী মনে হল ক্ষ্যাপার, বড় বড় পা ফেলে ফেলে ঘোড়ার সঙ্গে ছুটতে লাগল। কী আশ্চর্য, কোত্থেকে ছুটে এসে ঘোড়ার সঙ্গ ধরেছে লোকটা. সমান বেগে চলেছে, সাহেব তীব্রতর গতিতে ঘোড়া ছোটাল। কী অভাবনীয় ব্যাপার, লোকটারও সেই সমান ক্ষিপ্রতা। শুধু ক্ষিপ্রতা নয়, যেন শূন্যের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। সাহেব বিমূঢ় হয়ে ঘোড়া থামালেন। ক্ষ্যাপাচাঁদও থামল। কী চাও তুমি? গর্জে উঠল সাহেব। ক্ষ্যাপা কিছু বলল না, ঘোড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল আর হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাহেবের আরতি করতে লাগল।

'এ কী করছে?' পথচারী একটি ভদ্রলোককে সাহেব জিগগেস করল।

ভদ্রলোক বললে, 'এ এক পাগল।'

আরেকজন বললে, 'মোটেই পাগল নয়। এ একজন সাধু। তোমার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তির বিকাশ দেখে তোমাকে এ পূজা করছে।'

ক্ষ্যাপাচাঁদ বালকের মত হাসতে লাগল।

সাহেবেরও মনে হল এ কখনোই পাগল নয়। পাগল কখনো ঘোড়ার সঙ্গে ছুটতে পারে! সাহেব ক্ষ্যাপাকে সেলাম করল; বললে, 'এ সাঁচ্চা সাধু হ্যায়—'

কিন্তু ক্ষ্যাপা গোঁসাইজির কাছে বসে কেবল কাঁদে কেন? চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়ে কাঁদে। গোঁসাইজি গ্রাহ্যও করেন না, চুপ করে বসে তার কান্না দেখেন। গোঁসাই যখন ইঙ্গিত করেন তখন একটু থামে আবার কতক্ষণ পরে সংস্কৃতে হিন্দিতে নানা অজানা ভাষায় স্তবস্তুতি সুরু করে। কখনো বা আরতি করতে করতে নাচতে সুরু করে। লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে :

'তাতা থাইয়া তাতা থাইয়া তাতা থাইয়া। বৃন্দাবনমে বংশী বাজে নাচে কিষন কানহাইয়া।'

আবার কাঁদতে বসে। বলে, 'তুমি আমার রামজি। তোমার সঙ্গে আমার তিন যুগ কেটে গেল—ত্রেতা দ্বাপর আর কলি—তুমি দর্শনই দিলে, চরম কৃপা তো করলে না। আমাকে তোমার করে নাও, আর যেন পুনর্জন্ম না হয়।'

চলো বৈষ্ণবশিরোমণি রামদাস কাঠিয়া বাবাকে দেখে আসি!

কাঠের কৌপীন পরেন বলে নাম কাঠিয়া বাবা। একটা বড় ছাতার নিচে সামান্য কম্বলাসনে বসে আছেন, উজ্জ্বল দেহ ভস্মাবৃত। মাথার সরু সরু পিঙ্গল জটা পিঠের দিকে ঝুলে রয়েছে। শরীরে এত তেজ অথচ হৃদ্য স্নিগ্ধ আভা। দুটি চোখে মমতার মাধুরী। মনে হয় যেন কত কালের কত আপনার লোক, দেখলেই মন-প্রাণ যেন শীতল হয়ে যায়। প্রেমে স্নান করে উঠে।

কাঠিয়া বাবার আর এক নাম ব্রজবিদেহী। দেহে থেকেও তিনি দেহশূন্য।

গোঁসাই বাবাজিকে প্রণাম করলেন। বাবাজি প্রতিনমস্কার করলেন গোঁসাইকে। বসতে আসন দিলেন।

চড়ার উপরে তাঁবুর ভিতরে শুয়ে ভক্ত বলছে গোঁসাইকে, কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম!

'কোথায় ছিলে?'

'ব্রাহ্মসমাজে টানা পাখার নিচে ছিলাম এখন এই উন্মুক্ত গঙ্গার চড়ার উপরে কম্বল সম্বল করে শুয়ে আছি।'

'দেখ না আরো কতদূর যেতে হয়! কোন সর্বস্বান্তের কিনারে।' গোঁসাইজি অভয় দিলেন : 'ভগবান যার কাছে ধরা দেন তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েই ধরা দেন।'

॥ ৩১ ॥

আরো এক কাঠিয়াবাবার সঙ্গে দেখা হল, নাম ছোট কাঠিয়াবাবা। এরও পরিধানে কাঠের কৌপীন, গা খোলা, রেশম-পশম-তুলো তন্তুমাত্র আচ্ছাদন নেই, না জট বা মালাতিলকের আড়ম্বর। মুক্ত আকাশের নিচে ছেঁড়া একটা চ্যাটাইয়ের উপর বসে আছে। শরীর শক্ত ও মজবুত কিন্তু মুখখানি শিশুর মত সুকুমার। কথাও শিশুর মত আধো-আধো। বারে বারে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। যত দেখা যায় মনে হয় আরো একবার দেখি।

কিন্তু সাধু দেখে শুধু গোঁসাইকে। রোজ দু-তিনবার করে গোঁসাইয়ের আড্ডায় আসে আর ধুনির ওপারে ঠাকুরের মুখোমুখি হয়ে বসে। দুটি হাত জোড় করে ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আর কাঁদে।

গোঁসাইজি বলেন, 'ইনি এক সিদ্ধ মহাপুরুষ, ভরতের ভাবে রামের উপাসনা করেন। পাঁচ শো বছর আগে দেহকল্প করেছিলেন, এখনো অটুট আছেন। একটিও চুল পাকেনি, দাঁত পড়েনি। শরীরের কোনো গ্রন্থি ঢিলে হয়নি এতটুকু।'

'থাকেন কোথায়?'

'পাহাড়ে। কোনো আশ্রয় নেই অবলম্বন নেই। এমনকি গাঁজা-চরস পর্যন্ত খান না। আগে খেতেন, তবে ওসব সংগ্রহ করতে হলে লোকালয়ে আসতে হয় আর তাতে অনেক সময় নষ্ট হয় বলে ছেড়ে দিয়েছেন।'

কিন্তু এই ছাউনিতে বারে বারে আসে কেন? কিসের লোভে?

বা, এই তাঁবুতে যে আমার রামজি থাকেন। যখনই আসি তখনই রামজির দেখা পাই। আসব না আমি? আমাকে আসতে কি কেউ বারণ করছেন?'

যেন বারণ করলে শুনবে! যেন কারু সাধ্য আছে তার রামপ্রণাম বন্ধ করে!

সাধু নরসিংহ দাসকে দেখ। আরেক নাম পাহাড়ীবাবা। 'তুহি মেরা প্রাণ' বলে যাকে খুশি আলিঙ্গন করে ধরে, আর যে সেই আলিঙ্গন পায় নিমেষে পুলকপ্রাবল্যে প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়ে। খিদে পেলে সামনে যাকে পায় তারই কাছে হাত পাতে, কিছু না দিয়ে পালায় এমন সাধ্য কী। সাধু থাকে কোথায়? মানস সরোবরে। মানসেই সরস হয়ে আছে। নইলে এমনি করে প্রাণের আলিঙ্গন বিলোয় কী করে!

আর একে চেন? এর নাম ভিখন দাস, পাটনার কাছাকাছি কোথাও আশ্রম। বহির্বাস সাধারণ কৌপীন, গলায় তুলসীর মালা, গোপীচন্দনের তিলক। প্রেমঘন প্রসন্ন দৃষ্টি। এরও বৈশিষ্ট্য আকাশবৃত্তি। আজকের বস্তু কালকের জন্যে সঞ্চয় করে না। যদি ভাণ্ডারার অভাব হয়, রঘুনাথজির দরজায় গিয়ে ধন্না দেয়। বলে, ধন্না পাবার জন্যেই রঘুনাথজির এই কৌশল। ধন্নার সঙ্গে-সঙ্গেই কোত্থেকে কে জানে খাদ্যবস্তু এসে পড়ে। বলে, মা গঙ্গা নিরবচ্ছিন্ন বয়ে চলেছেন, কারু অপেক্ষা না রেখে, তেমনি ভগবৎকৃপা বিশ্বময় বয়ে চলেছে। আমি গঙ্গাস্রোতে হাত রাখছি স্পর্শে পবিত্র হবার জন্যে, তেমনি ভগবানের কৃপাস্রোতে আমার প্রার্থনাটি রাখছি ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে।

এস, এস। গোঁসাইজি নিজের আসনের পাশটিতে ভিখন দাসকে বসালেন আদর করে।

আর ইনি নাথ যোগীদের মোহান্ত, গম্ভীরনাথ। ইনিও গয়ার কাছে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের সানুতে কপিলধারায় যোগসাধন করে সিদ্ধ হয়েছেন। এমন নিত্যযুক্ত যোগী কম মেলে। গোঁসাইজি বলেন, অভিমন্যুকে সপ্তরথী মিলে মেরেছে। অভিমন্যু হচ্ছে অভিমান। আর আমার সপ্তরথী হচ্ছে গয়ার

গম্ভীরনাথ, অযোধ্যার মাধোদাস, নবদ্বীপের চৈতন্যদাস, কাশীর ত্রৈলঙ্গস্বামী, মেছুয়াবাজারের সন্ন্যাসী, দার্জিলিঙের লামা আর মানসসরোবরের পরমহংস। গায়ে যেমন শীত বা তাপের অনুভব হয় তেমনি গম্ভীরনাথের কাছে গিয়ে বসলে হয় যোগানুভব।

এ কে, এক উগ্রতেজী সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত। গোঁসাইজিকে বললে, 'তুমি অহর্নিশ' যে সমাধিতে থাকো তা শাস্ত্রসম্মত নয়। শাস্ত্রে বলে—' বলে একগাদা সংস্কৃত আওড়াতে লাগল।

পনেরো-ষোলো বছরের একটি হিন্দুস্থানী বালকসন্ন্যাসী অদূরে এসে বসল। কতক্ষণ শুনে বিদ্রূপের হাসি হেসে বালক বললে, 'আরে! কাকে আপনি শাস্ত্র শোনাচ্ছেন? শাস্ত্রের আপনি জানেন কী!'

'বটে।' বালকের স্পর্ধায় সন্ন্যাসী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল : 'তুমি কী বোঝ! কোথাকার চ্যাংড়া ছোকরা, তুমি শাস্ত্রের নাম শুনেছ কোনোদিন?'

বালক গম্ভীর হয়ে বললে, 'সমস্ত শাস্ত্র আমার মুখস্থ।'

মহাশব্দে হেসে উঠল সন্ন্যাসী। বললে, 'এটা কোন শাস্ত্রে আছে বলতে পারো?'

'ব্যস, খুব হয়েছে।' বালক টিটকিরি দিয়ে উঠল : 'উচ্চারণ ঠিক নেই, ছন্দজ্ঞান ঠিক নেই, শাস্ত্র বাতলাতে এসেছেন!'

'তুমি ছন্দের কী জানো! মুখ দিয়ে ভালো করে এখনো কথা ফোটেনি, উচ্চারণ শেখাতে এসেছে।' সন্ন্যাসী প্রায় মারমুখো হয়ে উঠল : 'শাস্ত্র তো মুখস্থ বলছ কিন্তু এক চরণ আবৃত্তি করো তো!'

'বেশ, তবে শুনুন। বসুন চুপ করে।'

বালক তখন শাস্ত্রশ্লোক আবৃত্তি করতে লাগল। যেমন ছন্দজ্ঞান তেমনি উচ্চারণ। যত রকম সমাধির কথা শাস্ত্রে বলা আছে তা বললে অনর্গল, ব্যাখ্যা করে বোঝালে।

সন্ন্যাসী তো হতভম্ব। যারা এতক্ষণ বালকের প্রতি উপেক্ষমান ছিল তারাও বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। এ কী অকাট্যপ্রকটন।

বালক গোঁসাইজিকে দেখিয়ে বললে, 'ইনি যে অবস্থায় আছেন তার চেয়ে উচ্চতর অবস্থা নরদেহে সম্ভব নয়। এর চেয়ে এক রেণু উপরে উঠতে গেলেই দেহ ছুটে যাবে। এঁর এখনো দেহ ছেড়ে যাবার সময় হয়নি।'

গোঁসাইজি বালককে এগিয়ে আসতে ইশারা করলেন। বালক ধুনির সামনে এসে বসল। গোঁসাইজি তাকে প্রণাম করলেন।

সন্ন্যাসী পালিয়ে গেল।

অন্তরঙ্গ ভক্ত গোঁসাইজিকে জিগগেস করল, বালকটি কে?

গোঁসাইজি বললেন, 'কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী। মৃত একটি ব্রাহ্মণ বালকের দেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন।'

তখন উপস্থিত সকলে হায়-হায় করে উঠল। ঠাকুর নিজে প্রণাম করলেন,

তা জেনেও আমাদের মাথা নোয়াবার মতি হল না। আমাদের গতি কী হবে!

আর ঐ দেখ হরিদ্বারের মহাত্মা। দণ্ডী সন্ন্যাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেমন ঐশ্বর্য তেমনি মাধুর্য! নাম বলে দিতে হবে? নাম ভোলা গিরি।

আজ উত্তর সংক্রান্তিতে মকরস্নান।

সুরু হয়েছে সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রা। প্রথমে নাগাসন্ন্যাসীদের দল, তাদের অগ্রণী ভোলা গিরি, চলেছেন ঘোড়ায় চড়ে। সন্ন্যাসীদের কাঁধে ঝাণ্ডা, আবার কারু হাতে চামর, সেই ঝাণ্ডাকেই ব্যজন করতে-করতে চলেছে। তাদের পিছনে ত্রিপুণ্ড্রধারীর দল, হাতে দণ্ড-কমণ্ডলু। তাদের পিছনে জটিল ব্রহ্মচারীরা, চলেছে নতশিরে। এর পর দিগম্বর উদাসীদের দল। ক্রমে ক্রমে দশনামা, নির্মলা, আকালী, কত রকম সম্প্রদায়। এগুচ্ছে আর স্নান করে করে ফিরছে। তুমুল আনন্দনাদে স্বর্গমর্ত একাকার হয়ে যাচ্ছে।

সন্ন্যাসীদের পরে বৈষ্ণবের দল আর তাদের অগ্রনায়ক রামদাস কাঠিয়া বাবা। তাদের কারু কারু কণ্ঠে 'সীয়ারাম' 'সীয়ারাম,' কারু কারু কণ্ঠে বা 'রাধেশ্যাম' রাধেশ্যাম'। কখনো গর্জন কখনো বা গদ্গদসম্ভাষ।

তীর্থগুরু ভক্তদের স্নানমন্ত্র পড়াচ্ছে। বলো, ধন দাও জন দাও স্বর্গ দাও মোক্ষ দাও।

গোঁসাইজি শুনতে পেয়ে আপত্তি করলেন। ও সব কী চাইতে বলছেন? ওসব কি চাইবার মত?

সে কি? সংকল্পমন্ত্র পড়াব না?

না। আমাদের সংকল্প বিকল্প নেই। শুধু ভগবৎপ্রীতির জন্যেই আমাদের এই স্নান। এর বাইরে আমাদের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, থাকতে পারে না।

কিন্তু স্নানশেষে কথা উঠল গোঁসাইজিকে নিয়ে। বৈষ্ণবদের মাথার উপরে উঠে আড্ডা গেড়েছেন, কী এঁর অধিকার? অনেক কুম্ভমেলায় আমরা এসেছি, চড়ায় থেকেছি কিন্তু কোনো বাঙালী সাধুকে ছাউনি করে এমনি জাঁকিয়ে বসতে কোনোদিন দেখিনি।

আগে ব্রাহ্ম ছিল পরে সাধু হয়েছে এমনি এক বাঙালী বন্ধু গোঁসাইয়ের বিরুদ্ধে দল পাকাল।

দেখুন না, বৈষ্ণবদের মধ্যে স্থান নিয়েছে অথচ বৈষ্ণবদের প্রচলিত বেশ পরেনি। পরেছে গেরুয়া। গলায় শুধু তুলসী নয়, তুলসীর সঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালা। তিলক ধারণ করেছে অথচ আবার জটা রেখেছে, দণ্ড-কমণ্ডলুও বাদ দেয় নি। আরো দেখুন, আশ্রমে দুটি বিগ্রহ স্থাপন করেছে দশাবতারের মধ্যে যাদের নামোল্লেখ নেই। নাম শুনবেন তাদের? সীতা-রাম বা রাধা-কৃষ্ণ নয়, তাদের নাম গৌর-নিতাই। গৌর-নিতাইয়ের পুজো কি শাস্ত্রবিহিত? আরো দেখুন কাণ্ড, আশ্রমে মহিলাদের স্থান দিয়েছে। হলই বা না তারা শাশুড়ি বা কন্যা, কিন্তু সন্ন্যাসীর সঙ্গে সংসারের সংশ্রব হয় কী করে?

এ সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের অপমান। এর মীমাংসার জন্যে সভা বসুক। সভা যদি সমর্থন না করে মেলা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক গোঁসাইকে।

'গোসাইজি যে বেশ ধারণ করেছেন শাস্ত্রে তার উল্লেখ আছে।' বললে অমরেশ্বরানন্দ, 'তার নাম অবধূতবেশ। পদ্মপুরাণেও আছে তুলসী আর রুদ্রাক্ষের সহাবস্থিতির কথা।'

'পদ্মপুরাণ বৈষ্ণবদের প্রামাণ্য গ্রন্থ।' সমর্থন করল বৃদ্ধ পরমানন্দ।

'আর গৌর-নিতাই?' অমরেশ্বরানন্দ আবার বললে, 'নবদ্বীপে আমি শাস্ত্র পাঠ করেছি। আমি জানি বাঙলাদেশে শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা হয়। আর গৌর নিতাই যে কৃষ্ণ আর বলরামের অবতার সে কথার প্রমাণ শাস্ত্রেই দেওয়া আছে।'

তাই বলে আশ্রমে স্ত্রীলোক রাখবে?

এবার উঠলেন স্বয়ং ভোলা গিরি। বললেন, 'সন্ন্যাসী-আশ্রমে স্ত্রীলোক রাখা নিষিদ্ধ বটে কিন্তু তা সাধারণের পক্ষে, সামর্থ্যবানের পক্ষে নয়। গোস্বামী-প্রভু সমর্থতম পুরুষ, সাক্ষাৎ শিবচ্ছবি। যে জীবন্মুক্ত সে সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত। দেখছ না অহর্নিশ ইনি কেমন সমাধিমগ্ন! কেমন প্রেমদ্রব!'

'সাক্ষাৎ মহেশ্বর।' বললেন কাঠিয়াবাবা, 'এঁর কপালে আগুন জ্বলছে, যা কিছু এতে পড়ছে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। যেমন তেজস্বী তেমনি প্রেমিক। বৈষ্ণবদের মহাভাগ্য যে ইনি তাদের মধ্যে ছাউনি করে রয়েছেন।'

সমগ্র সন্ন্যাসীমণ্ডলে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সমস্ত সম্প্রদায়ের নেতারাই গোঁসাইকে শিবতুল্য বলে মেনেছেন। কোথায় মেলা থেকে তিনি বিতাড়িত হবেন, তা নয়, দলে দলে সকলে গোঁসাইকে দর্শন করতে ভিড় করে দাঁড়াল। স্থির হয়ে পূজাবিনম্র হয়ে দাঁড়াল। কৌতূহলীর দৃষ্টি নিয়ে নয়, ভক্তি-পবিত্র শরণাগতের দৃষ্টি নিয়ে।

'এ সাধুর নাম কী?'

ঠাকুরের সন্ন্যাসনাম অচ্যুতানন্দ। তাই এবার প্রচার হল।

'আপনারা কোন সম্প্রদায়?'

'মাধ্বাচার্য সম্প্রদায়।'

সমস্ত সন্দেহ নিরস্ত হল। নিষ্পত্তি হল সমস্ত তর্কের। স্থাপিত দল অখণ্ড মহিমা। দয়ালদাস স্বামী তার ছাউনিতে গোঁসাইকে সশিষ্য নিমন্ত্রণ করল।

বললে, 'আমার এক শিষ্য, বাঙালী শিষ্য, আপনাকে তাড়াবার চেষ্টায় অগ্রণী ছিল, তাতে মনে আমি ভীষণ ক্লেশ পাচ্ছিলাম। এখন আপনার মহিমা যখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে তখন আপনাকে বিশেষ সম্মান দেবার জন্যেই আমার নিমন্ত্রণ।'

গোঁসাই বললেন, 'আমি সম্মানের ভিখারি নই।'

'তা কি আমি জানিনা? এ সম্মান গৌর-নিতাইকে। সংকীর্তনকে। চলুন আমার ছাউনিতে কীর্তন করবেন চলুন।'

কীর্তনের নাম শুনলে কে স্থির থাকে? চলো দয়ালদাসের ছাউনিতে ভিক্ষে নিই গে। নামগানের বন্যা আনি।

চড়ার উপর দিয়ে যাচ্ছেন দেখতে পেলেন তাঁবুর একধারে তক্তপোষের উপর মখমলের গদিতে এক সাধু বসে আছে। রাজার মত চেহারা, রাজার মত সাজগোজ। গলায় হীরে-মুক্তোর মালা, মাথায় দামি সিল্কের পাগড়ি, গায়ে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা। এপাশে ওপাশে পিছনে মোটাসোটা মখমলের তাকিয়া। তাঁবুর ভিতরে বাইরে ধনী মাড়োয়ারী শিষ্যদের ভিড়। পুঞ্জীকৃত উপহারের দ্রব্য।

'এ রকম বিলাসী আবার সন্ন্যাসী নাকি?' এক ভক্ত নালিশ করল গোঁসাইয়ের কাছে : 'কোথায় ত্যাগের আগুন হয়ে থাকবে, তা নয়, আসক্তির আঠা হয়ে আছে।'

গোঁসাইজি কোনো কথা কইলেন না।

'নবাব সাধুর নাম জানেন?'

'নাম জানি। তবে সাধু নবাব কিনা তা জানি না।'

'কী নাম?'

'নাম সংকরাণ্য।'

সেদিন সন্ধ্যায় চারদিক আঁধার করে দুর্দান্ত ঝড় উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নামল প্রচণ্ড বৃষ্টি। সমস্ত ছাউনি-ছাতা উড়ে গেল। হাজার-হাজার সাধু সেই অনাবৃত আকাশের নিচে শুয়ে রইল। কোথায় বা কম্বল, কোথায় বা ধুনি।

পরদিন ঝড় থামলেও বৃষ্টি থামল না।

তাঁবুর বাইরে এক দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী এসে হাজির। বললে, 'আপনাদের ভাণ্ডারে কোনো জিনিস লাগবে? বৃষ্টিতে সব তছনছ করে দিয়েছে। যদি লাগে তো বলুন পাঠিয়ে দেব। সমস্ত রাত ধরে সকলের কাছে গিয়ে গিয়ে জানছি কার কী লাগবে, আর যার যা দরকার তাই দিচ্ছি পাঠিয়ে। সর্বক্ষণ ছুটোছুটির উপর আছি, বলুন, দেরি করবেন না।'

'দরুণ চাল লাগবে আর কাঠ আর ঘি—' ভক্ত বলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। শুধোল : 'এ কী, আপনার পায়ে রক্ত কেন?'

'ও কিছু নয়।' সাধু পাশ কাটাতে চাইল : 'জলকাদায় ছুটোছুটি করতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেছি বারকতক, তাই খানিক কেটেকুটে গিয়েছে। ও কিছু নয়। ঐ নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে আর কাজ হয় না। যত শিগগির সম্ভব আপনাদের জিনিস আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।' বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতেই বেরিয়ে গেল সন্ন্যাসী।

'এ কে মহাপুরুষ?' ভক্ত জিজ্ঞেস করলে গোঁসাইকে : 'নিজের শরীরকে

তুচ্ছ করে পরোপকার করে বেড়াচ্ছে। আঘাতের দিকে পর্যন্ত তাকাচ্ছে না। কে এ?'

'সে কী? এ'কে চিনতে পারলে না?'

'আগে দেখেছি কি কখনো?'

'দেখেছ বৈ কি। ইনিই তোমার সেই বিলাসী সাধু সঙ্করাণ্য। যাকে তোমার সন্ন্যাসের অনুপযুক্ত মনে হয়েছিল।'

'বলেন কী! এত বড় ত্যাগী, এত বড় পরোপকারী!'

'হ্যাঁ, শুধু বাইরেটা দেখেই বিচার কোরো না।' বললেন গোঁসাই প্রভু, 'ভক্তশিষ্যেরা যদি গুরুকে সাজিয়ে সুখ পায় তা হলে গুরু কি তাদেরকে বঞ্চনা করবে? নিরাসক্ত পুরুষের কী আসে যায় দুটো তুচ্ছ সাজসজ্জায়? শুধু ভক্তচিত্তবিনোদের জন্যেই গুরুর এই বিলাসভাব।'

সঙ্করাণ্যের উদ্দেশে প্রণাম করল ভক্ত। যেন কাউকে বিচার না করি। যেন চোখের দেখাকেই না সার বলে মানি।

এ আবার কে এল তাঁবুতে? রাত তখন প্রায় এগারোটা, তখনো সমানে বৃষ্টি চলছে। ধুনির সামনে গোঁসাইজি আসনে বসে আছেন, আর সকলে কেউ ঘুমুচ্ছে নয়তো বসে বসে ঢুলছে। এ অসময়ে কে এই রসময়?

সাধু-সন্ন্যাসী নয়, মাথায় টুপি, কোট-প্যান্ট পরা সাধারণ এক দিশি সাহেব।

কিন্তু ঠাকুরের এ কী ব্যবহার! একেবারে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বুকে জড়িয়ে ধরলেন সাহেবকে, আর যা অসাধারণ, নিজের আসনে তাকে বসালেন।

তারপর দুজনে ঘন হয়ে বসে নিম্নস্বরে কথা বলতে লাগলেন। বাইরে তখনো ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির শব্দে তাদের কথা ভক্তেরা কেউ শুনতে পেল না।

দিশি সাহেব হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি এখন যাব।

সে কি, এই বৃষ্টির মধ্যেই? ভক্তদল চঞ্চল হয়ে উঠল। যদি একান্তই যাবেন, ছাতা দিই, ছাতা নিয়ে যান।

একজন ছাতা দিতে যাচ্ছিল, ঠাকুর বাধা দিলেন। বললেন, 'ওঁর ছাতার দরকার হবে না। দেখলে না বৃষ্টির মধ্যে এলেন, গায়ে এক ফোঁটাও জল লাগেনি!'

সত্যিই তো, এ আমরা লক্ষ্য করিনি এতক্ষণ।

'ইনি কে? নাম কী?'

'ইনি আমার গুরুভাই। নাম সা-সাহেব।' বললেন গোঁসাইজি।

'মুসলমান?'

'ছিলেন। বলতেন, হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সেই এক উৎস। যিনি বৃন্দাবনে ধেনু চরিয়েছিলেন তিনিই আবার আরবদেশে ছাগল চরিয়েছিলেন।'

বললেন গোঁসাইজি, 'এখন পরমহংস অবস্থা। এখন ওঁর শক্তি অসাধারণ। জল ওঁকে সিক্ত করতে পারে না। আগুন পারে না দগ্ধ করতে। এলাহাবাদে খুব গোপনে আছেন, আমরা কী ভাবে আছি, খবর নিতে এসেছিলেন।'

তারপর মেলার শেষে গোঁসাইজি যখন কলকাতায় ফিরছেন ছুটতে-ছুটতে রেল স্টেশনে সা-সাহেব এসে হাজির।

একটা কামরায় সবাইকে নিয়ে গোঁসাইজি উঠেছেন, সা-সাহেব সেখানে গিয়ে পড়ল। এ করেছেন কী? এ কামরায় নয়, পিছনের কামরায় গিয়ে উঠুন।

সে আবার কী কথা! তাছাড়া গাড়ি ছাড়তে চার পাঁচমিনিট মাত্র বাকি আছে। এখন কী আর এ হাঙ্গামা পোষায়? মোটঘাটই বা কত!

কিন্তু ঠাকুর উঠে পড়লেন। গুরু ভাইয়ের, সা-সাহেবের, নির্দেশ তিনি অগ্রাহ্য করতে রাজি নন ।

মগরা স্টেশনে মুখোমুখি একটা ট্রেনের সঙ্গে ঠাকুরদের ডাউন ট্রেনের প্রচণ্ড কলিশন হল। ঠাকুরদের কামরার আগের ও পিছের কামরা দুটো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, মাঝখানের কামরাটার কিছু হল না। যেমন নিটুট, তেমনি নিখুঁত রইল।

এখন বুঝতে পারলে সা-সাহেবের কতখানি শক্তি! গুরুভাইয়ের জন্যে কতখানি ব্যাকুলতা।

॥ ৩২ ॥

কলিশনে গোঁসাই ও তাঁর শিষ্যদের কামরাটা অটুট থাকল বটে কিন্তু গোঁসাই তাঁর পদতলে আঘাত পেলেন। কেন, তাঁর আবার আঘাত কেন?

রহস্যটা কী?

গোঁসাই বললেন বটে সা-সাহেবের আশ্চর্য শক্তি, লোকেও তাই জানল বটে, কিন্তু আসল শক্তি গোঁসাইয়ের। যখন সংঘর্ষ হল গোঁসাই-ই পদভরে সমস্ত শক্তি নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে কামরাটাকে স্থির রাখলেন। তাইতেই তাঁর পায়ে আঘাত। সা-সাহেবের তিনি অমর্যাদা ঘটাতে পারেন না বলেই সা-সাহেবের শক্তির প্রশংসা করলেন, আত্মপ্রচার করলেন না।

কলকাতায় এসে উঠলেন কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনের বাড়ি। সেখানে কদিন থেকে গেলেন কালনা। কালনা থেকে নবদ্বীপে এসে সশিষ্য উঠলেন টোলবাড়িতে, ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের হরিসভায়।

হরিসভায় মহাপ্রভুর বিগ্রহ। এমন মনোহর ভঙ্গিমা তো দেখিনি কোথাও।

কী করে দেখবে? যে ভঙ্গিমায় বিদ্যারত্নের অন্তরে প্রকাশিত হয়েছিলেন

এ বিগ্রহ তারই প্রতিরূপ।

আজ ফাল্গুনী পূর্ণিমা। তার উপর আবার সন্ধ্যাতেই চন্দ্রগ্রহণ।

আজ একেবারে হুবহু মহাপ্রভুর অবতরণের লগ্ন।

কী না জানি হয়! কে না জানি আসে! হাজার হাজার ভক্ত স্নানার্থী গঙ্গাতীরে এসে জমেছে। শতশত দলে সুরু হয়েছে কীর্তন, আর্তনাদ, হুঙ্কার-গর্জন—তুমি এস, তুমি দেখা দাও, তুমি আবার সেই হরিনামের বন্যা আনো।

জয় শচীনন্দন! জয় শচীনন্দন! গদগদ কন্ঠে মহাপ্রভুকে আহ্বান করতে-করতে গঙ্গাতীরে এসে দাঁড়ালেন গোঁসাই।

তাঁর সঙ্গের শিষ্যভক্তদল সনৃত্য কীর্তনে মুখর হয়ে উঠল।

লোকারণ্য গঙ্গার ঘাট, সকলে অনুভব করল সপার্যদ মহাপ্রভুই সংকীর্তন করছেন।

আর কথা নেই, সর্বব্যাপী আনন্দ-ক্রন্দন, এ আমাদের মহাপ্রভুরই নবাবির্ভাব। এ আবার তাঁর নতুন করুণা।

দু-বাহু প্রসারিত করে সাধু হরবোলানন্দ ছুটে এলেন। গোঁসাইও দু-বাহু মেলে ধরলেন। পরস্পরের আলিঙ্গনে গাঢ়বদ্ধ হলেন দুজনে।

তারপর সুরু করলেন উত্তাল নৃত্য।

'ওগো আমাদের সেই গৌর-নিতাই নাচছে গো।' সকলে বলে উঠল এক-বাক্যে : 'ওগো এই যে আমাদের দুই আরাধনার ধন।'

'এই যে এ্যাদ্দিন পরে পেয়েছি সামনে।' কোত্থেকে একটা লোক ছুটে এল গোঁসাইয়ের দিকে। তার হাতে একটা বাঁশ। বলছে, 'তোকে আজ বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে ঠিক করব।'

কী হল? কী হল? ভক্তদল তাকে রুখতে এগিয়ে এল। কেন, কী ব্যাপার?

'কী ব্যাপার! ও এ্যাদ্দিন আসেনি কেন? কেন এত দেরি করল? কোথায় ছিল এ্যাদ্দিন? আজ ওর একদিন কি আমার একদিন!'

গোঁসাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাঁশকে কী করে বাঁশি করতে হয় গোঁসাই ছাড়া আর কে জানে!

ক্ষিপ্তপ্রায় লোকটা হঠাৎ বাঁশ ফেলে দিয়ে গোঁসাইয়ের পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়ল। কোথায় তর্জন-গর্জন, হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল। কতক্ষণ পরে উঠে পড়ে নাচতে সুরু করল। গান ধরল স্বতঃস্ফূর্ত।

'গোলোক হতে অবনীতে, জীবে প্রেম বিলাইতে
উদয় হল রে।
উত্তম অধম নাই, যারে দেখে আপন ঠাঁই
ধরিয়া ধরিয়া প্রেম করে ॥'

শুধু বাঁশকেই বাঁশি করেন না ঠাকুর, উদ্ধতকে নিয়ে আসেন শ্রদ্ধায়

হুংকারকে ক্রন্দনে, আস্ফালনকে নৃত্যে, সমস্ত অস্তিত্বকে বিনম্র শরণাগতিতে।

গ্রহণ লেগেছে। গ্রহণ লেগেছে।

'ঐ দ্যাখ, ঐ দ্যাখ।' গোঁসাই আঙুল তুলে দেখালেন চাঁদের দিকে। নিজেই অনিমেষে তাকিয়ে রইলেন। কী দেখলেন কী দেখালেন কে বলবে। দেখতে দেখতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

শিষ্যভক্তেরা তাঁকে ধরে বসিয়ে দিল।

চাঁদ যতক্ষণ রাহুগ্রস্ত, রাহুস্পৃষ্ট থাকল, উঠলেন না সমাধি থেকে। তিন ঘন্টা পর চাঁদের মোচন হল। তখন গোঁসাই জাগ্রত হলেন।

চলো চলো এবার সকলে স্নান করি।

শুধুই কি স্নান? সুরু হল সেই জলকেলি, এর ওর গায়ে জল ছিটোনোর খেলা। বালকের মতই গোঁসাইয়ের দৌরাত্ম্য, বালকের মতই আবার আনন্দে ভোলানাথ।

স্নানান্তে তীরে উঠতেই কে একটি বালিকা গোঁসাইয়ের জন্যে সরবৎ নিয়ে এল। নাও, প্রসাদ পাও।

'কে রে মা তুই?'

মেয়েটি কিছু বলে না, মুখ টিপে টিপে হাসে।

'শুধু আমাকেই দিবি, আমার ভক্তদের দিবিনে?'

'বা, সবাইকে দেব। ভয় নেই, আমার টান পড়বে না।'

ভক্তরাও প্রসাদ পেল। কিন্তু এ যে কে, কার মেয়ে, কেউ বলতে পারে না। সরবৎ খাইয়ে চলে গেল মেয়ে। কোথায় তুমি থাকো? কোথাও না।

পরদিন সকালে এক বুড়ি এক ভাঁড় দুধ নিয়ে উপস্থিত।

এ আবার কী মূর্তি!

গোঁসাইয়ের ভক্তশিষ্যদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এ কী, তোরা এখানে কী করে এলি? তোরা যে সব ব্রজের লোক। কী আশ্চর্য, তোদেরই দেখব বলে কবে থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তোরা এখানে? বোস, তোদেরকে দুধ খাওয়াচ্ছি।'

একটা গ্লাসে ভাঁড় থেকে দুধ ঢালল বুড়ি। আগে গোঁসাইকে খাওয়াল। পরে আবার এক গ্লাস ভরল। এক ভক্ত খেতে আবার আরেক গ্লাস।

'কতজন ভক্ত এখানে দেখেছ?'

'দেখেছি। আমার টান পড়বে না। আমার ভাঁড় অফুরন্ত।'

ভক্তদের মধ্যে বসে আছে হরিমোহন পণ্ডিত। সে বললে, 'আমি খাব না।'

'কেন?'

'পাত্র এঁটো হয়ে গেছে।' বললে পণ্ডিত।

'এঁটো কি হে? এ যে প্রসাদ। প্রসাদ কখনো এঁটো হয়?' বললেন গোঁসাই, 'নিন, খেয়ে নিন।'

তখন পণ্ডিত চোখ বুজে খেয়ে নিল।

'পাতে মোড়া ও কী?' গয়লানিকে জিজ্ঞেস করল এক ভক্ত।

'ও আছে এক জিনিস।'

'দেখি না!'

'ও তোমাদের দেব না। তোমরা দুধ খাও।'

'ও কাকে দেবে?'

'দুটো ছেলে অনেক ঘুরে-টুরে হয়রান হয়ে আসে আমার কাছে, খেতে চায়। এই ক্ষীরটুকু ওদের জন্যে রেখেছি। এখানেও তো ওরা আসে—তাই না?' গয়লানি তাকাল গোঁসাইয়ের দিকে।

'আসে।' গোঁসাই সম্মতিতে মাথা নাড়লেন।

'আজ এলে একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিও।' বুড়ি পরে আপন মনে বললে, 'বড় ছেলেটি বেশি ভালো, কেমন আলাভোলা, হাঁকডাক করে খায়। আর ছোটটি ঠাণ্ডা।'

'দেব পাঠিয়ে।'

বুড়ি চলে গেল ডগমগ হয়ে। গোঁসাই বললেন, 'যশোদাভাবে আছেন। খুব উচ্চ স্তরের সাধিকা।'

মহাপ্রভুর বাড়িতে রসিক দাসের কীর্তন হবে। গোঁসাই সেখানে চললেন সদলে।

পৌঁছুতেই রসিক এসে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল ঠাকুরকে। আশীর্বাদ ভিক্ষা করল সংকীর্তন যেন সার্থক হয়।

গোঁসাই তার মাথায় হাত রেখে বললেন, মঙ্গল হোক।

আর রসিককে পায় কে। কয়েক মিনিটের মধ্যে কীর্তন তুমুল জমিয়ে ফেলল রসিক। ঐ তো, ঐ তো—মহাপ্রভুর বিগ্রহের দিকে আঙুল দেখিয়ে লাফিয়ে উঠলেন গোঁসাই—যেন পলকে সকলের দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল, সভামধ্যে দেখতে পেল মহাপ্রভুকে। আকাশস্পর্শী হরিধ্বনি উঠল। জয় শচীনন্দন। জয় শচীনন্দন!

রসিক সার্থক। রসিকের কীর্তন সার্থক। রসিকের সর্বত্র মঙ্গল।

চলো রাইমাতার বাড়ি যাই।

সে আবার কে?

এক তপস্বিনী বৈষ্ণবী। শুনে কী বুঝবে? দেখবে চলো।

'ওগো আমার বাড়ি অদ্বৈত এসেছে গো।' সশিষ্য ভক্ত গোঁসাইকে দেখে বৃদ্ধা বৈষ্ণবী রাইমাতা উল্লাসে হাঁক পাড়ল : 'তোরা কে কোথায় আছিস দেখে যা—যার ডাকে মহাপ্রভু নেমে এসেছিলেন বৈকুণ্ঠ থেকে—ওরে সে, সে আমার বাড়ি এসেছে—'

কী করবে, লোক ডাকবে না আগে বসতে দেবে, কোথায় বা বসতে দেবে—ব্যাকুল হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল রাইমা।

গোঁসাই নিজের থেকে সকলকে নিয়ে দাওয়ায় বসলেন। বললেন, 'আমরা বেশ বসেছি। তুমিও বোসো চুপচাপ।'

'ওরে তুইই তো মহাপ্রভুকে এনেছিলি, আচণ্ডালে হরিনাম বিলিয়ে জীবোদ্ধার করেছিলি—ওরে তোকে পেয়ে আমি স্থির থাকি কি করে? আমার ছেলেদের মুখ শুকনো—তাদের আমি কী খেতে দিই? তুইও তো ঐ দলে। বল কী খেতে তোর ইচ্ছে করছে? সেদিন দূর থেকে তোদের দেখে এলাম। বড় আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল সবাইকে নিয়ে আমার বাড়িতে একদিন আসিস। তুই আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলি, চলে এলি সদলবলে, আপনজনের মত বসলি আমার ঘরের দাওয়ায়। এখন আমি তোদের কী খেতে দিই, আমি গরিব মানুষ, আমার কী আছে!'

গোঁসাই বললেন, 'তোমার ঠাকুরঘরে প্রসাদ বলতে যা আছে তাই আমাদের দাও, আমরা কণা কণা করে ভাগ করে খাব।'

রাইমাতা ঠাকুরঘরে প্রবেশ করল।

ফিরে এল হাতে এক থালা রসগোল্লা। নিজেই সবাইকে দিল বিতরণ করে।

সাহস বেড়ে গিয়েছে রাইমার। বললে, ওঠা চলবে না। এখানে দুটি অন্ন পেয়ে যেতে হবে।

কত মেয়েছেলে এসে জড়ো হয়েছে বাড়িতে, রাইমা নিজের হাতে সব রান্না করল। চোখ দুটি ঊর্ধ্বে টানা, ভাবের ঘোরে ঢুলুঢুলু ছুটোছুটি করে একাই একশো হয়ে কাজ করতে লাগল। কখন যে নিজের থেকে দু-চোখ জলে ভরে ভরে ওঠে, টের পায় না, বুকের আঁচল ভেসে যায়। দুহাত কাজ করছে বটে কিন্তু চোখ রয়েছে কোন ভাবলোকে, কী দেখছে, কেন এত সুখেও তার কান্না, তা কে বলবে।

বেলা বারোটার মধ্যে ভোগ হয়ে গেল। সবাই তারপর বসল আসন করে।

এর মধ্যে কত কী ব্যঞ্জন তৈরি করেছে রাইমা। তৃপ্তি করে সবাই আকণ্ঠ খেল—এত বিস্তৃত আয়োজন যে ফেলব না ফেলব না করেও ফেলল কিছু কিছু। সে সব অবশিষ্ট একত্র করে নাড়ু পাকাল রাইমা, আশ্রমে যত লোক তত নাড়ু। প্রত্যেকে পেল একটা করে।

উচ্ছিষ্ট পাতা কাউকে তুলতে দিল না রাইমা। যদি কেউ তোলো তো ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

বিদ্যারত্নের ছেলে মথুরানাথ পদরত্ন বললে, 'একটি অদ্ভুত তমাল গাছ দেখবেন আসুন।'

বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল পদরত্ন।

একটা গাছ নয় তো শ্যামসমারোহের মন্দির! চূড়া তুলে উঠে গেছে উপরে আর শাখা-প্রশাখা এমন ছত্রাকারে ছড়িয়ে রয়েছে যেন মাটির উপরে

একটি নিভৃত ঘর তৈরি হয়েছে। গাছের নিচেটা দিনের বেলাও অন্ধকার। রহস্যসুন্দর। মনে হয় ঐ গোপনের ঘরে ঢুকলে কোন এক অনির্বচনীয়ের সঙ্গে চেনা হয়ে যাবে।

কিন্তু লতামণ্ডপের বাইরে ও কে দাঁড়িয়ে!

একটি তিন বছরের ছেলে। পদরত্ন বললে, আমার ছেলের ঘরে নাতি।

কিন্তু গোঁসাইকে দেখে ছেলেটি লজ্জায় হাত দিয়ে চোখ ঢাকছে কেন, আবার হাত একটু সরিয়ে নিয়ে আড়চোখে মুচকে হাসছে কেন? ও কে? কই শুধু হাসছেই না তো! এখন যে দেখছি কাঁদছে নিঃশব্দে।

'তোমরা এই ছেলেটিকে ভালো করে দেখে রাখো।' শিষ্যভক্তদের বললেন গোঁসাই, 'যার জন্যে লোকে ছুটোছুটি করছে তিনি যে কখন, কোন অলিতে-গলিতে কী ভাবে লীলা করছেন, তাঁর কৃপা ছাড়া কারু সাধ্য নেই জানতে পারে। তোমরা ধন্য হলে।'

সময়বসী একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল ছেলেটির গা ঘেঁষে।

এটি কে?

এ আমার দৌহিত্রী, মেয়ের ঘরের নাতনি।

মেয়েটি ডান হাত দিয়ে ছেলেটির গলা জড়িয়ে ধরে দাঁড়াল বাঁ দিকে। কত যেন খেলার সাথি, কত তাকে ভালোবাসে, এমনি স্নেহঢালা সেই দাঁড়াবার ভঙ্গি।

'জয় রাধারাণী।' এক ভক্ত উল্লাস করে উঠল!

মেয়েটি ছুট দিল। পদরত্ন নাতিকে নিয়ে এল গোঁসাইয়ের কাছে। সে গোঁসাইকে প্রণাম করল। গোঁসাই তাকে বুকে তুলে নিলেন। গায়ে পিঠে মাথায় আশীর্বাদের হাত বুলিয়ে দিলেন। আর কাউকে প্রণাম করতে হবে না। 'তুমিই নমস্য হয়ে থাকবে।

ছেলেটি কদিন পরেই মরদেহ ত্যাগ করল।

কিন্তু শ্রীবাসের আঙিনায় ভেট চায় কেন? এ কী অনাচার!

যারা দ্বারে দ্বারে বিনামূল্যে প্রেম বেচে গেল তাদের বিগ্রহ দেখতে পয়সা লাগবে? যাদের পয়সা নেই যারা কাঙাল, তারা কাঙালের ঠাকুরকে দেখতে পাবে না?

দরকার নেই দেখে। আমি বাইরে থেকেই প্রণাম করছি।

তার চেয়ে চলো পুরোনো বন্ধু রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি যাই। রাজকুমার ব্রাহ্মসমাজে গান গায়, আমার কত দিনের চেনা।

গোঁসাইকে পেয়ে রাজকুমার আনন্দে উথলে উঠল। রাজকুমারের মা এসে প্রণাম করল গোঁসাইকে।

'সে কী?' গোঁসাই বললে, 'রাজকুমার আমার ভাই। সে সূত্রে আপনি আমার মা। মা কি ছেলেকে প্রণাম করে?'

রাজকুমারের মা বললেন, 'বাবা, আমি যে তোমাকে মহাদেবের মত

দেখছি।'

গোঁসাই বললেন, 'তা হলে আপনি মহাদেবকে প্রণাম করুন, আমি মাকে প্রণাম করি।'

রাজকুমার বললে, 'রামপুরহাটে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে আপনি আমাকে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন, আমার হৃদয় তোমার হোক, তোমার হৃদয় আমার হোক। কই আমার হৃদয়ে তো আপনার হৃদয়ের ছায়াটুকুও পড়ল না। আমি যেমন ছিলাম তেমনিই রয়ে গেলাম। আমার দুর্গতিতে আপনি আর চুপ করে থাকতে পাবেন না। একটা বিহিত আপনাকে করতেই হবে।'

'কী চান বলুন।'

'আমাকে এমন কোনো সহজ উপদেশ দিন যা পালন করে আমার কলুষিত চিত্ত অন্তত এক মিনিটের জন্যে ভগবৎচিন্তায় নিমগ্ন হতে পারে।'

'বেশ, তাই দিচ্ছি' বরাভয়ময় কন্ঠে বললেন গোঁসাই, 'সহজও বটে আবার শক্তও বটে। সহজ কেননা অল্প মনোযোগেই পালন করা সম্ভব আর শক্ত কেননা লোকে জেনেও এতে আকৃষ্ট হয় না।'

'আপনি বলুন। আমি করব।'

'আপনি ওঙ্কার সাধন করুন।'

'ওঙ্কার!'

'হ্যাঁ, ওঙ্কার কী? অ, উ আর ম। অ সৃষ্টি, উ স্থিতি আর ম প্রলয়। মানে কী? যা আগে ছিল না, এখন আছে, পরে থাকবে না। যা দেখছেন সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা স্থল জল মানুষ পশু পাখি কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা তৃণ গুল্ম—সমস্ত স্থাবর জঙ্গম—আগে কিছুই ছিল না, এখন আছে, পরে আবার থাকবে না। চরাচরে যা দেখবেন তাতে এই ভাব এই অর্থ আরোপ করুন। ছিল না, আছে, থাকবে না—শুধু এই মন্ত্র এই ধ্যানজ্ঞানে নিবিষ্ট হতে হতে আপনার চোখ খুলে যাবে। কিছুতেই আর মমতা থাকবে না, সব অসার মিথ্যে বলে মনে হবে। ক্রমে ক্রমে হৃদয় শূন্য বোধ হবে। কী সে চিরস্থায়ী জিনিস যা দিয়ে এই শূন্যতা পূরণ করা যাবে আর অভাববোধ থাকবে না? তখনই আপনার ব্যাকুলতা জাগবে।' গোঁসাই আশ্বাসে বদান্য হলেন : তখনই বুঝবেন আপনার দীক্ষা নেবার সময় হয়েছে। ওঙ্কার মন্ত্রের সাধনে আপনার ঠাকুরঘরের আবর্জনা আগে দূর করুন।'

'ঠাকুরঘর?'

'হ্যাঁ, আমাদের হৃদয়ই আমাদের ঠাকুরঘর।'

॥ ৩৩ ॥

গঙ্গপথে নৌকো করে গোঁসাই-প্রভু শান্তিপুরে এলেন। নিজগৃহে, শ্যাম-

সুন্দরের আলয়ে এসে উঠলেন। যে শান্তিপুর একদিন নির্যাতনের একশেষ করেছিল, আজ বরণডালা সাজিয়ে আনল। মুক্তকণ্ঠে জয় দিল সকলে। সজ্জন সুহৃদ গোস্বামীদের সম্মান দিলেন, মাতৃস্থানীয়াদের পা ধুয়ে দিলেন স্বহস্তে।

শ্রীমূর্তিখানি দেখ! দেখলেই মন-প্রাণ ভক্তিতে ভরে ওঠে।

এই আমার শ্যারসুন্দর! প্রণাম করলেন গোঁসাই। বললেন, 'কত খেলাই খেলল আমার সঙ্গে। ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করছি, হঠাৎ চোখের সামনে এসে হাজির হত, বলত, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো তো। আমি বলতাম, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, আমি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বিশ্বাস করি না। শ্যামসুন্দর ছাড়ত না, আবার আসত, আবার কৃষ্ণনাম গুঞ্জন করত। শেষে একদিন মরীয়া হয়ে জিগগেস করলাম, তবে আমাকে ব্রাহ্মসমাজে আনলে কেন? শ্যামসুন্দর বললে, আবার তোকে ভেঙে গড়ব বলে। ভেঙে গড়লেই জিনিস সুন্দরের চেয়েও সুন্দর হয়ে ওঠে।'

চৌদ্দমাদলের নগরকীর্তন করে গোঁয়াই-প্রভুকে নিয়ে গেল বাবলায়। শোনা গেল আবার সেই অপ্রাকৃত কীর্তন। গৌরহরি এখানে যে সপার্ষদ কীর্তন করেছিলেন তাই যেন প্রকৃতিতে রেকর্ড হয়ে আছে, গোঁসাইয়ের মত শক্তিশালী সাউন্ড-বক্স পাওয়া যেতেই ভক্তবৃন্দের একাগ্রতার পিন-এ লেগে বেজে উঠেছে। কোনো শব্দই হারিয়ে যায়নি। কার্যকারণের যথার্থ সংযোগ হলেই শুনতে পাবে সে উজ্জীবিত হরিনাম।

অদ্বৈতপ্রভুর ভজনস্থান কোথায়?

সকলে ইতস্তত খুঁজছেন, বিচার করে দেখছেন, কিন্তু একমত হতে পারছেন না। কোথাকার একটা কুকুর কখন থেকে সঙ্গ ধরেছে, কিছুতেই ফিরে যাচ্ছে না, সে হঠাৎ একটা অচিহ্নিত জায়গা আঁচড়াতে সুরু করল। এ কী আচরণ! জায়গাটা খোঁড়ো তো, গোঁসাইপ্রভু আদেশ করলেন। খুঁড়ে মাটির নিচে একখানা খড়ম, পঞ্চপাত্র ও একটি পেতলের হাঁড়ি পাওয়া গেল। এ সমস্তই অদ্বৈতপ্রভুর ব্যবহৃত জিনিস। সুতরাং, সন্দেহ নেই, এ আঁচড়কাটা জায়গাই তাঁর ভজনস্থান।

কিন্তু কুকুরবেশে এ কে দেখা দিল?

গোঁসাইজি বললেন, 'পূর্বজন্মে সাধক ছিলেন, সাধনাভ্রষ্ট হয়ে কুকুর হয়ে জন্মেছেন। কিন্তু ভয় নেই, শিগগিরই এ দেহ ছেড়ে দেবেন।'

পরদিন সকলে দেখল দেহের অর্ধাংশ গঙ্গায় ডুবিয়ে দিয়ে তীরে মরে পড়ে আছে কুকুর।

তারপর কলকাতায় এলেন গোঁসাই। উঠলেন সুকিয়া স্ট্রিটে রাখাল রায়ের বাড়িতে। প্রয়াগে পতিগৃহে ছিল, বাবার সঙ্গে দেখা করতে চলে এল প্রেমসখী। এসেই জ্বরে পড়ল। সে জ্বর আর ছাড়ল না।

প্রেমসখীর মৃত্যু আসন্ন, পাশের ঘরে গোস্বামী-প্রভু যেমন রোজ করেন, তেমনি পাঠ করে চলেছেন। কান্নার রোল উঠেছে তবু অর্ধপথে পাঠ থামালেন না। পাঠ শেষ করে যখন রুগীর ঘরে এলেন, তখন সামান্য কটা

নিশ্বাসই আর বাকি আছে। বললেন, কীর্তন সুরু করো। কীর্তন সুরু হতেই গোঁসাই নাচতে লাগলেন। কতক্ষণ পরে প্রেমসখীর মাথায় ডান পা রেখে দাঁড়ালেন স্থির হয়ে। একটা পবিত্র বিভায় সমস্ত ঘর আলোকিত হয়ে উঠল।

'তুমি কী নিষ্ঠুর!' প্রেমসখীর দিদিমা, গোঁসাইজির শাশুড়ি কেঁদে উঠলেন : 'মেয়েটা মরে যাচ্ছে আর তুমি নাচছ? তুমি আনন্দ করার আর সময় পেলে না?'

গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'আমি যে দেখছি কুতুর মা এসেছেন, তাঁর সঙ্গে বৃন্দাবনের নিত্যলীলার সহচরীরা, তাঁরা যে কুতুকে কোলে করে নিত্যধামে নিয়ে যাচ্ছেন—এ দেখে আমি কাঁদব, না, নৃত্য করব?'

সমস্ত শোক শান্ত হয়ে গেল। মা এসে নিয়ে গেলেন মেয়েকে রাধা-গোবিন্দের পায়ে সমর্পণ করে দিতে, এর পরে কার কী কথা?

রাখাল রায়ের খুব ইচ্ছে প্রভুর একখানা মূর্তি তৈরি করে রাখে। সেই উদ্দেশে কৃষ্ণনগরের এক কুম্ভকারকে ডেকে এনেছে। সরাসরি সামনে বসে গড়তে গেলে প্রভু বিরক্ত হবেন অনুমান করে কুম্ভকারকে বলেছে গোপনে সম্পূর্ণ করতে। কী, পারবে তো? দক্ষ কুম্ভকার একবাক্যে স্বীকার পেল —পারব। প্রভুকে এক নজর দেখলেই মূর্তি মনের মধ্যে বসে যায় দাগ কেটে। আপনি ভাববেন না, গোপনে থেকেই নির্মাণ করে দেবো আপনাকে।

প্রভুর কাছে গোপন কিছুই নেই। তিনি রাখালকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'মূর্তি কদ্দুর হয়েছে?'

রাখাল অপ্রতিভ হয়ে গেল। বললে, 'প্রায় সম্পূর্ণ।'

'মূর্তি ভেঙে ফেল।'

রাখাল হয়তো ভাবল মূর্তি অবিকল হয়নি বা কারিগর কুশলী নয়, প্রভু তারই ইঙ্গিত করছেন। তাই বললে, 'মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। একেবারে আপনার প্রতিরূপ। আপনি একবার দেখবেন আসুন।'

'না, আমি দেখব না।' বললেন গোঁসাইজি, 'তুমি মূর্তি ভেঙে ফেল।'

'ভেঙে ফেলব?' মর্মাহতের মত বললে রাখাল।

'হ্যাঁ, ভেঙে ফেলবে! এ নশ্বর দেহ কিসের গৌরব করে, কিসের অহঙ্কার? কীটের চেয়েও নীচ, ধুলোর চেয়েও মূল্যহীন তাকে কে চায় পাথরে ধরে রাখতে? ওসব কপটতা ছাড়ো, মূর্তি ধুলো করে দাও।'

দেহই যখন ধুলো হয়ে যাবে তখন মূর্তিও ধুলো হোক। কুম্ভকার মূর্তি ভেঙে ফেলল।

'অভিমান যাবে কিসে?' গোঁসাইজিকে শিষ্যভক্ত জিগগেস করলে।

অভিমান যাওয়া কি সহজ কথা?' বললেন গোঁসাইজি, 'একেবারে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অভিমানের মোচন নেই। তবু, অভিমান তাড়াবার জন্যে সাধন দরকার। সকলের চেয়ে নিজেকে হীন বলে জানতে হয়, কাঙাল বলে।

মুটে মজুর এমন কি জঘন্য ইতর জনও আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এই অকপট শ্রদ্ধাভক্তি রাখতে হয় মনের মধ্যে। সকলের কাছেই মাথা নত করে থাকতে হয়। তা হলেই যদি শাসন হয় অভিমানের।'

'বড় কঠিন শাসন।'

'নিশ্চয়। ধর্ম বিষয়ে অভিমান তো সব চেয়ে খারাপ। সামান্য ধর্ম-অভিমানে কত যোগী-ঋষির পতন হয়েছে।'

'আমাদের তাহলে কী হবে?'

'একটা সাধারণ সহজ উপায় বলে দি।'

'কী?' শিষ্যভক্ত উৎসাহিত হয়ে উঠল।

'শুধু নিজের সাধন ভজন নিয়ে পড়ে থাকো। আর নির্জনে চলে যাও। লোকালয়ে থাকলেই অভিমানের কারণ এসে দেখা দেয়। পাহাড়-পর্বতে থাকতে পারলেই শান্তি।'

'কিন্তু খাওয়া জুটবে কী করে?'

'জানি এই আহারের জন্যেই আবার লোকালয়ে ফিরতে হয়। এক আহার-চিন্তাতেই সাধন নষ্ট। তাই সর্ব প্রথমে আহার সংযম করতে হয়, পরে ধীরে ধীরে আহারত্যাগ। প্রথমে ডালভাত তরকারি, তারপরে শুধু ডালভাত বা তরকারি-ভাত, তারপরে সেদ্ধ ভাত। তারপরে জল ভাত। তারপরে নুন ত্যাগ। নুন ত্যাগ হলে জল ভাতের সঙ্গে ফল। শেষে ভাত ফেলে দিয়ে শুধু জল ফল। তারপরে ফলের পরিমাণ কমিয়ে নিমপাতা ও বেলপাতা ধরবে। তারপরে শুধু জল আর পাতা। মিষ্টি কদাচ নয়। মিষ্টি বলতে শুধু ফলের মিষ্টি। আসল রহস্য কী জানো? আসল রহস্য হচ্ছে বীর্যধারণ। যার বীর্য আছে তার অন্য অভিমানে কী দরকার?'

সুকিয়া স্ট্রিট ছেড়ে গোঁসাইজি কম্বুলিটোলায় এসে বাসা নিলেন।

'গৌর-নাচা বাবা এখানে আছে?'

'আরে এ যে দেখি আমার ক্ষ্যাপাচাঁদ।' গোস্বামী-প্রভু হাত বাড়িয়ে ক্ষ্যাপাচাঁদকে বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করে ধরলেন : 'তুমি কোত্থেকে এলে?'

সেই প্রয়াগে দেখা হয়েছিল। ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর থেকেই মনে আকাঙ্ক্ষা আবার সেই গৌর-নাচা বাবাকে দেখে। গোস্বামী-প্রভুর নাম ভুলে গিয়েছে, একমাত্র পরিচয় সংগ্রহ করে রেখেছে, গৌর-নাচা। অর্থাৎ যে গৌরনাম শুনলেই নাচতে সুরু করে। কিন্তু তার ঠিকানাও তো জানা নেই। কোথায় গেলে গৌর-নাচা বাবার সংবাদ পাব? কিছু হদিস দিতে পারে ভেবে ক্ষ্যাপাচাঁদ পায়ে হেঁটে চলে এসেছে বাঙলাদেশে। গিয়েছে নবদ্বীপে, গিয়েছে শান্তিপুরে—গৌর-নাচাকেই লোকে নির্দিষ্ট করতে পারে না, তারপর তার ঠিকানা দেবে!

শেষ পর্যন্ত ক্ষ্যাপাচাঁদ কলকাতায় চলে এল। কলকাতা তো আরো জটিল আরো কুটিল। তারা গৌরকেই চেনে না তো গৌর-নাচাকে চিনবে।

তবু, এমন প্রাণের টান, সন্ধান ছাড়ছে না ক্ষ্যাপাচাঁদ। যাকে পাচ্ছে তাকেই জিগগেস করছে। আমার গৌর-নাচা বাবাজি কোথায় আছে বলতে পারো?

শেষে একদিন রাস্তায় বাণীতোষ বাগচীর সঙ্গে দেখা। গোস্বামী-প্রভুর জামাই বাণীতোষ।

বুঝতে পারল কাকে চায়। বললে, আসুন আমার সঙ্গে।

সটান নিয়ে এল কম্বুলিটোলায়, গোঁসাইজির কাছে। আরে এই তো আমার সেই গৌর-নাচা বাবা।

'গোঁসাইজি, হাম তুমহারা হো গিয়া।' ক্ষ্যাপাচাঁদ প্রভুর কাছে কেঁদে পড়ল।

'কী যে বলেন, আমিই আপনার হয়ে গিয়েছি।' প্রভু বললেন বিনীত হয়ে।

'নেহি। তু মেরা রামজি হো। তুহার লিয়ে হাম ত্রেতাযুগমে পড় রহা হ্যায়। তিন যুগ হামার গুজাড় গিয়া। আবতো কৃপা করতে তু হামকো সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া। আব হামকো কৃপা কর। হাম্‌কো তোহার কর লে।

গোস্বামী-প্রভু কাঁদতে লাগলেন।

'মেরা বাত শুন্। হাম তুমহারা মাফিক জটা রাখেঙ্গে, মালা-তিলক ধারণ করেঙ্গে, আউর সব দেশমে এছা বাত হাজির করেঙ্গে কি, নবদ্বীপমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হুয়ে হ্যায়, উনকো ভজন করো।'

প্রেমাশ্রুতে উদ্বেল হয়ে উঠলেন প্রভু।

ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে গোঁসাইজির সঙ্গে রামনাম করতে সুরু করল ক্ষ্যাপাচাঁদ। সেদিন তো গলা মিলিয়ে কথা মিলিয়ে ভরপুর গলায় গান ধরল রীতিমত।

> 'চল ভাই ভার নিয়ে যাই অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
> দিব তার চরণে ভার, রাম বিনে ভার কে বা লবে ॥
> পাপে হয়েছি ভারী, আর তো ভার সইতে নারি।
> বিনা সেই ভূ-ভারহারী, সে বিনে ভার আর কে ববে ॥
> দিয়ে ভার নিয়ে শরণ, বলব দুটি ধরে চরণ,
> এবার যেমন বইলেম ভার এমন ভার আর দিও না ভবে ॥'

কারা ঠোঙায় করে গোঁসাইজির জন্যে সন্দেশ নিয়ে এসেছে। বাড়ির ঝিয়ের হাতে ঠোঙাটা দিয়ে বললে, প্রভুকে দিয়ে এস। বোলো এক ভক্তবন্ধু পাঠিয়েছে।

গঙ্গাস্নান করে ফিরেছেন, প্রভু ঠোঙা নিলেন হাতে করে। ভক্তবন্ধুর পাঠানো, নিঃসন্দেহে খেলেন একটা সন্দেশ। খেয়েই কী হল, প্রভু অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

ক্ষ্যাপাচাঁদ বললে, সন্দেশের মধ্যে বিষ দিয়েছে।

তা হলে কী হবে? কে দিল সন্দেশ? ঝিকে ধরো। পুলিশ ডাকো।

'ও সব কিছু হাঙ্গামা করতে হবে না। আমি যোগক্রিয়ায় সারিয়ে দিচ্ছি।' বললে ক্ষ্যাপাচাঁদ।

ক্ষ্যাপাচাঁদের যোগপ্রভাবে বিষশক্তি খর্ব হল, প্রভু নিরাময় হয়ে উঠলেন।

কম্বুলিটোলা ছেড়ে চলে এলেন সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে।

কিন্তু সেখানে আবার অন্য উপদ্রব। সামনে বাড়ির ভাড়াটের হরিনামে আপত্তি। রাত্রেও যদি ওরা ধেই-ধেই করে নাচে আর চেঁচায় তা হলে বেচারার মদের নেশাটা ঘন হয়ে জমতে পারে না।

দু বাড়ির একই বাড়িওয়ালা। তাকে ডাকিয়ে সামনের ভাড়াটে বললে, ওদের চেঁচামেচি বন্ধ করে না দিলে তো প্রাণে বাঁচিনা। রাত্রেও যদি কেলে-ঙ্কারি চালায় তাহলে ঘুমুই কী করে? ওদের থামতে বলুন, না থামে তো থামিয়ে দিন।

'কেলেঙ্কারি কী মশাই। কীর্তন হচ্ছে। আমার বাড়িঘর পল্লী শহর ধন্য হয়ে যাচ্ছে। হিন্দু হয়ে হিন্দুর ধর্মীয় আচরণ বন্ধ করে দেব?'

'ধর্ম না মুন্ডু!' লোকটা খেঁকিয়ে উঠল; 'হরি হরি বলে না চেঁচালে ধর্ম হয় না? মনে মনে ইষ্ট নাম করুক না যত খুশি। পাড়ার লোকের শান্তিভঙ্গ করা কেন মশাই?'

'আপনার না পোষায় আপনি অন্য পাড়ায় উঠে যান। আমি কিছু করতে পারব না।' চলে গেল বাড়িওলা।

আচ্ছা, আমি একাই পারব। নিজের মেয়েকে শিখিয়ে দিল কুলকুচো করে মুখের জল ওদের রান্নাঘরের মধ্যে ছিটিয়ে দিতে।

খুব ঘেঁষাঘেঁষি রান্নাঘর। জল ছিটিয়ে ফেলা কঠিন নয়। বাপের কথামত মেয়ে মুখের উচ্ছিষ্ট জল গোঁসাইদের রান্নাঘরে ছুঁড়ে দিল। পড়ল গিয়ে রান্নাকরা জিনিসের উপর। দিনের খাওয়াই নষ্ট হয়ে গেল।

এই মহৎ-লাঞ্ছনার প্রতিকার কী?

লোকটা তার মনিবের কাজে বাইরে বদলি হয়ে গেল। সেখানে একদিন ঠেসে মদ খেল। এত খেল যে হার্টফেল করে মারা গেল। শবদেহ বাক্সে পুরে কলকাতায় আনা হল। যে-সে ধরল সেই বাক্স, কুলির মাথায় করে নিয়ে গেল শ্মশানে।

ভক্তকে দ্রোহ করলে ভক্ত ক্ষমা করতে পারে কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান সেই ভক্তদ্রোহীকে ক্ষমা করেন না।

পার্বতীচরণ রায় গোঁসাইজির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

আরো একবার এসেছিল গেন্ডেরিয়ায়। বলেছিল, 'গোঁসাই, ভগবানের অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস নেই কিন্তু তোমার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস। তুমি যদি বলো ভগবান আছেন তা হলেই মানব, নচেৎ মানব না।'

স্থির শান্ত সহজ স্বরে গোঁসাইজি বললেন, 'ভগবান আছেন।'

'তাঁকে দেখা যায়?'

'হ্যাঁ, দেখা যায়!'

'তুমি তাঁকে দেখেছ?'

'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'আমাকে দেখতে পারো?'

'পারি। কিন্তু তুমি তা বিশ্বাস করবে না। বলবে ভেল্কিবাজি। তার চেয়ে নিজে উপলব্ধি করে প্রত্যক্ষ করবে আর তখনই তাকে মানবে দর্শন বলে।'

পার্বতীচরণ ব্রাহ্ম ছিল, ডেপুটিগিরি করত। রিটায়ার করে বিলেত গেল আর সেখানে এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করল। কিসের ধর্মকর্ম! যতদিন আছি, ঘুরি ফিরি আর স্ফূর্তি করি।

কিন্তু সহজে ত্রাণ পেল না পার্বতীচরণ।

একদিন রাতে শোবার ঘরে দেখতে পেল এক জ্যোতির্ময়ী হিন্দু দেবী ঘর আলো করে বসে আছে। কে দুর্গা না লক্ষ্মী না জগদ্ধাত্রী! এ আবার কেমনতরো দর্শন! ব্রাহ্ম অবস্থায় নিরাকার মানত, তারপর মেম বিয়ে করে নাস্তিক হয়েছে, তার কাছে কেন এক হিন্দু দেবীর আবির্ভাব পার্বতীচরণ ভাবনায় পড়ল।

তারপর আরেকদিন দেখল তিনজন ভারতীয় সাধু তার ঘরে বসে আছেন। তাদের মধ্যে একজন, কী আশ্চর্য, আমাদের গোঁসাইজি। তাঁরা বললেন, স্পষ্ট ইংরেজিতে বললেন, গো ব্যাক টু ইণ্ডিয়া। ভারতে ফিরে যাও।

মন চাইল না আদেশ উপেক্ষা করে। বিলেত থেকে চলে এল তাড়াতাড়ি, ধরল এসে গোঁসাইকে। জিগগেস করল, 'আর দুজন সাধু কে? কোথায় গেলে তাঁদের দেখা পাব?'

'হরিদ্বারে যাও। গঙ্গাতীরে দেখা পাবে।'

গোঁসাইকে বিশ্বাস করে পার্বতীচরণ তক্ষুনি হরিদ্বারে যাত্রা করল। গঙ্গাতীরে দেখতে পেল সেই দুই বিলেত-যাওয়া সাধু বসে আছেন।

তাঁদের কাছে উপদেশ চাইল পার্বতীচরণ। তাঁরা বললেন, 'গোঁসাইয়ের কাছে যাও।'

গোঁসাইয়ের কাছে ফিরে এল। বললে, 'তোমার কথাই ঠিক। বাকি দুই সাধুর দেখা পেলাম হরিদ্বারে। তাঁরা আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বলো আমি কী করব?'

'বিলেতেই ফিরে যাও।' বললেন গোঁসাই।

পার্বতীচরণের সমস্ত ভার নেমে গেল। বললে, 'গোঁসাই, তুমি আমার মর্মের কথাটাই বলেছ, আমি ফিরে যাব। আমি বুঝতে পারছি আমার এই দেহে এই জন্মে সাধনভজন কিছুই হবে না। কত যে কদাচার করেছি অখাদ্য খেয়েছি পাপে কলুষে ডুবেছি তার শেষ নেই। শেষে বৃদ্ধ বয়সে বিধর্ম

বিবাহ। তবু তোমার যেটুকু কৃপা পেয়েছি এ জীবনে সেই আমার পরম পাথেয়। একটা ভ্রষ্টাচারী নাস্তিক এর বেশি আর কী আশা করতে পারে? গোঁসাই, আর যা হবার তা হোক, তুমি আমাকে ভুলো না।'

গোঁসাই কাউকে ভোলেন না। শুধু মন পবিত্র ও প্রফুল্ল রাখবে। আর মনের মধ্যে সব সময়ে একটি প্রার্থনার ভাব জাগিয়ে রাখবে। সব সময়েই, লেখাপড়া করছ কি কথাবার্তা বলছ বা পথে ঘাটে চলছ, কতক্ষণ অন্তর-অন্তর একটু অবসর নিয়ে ভগবানকে একটু স্মরণ করে নেবে। তিনি সর্বদা সঙ্গে আছেন, আমাকে কত ভালোবাসছেন, কত ভাবে দয়া করছেন, এই ভেবে মনে মনে তাঁকে প্রণাম করবে। যত বেশি প্রণাম করবে তত বেশি মঙ্গল।

ভরতের মনে হল, প্রভু বিনে আমার সুখ কী। কিসের আমার ভোগবিলাস, রাজসিংহাসন! যদি আমার প্রভুকেই সংসারের রাজা করতে না পারলাম তাহলে আমার সংসারে কী হবে? যতদিন তাঁকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনা না যাবে ততদিন আমিও বনবাসী হয়ে থাকব। প্রভু ছাড়া আমার সংসার বন ছাড়া আর কিছু নয়। বলো আমার প্রভুকে কোন দিকে তাড়িয়ে দিলে? আমিও সেই দিকে যাব। আমার সংসারের রাজা, সুখের রাজা চলে গেল আর আমি হরিহারা হয়ে পড়ে থাকব এ হতেই পারে না। আমার প্রাণারাম রামকে ফিরিয়ে আনো।

॥ ৩৪ ॥

দপ্তরি পাড়ায় থাকে, ধাত্রীগিরি করে, নাম ক্ষীরোদা সুন্দরী দাসী। গোঁসাই-প্রভুর শিষ্যত্ব নিয়েছে। তার এ কী ভাব হল! দেখল, এ গোঁসাই কোথায়, এ ষড়ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গ। দেখামাত্রই অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

তখন আবার তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে সুরু করো নামকীর্তন।

ব্রাহ্ম জ্ঞানেন্দ্র হালদারের মা, ইনিও ব্রাহ্মিকা, গোঁসাইজির কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে বসলেন। দীক্ষান্তে তাঁর মহাভাব উপস্থিত হল। তিনিও বাহ্যজ্ঞান হারালেন।

প্রভু তাঁকে সুস্থ করে তুলতেই তিনি বলে উঠলেন 'আমি পেয়েছি, আমি দেখেছি—'

'তাই তো আপনার দেহও চলে গিয়েছিল।' বললেন গোঁসাইজি।

'তবে আবার বাঁচালেন কেন?'

'এ শহর কলকাতা, না বাঁচালে যে পুলিশ এসে ধরত।' গোঁসাইজি হাসলেন : 'পাহাড় জঙ্গল হত দেহটা টেনে ফেলে দিতে বাধত না। তুমিও তখন মায়ামুক্ত হয়ে যেতে।'

বিশ্বাস কি কখনো দেখেশুনে হয়? অনেকে বলে অলৌকিক কিছু

দেখলেই বিশ্বাস হবে। অলৌকিক কিছু দেখলেও অলৌকিকত্ব সম্পর্কে তর্ক করবে। বিশ্বাস পেতে গেলেও, যাকে বিশ্বাস করব, সেই ভগবানের কৃপা দরকার।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর গোঁসাইজির সঙ্গে দেখা করতে চান। বলে পাঠিয়েছেন, একটু নির্জনে বসে আলাপ করব।

গোঁসাইজি বললেন, 'এখানে নির্জনতা নেই। যে যখন চাইছে অবাধে চলে আসছে। একজনের জন্যে আরেকজনকে ঠেকাব কী করে? এমনি চলে আসুন।'

তাই এলেন কালীকৃষ্ণ।

তাঁর ঘরে এত ভোগ এত ঐশ্বর্য তবু তাঁর সুখ নেই। শত যশে নামেও তাঁর প্রাণের জ্বালার নিবারণ হচ্ছে না। কী করে শান্তি পাব বলুন।

প্রভু বললেন, 'ভগবান যাকে যা দিয়েছেন তার সদ্ব্যবহার করলেই শান্তি।'

কালীকৃষ্ণ নিজের অন্তরের মধ্যে তাকালেন। আমাকে ভগবান কী দিয়েছেন?

'আপনাকে ভগবান অগাধ ধনৈশ্বর্য দেননি?'

'দিয়েছেন।' সবিনয়ে স্বীকার করলেন কালীকৃষ্ণ।

'তার সদ্ব্যবহার করুন।'

'কেন, আমি তো দান করি।'

'দান করেন, কিন্তু খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে। খবরের কাগজে নামটা ছাপা না হলে খুশি হন না।' প্রভু বললেন স্নিগ্ধ স্বরে, 'প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করে সঙ্গোপনে দিতে পারলেই শান্তি পাবেন।'

'মনি-অর্ডারে বা রেজেস্ট্রি করে পাঠাতে গেলেও তো নাম সই করতে হবে।'

'না, না, আপনি সরাসরি খামে পুরে পাঠিয়ে দিন।'

'যদি মারা যায়?'

'যাবে না, ভগবানের জন্যে দান করছেন, ভগবানই সে দান বহন করবেন।'

সম্পূর্ণ স্বত্বত্যাগই দান। কোনো সর্ত সংযুক্ত করে দিলে সে আর দান রইলনা। দত্ত বস্তু হয়ে গেল। দত্ত দ্রব্য আগুনে দগ্ধ হলে হবে, জলে পড়লে পড়বে, পথে মারা গেলে যাবে, আমার শুধু দানেই পরিতৃপ্তি। দানেরও একটা পিপাসা থাকা দরকার। ভয় বা স্নেহ লজ্জা বা মান, বংশমর্যাদা বা প্রত্যুপকার —এরকম কোনো প্ররোচনায় যে দান সেটা খাঁটি দান নয়। দান করে যদি অনুতাপ হয়, তাও নয়। যে দান ফলাভিসন্ধিহীন, দানের পাত্রকে দেখলেই যা আপনি থেকে উৎসারিত হয়ে ওঠে তাই দানপদবাচ্য।

প্রভু ঠিক করলেন আবার বৃন্দাবনে যাবেন।

'আপনি বৃন্দাবনে গেলে আমার কী উপায় হবে?' এক সাধু এসে কেঁদে পড়ল।

'কেন, আপনার অসুবিধে কী!'

'প্রতিদিন আপনি আমাকে খেতে দিতেন।' বললে সাধু, 'আপনার যাবার পর কেউ আমার দিকে মুখ তুলেও চাইবে না।'

'তা হলে কী করবেন?'

'আমি হরিদ্বারে চলে যাব।' সাধু দ্বিধাগ্রস্তের মত বললে, কিন্তু আমি কপর্দকশূন্য, আমাকে ভাড়ার টাকাটা জোগাড় করে দিন।'

প্রভু ধ্যানমগ্ন হলেন।

কতক্ষণ পরে ভোলাগিরির এক ভক্ত এসে উপস্থিত! এসে প্রভুর পায়ের কাছে পাঁচটি টাকা রাখল। প্রভু চোখ মেলে বললেন, 'এই যে আপনার প্রাপ্য টাকা ভগবান রেখে গেলেন।'

সাধু টাকা নিয়ে চলে গেল।

প্রভু বললেন, 'যখন সাধু এসে টাকা চাইল মনে হল নিজের পথের সম্বল যা আছে তার থেকে সাধুকে দিয়ে দিই। গুরুদেব তখুনি ধ্যানে এসে নিষেধ করলেন, সাধুকে কিছু দিয়ে কাজ নেই। কিন্তু আমার প্রাণ যে কিছু সাহায্য করবার জন্যে কাঁদছে। তখন ভগবান এই ব্যবস্থা করলেন। তাঁর দয়া নিরন্তর, নিরবধি!'

বৃন্দাবনে যাচ্ছেন, সবার থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, বাড়ির মেথর এসে প্রণাম করলে প্রভুকে।

গোঁসাইজি সেই প্রণাম ফিরিয়ে দিলেন। করজোড়ে বললেন, 'আশীর্বাদ করুন যেন রাধারাণীর দর্শন পাই।'

মেথর কাঁদতে লাগল। শিষ্যভক্তের দল অভিভূত হয়ে গেল।

এতে অভিভূত হবার কী আছে? গোস্বামী-প্রভু বললেন, সমস্ত মানুষের চরণতলেই ভগবৎপ্রাপ্তির সরণি।

কেশীঘাটে কালাবাবুর কুঞ্জে এসে উঠলেন গোঁসাইজি। সেখানে কিছু-দিন থেকে চলে এলেন তীর্থমণিকুঞ্জে। বললেন, 'শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃতধাম। এর এক একটি রজকণা এক একটি মহাবিষ্ণুতুল্য। এই ধামের তরুগুল্ম সাধারণ তরুগুল্ম নয়। সকলেই ছদ্মবেশী দেবতা। শুধু একটি সূক্ষ্ম যবনিকা এই দিব্যধামকে আবৃত করে আছে। একটু চোখের আড়াল ভাঙলেই সমস্ত প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। থাকো, দেখ আর দেখতে শেখ। এখানে এলেই তো সমস্ত পাপনাশ, সমস্ত প্রারব্ধক্ষয়।

গোস্বামী-শিষ্য বেণীমাধব গৌরলীলার গান ধরেছেন :

গৌর অনুগত না হলে কি তাপিত প্রাণ জুড়ায়
আমরা জেনে শুনে প্রাণ সঁপেছি শ্রীগৌরাঙ্গের পায়।
নয়নরঞ্জন খঞ্জন আঁখি কত দুঃখী তাপীর দুঃখ পাসরায়
নবদ্বীপের নবগোরা দেখবি যদি আয়॥
দ্বিজ গোঁসাই চাঁদে বলে, শ্রীগৌরাঙ্গের নাম না নিলে,

কি করবে তার বিদ্যা-কুলে, বৃথা জনম যায়॥

এক শিষ্য এসে গোঁসাইজিকে বললে, 'আপনার সাধন আপনি ফিরিয়ে নিন।'

'কেন, কী হল?' গোঁসাইজি শান্তনেত্রে তাকালেন।

'আমরা সংসারী লোক, আমরা কি এ সব সাধন করতে পারি?'

'কেন, বেশি কিছু তো নিয়ম নেই, শুধু মদ মাংস উচ্ছিষ্টমাত্র খেতে নিষেধ। মদ মাংস না খেয়ে পারো না?'

'কী করে পারব বলুন। চিরকাল ও দুটো খেয়ে এলাম, এখন কি আর ছাড়া যায়? ভদ্রলোকদের সঙ্গে ভদ্রতা রাখতে গেলেই ওসব খেতে হয়। আর উচ্ছিষ্ট? সমাজের মধ্যে বাস করি, দশ বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে হয়, তাতে উচ্ছিষ্ট বিচার চলে কী করে?'

গোস্বামী-প্রভু হতাশ হলেন না, সস্নেহে বললেন, 'আচ্ছা একটু চেষ্টা করো। তারপর না পারলে আর কী করবে।'

শিষ্য স্পষ্টকণ্ঠে বললে, 'ও সব চেষ্টা-টেষ্টার ভণ্ডামি আর করতে পারব না। সত্যি কথা বলতে কী, কোনো চেষ্টাই আসেনা মনের থেকে। আজ আপনাকে সত্য কথাটা বলে ফেলে পরিষ্কার হতে এসেছি।'

'একটু অন্তত নাম তো করতে পারো।'

'নামেও রুচি নেই। কখনো-কখনো নামও মনে আসে না। নাম যে করতে হবে সেকথাটাও ভুলে যাই।'

'বেশ, আমাকে শুধু স্মরণ কোরো।' বললেন প্রভু, 'আরও তুমি জেনে রাখো যা তুমি অপরাধ করবে সমস্ত দণ্ড আমি ভোগ করব। কোনো অপরাধই তোমাকে স্পর্শ করবে না। তুমি দণ্ডমুক্ত দায়মুক্ত হয়ে গেলে।'

এত দয়া এত স্নেহ! শিষ্য প্রভুর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল : 'আমার অপরাধের দণ্ড আপনি ভোগ করবেন! আর আমি নিরংকুশ ধর্মের ষাঁড় হয়ে ঘুরে বেড়াব?'

অঝোরে কাঁদতে লাগল শিষ্য। আর বুঝি তার ভুল হবে না, ঘটবে না বিচ্যুতি।

ভগবানে চিত্তসমর্পণ ও অচলা ভক্তি আসবে কিসে?

স্বাধ্যায়ে অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থপাঠে ও নামজপে, সৎসঙ্গে, বিচারে আর দানে। বিচার—কী বিচার? বিচার অর্থ সর্বদা আত্মনিরীক্ষণ। যদি বোঝো আত্মপ্রশংসা ভালো লাগে, পরনিন্দায় আমোদ হয়, তা হলে মনে করবে ধর্মবিচ্যুতি ঘটল, নরকের দ্বার প্রশস্ত হল। আর দানের অর্থ দয়া, কারু প্রাণে কষ্ট না দেওয়া। শুধু মানুষকেই নয়, পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গ কাউকেও কষ্ট দেবে না। সব চেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে অহংকার। লোকের কাছ থেকে সম্মান নিতে নিতে শুধু নিজের কাপট্যই বাড়ে, তাই লোকের সামনে যত হীন ও মলিন রূপে পরিচিত হওয়া যায় ততই মঙ্গল।

বৃন্দাবনে যমুনা তীরে কতগুলো প্রেত এসে গোঁসাইজির কাছে উপস্থিত হল। বললে, 'আমাদের সদ্গতি করুন।'

প্রভু বললেন, 'আমি কিছুই জানিনা। আমার গুরুদেব জানেন।'

'ও সব কথায় কাজ নেই। আপনি যমুনার জলে নামুন।'

ঠাকুর নামলেন। উঠে এলে প্রেতগুলো তাঁর পা থেকে জল নিয়ে খেতে লাগল। দেখতে দেখতে ওদের কালো মূর্তি জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠল।

খবর পেঁছুল ভক্ত মহেন্দ্র মিত্রের কাছে। বললে, 'প্রেত উদ্ধার হল, আমরাও বা চরণামৃত ছাড়ি কেন?'

জোর করে মহেন্দ্র নিল চরণামৃত। পিপাসু ভক্তদের বিতরণ করল। সবাই সেই অমৃতে আতরের গন্ধ পেল।

এই মহেন্দ্র মিত্রই গোঁসাইজিকে নিয়ে গান বাঁধল :

'ভালো ভালো জটে বুড়ি গিয়েছিল বৃন্দাবন,
লং সাহেবের গির্জা দেখে বলে গিরি গোবর্ধন।
কেশব সেনের চশমা দেখে বলে কালীর বাঁকা নয়ন॥'

শুনে গোঁসাইজির কী আনন্দ!

এবারে বৃন্দাবনে ময়ূরমুকুট বাবাকে লাভ করলেন ঠাকুর।

বাবাজি ন-বছর বয়সে বৈরাগী হয়ে হিমালয়ে চলে যান। সেখানে চার-পাঁচ বছর ঘুরে বেড়াবার পরে এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নেন। হিমালয়ে বহু বছর কঠোর সাধনা করে কৈলাসে চলে যান। সেখানে কৈলাস-পতির দর্শন লাভ করেন। কিন্তু আপনা থেকেই অন্তরে বৃন্দাবনের মধুর লীলা স্ফূর্তি পেতে থাকে। আদেশ হয় বৃন্দাবনে গিয়ে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব লাভ করো। চলে এলেন বৃন্দাবন। কিন্তু কোথায় সেই সদগুরু যিনি তাঁকে ব্রজলীলা উপলব্ধি করাবেন। ঘুরতে ঘুরতে রাধাকুণ্ডে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে রাধারাণী স্বপ্ন দিলেন, বললেন, কেশীঘাটে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আছেন। তাঁর শরণাপন্ন হলেই তোমার বাসনা চরিতার্থ হবে।

কেশীঘাটে এসে গোঁসাইজির দেখা পেলেন সাধু। শিবের কথা, রাধারাণীর কথা সব বললেন তাঁকে। প্রভু তার মধ্যে শক্তিসঞ্চার করে দিলেন। তার ফলে সাধুর কৃষ্ণদর্শন হল।

তুমি যে হরি তা বুঝি কী করে? তখনই ভক্তবৎসল কৃষ্ণ একটি ময়ূর হয়ে গেলেন আর ঝোলা ঝাড়া দিয়ে কতগুলো পালক ফেলে দিয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। বাবাজি পালকগুলো কুড়িয়ে নিয়ে একটা মুকুট তৈরি করে মাথায় পরলেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে গেল ময়ূরমুকুট বাবাজি।

পাণ্ডা গোবিন্দজির প্রসাদ এনে দিয়েছে গোঁসাইকে। বাড়ির আবর্জনা সাফ করে যে মেথরানি তাকে প্রভু কাছে ডাকলেন। বললেন, তুমি মার সমান। মার মতন তুমিই সন্তানের সেবা করছ, এই নাও তোমার জন্যে গোবিন্দজির প্রসাদ রেখেছি।

দুই হাত একত্র করে মেথরানি প্রসাদ নিল। বললে, 'কেউ আমাদের এমন করে ডাকে না, বলে না—'

নামেই সব—বললেন গোস্বামী-প্রভু। শরীর থেকে অহংকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশলই নাম। শরীর হতে আমি পৃথক এ উপলব্ধি করতে হলে শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করা খুব কঠিন কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষ্য রেখে নাম করার মত উপকার আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। সহজ শ্বাস-প্রশ্বাসে নামটি একবার ঠিকমত গেঁথে নিতে পারলেই আত্মদর্শন।

বৃন্দাবনে ছ সাত মাস থেকে প্রভু ফিরলেন কলকাতা, সেখান থেকে কয়েক দিন পরে ঢাকায় চলে এলেন। সেখানে মাঘমাসে, ধুলোট হবে বলে জানালেন সকলকে।

হাজারে হাজারে লোক এসে জড়ো হল গেণ্ডারিয়ায়। উৎসবের আনন্দ-বাজার বসে গেল। স্থানাভাবের দরুন কত যে তাঁবু পড়ল তারও হিসেব নেই। কত যে কীর্তনের দল এসেছে তারই বা কে খোঁজ করে?

কীর্তন আর কীর্তন—চলেছে অন্তহীন অমৃতনির্ঝর। কীর্তনের মধ্যে মাঝে মাঝে প্রভু জয় শচীনন্দন বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠছেন, কখনো বা নাচছেন উন্মত্ত হয়ে। ধুলোটের শেষদিনে নগরকীর্তন বেরুল। আর গান উঠল ভুবনমাতানো :

দয়াল নিতাই ডাকে আয়
প্রেমধন বিলায় গৌর রায়
(এই ধর প্রেম লও বলিয়ে)

সমস্ত ঢাকা শহর কীর্তনে উন্মাদ হয়ে উঠল। শরীর অসুস্থ বলে গোস্বামী প্রভু ঘোড়ার গাড়ি করে যাচ্ছেন মিছিলের পিছনে, কিন্তু তিনি একাই সমস্ত অগ্রপশ্চাৎ জ্যোতির্ময় করে রেখেছেন। তাঁকে ঘিরেই একটা আনন্দ-অম্বুধি উল্লসিত হয়ে উঠেছে। শ্রীধর নাচছে আর ঊর্ধ্বে আঙুল দেখিয়ে বলছে, ঐ দেখ ক্ষীরোদসাগর! ঐ দেখ শ্বেতদ্বীপ। যে যাকে দেখছে তারই পদধূলি নিচ্ছে—ভক্ত-পদধূলিই জীবনের পরম সম্পদ—রাস্তায় গড়িয়ে পড়ে সর্বাঙ্গে ধুলো মাখছে। কীর্তন বেরিয়ে যাবার পর, যারা কীর্তনে যোগ দেয়নি, তারা রাস্তায় এসে মুঠো-মুঠো ধুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে, গায়ে মাথায় মেখে পবিত্র হচ্ছে। চলেছে এক পরমপাবনী উন্মাদনা।

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এক সৈন্যবাহিনী, তারা কীর্তনের জন্যে পথ করে দিল, কেউ কিছু বলে নি, কাঁধের বন্দুক অবনত করল।

আশ্রমে ফিরে এল কীর্তনের দল। প্রভু বললেন, 'আজ যে চাইবে সেই সাধন পাবে।'

সকাল নটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত চলল সাধন-বিতরণ। প্রায় পাঁচশো লোক পেয়ে গেল কৃপামন্ত্র।

আশ্রমের গাছগুলো মধুক্ষরণ করতে লাগল। গাছের সমস্ত পাতা ভিজে রয়েছে, মেঘের থেকে বর্ষণ নেই, তবে কেন এই আর্দ্রতা। গাছের গা ফেটেও রস ঝরছে। সকলে আস্বাদ করে দেখছে, মধু। গাছের কীর্তনাশ্রু।

ঢাকায় এই শেষ ধুলোট।

উৎসবশেষে প্রভু বললেন, কলকাতায় যাব।

কৃষ্ণ বুঝি মথুরায় চললেন। কিন্তু তাঁর লীলাস্থল গেণ্ডেরিয়ায় তিনি কি আর ফিরবেন না? ব্রজবাসীরা যেমন কৃষ্ণের জন্যে কাতর তেমনি ঢাকা-বাসীরা বিজয়কৃষ্ণের জন্যে কাতর হয়ে উঠল।

কোথায় প্রভুর কোন লীলা হবে তা কে বলবে?

হরিদাস বসু বোলপুরে ওকালতি করে। হিন্দুধর্ম আগাগোড়া কুসংস্কারে জড়িত এই জ্ঞানে সে ব্রাহ্ম হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মবিধি পালন করেও তার মনে সুখ নেই। পরব্রহ্ম শুধু একটা কথার কথা। পাপ পুণ্য শুধু সামাজিক সংস্কার। এই সব বিবেচনা করে ধর্মকর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে সে পুরোদস্তুর বিষয়বিলাসে মত্ত হয়েছে। হায়, সেখানেই বা শান্তি কোথায়? ইন্দ্রিয়সেবায় শুধু স্বাস্থ্যের অপচয়।

বোলপুরে তার বন্ধুরা প্রেততত্ত্ব আলোচনা করে, চক্র তৈরি করে বসে পরলোকবাসীদের নামায়, তাদের সঙ্গে আলাপ করে। বন্ধুর এক যুবতী স্ত্রী এ-চক্রের মধ্যস্থ বা মিডিয়ম। তার মুখ দিয়েই কথা কয় আত্মারা।

হরিদাস বলে, গাঁজা।

একদিন বৈঠকে দেখা গেল, যুবতীর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর, সর্বাঙ্গে জ্যোতিচ্ছটা। এই গাম্ভীর্যলাবণ্য তো যুবতীর নিজস্ব নয়। তবে আজ কে এল?

যুবতীর মুখ দিয়ে কথা বেরুল : 'আমি অঘোরনাথ। হরিদাসকে ডাকো।'

হরিদাসকে ডেকে আনা হল।

হরিদাস স্বকর্ণে শুনল অঘোরনাথ বলছে, 'কলকাতায় যাও। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে গিয়ে দীক্ষা নাও।'

স্বকর্ণে শুনেও হরিদাস যেতে চায় না। বলে, ভূতের মুখের কথা শুনে যেতে প্রস্তুত নই।

কিন্তু না গিয়েও তো শান্তি পাচ্ছে না। ভূত কেবলই তাড়া দিয়ে ফিরছে। এ যে সে ভূত নয়। স্বয়ং অঘোরনাথ।

তারপর একদিন গেল হরিদাস। বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করল। প্রভু বললেন, 'কাল এস।'

'কখন?'

সময় ঠিক করে দিলেন। কিন্তু হরিদাসের যেতে দেরি হয়ে গেল। দু-দশ মিনিটের ব্যবধানে কী আর এসে যায়?

প্রভু তাকে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, 'ধর্মের প্রথম কথাই হচ্ছে সময়-নিষ্ঠা। যার সময়-নিষ্ঠা নেই তার তো শ্রদ্ধাও নেই। হবে হচ্ছে এই গয়ং গচ্ছ ভাবে ওকালতি চলে কিন্তু কৃষ্ণসাক্ষাৎকার চলে না।'

হরিদাস বোলপুরে ফিরে এল।

॥ ৩৫ ॥

বোলপুরে ফিরে এসে হরিদাস বললে, দীক্ষা দিলে না।

আবার যাও। বারে বারে যাও। না পাওয়া পর্যন্ত নিবৃত্ত হবে না।

আবার গিয়ে উপস্থিত হল হরিদাস।

'আবার এসেছ?'

'আমি কি নিজের ইচ্ছেয় আসি? আমাকে জোর করে বারে বারে পাঠায়।'

'কে পাঠায়?'

'অঘোরনাথ।'

নাম শুনে গোঁসাই-প্রভু শিহরিত হলেন। বুঝলেন মর্মকথা। বললেন, 'তোমার সাধন মিলতে আরো কিছুদিন বাকি আছে। এখন যাও, আমি পরে খবর পাঠাব।'

আবার ফিরে গেল হরিদাস।

পরে খবর পাঠাবে! যেন খবর পাঠালেই ছুটতে হবে আমাকে।

কিন্তু সত্যি সত্যিই খবর যখন পাঠালেন গোঁসাইজি, হরিদাস স্থির থাকতে পারলনা। ছুটে চলে এল কলকাতা। নীরবে প্রভুর কাছে এসে দাঁড়াল।

'বোসো। আজ দীক্ষা হবে।'

আসনে বসল হরিদাস। বসেও সে বুঝি নিঃসন্দেহ হতে পারছে না। বললে, 'আগে আমার একটা প্রশ্নের মীমাংসা চাই। মানুষ কী করে মানুষের গুরু হয়?'

প্রভু বললেন, 'মন্ত্রদাতা গুরু মানুষ নন, তিনি ভগবান।'

হরিদাস অভিভূতের মত তাকিয়ে রইল। শান্ত হল। পূর্ণ হল। দীক্ষিত হল।

আগুন তো সর্বত্র আছে, এমন কি শূন্যেও আছে, কিন্তু তাকে ধরি কী করে? যেখানে প্রদীপ জ্বলছে বা চুল্লি জ্বলছে সেইখানেই আগুন বিশেষরূপে প্রকাশিত। সেখানে গিয়ে আগুনকে ধরো। বলছেন প্রভু, তেমনি ঈশ্বর সর্বব্যাপী হলেও কেউ তাঁকে ধরতে পারে না। গুরুতেই তাঁর চিৎশক্তির সবিশেষ প্রকাশ। সুতরাং সেখানে গিয়ে আশ্রয় নাও। গুরুই

ঈশ্বর। গুরুর পূজাই ঈশ্বরের পূজা।

গুরুদক্ষিণা কী?

মোক্ষার্থীদের গুরুদক্ষিণা নেই। বলেছেন প্রভু, সদগুরু তাদের আত্মসাৎ করে নেন। যে আপনার জিনিস হয়ে যায় সে কাকে দক্ষিণা দেবে? নিজের থেকে নিজের কি কোনো দক্ষিণা নেওয়া চলে?

সাধন-উল্লাসে হরিদাস দেখল প্রভুর আসনে হরেকৃষ্ণ নাম ফুটে উঠেছে। কতক্ষণ পরে নাম নেই, আসনে যুগলমূর্তি। যুগলমূর্তি আবার আসন ছেড়ে প্রভুর উরুর উপর।

আগে শুনলে হরিদাস গাঁজাখুরি বলত, এখন স্বচক্ষে দেখে কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু চোখকে বলছে, চোখ, তুমি নিষ্পলক হয়ে যাও।

দীক্ষা-অন্তে হরিদাস অন্য রকম হয়ে গেল। নামে রুচি জন্মাল, কীর্তনে আনন্দ। তার বাড়ি কুলীনগ্রাম, যে গ্রামের রামানন্দ বসু মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র ছিল, যার দরুন কুলীনগ্রামের সামান্য কুকুরকেও তিনি প্রিয় বলে অনুভব করেছিলেন, সেই গ্রামে হরিদাস খবর পাঠাল, গোঁসাই-প্রভুর কাছ থেকে দীক্ষা নেবে তো কলকাতায় চলে এস। যাওয়া আসার খরচ আমি দেব।

প্রভু তখন ১৪।২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে ৪৫ হ্যারিসন রোডের বাড়িতে আছেন। একদিন এক দঙ্গল মেয়ে-পুরুষ সেখানে এসে উপস্থিত হল।

'আমরা কুলীনগ্রামের লোক—'

বেশির ভাগই বেশে-বাসে অসম্ভ্রান্ত। কয়েকজন গণ্যমান্য পোশাকের লোকও আছে দলের মধ্যে।

ওরা কারা? গণ্যমান্যদের জিগগেস করলে কেউ। আর আপনারা?

'ওরা, যাকে বলে ছোটজাত, হাড়ি মুচি ডোম দুলে বাগদি—কামার কুমোর ছুতোর মিস্ত্রিও আছে আর আমরা ক-জন বামুন কায়েত। কিন্তু এখন আর ওরা-আপনারা নেই। আমরা এখন সকলে এক গাঁ—আমরা সবাই কুলীনগ্রামের।'

'তাতো হল, কিন্তু আপনাদের মতলবখানা কী?'

'বোলপুরের উকিল হরিদাস বসু এখানে আছেন না? তাকে ডাকুন।'

হরিদাসের তো চক্ষু স্থির! কী সর্বনাশ। এত লোক!

শুধু সংখ্যা? এদের অনেকের অপকীর্তি তো অজানা নয়। ওটা তো নামকরা গুণ্ডা। ওটা তো চুরি করে জেল খেটে এসেছে। আর, ছি ছি, শ্যামাকান্ত চাটুজ্জ্যের কানে কানে বলে হরিদাস, 'ও মেয়েটা পতিতা।'

ভক্ত শ্যামাকান্ত বললে, 'পাতকীরাই তো বেশি করে আসবে ঠাকুরের কাছে।'

'কিন্তু গোঁসাইকে গিয়ে বলি এমন সাধ্য নেই।' হরিদাস ফাঁপরে পড়ল :

'যদি বিরক্ত হন যদি এক কথায় বিদায় করে দেন।'

'কিন্তু এরা যাঁর জিনিস তাঁর কাছে তো এদের একবার পৌঁছে দিতে হবে।'

হরিদাস ভয়ে-ভয়ে উঠে গেল উপরে। দেখল প্রভু তখন ভক্তদের কাছে শিবচতুর্দশীর কথা বলছেন। বলছেন কী করে পশুঘাতক ব্যাধকে উদ্ধার করলেন মহাদেব।

কথাশেষে হরিদাস বললে, মহাদেব কৃপা করে শুধু একটি ব্যাধকে উদ্ধার করেছিলেন, আজ একশোরও বেশি ব্যাধ কুলীনগ্রাম থেকে এসেছে উদ্ধার পেতে। আমাদের শিবসুন্দর কি কৃপা করবেন না?

কুলীনগ্রাম! সেই প্রিয় নাম! প্রভু চঞ্চল হয়ে উঠলেন, 'কাল দীক্ষা হবে।'

হবে, হবে, আমাদের হবে। আমরাও প্রভুর মনোনীত। আমাদেরও তিনি পারের কড়ি জুটিয়ে দেবেন।

পরদিন লোক যেন আরো বেশি দেখাল। রাত ভোর হতে না হতেই সবাই গঙ্গাস্নান করে হাজির হয়েছে! কেউ বা অন্ধকার না কাটতেই ভিড় করেছে। তাদের সূর্য আজ আলো হয়ে দেখা দেবে না, শব্দ হয়ে ধরা দেবে।

প্রশস্ত হলঘরেও কুলিয়ে উঠছে না সকলকে। মেয়েরা একদিকে, পুরুষেরা আরেক দিকে, দু-দিকেই স্তূপীভূত ঔৎসুক্য।

প্রভু এসে আসন নিলেন। প্রারম্ভিক উপদেশ বিতরণ করে দীক্ষা দিলেন জনতাকে।

মুহূর্তে তুমুল তরঙ্গ উঠে গেল। কেউ আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল, কেউ বা হাসতে লাগল উদ্বেল হয়ে। কেউ নাচতে লাগল, কেউ বা পড়ে রইল অজ্ঞান হয়ে। কে ছোট জাত কে বড় জাত কোনো সীমারেখা রইল না, বামুনে মুচিতে হাড়িতে কায়েতে কোলাকুলি চলল। ভক্তির দেশে আবার জাত কী। ভক্তির কৌলীন্যেই তো কুলীনগ্রাম!

'যাও ঘরে গিয়ে কীর্তন করো গে।'

কীর্তন শোনাতে এল নীলকন্ঠ, এল গণেশদাস। গণেশদাসের সঙ্গে বৃন্দাবনের বলরাম দাস বাবাজি।

সেই বলরাম দাস, বৃন্দাবনে যার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল গোঁসাইজির। কীর্তনে 'সুখময় বৃন্দাবন' কথাটি শুনে ভাবাবেশে তিনদিন অচৈতন্য অবস্থায় কাটিয়েছিলেন। রোমকূপ থেকে রক্তক্ষরণ হয়েছিল। সবাই ভেবেছিল দেহ ছেড়ে দেবেন বোধহয়। গোঁসাইজি তাঁর বুকে কান পেতে শুনতে পেলেন ভিতরে সুখময় বৃন্দাবন ধ্বনিত হয়ে চলেছে। তখন গোঁসাইজি নিজেই কীর্তন সুরু করলেন : সুখময় বৃন্দাবন, সুখময় বৃন্দাবন, আর অমনি হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন বলরামদাস।

বীরভূমের সূর্যনারায়ণ রায়ও কীর্তন শুনিয়ে যান।

'ও যমুনে, তোর তীরে শ্যাম আমার বাঁশী বাজাত।
ভুবনমোহন তানে ভুবন ভুলাত।
আমার না হয় হিয়া পাষাণ
তরলে, তোর তো তরল প্রাণ,
না হেরে সে চাঁদ বয়ান, কেমনে আছ জীবিত।'

কৃষ্ণলীলার আরো গান গাইতে যাচ্ছিল, গোঁসাই-প্রভু সূর্যনারায়ণকে বাধা দিয়ে সকাতর বিনয়ে বললেন, 'দয়া করে একটি শ্যামার গান করুন।'

সূর্যনারায়ণ তক্ষুনি গলা ছেড়ে গান ধরল :

'জাননা রে মন পরম কারণ
শ্যামা কভু মেয়ে নয়
সে যে মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়।'

'আচ্ছা একটা কথা জিগগেস করতে পারি?' কীর্তনশেষে প্রশ্ন করল সূর্যনারায়ণ।

'করুন।'

'আপনি ওরকম বিনয় করে গানের জন্যে প্রার্থনা করলেন কেন? আমাকে আদেশ করলেই তো হত। আপনার একটা আদেশই তো যথেষ্ট।'

'না।' বললেন গোঁসাইজি, 'তুমি কৃষ্ণের গান গাইছিলে, আমি তোমাকে কালীর গান গাইতে বললাম। ভাব থেকে হঠাৎ ভাবান্তর ঘটালে ভাবের কাছে অপরাধ হয়, তাই তোমার ভাবের কাছে ক্ষমা পাবার আশায় ঐ ভাবে বলেছিলাম।'

সূর্যনারায়ণ মুগ্ধ হয়ে গেল। অমন করে ক-জন ভাবে।

'ভাবটি যেন কেমন লজ্জাবতী লতা।' বললেন গোঁসাইজি, 'স্পর্শ করলেই সংকুচিত হয়ে পড়ে। সামান্য অনাদর অমর্যাদা সইতে পারেনা, শুকিয়ে যায়। সুতরাং দেখতে হয় কারু ভাবের কাছে না অপরাধী হই।'

'নটবর বেশে বৃন্দাবনে এসে কালী হলি মা রাসবিহারী।' সূর্যনারায়ণ আবার গান ধরল।

সাবজজ চণ্ডীচরণ সেন এসে জিগগেস করলে, 'সমাজের মঙ্গল হবে কিসে?'

'ঋষি-প্রকাশিত শাস্ত্রমতে চললে।'

'আমাদের ব্রাহ্মসমাজ তো সেই রকমই চলেন।' বললেন চণ্ডীবাবু।

'না, চলেন না। শাস্ত্রের যে অংশটুকু মতের সঙ্গে মেলে তাই শুধু মানেন, যা মেলে না তা ফেলে দেন। তাতে হবে না। মানতে হলে শাস্ত্রের সমস্তটাই মানতে হবে। হ্যাঁ, সমস্ত—আগাগোড়া।' বললেন গোস্বামী-প্রভু, 'আগে অভিধান দেখে শাস্ত্রের মর্ম নিরূপণ করতাম, বহু অংশ পরিত্যাজ্য মনে হত। কিন্তু একদিন গুরুকৃপা হল, গুরুকৃপায় ঋষিরা প্রকাশিত হলেন,

আশীর্বাদ করে বললেন, তোমার অন্তরে শাস্ত্রস্ফূর্তি হোক। সেই থেকে শাস্ত্র-অর্থের রহস্যভেদ হল। বুঝলাম শাস্ত্রের একটি অক্ষরও ত্যাগ করবার নয়।'

'একটি অক্ষরও নয়?'

'না, একটি অক্ষরও নয়।' গোস্বামী-প্রভু জোর দিয়ে বললেন, 'শাস্ত্র কি অক্ষর, না কালি না কাগজ? শাস্ত্র জীবন্ত, স্বপ্রকাশ। শাস্ত্র স্বসম্পূর্ণ। তবে শুধু দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ব্যবস্থা, অধিকারী ভেদে উপদেশ।'

'ব্রাহ্মধর্মের ভবিষ্যৎ কী?' প্রভুর শিষ্য মণীন্দ্র মজুমদার জিগগেস করলে।

'যার দ্বারা যে প্রয়োজন সাধিত হবার কথা তা হয়ে গেলে তার আর দরকার থাকে না। যেমন কুরুক্ষেত্র বিজয়ের পর গাণ্ডীবের আর দরকার ছিল না।'

'হ্যাঁ, কৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর অর্জুন লাঠি-হাতে সাধারণ একটা ডাকাতের কাছে হেরে গেলেন।'

'গাণ্ডীব তুলতে গেলেন, তুলতে পারলেন না।' বললেন প্রভু, 'যদি বা তুললেন গুণ দিতে পারলেন না। পরাজিত হয়ে চলে গেলেন বদরিকাশ্রম। সেখানে গিয়ে ব্যাসদেবকে প্রশ্ন করলেন, এরকম কেন হল?'

'ব্যাসদেব কী বললেন?'

'বললেন, যদ্দিন কৃষ্ণ ছিলেন তদ্দিন তাঁর শক্তিতে তুমি শক্তিমান ছিলে আর সে শক্তির বাহন ছিল গাণ্ডীব। এখন কৃষ্ণ নেই, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও শেষ হয়েছে, এখন আর গাণ্ডীবের কী দরকার? এখন পরলোকে কিসে মঙ্গল হয় তার চিন্তা করো। তপস্যানিরত হও।' গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'তেমনি ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আর প্রচার-বক্তৃতা করা বৃথা, এখন ব্রাহ্মরা যে যার মঙ্গলের জন্যে তপস্যা করো।'

'ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন কী ছিল?'

'খৃস্টধর্ম থেকে ভারতবর্ষকে বাঁচানো, দেশে সুনীতির প্রচার আর দুর্নীতির উচ্ছেদ।'

প্রতাপ মজুমদার এসেছেন। কথায় কথায় বললেন, 'শুধু মানুষের মুখ চেয়ে-চেয়ে জীবন নষ্ট করলাম। কে কী বলবে কে কী ভাববে, শুধু লোক-লজ্জার ভয়ে মারা গেলাম। লোকে বড়লোক বলুক বড়লোক ভাবুক শুধু এই অভিমানে আর ধর্ম হল না।'

গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'আপনি গীতা ও ভাগবত পড়বেন। শুধু ইংরেজি ভাবে থাকবেন না। আর যারা শুধু টাকা পয়সা দিয়ে টানতে যায় তারা শুধু অহঙ্কারকেই প্রশ্রয় দেয়, আত্মাকে পায় না।'

অর্থ আর স্ত্রীলোক দুইই ভয়ানক।

বললেন প্রভু 'দুইই ভয়ানক। তবে স্ত্রীলোকে আসক্তির চেয়ে অর্থে আসক্তি বেশি অনিষ্টকর। সম্ভোগে অনেক সময়ে স্ত্রীলোকে আসক্তি কমে,

অর্থে আসক্তি সহজে কাটতে চায় না। অর্থ যতই পাওনা কেন কিছুতেই তৃপ্তি নেই। আরো পাও আরো চাও। আবার চাও। কেবল চাও। দরকার নেই ক্ষমতা নেই তবুও চাও। এ আসক্তি ভয়ঙ্কর।'

এক অঘোরপন্থী সাধু এসে উপস্থিত।

গোস্বামী-প্রভু তাঁকে খেয়ে যেতে বললেন।

সাধু বললে, 'কারণ চাই। কারণ ছাড়া আমি আহার করিনা।'

তাকে মদ আনিয়ে দিলেন প্রভু। সাধু তা খেল আনন্দ করে। প্রভু বললেন, 'এ সুধাপান নয় এ কুলকুণ্ডলিনীমুখে আহুতি।'

মদ পেয়েও সাধু তক্ষুনি আহারে বসল না, তার বুঝি অন্য কিছুতে আকর্ষণ।

সাধু যোগজীবনের ঘরে ঢুকল। প্রশ্ন করলে, 'তোমার বাক্সে কত টাকা আছে?'

নির্দ্বিধায় যোগজীবন বললে, 'দুশো টাকা।'

প্রভুর কাছে এসে বললে, 'আমার দুশো টাকার বিশেষ দরকার। যোগজীবনের বাক্সে দুশো টাকাই আছে। ওকে ও টাকাটা আমাকে দিয়ে দিতে বলুন।'

যোগজীবনের টাকা মানে আশ্রমের টাকা।

যোগজীবনকে ডাকলেন প্রভু। বললেন, 'ক্যাশবাক্সে যত টাকা আছে সব দিয়ে দাও সাধুকে।'

সমস্ত কুড়িয়ে কাচিয়ে দুশো টাকার কিছু বেশি হল। তাই সব দেয়া হল সাধুকে।

সাধু বললে, 'আমি আসছি।'

'সে কি, খেয়ে যাবেন না?'

'এই আসছি, এসেই খাব।'

আর এল না সাধু। বিজয়কৃষ্ণ সমস্ত দিন তার ফেরার প্রতীক্ষায় উপবাস করে রইলেন।

সাধু না জোচ্চোর!

বাসিন্দেরা সাধুর নিন্দা করছে শুনে প্রভু দুঃখিত। বললেন, 'ঐ টাকা কি আমার? আমার তো অযাচক বৃত্তি। যা দেন ঈশ্বর দেন, তাই ও টাকা ঈশ্বরের।'

'তাই বলে ও টাকা ও সাধু নেবে কেন?'

'সাধু নিয়েছে কে বলছে? টাকা ঈশ্বরই নিয়েছেন। দিলেও তিনি নিলেও তিনি। পূর্ণ-শূন্য সমস্ত তিনি।'

একেই বলে অনাসক্তি।

'সেবা বন্দনা আউর অধীনতা সহজে মিলয়ে গোঁসাই।'

দীনহীন বিনীত হওয়া ছাড়া ভগবানলাভের আর দ্বিতীয় পথ নেই।

অধীনতা—অধীন থাকবার ভাব, হ্যাঁ, সবাই আমার শিক্ষক সবাই আমার গুরুজন এই অর্থে আমি সবার অধীন। সেবার মধ্যেও এই দাস্য, এই অনুরাগ। দয়ার ভাব না থাকলে সহানুভূতি না থাকলে সেবা হবে কী করে? পতি-সেবা পত্নী-সেবা সন্তান-সেবা, প্রভু-সেবা ভৃত্য-সেবা। সেবায় অভিমান হলেই সর্বনাশ। যাদের সেবা করছি সবাই আমার ঈশ্বর।

বন্দনা—বন্দনা মানে মানুষের বন্দনা, স্থানের বন্দনা, বস্তুর বন্দনা। যে কারো থেকে বা যা কিছুর থেকে সত্য পাওয়া যায়, সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাকেই বন্দনা করো। কেননা সেই তোমার ঈশ্বরের বার্তাবহ। কায়িক, বাচিক মানসিক—তিন রকম বন্দনা। যুক্তকরে নমস্কার বা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কায়িক বন্দনা, স্তবস্তুতি বাচিক, আর মনে একটি প্রীতি-উজ্জ্বল পূজার ভাব জাগিয়ে রাখাই মানসিক বন্দনা। আর অধীনতা—অধীনতাই তো আত্মীয় করে তোলে, ব্যবধান দূর করে দেয়।

'আচ্ছা, মানুষের স্বাধীনতা বলে কি কিছু আছে?'

'কিছু আছে। দড়িবাঁধা স্বাধীনতা।' বললেন বিজয়কৃষ্ণ।

'দড়িবাঁধা?'

'এর চেয়ে ভালো আর কী বলতে পারো! যেন গরুর গলায় দড়ি কে বেঁধে দিয়েছে। দড়ি যতটা লম্বা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ততদূর যাবারই তার স্বাধীনতা আছে—সেই দড়িবাঁধা স্বাধীনতাই মানুষের। দড়ির অতিরিক্ত যাবার তার ক্ষমতা নেই। তাই বলছি মানুষ দড়িবাঁধা গরুর মতই স্বাধীন।'

ভক্ত এসে দারুণ হাহাকার করে পড়ল গোঁসাইজির কাছে। বললে, 'ভিতরের যন্ত্রণা যে আর সহ্য করতে পারছিনে। নাম ধ্যান সাধনভজন সব ছুটে গিয়েছে, দিন-রাত জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছি। এবার বোধহয় নাস্তিক হলাম।'

প্রভু শান্তস্বরে বললেন, 'না, নাস্তিক হবে না।'

'তবে কী করব?'

'দিন কতক অন্য কোথাও চলে যাও।' বললেন প্রভু, 'এখানে লোকের দৃষ্টি তোমাকে শুকিয়ে দিচ্ছে।'

'লোকের দৃষ্টি?' ভক্ত চারদিকে তাকাল।

'লোকের দৃষ্টি বড় বিষম। দেখনি জীবন্ত গাছ পর্যন্ত লোকের দৃষ্টিতে শুকিয়ে যায়।'

'তা আমার কী করবে?' ভক্ত বললে, 'আমি তো সবসময়ে আপনার স্নেহদৃষ্টিতে সুরক্ষিত।'

'তবে তোমার আর ভয় কী!' প্রভু প্রসন্ন মুখে বললেন, 'যেখানেই যাও, যদি নরকেও যাও, নিশ্চয় জেনো সেখানেও তোমাকে বুকে করে রাখবার একজন আছেন।'

তবে আর কিসের অন্তর্বাহ! কিসের নাস্তিক্য!

'চলো আমার সঙ্গে পুরী চলো।' গোঁসাইজি ঘোষণা করে উঠলেন।

সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল।

কিন্তু কুলদানন্দের মনে ধাক্কা লাগল। পুরী! প্রভুর জননী স্বর্ণময়ী দেবী যে বলেছিলেন, পুরী গেলে বিজয় আর ফিরবে না।

॥ ৩৬ ॥

তেরো শ চার সনের চব্বিশে ফাল্গুন, স্টিম-লঞ্চের সঙ্গে দুখানি বজরা বাঁধা, একখানাতে সশিষ্য গোস্বামী-প্রভু, আরেকখানাতে আত্মীয়-স্বজন। পুরী-যাত্রা সুরু হল।

বিদায়কালে প্রভু করজোড়ে ভক্তদের উদ্দেশ করে বললেন, 'আশীর্বাদ করুন, আমার যেন ধামপ্রাপ্তি হয়।'

এ কী নিদারুণ কথা, সকলে বিদীর্ণবক্ষে হায় হায় করে উঠল।

'আমরা তবে কী করব, কী নিয়ে থাকব?'

সেই মহাপ্রভুর কথাই বললেন আবার গোঁসাইজী : 'ঘরে কর নাম-সংকীর্তন, শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবন।'

বিকেল চারটে কয়লাঘাটা থেকে স্টিমার ছাড়ল। পরদিন দুপুর বারোটায় নোঙর করল গেঁয়োখালিতে। ডাকবাংলায় এসে উঠলেন গোঁসাইজি। সঙ্গে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী।

সেদিন দোলপূর্ণিমা। প্রভুর চরণে আবির দেবার জন্যে ভক্তদল আবেগে রঙিন হয়ে উঠল। আবির দিয়ে রঞ্জিত হল অনুরাগে।

চারদিন পরে স্টিমার কটকে পেঁছুল। ন-মাইল দূরে বারং স্টেশন, সেখান থেকে পুরীর ট্রেন। গোঁসাইজি ঘোড়ার গাড়িতে করে বারং এলেন, স্ত্রী-ভক্তরা গরুর গাড়িতে আর অবশিষ্টের দল পদব্রজে।

দুপুরের ট্রেন, পুরী পেঁছুতে পেঁছুতে বেলা গড়িয়ে গেল। ট্রেন দাঁড়াল পুরোনো স্টেশনে, এখান থেকে শহর দু মাইলেরও বেশি। বেশ, তো, ঘোড়ার গাড়ি ডাকি।

প্রভু বললেন, 'না। পুরীধামে যানারোহণ করব না।'

কিন্তু প্রভু হাঁটবেন কী করে? দিবানিশি একাসনে থাকার দরুন তাঁর পায়ে বাত হয়েছে, লাঠি কিংবা মানুষের কাঁধ ছাড়া চলতে-ফিরতে পারেন না। তা কী করা যাবে, যিনি কলকাতা থেকে এতদূরে এনেছেন তিনিই হাত ধরে নিয়ে যাবেন।

দু শিষ্যের কাঁধে ভর দিয়ে এগোলেন প্রভু। কিছুদূর গিয়ে পথের পাশের একটা বড় বাড়ির বারান্দায় বসলেন বিশ্রাম করতে। হঠাৎ ক-জন পাণ্ডা এসে উপস্থিত হল, বললে, প্রণামী দাও। তাদের সকলের পদধূলি মাথায় নিলেন প্রভু, প্রণামী দিলেন। পাণ্ডার দল যেমন এসেছিল তেমনি

চলে গেল।

এ কী, প্রভু নিজের পায়েই সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। না, লাঠি লাগবে না, কারুর কাঁধ লাগবে না, প্রভু একলাই যেতে পারবেন হেঁটে। হাঁটবেন কী, প্রভু ছুটলেন, কোথায় তাঁর বাতের ব্যথা, কোথায় বা শরীরের দৌর্বল্য। মুখে হুঙ্কার, জয় জগন্নাথ, শরীরে মত্ত মাতঙ্গের বল আবির্ভূত হল। প্রভু ছুটলেন তো পিছু-পিছু আর সকলেও ছুটল—তুলল বিপুল হরিধ্বনি। সকলের মনে হল সপার্ষদ মহাপ্রভুই বুঝি এলেন আবার নীলাচলে।

আঠার-নালার কাছে আসতেই শ্রীমন্দিরের ধ্বজা চোখে পড়ল। মহাভাবে বিভোর হয়ে গেলেন গোঁসাইজি, উঠল হরিকীর্তনের সিংহনাদ। প্রভু নাচতে সুরু করলেন। ভক্ত বিধু ঘোষ গাইতে লাগল : 'যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, ঐ দেখ তারা দু ভাই এসেছে রে, গৌর নিতাই ভক্তসঙ্গে এসেছে রে—'

সে কী উন্মাদনা! প্রভুর চরণযুগল কঙ্করবিদ্ধ হচ্ছে সেই যন্ত্রণায় বিধু বারে-বারে পথের উপর শুয়ে বুক পেতে দিচ্ছে আর ইশারায় বলছে, আমার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যান। এমন সময় আরেক পাগল এসে উপস্থিত, কালিয়া-পাগল, সে নাচতে নাচতে বলতে লাগল, ও পথে নয় এ পথে, যেন মন্দিরের পথ একলা ওরই চেনা। চারদিকে ভাবের হরির লুট পড়ে গিয়েছে। গৌরবর্ণনা লোকে এতদিন কানেই শুনে এসেছিল, এবার দেখতে পেল স্বচক্ষে।

বড়দাণ্ডে নীলমণি বর্মনের দোতলা বাড়িতে প্রভুর থাকবার জায়গা হল। কিন্তু জগন্নাথকে দর্শন করবার আগে স্থির হতে পারছেন না। ধুলো-পায়েই বেরিয়ে পড়তে চান কিন্তু তীর্থগুরু হরেকৃষ্ণ খুটিয়া বললেন, আগে মহাপ্রসাদ, পরে জগন্নাথদর্শন। শ্রীক্ষেত্রে এই পদ্ধতি।

মহাপ্রভুর পাণ্ডাঠাকুর কানাই খুটিয়ার বংশধর হরেকৃষ্ণ।

গোস্বামী-প্রভু হরেকৃষ্ণ-র পদপুজো করলেন। শিষ্যভক্তের দল তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। তীর্থগুরুর আশীর্বাদ ছাড়া তীর্থফল জুটবে কী করে?

এবার তবে সবাই বসে যাও, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ বিতরিত হবে। না, পঙক্তি নেই, জাতি নেই, বর্ণ নেই, এমনকি উচ্ছিষ্টবিচার নেই, মহাপ্রসাদ মহা-প্রসাদ। সমস্ত কিছুর বাইরে, সমস্ত কিছুর উপরে।

গোঁসাইজির শাশুড়িঠাকরুনের কী ঘোরতর সংস্কার ছিল! সারা পথ কত তিনি বলে এসেছিলেন, তাঁকে নিজের হাতে রান্না করে খেতে হবে, অন্যের ছোঁয়া কিছুতেই খেতে পারবেন না। উচ্ছিষ্ট তো কল্পনার অতীত। সেই শুদ্ধাচারিণী বিধবা ব্রাহ্মণী আজন্মের সংস্কার এক মুহূর্তে বিসর্জন দিল। কই দাও মহাপ্রসাদ, আমিও খাব। শাশুড়িঠাকরুনও বসে পড়লেন পাতা নিয়ে।

কী স্বতন্ত্র শক্তি এই মহাপ্রসাদের।

বৃন্দাবনের যেমন রজ তেমনি শ্রীক্ষেত্রের মহাপ্রসাদ।

মহাপ্রসাদ ভোজনের পর গোঁসাইজি আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন, চলো, জগদ্বন্ধুর মুখচন্দ্রমা দেখে আসি।

পাণ্ডারা নিরস্ত করতে চাইল। বললে, 'আজ পরিশ্রান্ত আছেন, আজ থাক, কাল দর্শন করবেন।'

'কাল?' প্রভু বললেন, 'কালের কথা কিছুই বলা যায় না। মৃত্যু কখন এসে পড়ে তা কে বলতে পারে? সুতরাং আজই এই মুহূর্তেই দর্শন করব।'

রাত হয়েছে, হোক, দলবল নিয়ে প্রভু চললেন শ্রীমন্দির। বিগ্রহ দর্শন করা মাত্রই ভাববিহ্বল হয়ে বসে পড়লেন, যেন কত আপনার জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে এমনি স্নেহাবেশে হাত মুখ নেড়ে অস্ফুটে কত কী বলতে লাগলেন। কত মনের কথা, কত প্রাণের ব্যথা জমে ছিল এতদিন—সব প্রেমাশ্রু হয়ে প্রকাশিত হল, প্রবাহিত হল। লোকে জগন্নাথকে দেখবে না জগদগুরুকে দেখবে। দুইই বুঝি একবস্তু।

শ্রীক্ষেত্রে আছেন কিন্তু গৃহস্থের নিত্যকর্ম থেকে তাঁর বিরতি নেই। ধর্মালোচনা, পূজা পাঠ ও কীর্তন সমানেই চলেছে। চলেছে ভিক্ষুক বিদায়, অতিথি সৎকার, বৃক্ষসেবা, পশুসেবা এমনকি কীটসেবা। বইয়ের নিচে বাতাসার গুঁড়ো রেখে দেন যাতে পিঁপড়েরা এসে খায়। আরশুলা, ইঁদুরকেও ভোলেননি। শস্য ছড়ানো দেখে তো পাখিরা আসছেই ঝাঁক বেঁধে। আর আসে বানরের পাল। তাদের সব বিচিত্র নাম রেখেছেন প্রভু। কেউ বুড়ো, কেউ গোদা, কেউ নাককাটা, লেজকাটা, হাঁদাপেটা, কেউ বা শুধু দাদামশাই। একদিন একটা ষাঁড় এসে উপস্থিত। সেও খেয়ে গেল পেট ভরে।

কী বলছে ভাগবত? গৃহস্থের ধর্ম কী?

গৃহস্থ কৃষ্ণার্পণ করে যথাযোগ্য ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করবে, সর্বদা অমৃতস্বরূপ ভগবানের অবতার-কথায় অবহিত ও শ্রদ্ধান্বিত থাকবে। যাবৎ অর্থে প্রয়োজন তাবন্মাত্র বিষয়সেবা করবে, অন্তরে থাকবে দেহ ও গেহের প্রতি বিরক্তি, বাইরে আসক্তবৎ আচরণ করে প্রকাশিত করবে পৌরুষ। আত্মীয়দের নিয়ে আমোদ করবে কিন্তু কিছুতেই মমতা রাখবে না। দৈবাৎ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জন হয়, সেই অতিরিক্তে কদাচ অভিমান করবে না, কেননা, যে পরিমাণে উদরপূর্তি হয় সেইটুকুতেই গৃহস্থের স্বত্ব, যে ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি দ্রব্যের অভিলাষ করে সে চোর, সে দণ্ডার্হ। অতএব মৃগ, উষ্ট্র, পর্বত, মর্কট, ইঁদুর, সাপ, পাখি, মক্ষিকা ইত্যাদি যে কোনো প্রাণী গৃহে বা ক্ষেত্রে প্রবেশ করে শস্যাদি ভোজন করলে তা নিবারণ করা উচিত নয়, বরং নিজের পুত্রের মতই তাদের দর্শন করা উচিত। সমস্তকে নিয়েই ভগবানের শ্রীঅঙ্গের পূর্ণতা, কাউকে বাদ দেবার বা তুচ্ছ করবার অধিকার নেই। পঞ্চযজ্ঞ নির্বাহ অবশ্য বিধেয়, পঞ্চযজ্ঞ করে যা অবশিষ্ট

থাকবে তা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করবে। মানুষ পশু পাখি দেবতা ঋষি —সমস্ত শরীরই ভগবানের সৃষ্টি, সকল পুরেই তিনি জীবরূপে শয়ন করে আছেন, সমস্ত সৃষ্টিই ঈশ্বরের অবয়ব, কাকে ছোট কাকে বড় বলবে— সমস্তই হরির শরীর, হরির মন্দির।

শান্তিসুধা তার ছেলে কোলে নিয়ে এসেছে, তাকে গোঁসাইজি খেতে দিয়েছেন, অমনি এক বানরের বাচ্চা এসে হাজির। দৌহিত্রের দিকে তাকিয়ে গোঁসাইজি বললেন, 'তুমি যেমন গোপাল এ বানর-শিশুও তেমনি গোপাল। একেও খেতে দিতে হয়।' দুই গোপাল একই থালা থেকে খেল ভাগ করে।

ছোট একটি কাঠের মন্দির এল ঠাকুরের জন্যে। তাতে তিন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, জগন্নাথ বলরাম আর সুভদ্রা। গোঁসাইজি নিত্য সেই তিন বিগ্রহের পুজো করতে লাগলেন।

তারপর সুরু হল তাঁর তীর্থদর্শন। মার্কণ্ডেয় সরোবর, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, মহাপ্রভুর গম্ভীরা, গুণ্ডিচাবাড়ি, সার্বভৌমের গৃহ, হরিদাসের সমাধি, সিদ্ধবকুল, গোবর্ধন মঠ, টোটা গোপীনাথ। তারপর বৈশাখে চন্দন-যাত্রা, জ্যৈষ্ঠে স্নানযাত্রা, আষাঢ়ে রথযাত্রা—সকল যাত্রার যাত্রী হলেন বিজয়কৃষ্ণ।

চন্দনযাত্রা নরেন্দ্র সরোবরে। চতুর্দোলায় চড়ে লক্ষ্মী-সরস্বতীসহ মদনমোহন আসে। অন্য দোলায় আসে পঞ্চশিব—যমেশ্বর, নীলকণ্ঠ, মার্কণ্ড. লোকনাথ আর কপালমোচন। দুই নৌকো করে দুই দল সরোবর পরিক্রমা করে। পরিক্রমার পর সরোবরস্থ মন্দিরে বিগ্রহদের ভোগ-পুজো হয়—সঙ্গে কত নৃত্যগীত কত কথাকীর্তন। তারপর ভোগ-অন্তে বিগ্রহেরা যে যার মন্দিরে প্রস্থান করে।

অক্ষয় তৃতীয়া থেকে সুরু করে একুশদিন ধরে এ উৎসব চলে। প্রভু তাই দেখেন অনিমেষে, ভক্তদের বলেন, তোমরা নরেন্দ্রে স্নান করো, এ সময় এখানে গঙ্গা-যমুনা এসে মিশেছে। একসাথে গঙ্গাযমুনাস্নান হয়ে যাবে।

আনন্দের তুফান তুলে স্নান করে সকলে।

একদিন উত্তর-পশ্চিম কোণের বটগাছের দিকে সকলের দৃষ্টি ফেরালেন প্রভু। বললেন, 'কতদিন এই গাছের নিচে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মহাপ্রভু এসে বসেছেন।' আরেকদিন উত্তর তীরের বন দেখিয়ে বললেন, 'কখনো-কখনো বিপিনভোজন করে গেছেন ওখানে।' আরেক দিন সেই উত্তর দিকেই অঙ্গুলি-সঙ্কেত করে বললেন, 'দেখ দেখ কেমন সুন্দর মন্দির। কেমন সোনার চুড়ো তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সে কী, দেখতে পাচ্ছনা তোমরা?'

কী করে দেখবে? কী করে বুঝবে ঐটিই প্রভুর ভাবী সমাধিমন্দির?

স্নানযাত্রার দিন দয়িতা-পাণ্ডরা প্রভুর কাছে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করে বসল। প্রার্থিত অর্থ না দিলে স্নানবেদীর কাছে যেতে দেওয়া হবে না। অন্যায় দাবি মেনে নিতে প্রভু রাজি হলেন না, দরকার নেই তোমাদের অনুষ্ঠান দেখতে। আমি মন্দিরে চললাম, মন্দিরে বসেই আমি জগন্নাথের অপ্রাকৃত

স্নানযাত্রা দর্শন করব।

পাণ্ডারা তখন বুঝল তাদের অনুষ্ঠান ব্যর্থ হবে, জগন্নাথ মন্দির ছেড়ে যাবেন না স্নানবেদীতে। তাদের দেওয়া জলে স্নান না করে মন্দাকিনীতেই আজ স্নান করবেন।

তখন পাণ্ডারা এসে প্রভুর পায়ে পড়ল। চলুন স্নানবেদীতে, আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন। আপনার যা খুশি তাই দেবেন।

স্নানবেদীর ধারে গিয়ে প্রভু দেখলেন স্নানযাত্রা। তীর্থের সম্মান রাখতে প্রভু যে অর্থ দিলেন, পাণ্ডারা দেখল, তা তাদের প্রার্থনারও অতিরিক্ত।

কিন্তু রথযাত্রার দিন অন্যরকম বিপদ ঘটল। প্রভুর পায়ে ব্যথা উপস্থিত হল, এত ব্যথা যে চলা দূরের কথা, উঠে দাঁড়ানো কষ্টকর হল। রথযাত্রা দেখা বুঝি অদৃষ্টে নেই। ভক্ত-শিষ্যরা বললে, ভাবছেন কেন, আপনার জন্যে আমরা তাঞ্জাম নিয়ে আসব, তাতে চড়ে বামন দর্শন করবেন।

রথে তু বামনং দৃষ্টবা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। শাস্ত্রে আছে, আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে পুষ্যানক্ষত্রে রথে জগন্নাথকে দেখলে পুনর্জন্মের খণ্ডন হয়। কিন্তু পাণ্ডাদের নিজেদের মধ্যে টাকা পয়সার বাঁটোয়ারা নিয়ে ঝগড়া সুরু হয়েছে, বামনকে রথস্থ করা হচ্ছে না। এদিকে দ্বিতীয়া বুঝি কেটে যায়।

শিষ্যকে পাঠিয়েছেন প্রভু, বামন রথস্থ হলে যেন খবর পাঠায়। খবর পেঁছুলে তিনি তাঞ্জামে করে রওনা হবেন।

শিষ্য খবর নিয়ে এল, দ্বিতীয়া প্রায় শেষ হতে চলল বিগ্রহকে এখনো রথে বসানো হয়নি। তবে আর গিয়ে কী হবে, তাঞ্জাম ফিরিয়ে দাও, যেতে যেতে ফুরিয়ে যাবে দ্বিতীয়া।

'এখনো তো কিছুক্ষণ দ্বিতীয়া আছে, আপনি আপনার বিগ্রহ নিয়ে তাঞ্জামে উঠে বসুন, সেই আমাদের রথস্থ বামন দেখা হবে।' শিষ্যভক্তের দল প্রভুর কাছে সকাতর প্রার্থনা জানাল।

প্রভু উঠে বসলেন তাঞ্জামে। সঙ্গে তাঁর নিজের জগন্নাথ। শিষ্যরা তাঞ্জাম কাঁধে নিয়ে ঘুরতে লাগল। না, দ্বিতীয়ার এখনো অবসান হয়নি। কে আছ রথস্থ বামনকে দেখে জন্মশৃঙ্খল ছিন্ন করো। জয় প্রভু বিজয়কৃষ্ণ।

শিবচতুর্দশীর দিন গেলেন লোকনাথ মহাদেবকে দর্শন করতে। 'হরিহর' 'হরিহর' বলে উন্মত্ত নৃত্য করলেন। বললেন, ওঁ নমঃ শিবায়, এই নাম সর্বদা জপ করো, এতেই সিদ্ধিলাভ হবে। স্বয়ং দ্বারকানাথ এই নাম জপ করে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন। যে কৃষ্ণকে পূজা করে অথচ শিবকে মানেনা কিংবা যে শিবকে পুজো করে অথচ কৃষ্ণকে মানে না, উভয়েই নরকস্থ হয়। শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে। শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণু র্বিষ্ণোস্তু হৃদয়ং শিবঃ।'

আর দোলযাত্রার দিন মন্দিরে দোলবেদী ঘিরে প্রভুর সে কী মহাভাবময় নৃত্য ! লোকে বিগ্রহ দেখবে। স্বয়ং ছত্রপতি বলে উঠল, এই তো স্বয়ং এসেছেন

জগন্নাথ। বলে প্রভুর মাথায়ই ছাতা ধরল।

কত লীলা কত ভাব কত আত্মপ্রকাশ। নিত্য সমুদ্রস্নান করেন, সেদিন অতর্কিতে এক ঢেউ প্রভুর বাঁ হাঁটুতে আছড়ে পড়ে অস্থিসন্ধি ভেঙে দিল, আবার তক্ষুনি আরেকটা ঢেউ এসে অনুরূপ আছড়ে পড়ে ভাঙা অস্থিতে জোড়া লাগিয়ে দিল। কেউ জানতেও পারল না কী ঘটে গেল। শিষ্যস্কন্ধে ভর দিয়ে গৃহে ফিরলেন। বললেন, ঢেউয়ের বাড়ি লেগে হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছি, প্রলেপ লাগাতে হবে।

সামান্য ব্যথা, প্রলেপ লাগাতেই সেরে গেল। কিন্তু সেদিন কে হঠাৎ এসে প্রভুর পা টিপতে বসল। হাঁটুর যেখানটায় ব্যথা পেয়েছিলেন সেখানটায় হাত বুলুতে লাগল। তারপরে খানিকক্ষণ ডমরু বাজিয়ে নৃত্য করলে। প্রভুর ব্যথা সেরে গেছে তাতেই যেন তার আনন্দ। নাচতে নাচতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কে এই দিব্যকান্তি পুরুষ?

প্রভু বললেন, 'ইনি সমুদ্রের অধিষ্ঠাতা বরুণদেব। অতর্কিতে সেদিন সমুদ্র আমাকে আঘাত করেছিল বলে তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করে আমার সেবা করতে এসেছিলেন। যারা ভক্ত দেবতারাও তাদের সেবা করেন।'

কখনো কখনো সমুদ্রে গিয়ে স্নান না হলেও আসনে বসেই প্রভুর স্নান হয়ে যায়। ভক্তরা সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে প্রভুর সর্ব শরীর আর্দ্র, জটা থেকে টপ টপ করে অবিরল জল পড়ছে। এ কী অঘটন! প্রভু বললেন, 'সমুদ্রস্নান করে এলাম।'

আসন থেকে উঠলেন না, ভক্তরা অবাক হয়ে ভাবতে বসল, সমুদ্রে গেলেন কখন? প্রভু বললেন, 'আসনে বসেই সমুদ্রস্নান করলাম।'

পুরীতে তখন বানরনিধন চলেছে। বানররো শস্যফল নষ্ট করে, সুতরাং এদের মেরে ফেল—সরকার জারি করেছে ফতোয়া। শহরে শিকারিরা বন্দুক নিয়ে ঘুরছে, গুলি ছুঁড়ছে যত্রতত্র। একদিন তো প্রভুর চোখের সামনেই একটা বানর গুলি খেয়ে মারা পড়ল, রক্তে ভেসে গেল রাস্তা। প্রভু বালকের মত অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। পরক্ষণে বললেন দৃঢ়স্বরে, বিষ্ণুক্ষেত্র বানররক্তে কলুষিত হতে দেব না।

প্রভু তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করলেন। শিকারিরা লুকিয়ে লুকিয়ে ফিরতে লাগল—গোঁসাইজি ও তাঁর শিষ্যদের নজরে যেন না পড়ে। কিন্তু বানরের দল কী উপায়ে কে জানে বুঝতে পেরেছে প্রভু তাদের সহায়-সুহৃৎ। বন্দুক হাতে শিকারি দেখতে পেলেই বানরের দল ছুটে আসে প্রভুর কাছে, একেবারে প্রভুর পা চেপে ধরে মিনতি জানায়। প্রভু বুঝতে পারলেন আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যেই তারা ডাকছে প্রভুকে। কী করে তারা টের পেয়েছে প্রভুই একমাত্র পরিত্রাতা।

প্রভুর কাছে খবর পেঁাছে গিয়েছে বুঝতে পেরে শিকারি সরে পড়ে।

কিন্তু একটা স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বার করা না পর্যন্ত গোঁসাইজি ও তাঁর শিষ্যদের স্বস্তি নেই।

মিউনিসিপ্যালিটির কাছে প্রভু লিখিত আবেদন পাঠালেন।

সে আবেদন সরাসরি অগ্রাহ্য হয়ে গেল।

বানরেরা কী করে বুঝল তাদের পক্ষের আবেদন অগ্রাহ্য হয়ে গেছে। তাই তারা দলে দলে প্রভুর অঙ্গনে এসে ভিড় জমিয়ে বসল। সে এক বিরাট সভা, সবচেয়ে বিস্ময়কর, কোনো কিচিরমিচির নেই, কোলাহল নেই, লঘুতা চপলতা নেই, সব গম্ভীর ব্যথিত মুখে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, যেন বিপদের মুহূর্তে চাইছে উদ্ধারের উপায়। প্রভুই সমুদ্ধর্তা।

ছোটলাট উডবার্নের কাছে আবেদন পাঠানো হল। বানরবধ অবৈধ, অশাস্ত্রীয়। উডবার্ন বানরবধ রদ করে দিল।

আনন্দের প্লাবন নামল পুরীতে। প্রভুকে ঘিরে বানরযূথের সে কী নৃত্যরঙ্গ, গতিভর্তা প্রভু সাক্ষী, তুমিই আমাদের বাঁচিয়েছ।

চল্ মহাবীর ঠাকুরের পূজা দিই গে।

॥ ৩৭ ॥

হৃদয় যদি শুষ্ক মনে হয়, অন্তরে যদি ভাব না থাকে, তবে কাউকে কিছু দান করে এস। গোস্বামী প্রভু বললেন, 'লোককে খুব দেবে। দিলেই সব খুলে যাবে।'

দানের স্পর্শেই খুলে যাবে কাঠিন্যের কারাগার, সরে যাবে কার্পণ্যের অবরোধ।

পাত্রাপাত্রের বিচার উঠে গেল। কার কী অভাব বলো, সাধ্যমত মোচন করে যাই। যেদিন কিছু দান হয় না সেদিন বন্ধ্যা দিন।

শ্রীমন্দিরের কাছে এক মিঠাইওলা হাত পাতল। বললে, 'ছেলের পৈতে দিতে পাচ্ছিনা, যদি কিছু দেন—'

প্রভু দশটাকা দিয়ে দিলেন। বললেন, 'পত্র পুষ্প দিয়ে কোনো রকমে।'

আনন্দে ভরে উঠল মিঠাইওলা। বললে, 'রাধারাণী তোমকে বনায়ে রাখে।' পাশের লোককে টাকা দেখিয়ে বললে, 'বাবা মহারাজজিকা জয়। যমুনামাই উনকে বনায়ে রাখে।'

'ঝড়ে ঘর ভেঙে পড়েছে, মেরামত করবার পয়সা নেই।' আরেকজন হাত পাতল।

কুড়ি টাকা দিয়ে দিলেন গোঁসাইজি।

'দেশে ফিরে যাবার রেলভাড়া জুটছে না।'

দিয়ে দিলেন যা দরকার। ভাণ্ডারে যদি একটি পয়সাও থাকে তা দান করে যাবে।

সেদিন যে একটি পয়সাও নেই। না, দিন বন্ধ্যা হতে দেব না। দুটি ঘটির একটি বেচে দিলেন প্রভু। সেই পয়সা বিতরণ করলেন।

কলিতে শুধু দুই বস্তু। দান আর নাম। সম্পূর্ণ স্বত্বত্যাগই দান। যাকে দেবে সে যদি তক্ষুনি তা নষ্ট করে ফেলে, কিছু বলতে পারবে না। আগুনে দগ্ধ করে ফেললেও না। তুমি যদি মনে করো তোমার সর্ত-মত দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে, তা হলে সেটা আর দান নয়, সেটা ন্যাস—গচ্ছিত রাখা। তেমন দান পাপ। সমস্ত নিঃশেষ করে দেওয়ার নামই দান।

যে চেয়েছে তাকে দেওয়ার চেয়ে যে চায়নি তাকে দেওয়া মহত্তর। কিন্তু যে যাচ্ঞাও করেনি, দান পেয়ে স্বীকারও করবে না অথচ ফিরিয়েও দেবে না তাকে দেওয়াই মহত্তম। সামান্য স্বীকৃতির আশাটুকুও রাখবে না।

চেয়েছে তাই দিয়েছ—সেটা দানমাত্র। কিন্তু চায়নি অথচ দিয়েছ সেটা ইষ্টদেবের পূজা। সে দানের মত আনন্দ নেই।

'যা খাবেন সমস্ত ভগবানের কাছে ধরবেন।' বললেন প্রভু, 'প্রহ্লাদ যখন বিষ খায় তখন তাও ভগবানকে নিবেদন করেছিল। জলটুকু খেতে হলেও মনে মনে ভগবানে নিবেদন করে নেবেন। বৃন্দাবনে গৌর শিরোমণির নাতিটির কী সুন্দর ভাব দেখেছিলাম। প্রসাদী বস্তু ছাড়া আর কিছু সে মুখে তুলবে না। এমনকি জল পর্যন্ত না।'

বিষয়ের স্পর্শে মলিনতা আসে। প্রহ্লাদ যে প্রহ্লাদ, তারও মতিভ্রম হল।

তার মধ্যে দৈত্যভাব জাগ্রত করবার জন্যে দৈত্যরা খাবারের মধ্যে মদ মাংস মিশিয়ে দিতে লাগল। মদ-মাংসের স্পর্শে তার মধ্যে জেগে উঠল তমোভাব। ফলে সে বেরুল দিগ্বিজয়ে। যে রাজ্যে যায় সে রাজ্যেই সকলে তাকে নানা উপচারে পরিতুষ্ট করতে লাগল। শেষকালে বৈকুণ্ঠে এসে উপস্থিত হল প্রহ্লাদ। একেবারে ভগবানের সিংহাসনে গিয়ে বসল। লক্ষ্মী জিগগেস করল, ঠাকুর, প্রহ্লাদ এ কী করল? নারায়ণ বললে, প্রহ্লাদকে আমি আগুনে জলে পতনে পেষণে সর্বত্র কোলে করে রক্ষা করেছি। ও আমার সিংহাসনে বসেছে এ এমন কী বেশি অপরাধ! নারায়ণ প্রহ্লাদের সামনে এসে দাঁড়াল। নারায়ণে দৃষ্টি পড়ামাত্রই প্রহ্লাদের তমোভাব কেটে গিয়ে সত্ত্বভাব প্রকাশ পেল। এ আমি কী করেছি, বলে কাঁদতে লাগল প্রহ্লাদ। নারায়ণ বললে, ভয় নেই। দৈত্যরা তোমাকে চালাকি করে মদ-মাংস খাইয়ে তমোভাবান্বিত করেছিল। তুমি সেসব খাদ্য আমাকে নিবেদন করে গ্রহণ করলে এমন বিভ্রান্তি ঘটত না। প্রহ্লাদ বললে, ঠাকুর, আমার ওসব নিবেদন করতে কেন ইচ্ছে হয়নি কে বলবে? নারায়ণ বললে, বিষয়ের স্পর্শে মলিনতা আসে, সেই মলিনতাতেই এই বিভ্রান্তি।

আহারদোষ স্বয়ং প্রহ্লাদকে পর্যন্ত টলিয়ে দিতে পারে।

'আহারের সঙ্গে ধর্মের যোগ আছে।' বললেন গোঁসাইজি, 'শরীর আর আত্মার একত্র উপস্থিতি। আর শরীরের পরিণতিই তো মন। তাই আহারই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন। আহারের দোষেই রোগ, আহারের দোষেই ধর্মনাশ। শুধু প্রণালী মত আহার করো, তাইতেই সব হবে। আর কিছু করতে হবে না।'

ছান্দগ্য উপনিষদ বলছে, আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ—আহার শুদ্ধ হলে অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি ঘটে, অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হলে নিশ্চলা স্মৃতি হয়। স্মৃতিলাভ হলেই সমস্ত হৃদয়গ্রন্থির বিমোচন।

অযাচিত দান প্রত্যাখ্যান করতে হয় না। করলেই অপরাধ।

প্রভু যখন বৃন্দাবনে, পরিক্রমা করছেন, দেখতে পেলেন একটি সাধু অনাবৃত শরীরে শীতে ক্লেশ পাচ্ছে। তাকে একখানা কম্বল দিয়ে নমস্কার করলেন প্রভু, বললেন, আপনি এই কম্বলখানা গায়ে দিন। সাধারণ মামুলি কম্বল সাধুর পছন্দ হল না। ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, এমন বাজে কম্বল আমি নিই না, এ বাজারে বিক্রি করে দাও। কত অনুনয়-বিনয় করলেন প্রভু, সাধু গ্রাহ্য করল না। আরেক সাধুকে দিতেই সে তা হাত বাড়িয়ে তুলে নিল।

কয়েক দিন পরে সুরু হল তুমুল বর্ষণ। যমুনার চড়ায় যাবে, সাধুদের শারীরিক দুর্গতির শেষ রইল না। কম্বল ফিরিয়ে দিয়েছিল যেই সাধু তার বুঝি বেশি কষ্ট। সে শীতে অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। ধুনি জেবলে যে শরীরটাকে গরম করবে তার পর্যন্ত কাঠ নেই। তখন কাঠের সন্ধানে দিশেহারা হয়ে লকড়ির গোলা থেকে কয়েকটা কুঁদো চুরি করল। লকড়িওয়ালা ছাড়লেনা, চোর বলে ধরিয়ে দিল। বিচারে সাধুর জেল হল। কম্বল ফিরিয়ে দিয়েই তার এই দুর্দৈব।

প্রভু বললেন, 'অভাবে পড়লে অযাচিতভাবে যা আসে তাই ভগবানের দান মনে করে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়। ভগবানের দান অগ্রাহ্য করলে বিষম অনর্থ ঘটে। দেখ ঐ সাধুর দশা। যখনই কম্বল ছুঁড়ে ফেলল, আমার মন বললে, অভিমানী সাধু নির্ঘাৎ বিপদে পড়বে। অভিমান করে শ্রদ্ধার দান অগ্রাহ্য করতে নেই।'

তিনজন পুলিশ কর্মচারী বারোজন সাধুকে ধরে এনেছে। অপরাধ টিকিট না কেটেই ট্রেনে চড়েছে। বারো জনের ভাড়া পনেরো টাকা। এই টাকা না দিলে সোজা হাজতবাস।

গোঁসাইজি পনেরো টাকা দিয়ে দিলেন। খালাস করে নিলেন সাধুদের। বললেন, 'কাল থেকে এদের ভোজন হয় নি, মহাপ্রসাদ পাইয়ে দাও।'

দুপুরে বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন, একটি ওড়িয়া সাধু রাস্তায়

লুটিয়ে পড়ে প্রভুকে প্রণাম করল। পরে উঠে দুই হাতে প্রভুকে আরতি করতে করতে ওড়িয়া ভাষায় গান করতে লাগল।

সাধুর প্রায় উলঙ্গ-বেশ, প্রভু বললেন, 'ওকে একখানা গায়ের কাপড় দিলে হয়।'

সাধু কিছু দূরে চলে গিয়েছে, সতীশ ছুটে গিয়ে তাকে একখানা কম্বল আর চার আনা পয়সা দিয়ে এল।

কম্বল আর পয়সা ফিরিয়ে দিল সাধু। আবার গান ধরল ওড়িয়া ভাষায়। গান শেষে চলে গেল হাসতে হাসতে।

'ঐ দুটো গানের অর্থ কী?' একজন জিগগেস করল প্রভুকে।

প্রভু বললেন, 'প্রথম গানের অর্থ, হে রাম, তোমাকে বহুদিন পর দেখলাম। কত তোমাকে খুঁজেছি, পাইনি কোথাও। এত দিন কোথায় ছিলে? কেন দেখা দাও নি? আজ দেখলাম, দেহ-মন জুড়িয়ে গেল।'

'আর দ্বিতীয় গান?'

'দ্বিতীয় গানের অর্থ, হে রাম, হে দয়িত, আর ছলনা কেন? আবার ঐশ্বর্য কেন? কম্বল কেন? আমার কি কিছু অপ্রতুল আছে? আমাকে যে দুখানি হাত দিয়েছ তাই দিয়েই তো আমি শীত নিবারণ করি। পয়সার কী দরকার? আমার তো প্রসাদই আছে।'

সকলে মুগ্ধ হয়ে রইল।

প্রভু বললেন, 'এই কম্বল আর পয়সা আর কাউকে দিয়ে এস।'

একদিন সমুদ্র স্নান করে ফিরছেন, দেখলেন এক নেংটিসার সাধু রাস্তার পরিত্যক্ত হাঁড়ি থেকে মহাপ্রসাদ কুড়িয়ে নিয়ে খাচ্ছে। প্রভু সতীশকে বললেন, 'চারটি পয়সা আর আমার এই গায়ের চাদরখানা ওকে দিয়ে এস।'

সতীশ কাছে যেতেই সাধু তৃণগুচ্ছ হাতে করে প্রভুকে আরতি করতে এল। গান ধরল : নীল চক্র, জগন্নাথ, মন ভজ না চৈতন্য, মন ভজ না চৈতন্য। প্রভুকে লক্ষ্য করে বললে, 'আমি বৃন্দাবন গিয়েছিলাম। বৃন্দাবন শূন্য। এখন দেখছি দণ্ড কমণ্ডলু হাতে নিয়ে এখানে বিরাজ করছ।'

গায়ের কাপড়, পয়সা, কিছুই নিলে না। বললে, 'আমার প্রারব্ধ যা আছে তাই হবে। একশো বছরের উপর কেটে গেল। জগবন্ধু এখন এসব দিচ্ছেন কেন?' চলে গেল আপন মনে।

প্রভু বললে, 'কাপড় ফেলে রেখে এস। যে নেবার নেবে।'

কতক্ষণ পরে সেই সাধু ফিরে এল। সবাই ভাবল কাপড় পয়সা নিয়ে যাবে বোধ হয়। কিন্তু, না, আবার গান ধরল :'চৈতন্য ভজ না মন, দেখ মোর কেলে সোনা।' প্রভুকে দেখে তার কী আনন্দ! আবার গান : 'কত রোজ দেখি নাই তোর চন্দ্রবদন। আজ দেখছি। এতরূপ দেখি নাই, এমন প্রেম দেখি নাই।'

নাচতে-নাচতে আবার চলে গেল পথ দিয়ে। কোথায় কাপড়, কোথায়

পয়সা, চেয়েও দেখল না।

ঠাকুর বললেন, 'একেই বলে পঞ্চম পুরুষার্থ।'

'আমার আকাশবৃত্তি।' বললেন আবার প্রভু, 'ভগবান যেদিন যেমন দেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকি। কিছু না দিলেও তাঁরই দয়া বলে অনুভব করি। অশনে যে সুখ অনশনেও সেই সুখ। যিনি অশন দিয়েছিলেন তিনিই রেখেছেন অনশনে।'

বৃন্দাবনে আরেকদিন যমুনার চড়ায় গিয়েছেন প্রভু, সাধুদের ভিড় ঠেলে চলেছেন দূর প্রান্তে, সেখানে ফাঁকায় একটি অকিঞ্চন সাধু কয়েকজন জিজ্ঞাসুর সঙ্গে বসে ধর্মালোচনা করছে।

প্রভু এক পাশে বসলেন। অবসরমত জিগগেস করলেন, 'মহারাজ আজ আপকা সেবা হুয়া হ্যায়?'

সাধু বললে, 'নেহি।'

'কাল হুয়া হ্যায়?'

সাধু স্বচ্ছ মুখে বললে, 'নেহি।'

'পরশু হুয়া হ্যায়?'

স্বচ্ছতর মুখে সাধু বললে, 'নেহি।'

ক্রমান্বিত জিজ্ঞাসা করে প্রভু জানলেন গত সাতদিন ধরে সাধু অভুক্ত আছে। অথচ দেহে অবসাদ নেই মনে অপ্রসাদ নেই। কেন, কেন এই অনাহার? সাধু বোঝাতে চাইল সব গোবিন্দের ইচ্ছা। চেষ্টা করলে কোথাও কি ভিক্ষে মিলত না? সাধু বললে, প্রাণ যায় যাবে তবু কারু কাছে যাচ্ঞা করতে পারব না। যার প্রাণ তিনি ইচ্ছা করলে রাখবেন, ইচ্ছা করলে নিয়ে নেবেন।

এইটুকুই জানতে এসেছিলেন প্রভু। তক্ষুনি তাঁর কুঞ্জে ফিরে এসে সাধুকে খাবার পাঠিয়ে দিলেন।

সাধু তা প্রত্যাখ্যান করে কী করে? এ যে অযাচিত পাওয়া। এ যে গোবিন্দের পাঠানো।

গেন্ডারিয়ায় থাকতে একদিন গোঁসাইজির শাশুড়ি বুড়ো-ঠাকুরাণী নবকুমার বিশ্বাসকে বললেন, 'আজ তো হাতে কিছু নেই, আশ্রমে এতগুলি প্রাণী, খাবার কী হবে?'

নবকুমার আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'বাজার থেকে ধারে নিয়ে আসি গে।'

চাল ডাল তেল যা দরকার নবকুমার সওদা করে নিয়ে এল।

আহারান্তে প্রভু ডাকলেন নবকুমারকে। জিগগেস করলেন, 'বাজার থেকে কিছু জিনিস ধারে এনেছেন বুঝি?'

'বুড়ো ঠাকুরাণী বললেন তাঁর ভাঁড়ার শূন্য—'

'তা আপনার কোনো দোষ নেই। কিন্তু আপনাকে আমার ব্রতের কথা জানাই। আমার আকাশবৃত্তি, আমার আহ্বানও নেই বিসর্জনও নেই। ভগবান

যেদিন যা মেলান তাই আশ্রমের সকলকে সমানভাবে খেতে হবে। নিজের থেকে উদ্যোগ করে সে ভার নিতে গেলে ব্রতসাধন হয় না।'

'আমি জানি না।' নবকুমার হাত জোর করল : 'আমাকে মার্জনা করুন।'

কী বলছে গীতা? 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম।' যারা অন্য সব কামনা ত্যাগ করে একমনে আমারই উপাসনা করে সেই নিত্যযুক্ত ভক্তদের আমি ভরণ-পোষণের ভার বহন করি।

যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন, কেউ কেউ তাঁকে ভয় দেখিয়েছিল, তোমার নিরাশ্রয় পরিবার অনাহারে শুকিয়ে মরবে। গোঁসাইজি বললেন, 'ভগবানের নাম প্রচারের জন্য ভগবান যদি আমার পরিবারকে শুকিয়ে মারেন আমার আক্ষেপ করবার কী আছে!'

আসামে যাচ্ছেন, টাকা যা ছিল জাহাজ-ভাড়াতেই শেষ হয়ে গেল। দুদিন চলে গেল, আহার কিছুই জোগাড় হল না। তৃতীয় দিন খিদের জ্বালায় নদীর পাড়ের খানিকটা পলিমাটি জল দিয়ে গুলে খেয়ে ফেললেন। যাত্রীদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কয়েকজন এ দৃশ্য দেখে বিমূঢ় হয়ে গেল। এ কী করলেন? গোঁসাইজি বললেন, 'তা আর কী করা! ভগবান যা দিলেন তাই প্রণাম করে সাদরে গ্রহণ করলাম।'

'বা, আমাদেরও তো জানাতে পারতেন।'

গোঁসাইজি হাসলেন। বিনয়বচনে বললেন, 'আপনাদের উপর নির্ভর করে তো বার হইনি। যাঁর উপর নির্ভর করে বার হয়েছি তিনি যা জুটিয়ে দিলেন তাই খেলাম তৃপ্তি করে।'

ঢাকা থেকে চাটগাঁ যাচ্ছেন পায়ে হেঁটে। যদি শুধু শুকনো চাল জুটছে তো চিবিয়েই খেয়ে নিচ্ছেন। কত দিন তো শুধু রাস্তার দোপাটি ফুল খেয়েই কাটালেন। হাঁটলেন দিনে আটচল্লিশ মাইল করে। যদি কখনো ভাত জুটেছে তো তাই সই, নুন জোটেনি বলে গ্রাহ্য করেননি। যা এসেছে তাই ভগবানের প্রসাদ। যা আসেনি তাও।

আগে আগে বুড়ো ঠাকুরাণীর হাতে আশ্রমের ভার ছিল, তিনি ভেবে-চিন্তে রয়ে-সয়ে খরচ করতেন, তাই বুঝি অর্থও কম আসত। পরে যোগ-জীবন যখন ভার নিল তখন হিসেব উড়ে গেল, বাছবিচারের সর্ত রইল না। যা পাঠিয়েছেন ভগবান পাঠিয়েছেন, আর তুমি যদি ভগবানের আশ্রিত হও, নাও তোমার প্রয়োজন মত, যত প্রয়োজন তত আয়োজন। স্রোতের মত অর্থাগম হতে লাগল। ব্যয়ে কার্পণ্য নেই বলে আয়েও অজস্রতা। যেমন প্রভুর আকাশবৃত্তি তেমনি তাঁর ভাণ্ডারও ভগবানের ভাণ্ডার। আমি নিষ্কিঞ্চন কিন্তু আমার ভগবান যে রাজরাজেশ্বর।

'এসেছে ব্রজের বাঁকা কালো সখা দেখবি আয়

তোদেরি এই নদীয়ায়।
এবার তার রং ফিরেছে ঢং ফিরেছে
কালো এখন চেনা দায়॥
আর তার কালো বরণ নাই
এবার রাই-অঙ্গ-সঙ্গ পেয়ে গৌর হয়ে তাই
সেই ব্রজের প্রেমের খেলা সেই ব্রজের রসের খেলা
সেই ব্রজের ভাবের খেলা খেলতে এসেছে হেথায়॥"

ঝুলনপূর্ণিমার দিন সকলের ইচ্ছে হল প্রভুর জন্মোৎসব হোক। প্রভু বললেন, 'যদি কাঙালীদের পেট ভরে ভালো করে খাওয়াতে পারো তাহলেই উৎসব হতে পারবে।'

কিন্তু অত টাকা কই?

কোত্থেকে বিধু ঘোষ এসে বললে, 'এই উৎসবের সমস্ত খরচ আমি দেব। ডাকো কাঙালীদের।'

'জয় জটিয়াবাবার জয়।' কাঙালীদল উল্লাস করে উঠল। এত পিঠে-পায়েস কেউই আমাদের খাওয়ায় নি, তাও এত যত্ন করে। কত জম্বুর রাজা এল-গেল এমন কেউ করবে না।

প্রভু বললেন, 'দেখছ প্রসাদ থেকে কী আশ্চর্য সুগন্ধ বেরুচ্ছে। যথার্থই আজ জগন্নাথের ভোজন হল। এ তাঁরই পরিতৃপ্তির সুগন্ধ।'

আর কী সুন্দর পরিবেশন! পরিবেশনে এতটুকু অসাম্য নেই। পরিবেশনে অসাম্যও অপরাধ।

আর পরিবেশনই তো আমাদের জীবে জীবে কৃষ্ণকে প্রণাম।

ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে। প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ। এই তো প্রণাম মন্ত্র।

'রাত্রে শয়নকালে এবং ঘুম থেকে ওঠবার সময়, সাধন করতে বসে এবং সাধনের পর ওঠবার সময় ভগবানকে স্মরণ করে এই মন্ত্র পড়ে নমস্কার কোরো।' বললেন প্রভু, 'ভগবৎবুদ্ধিতে যেখানে যখন নমস্কার করবে এই মন্ত্র পড়ে কোরো। ভগবানের অন্তর্ধানকালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মুনিঋষি দেবদেবী প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী এই মন্ত্র পড়ে ভগবানকে নমস্কার করেছিলেন। এই মন্ত্র পড়ে ভগবানকে নমস্কার করলে সেই নমস্কার ভগবানের চরণে পৌঁছুবে এরূপ বর আছে।'

প্রভু পায়ে হেঁটে সমুদ্রস্নানে যাচ্ছেন, তাঁর ক্লেশ দেখে একজন বাঙালি ভদ্রলোক বললেন, 'পাল্কি চড়েও তো যেতে পারেন—'

প্রভু বললেন, 'এ স্থানের বালুকা সুবর্ণবালুকা। এ গায়ে লাগলে শরীর পবিত্র হয়ে যায়। বরং শরীর পাত করে এ ধূলির সঙ্গে মিশে যাওয়া ভালো তবু পাল্কিতে চড়ে যাওয়া ঠিক নয়।'

'আসল কী জানো!' বলছেন গোঁসাইজি। 'আসল হচ্ছে ভগবৎ-ইচ্ছা।

নিজের ইচ্ছায় চেষ্টায় কিছু হয় না, ভগবৎ-ইচ্ছায়ই সমস্ত। যখন চিকিৎসা করতাম, মনে ধারণা হত, এই ওষুধটা দিলেই রোগ আরাম হবে। দেখি তা হয় না। বারে বারেই হয় না। তখন বুঝলাম, ওষুধ কিছুই নয়, আসল হচ্ছে ভগবানের কৃপা। প্রথম প্রথম প্রচার করতে গিয়ে দেখি, লোকে একমনে শোনে, আমায় আনুকূল্য করে। শেষে দেখি সকলে উদাসীন, আমার কথায় কিছু হবার নয়। বুঝলাম আমার শাস্ত্রজ্ঞান, বক্তৃতার ক্ষমতা কিছুই নয়—ভগবৎকৃপায়ই সমস্ত। এমনিধারা পুরুষকারে আঘাত খেয়ে খেয়ে বুঝে নিয়েছি, আমি কিছুই নই, অসারের অসার। কর্মকর্তা ভগবান, সর্বনিয়ন্তা, ঐহিক পারত্রিক বিধাতা। ভেবে চিন্তে ইচ্ছে করে নিজের জীবনই কি আমি গড়তে পেরেছি! টোলে পড়তাম, গোঁড়া হিন্দু ছিলাম, হঠাৎ সংস্কৃত কলেজে গেলাম। হয়ে উঠলাম ঘোর বৈদান্তিক। পরে গেলাম ব্রাহ্মসমাজে। প্রচারক হলাম। ডাক্তারি করলাম। তারপর ঘুরে ফিরে আবার এই অবস্থা। ভগবৎ-ইচ্ছাতেই সমস্ত সম্পন্ন হচ্ছে। এখন শুধু দেখছি শিশুর মত অবস্থান। যদি যথার্থ শিশুর মত থাকতে পারি তাহলে মা সর্বদাই দৃষ্টি রাখেন।'

ফরমাস দিয়ে প্রসাদী লাড্ডু আনা হয়েছে। সবাইকে দিয়েছ তো? জিগগেস করলেন প্রভু।

অনেককেই দিয়েছি। ভক্ত উত্তর করল। শুধু পাণ্ডাদের দিইনি। ওদেরকেও কি দেব?

প্রভু বললেন, 'সকলকেই দেবে। চাকর, মেথর, বানর, গরু কাউকে বাদ দেবে না। সকলকে দিলেই ভগবান পান।'

কাকে বাদ দেবে? বাদ দিলে যে ভগবানই বাদ পড়ে যাবেন।

মিউনিসিপ্যালিটি থেকে টিকাদার টিকে দিতে এসেছে, মেয়ে নারায়ণীর গায়ের জামা খুলে টিকাদার দেখছে টিকে দেবে কি না, তাইতে জগবন্ধু ভীষণ চটে গিয়ে টিকাদারকে গালাগাল দিতে সুরু করেছে। প্রভু বললেন, 'একটু হলেই যদি উত্তেজিত হতে হয় তবে আর কী হল। রাগের অবস্থায় স্থির-ভাবে কাজ করাই মহত্ত্ব। স্বাভাবিক অবস্থায় স্থির হয়ে কাজ করার মধ্যে বাহাদুরি কী।'

পরে আরো বললেন, 'যদি শান্তি পেতে চাও সকলকে মিষ্টি বাক্য বলবে। কাউকে নিন্দা করবে না।'

শ্রীধর বললে, 'ঠাকুর আমাকে কী সুন্দর বলেছিলেন, যেখানে যাবি এমন বাক্য বলবি যেন প্রাণ শীতল হয়ে যায়।'

'আমি দিই তা কে বলে?' বললেন প্রভু, 'সমস্ত জগন্নাথদেবই দেন। তিনি ভিতরে ইচ্ছা না দিলে কেই বা দিতে পারে? কে দাতা কে গ্রহীতা কারই বা এই দানযজ্ঞ?'

'সেই এক পুরাতনে পুরুষ নিরঞ্জনে চিত্ত সমাধান কর রে।
আদি সত্য তিনি কারণ-করণ প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে।

জীবন্ত জ্যোতির্ময় সকলের আশ্রয়
দেখে সেই, যে জন বিশ্বাস করে।
জ্ঞান প্রেম পুণ্যে ভূষিত নানাগুণে যাঁহার চিন্তনে সন্তাপ হরে।
চির ক্ষমাশীল কল্যাণদাতা নিকটসহায় দুঃখসাগরে।
তাঁর মুখ দেখি সবে হও হে সুখী তৃষিত মনপ্রাণ যাঁর তরে।
ভজন সাধন তাঁর কর রে নিরন্তর চিরভিখারী হয়ে তাঁর দ্বারে॥'

৩৮

গোস্বামী-প্রভু বিরচিত আশাবতীর উপাখ্যানে আবার একটু ফিরে যাওয়া যাক।

আশাবতী বললে, এ বনপথে একা যেতে আমার সাহস হয় না।

যোগীবর উত্তর করলেন : কেন মা, মানুষ কি কখনো একা থাকে? যিনি বিশ্বনাথ তিনিই তো সঙ্গে আছেন।

আশাবতী বললে, এ কথা সত্য, কিন্তু যতদিন আমি তাঁকে সর্বস্থানে না দেখি ততদিন মুখের কথায় বইয়ের লেখায় সাহস হয় না। একটি পাঁচ বছরের বালক সঙ্গে থাকলে মনে বল থাকে। পরমেশ্বরকে সর্বব্যাপী বলছি অথচ অন্ধকারে ঐ গাছতলায় যেতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। একটা আলো সঙ্গে থাকলে ভয় যায়। জ্যোতির ঘরের মধ্যে আছি, তবু ভয়। অতএব পরমেশ্বর কাছে আছেন মুখে বলা না-বলা সমান।

মা আশাবতী, তুমি যা বললে তা ঠিক। যোগীবর সমর্থন করলেন : ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ না করে যারা ধর্ম-ধর্ম বলে আন্দোলন করে বেড়ায়, তাদের দৃষ্টান্তেই জগতে নাস্তিকতা বেড়ে যাচ্ছে। যারা মুখে পরমেশ্বর বলে অথচ আচরণে নাস্তিকতা দেখায় তারা ভণ্ড ছাড়া আর কী!

উত্তর আশাবতীর মনঃপূত হল না। বললে, কথার সঙ্গে আচরণ না মিললেই যে ভণ্ড হল তা নয়। যে লোক চেষ্টা করেও কথা ও কাজ এক করতে পারছে না, কিন্তু যত্ন করছে তাকে ভণ্ড বলি কী করে? যে জেনে-শুনে কপট ব্যবহার করে সেই ভণ্ড, সেই চোর, তার দ্বারা সকল পাপই সম্ভব।

যোগীবর প্রসন্ন হয়ে বললে, হ্যাঁ মা, এটাই যথার্থ কথা।

দুজনে মাতাজির আশ্রমে এসে উপস্থিত হল।

মায়ের চরণ ধারণ করে আশাবতী বললে, মা আজ আমার সুপ্রভাত, জন্ম সার্থক। অনেক দিনের আশা পূর্ণ হল, মা।

মাতাজি বললেন, কেন মা, এত দৈন্য কেন? ভক্তিভরে ভগবানের নাম করো, কোনো কিছুর অভাব থাকবে না। যতদিন ভগবৎপদারবিন্দসুধাস্বাদ না হয় ততদিন বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। আর বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি না হলে সুখ দুঃখ রোগ শোকের হাত থেকেও নিস্তার নেই।

উপায় কী?

ভগবৎলাভ। জানো তো অনন্তেই সুখ, অল্পে সুখ নেই। পরমেশ্বরই অনন্ত আর সমস্ত কিছুই অল্প। সেই অনন্তকে না পেলে আশার বিরাম হবে কেন? দেখ না, শৈশব হতে আমরা বড় জিনিসই ভালোবাসি। কেবল যে বড় ভালোবাসি তাই নয়, বড়কে ভালোবাসি। সুন্দরকে ভালোবাসি, মঙ্গলকে ভালোবাসি, পুরাতনকে ভালোবাসি, ভালোবাসাকে ভালোবাসি। এ সকল বস্তু পাই না বলেই আশা মেটে না, ছুটোছুটি করতেই প্রাণ যায়।

যোগীবর বললেন, শাস্ত্রেও সেই কথাই বলছে। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি-শ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে। পরাৎপর পরমেশ্বরকে দর্শন করলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় দূরে যায়, কর্মফলের ক্ষয় ঘটে।

আহা, কী অপরূপ! শুনলেও প্রাণে আশা আসে। ঈশ্বরকে না দেখা পর্যন্ত প্রাণ সুস্থ হয় না। মাতাজি আশাবতীর দিকে তাকালেন : মা, তোমার নাম কী? তুমি কি বাঙালি?

আশাবতী বললে, এ দুঃখিনীর নাম আশাবতী। বঙ্গদেশেই আমার গৃহ ছিল।

তেরো শ পাঁচ সালের ফাল্গুন, জগন্নাথের পদ্মবেশ। গত রাত একটা থেকে আজ সকাল দশটা পর্যন্ত শ্রীঅঙ্গে এই বেশ থাকবে। প্রভু সবাইকে নিয়ে চলেছেন জগন্নাথদর্শনে।

পথে বড়ছাতার মহান্তের সঙ্গে দেখা। সে প্রভুকে এগিয়ে নিতে এসেছে।

মন্দির আজ লোকে লোকারণ্য। তবু ভিড় সরিয়ে প্রভুকে মণিকোঠায় নিয়ে যাওয়া হল। প্রভু ভাবোন্মত্ত হয়ে উঠলেন, হরিধ্বনির পর হরিধ্বনি তুলে বেদীতে মাথা ঠেকিয়ে অজস্র প্রণাম করলেন। কোনোক্রমে একটু বাইরে এসে নাচতে লাগলেন ঘুরে ঘুরে, মুখে শুধু হরিজয়নাদ। জয় জগবন্ধু, জয় সংকর্ষণ, জয় মায়ী সুভদ্রা, জয় চক্রসুদর্শন—শুধুই জয় জয়। আর প্রণাম, পুনঃপুনঃ প্রণাম, মুহুর্মুহুঃ প্রণাম। সমস্ত পাণ্ডা সেবক দর্শক ভক্ত, আপামর সাধারণ সমস্ত জনগণকে প্রণাম।

মন্দির থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির নিচে মুক্তিমণ্ডপের সামনে বসে পড়লেন। ভিড় করে লোক আসতে লাগল প্রার্থনা নিয়ে। কল্পতরু ঠাকুর কাউকে ফেরালেন না।

পাণ্ডারা পাঁচ শো টাকা চাইল। কপর্দক নেই, তবু প্রভু সম্মত হলেন। ত্রিশ টাকার সিকি দু-আনি ভাঙিয়ে নিয়ে এল সরলনাথ, তাই বসে বসে বিলোলেন প্রভু। কোত্থেকে টাকা আসছে কে জানে। পরে কাউকে পাঁচ কাউকে দশ কাউকে পঁচাত্তর টাকা দিলেন।

রাধাকুণ্ডবাসী বেণী ব্রজবাসী পঁচাত্তরের কম নিতে রাজি হল না।

ঠাকুর যোগজীবনকে জিগগেস করলেন, 'কি, পারবে দিতে?'

'তুমি ইচ্ছা করলেই হয়।' বললে যোগজীবন ।

প্রসন্ন স্বরে ঠাকুর বললেন, 'তুই কিছু ভাবিসনে। অন্তরে সন্তোষ রাখলে যা চাইবি তাই হবে।'

মন্দির থেকে বেরিয়ে পথে যেতে-যেতেই বা কত দান। পট্টবস্ত্র, সাধারণ বস্ত্রই বা কত। যে যা চাইছে তাই পাচ্ছে। শেষে বাকি পয়সা হাতে হাতে দিতে না পেরে পথের মধ্যে লুট দিয়ে দিলেন। যে যা পাও নাও কুড়িয়ে।

বাড়িতে ফিরে এসে সবাই জিগগেস করল এ ব্যাপারের অর্থ কী।

প্রভু বললেন, 'আজ দেখলাম জগন্নাথ গোবিন্দ হয়ে রাখালবালকদের সঙ্গে গোচারণ করছে। আবার কিছুক্ষণ পরে দেখলাম রাজেশ্বর হয়ে যে যা চাইছে তাই বিলোচ্ছে দুহাতে। আমাকে দেখে হেসে বললেন, আজ যে যা চাইবে যত পারিস দে। তাই নির্বিচারে তাঁর আদেশ পালন করলাম।'

কিন্তু শুধু একদিন নয় নিত্য চলতে লাগল এই দানলীলা।

জগন্নাথবল্লভ মঠের মহাবীরের কাছে মানসিক করেছিলেন প্রভু, সেই পূজা দেখতে গেলেন। বললেন, 'মহাবীরের কাছে যে দিন এই পূজা মানস করলাম তার পরের দিনই বানরবধ বন্ধ হল।'

মঠে এক পা-কাটা বাবাজি থাকেন তাকে রেশমি চাদর ও বস্ত্র দিলেন পূজারিকেও তাই। ছড়িদাররাও বাদ পড়ল না। হাত পাতলেই টাকা, গামছা বস্ত্র—যেন উৎসবের স্রোত চলেছে। দানের মত আনন্দ আর কোথায়! ঋণ যে কে দেয়, কেন দেয়, কী করে এর পরিশোধ হবে, কে তার হিসেব রাখে কে বা তা নিয়ে মাথা ঘামায়!

প্রভু বললেন, 'আমি কিছুই করি না। ভিতর থেকে স্পষ্ট হুকুম আসে আমার কী সাধ্য কাউকে কিছু দিই!'

কে একজন বললে, 'গোঁসাইপ্রভু বড় নাম করলেন।'

প্রভু বললেন, 'নাম অতল জলে ডুবে যাক।'

গেণ্ডারিয়া আশ্রমের দক্ষিণের ঘরটিতে সকাল-সন্ধ্যেয় অনেক ভক্ত শিষ্য এসে জমায়েত হয়, তাদের গোলমালে কুলদার সাধনের ব্যাঘাত ঘটে। তাই একদিন নালিশ করল প্রভুর কাছে।

প্রভু বললেন, 'এদিকে ওদিকে আশ্রমে তো স্থানের অভাব নেই, গাছ তলায় বসেও তো নাম করতে পারো। নাম করা নিয়ে তো কথা, তা তো যেখানে-সেখানেই হতে পারে। দশটি লোক যেখানে মিলেমিশে আনন্দ করছে সেখানে তাদের বাধা দিয়ে নিজের সুবিধের চেষ্টা করতে নেই।'

কুলদা বাগ মানল না। বললে, 'যদি বলেন তো আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পুকুরধারে একখানা ছোট ঘর করে নিতে পারি।'

'তারপর?' ঠাকুর তাকালেন মুখের দিকে : 'কোথাও চলে যেতে হলে ঘরখানা উইল করে যাবে কার নামে!'

এক কথায় দমে গেল কুলদা।

শুনতে পেল প্রভু মহেন্দ্রকে বলছেন, 'ওর কৃপণতাদোষে ওর সাধন-ভজন মাটি হয়ে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে ও একশো টাকা জমিয়েছে, তা কোনো উপায়ে খরচ করিয়ে দিতে পারেন? কৃপণতাই সঙ্কীর্ণতা। ধর্মার্থীদের স্বভাবে একটিমাত্র দোষ থাকলেই সমস্ত সাধন-ভজন পণ্ড হয়ে যেতে পারে। তাই এখন থেকেই সাবধান হওয়া ভালো।'

কুলদা শুনতে পেল সেই কথা। প্রভুর কাছে এসে বললে, 'কী করে আমার সঙ্কীর্ণতা যাবে বলে দিন। আমি তা হলে হাতের টাকা কটা দান করে ফেলি।'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'এখুনি দান করবার প্রয়োজন কী? কোনো কাজই সাময়িক উত্তেজনায় করতে নেই। সমস্ত কাজই স্বাভাবিক অবস্থায় ধীরে সুস্থে করতে হয়। এখন থেকে আর সঞ্চয় কোরো না। তুমি যে পথে চলেছ তাতে সঞ্চয় নেই।'

আবার বললেন, 'ধনীদের মত যথার্থ বন্ধুহীন লোক অতি বিরল। সকলেই টাকার জন্যে ভালোবাসছে, হাসছে, মুখের দিকে চেয়ে আছে। রোগে শুশ্রূষা করছে, তাও অর্থের জন্যে। কোনো স্বার্থ নেই, এমন কেউ ভালোবাসতে পারে, তবে সংসারে সেই সুখী। সে ভালোবাসাই ঈশ্বরকে ভালবাসা। সে ভালোবাসাই সুখ। হরিনামই সব চেয়ে সহজ সুখ। নাম করতে করতেই অনুরাগ।'

কুঞ্জ গুহ সুস্থই আছে, প্রভু তাকে হঠাৎ বার্লি খেতে আদেশ করলেন। মহাপ্রসাদের বদলে বার্লি কেন বরাদ্দ হল কেউ নির্ণয় করতে পারল না। বোঝা গেল, দুদিন পরে যখন কুঞ্জর জ্বর হল। বিধু ঘোষ বললে, 'এতক্ষণে বুঝলাম বার্লির মহিমা।'

কিন্তু জ্বরকে অগ্রাহ্য করল কুঞ্জ। জ্বর গায়েই নরেন্দ্র-সরোবরে স্নান করল। আর স্নান করেই পড়ল ভারি হাতে। জ্বর একেবারে একশো-পাঁচ। এবার আর বার্লিতে পোষাবে না। ডাক্তার ডাকো।

প্রভু বললেন, 'আমার ইচ্ছে তুমি কোনো ওষুধ না খাও।'

কুঞ্জ একবাক্যে স্বীকার হয়ে গেল। বললে, 'আমারও সেই ইচ্ছে।'

প্রভু শুধু পথ্যের ব্যবস্থা করলেন। সকালে 'পাকাল মহাপ্রসাদ', বিকেলে 'মহাপ্রসাদ' আর রাতে প্রভুর প্রসাদী আম, ক্ষীর আর মিছরি।

আশ্চর্য, তাতেই সেই প্রবল জ্বর প্রশমিত হল।

কিন্তু এমন অসতর্ক কুঞ্জ, আবার ঠান্ডা লাগিয়ে বসল। বৃষ্টিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ভুলে গেল দরজা বন্ধ করতে। ফলে আবার সেই ভয়ঙ্কর জ্বর।

কারা বলাবলি করলে। 'কুঞ্জ না বিনা চিকিৎসায় মারা যায়।'

'বেশ, তবে ডাক্তার ডাকো।' প্রভু সরে দাঁড়াতে চাইলেন।

ডাক্তারে কিন্তু কুঞ্জ রাজি নয়। সে বলতে লাগল, 'না, ডাক্তার লাগবে না। আমি প্রভুর দেওয়া পথ্যেই ভালো হয়ে উঠব।'

কিন্তু কথা যখন উঠেছে তখন বিনা চিকিৎসার অভিযোগ খণ্ডন করে দিতে হবে। প্রভু বললেন, 'না, ডাক্তার ডাকো। আবার বার্লি খাক।'

ডাক্তার বাণীকন্ঠ ঘোষকে ডাকা হল। সে বসে দেখে-শুনে ওষুষ দিল। কিন্তু কই, রোগ ভালো হয় কই? এক ওষুধ বদলে আরেক ওষুধ দিল, কিন্তু যে জ্বর সেই জ্বর।

এক রাতে জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে পড়ল কুঞ্জ। ডাক্তারের কাছে না ছুটে সবাই ছুটল প্রভুর কাছে। বললে, 'কুঞ্জ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। বুঝি আর বাঁচানো গেল না।'

প্রভু শান্ত মুখে বললেন, 'চিন্তার কারণ নেই। কুঞ্জকে পাকাল খেতে দাও।'

অজ্ঞান কুঞ্জ পাকালের নাম করতেই চোখ মেলল। আর খাবি তো খা এক হাঁড়ি খেয়ে বসল।

সবাই ভাবল এই কুঞ্জর শেষ খাওয়া।

কিন্তু না, আস্তে আস্তে নামতে লাগল জ্বর। চলল আবার সেই পথ্যচিকিৎসা। পাকাল আর মহাপ্রসাদ আর সেই প্রসাদী আম-ক্ষীর।

কদিনের মধ্যেই নিরাময় হয়ে গেল কুঞ্জ।

এই কুঞ্জেরই স্ত্রী কুসুমকুমারী। ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিয়ে একেবারে তদগতপ্রাণা। ইনিই লিখেছিলেন স্বামীকে, 'ঠাকুরের কাছে প্রদত্ত নাম ও ঠাকুর এক বস্তু। একটি নামে যে আনন্দ তার সহস্রাংশের এক অংশও স্বামী-স্ত্রী-সংসর্গসুখে নেই।

কুসুম সন্ধ্যাকালে রান্নাঘরে গিয়েছে রান্না করতে। গিয়ে দেখল উনুনে আগুন নেই। হাঁড়িতে জল দিয়ে বসাল উনুনে, চাল ছেড়ে দিল। হাঁড়ির মুখ ঢাকল সরা দিয়ে। এক মুঠো খড় নিয়ে ল্যাম্পে ধরিয়ে উনুনে গুঁজে দিল। তারপর কাঠ গুঁজে দিতে ভুলে গেল। খড়ের আগুনে ইন্ধন না পেয়ে নিবে গেল আস্তে-আস্তে। কুসুমের কিছু খেয়াল নেই, সে নামানন্দে সমাধিস্থ।

হঠাৎ কুসুম দেখল প্রভু প্রকাশিত হয়েছেন। বলছেন, 'কুসুম, আজ তোমার ভাত অন্নপূর্ণা রাঁধলেন। তোমাকে আজ আর কষ্ট করে রান্না করতে হল না।'

সমাধিভঙ্গের পর কুসুম ভাতের হাঁড়ির সরা সরিয়ে দেখল দিব্যি ভাত হয়ে রয়েছে। ঝরঝরে ভাত, ফেনগালা।

বরিশালের উকিল গোরাচাঁদ দাস জিগগেস করল প্রভুকে, 'মশাই এ কি সত্যি? বিনা আগুনের রান্না?'

ঠাকুর হাসলেন ; 'এ আর বেশি কথা কী! পঞ্চভূত তো পড়েই আছে,

যে যখন যা সিদ্ধ করে। এ সত্য কথা বৈ কি। সত্য বলতে, এ কথাই সত্য। তোমরা এর মর্যাদা দিতে পারবে না, ভাববে প্রশংসার জন্যে কঞ্জ আর তার স্ত্রী এ রটনা করছে। যুগযুগান্তর চলে যাবে, পাহাড়ে অঙ্কিত রেখার মত এ অনন্তকাল সত্য হয়ে থাকবে। ভগবানের অন্নপূর্ণা-শক্তিই রান্না করেছেন।'

'চিন্তাময়ী তারা তুমি, আমার চিন্তা করেছ কি?
নামে জগৎ-চিন্তাময়ী, ব্যাভারে কৈ তেমন দেখি!
প্রভাতে দাও বিষয়-চিন্তে, মধ্যাহ্নে দাও জঠর-চিন্তে,
ও মা, শয়নে দাও সর্বচিন্তে, বল মা তোরে কখন ডাকি?
অচিন্ত্যরূপিণী মেয়ে, পরম চিন্তামণি পেয়ে
রয়েছ নিশ্চিন্ত হয়ে শম্ভুচাঁদকে দিয়ে ফাঁকি।'

সেদিন জগন্নাথদর্শন করে প্রভু অনেক স্তবস্তুতি করলেন : 'তুমি দামোদর, তুমি কেশব, তুমি নৃসিংহ, তুমি বামন, তুমি রুদ্র, তুমি বাসুদেব। তুমি এক বিগ্রহ, চতুর্ধা বিভক্ত—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন আর অনিরুদ্ধ। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।' অধীর হয়ে বলতে লাগলেন : 'হরিবোল হরিবোল।' পরে পরিপূর্ণ নেত্রে তাকালেন জগন্নাথের দিকে : 'দেখ জগন্নাথদেবের কী অপূর্ব শোভা, নিজের ছটায় নিজেই আলোকিত। তোমরা দীপ দাও কি না দাও, তাঁর কিছুই আসে যায় না তিনি নিজের আলোয় নিজেই উজ্জ্বল হয়ে আছেন।'

মন্দিরের দীপ নিবু-নিবু হয়ে এসেছিল, পাণ্ডারা কী ভেবে সলতে বাড়িয়ে দিল।

ঠাকুর গান ধরলেন :

'জান না রে মন, পরম কারণ, শ্যামা তো শুধু মেয়ে নয়,
মেঘের বরণ করিয়া ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়।
কভু বাঁধে ধড়া কভু বাঁধে চূড়া ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায়
কখন পার্বতী কখন শ্রীমতী কখন রামের জানকী হয়।
হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি দনুজদলে করে সভয়,
ব্রজপুরে আসি করে লয়ে বাঁশি ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয়।'

বাড়িতে এক অথর্ব ও অসুস্থ সাধু এসে উপস্থিত! না দেখে শুধু শব্দ শুনেই প্রভু চিনলেন সাধুকে। বললেন, 'এক ঠোঙা চাল ও কিছু পয়সা দিয়ে দাও।'

চাল দেওয়া হল কিন্তু তবিলে পয়সা নেই একটাও।

সাধু বললে, 'পয়সা চাই না। একটি ঘটি দিন।'

ঠাকুর শুনতে পেয়ে বললেন, 'আমার ছোট ঘটিটি দিলে হয় না?'

'না, সাধু নতুন ঘটি চায়। দিতে হলে কিনে এনেই দিতে হবে। কিন্তু ভাণ্ডার শূন্য।' বললে সারদাকান্ত।

'তাহলে যোগজীবনকে বলে সরলনাথকে বাজারে পাঠিয়ে দাও।' বললেন ঠাকুর, 'সরলনাথ ঠিক বাকি নিয়ে আসতে পারবে।'

'কিন্তু এত অর্থাভাব যে যোগজীবনকে বলতে ইচ্ছে হয় না।'

'এত ভাবনার কী দরকার!' ঠাকুর সরল স্বাচ্ছন্দ্যে বলে উঠলেন : 'সুযোগ এসেছে দান করে ফেল। সুসময় ছেড়ে দিলে আর মেলে না। দুর্যোধন ছেড়ে দিয়েছিল সুসময় যখন শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। আর সেই সুযোগ ফিরে এল না।'

সরলনাথকে সকলে বলে উদাসী সরলনাথ। পুরো নাম সরলনাথ গুহ ঠাকুরতা, বাড়ি বরিশাল, বানরিপাড়া। প্রথম যৌবনেই স্ত্রী আর সংসার ছেড়ে ঠাকুরে আশ্রয় নেয়, একে নির্ভর করেই ঠাকুর পথ হাঁটেন। ঠাকুরের বস্ত্রযজ্ঞে সরলনাথই প্রধান পুরোহিত। গুরুভক্তিতে নির্বিচল, সরলনাথের সরল সাধন।

সরলনাথের কাঁধে হাত রেখে ঠাকুর পথ চলছেন, হঠাৎ কাউকে দেখে বলে উঠলেন, 'এঁকে কিছু দান করো।'

দান করবে সরলনাথের কাছে পয়সা কোথায়? কিন্তু কিছু না দিলে গুরুবাক্য লঙ্ঘন হয় যে। সরলনাথ তখন রাস্তার ধারে মুদি-দোকানের কাছে হাজির হয়ে সরল মুখে বললে, 'দান করবার জন্যে ঠাকুর কিছু পয়সা চাচ্ছেন—'

অম্লান মুখে মুদি দিয়ে দিল পয়সা। তাই সরলনাথ এনে দিল প্রভুর হাতে। প্রভু তা প্রার্থীকে দান করলেন।

কোনোদিন প্রভু এমন জায়গায় এসে দানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যার কাছাকাছি কোনো দোকানদানি নেই। না, ঐ দেখা যাচ্ছে একটা পানের দোকান, সেখানে গিয়েই হাত পাতল সরলনাথ। সেই পানওলাই দিয়ে দিল যথাসাধ্য।

কেউ-কেউ আবার সাধ্যের অতীত করে দিল। কী যে ইন্দ্রজাল, ঠাকুর চাচ্ছেন শুনলেই যে যার হৃদয়ই শুধু খোলে না, ক্যাশবাক্সও খুলে দেয়।

ধার করে দান।

ঠাকুরের আবার কখন ইচ্ছে হবে ধার শোধ করবেন। সরলনাথকে বললেন, 'যাদের থেকে ধার এনেছ তাদের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে এস।'

সরলনাথ ফাঁপরে পড়ল : 'আমি কি সকলকে চিনি?'

ঠাকুর বললেন, 'বাজারে বলতে বলতে যাবে কে আমার কাছে কত পাও নিয়ে যাও এসে। যে ধার বলে দিয়েছে সে ঠিক নিয়ে যাবে দেখো।'

সত্যি, ঘোষণা করতে করতে পথ ধরে চলতে লাগল সরলনাথ। যারা নিজেদের উত্তমর্ণ মনে করছে, নিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রাপ্য টাকা। হিসেবে এতটুকুও ভুল করছে না।

মঙ্গুমঠে ঠাকুর প্রায় ছ শো টাকার কাপড় বিলোলেন। যে সাতজন

কনস্টেবল ও বারোজন ছড়িদার বিরাট লোকসংঘট্ট নিয়ন্ত্রণ করল তারাও ধুতি পেল।

পরে সন্ধ্যায় কীর্তন সুরু হল। সে কীর্তনে এক সন্ন্যাসী এসে যোগ দিল। ঠাকুরের হাত ধরে নাচতে লাগল উত্তাল হয়ে। যাবার সময় বলে গেল, 'আমি লোকনাথে থাকি, সেখানে গেলে দেখতে পাবে আমাকে। কী, চিনতে পাচ্ছ না? আমি শুধু দুধ খাই।'

লোকনাথে পোঁছে ঠাকুর বললেন, 'সমস্ত পুরী আচ্ছন্ন করে লোকনাথ বিরাজ করছেন। আকাশ-পাতাল জ্যোতির্ময় হয়ে রয়েছে।' পরে আবার বললেন, 'লোকনাথ আর জগন্নাথ এক। কখনো জগন্নাথকে দেখবে শুভ্র, কখনো লোকনাথকে শ্যাম।'

সত্যি, সবাই দেখল, মন্দিরের মধ্যে সেই সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে। ঠাকুর বললেন, 'উনিই লোকনাথ।'

পাণ্ডারা একুশ টাকা চেয়ে বসল। ঠাকুর সরলনাথের মুখের দিকে তাকালেন। আছে?

সরলনাথ বললে, 'পাঁচ টাকা আছে।'

'উপায়?'

'দেখছি।' সরলনাথ তখুনি ছুটল।

দেখল সিংহদ্বারের অদূরে এক দোকান। দোকানী সম্পূর্ণ অচেনা, চেহারাটা অত্যন্ত রূঢ়। কী ভেবে তার কাছেই হাত পাতল সরলনাথ। ঠাকুর পাণ্ডাদের দেবেন বলে ষোলটা টাকা চেয়েছেন, যদি দয়া করেন—

কত? ষোল টাকা? লোকটা হঠাৎ কোমল হয়ে গেল। অকাতরে বাক্স খুলে দিয়ে দিল টাকা।

বাসায় সেদিন একটি কুমারী কন্যা উপস্থিত। আবদারের সুরে ঠাকুরকে বললে, 'সবাইকে এত বস্ত্র দিচ্ছ আমি বুঝি কেউ নই?'

ঠাকুর সেই দুঃখিনী কন্যাকে এক পলকেই চিনতে পারলেন। বললেন, বিমলীমায়ী!

যোগজীবনকে বললেন, 'ত্রিশ-চল্লিশ টাকার মধ্যে একখানা শাড়ি কিনে দাও বিমলাদেবীকে। আর দু টাকার পুজো পাঠাও।'

পুরুষোত্তমের যত খাতির তত বুঝি বিমলাদেবীর নয়। অনেকে তো বিমলাদেবীকে দর্শনই করে না। বিমলাদেবীই যে অধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই কথাই ভুলে থাকে।

আরেকবার দেখা দিয়েছিলেন পাগলিনী ভিখারিনির বেশে। সমুদ্র স্নান করে ফিরছেন দেখলেন চীরবাসা এক ভিখারিনি আলুলায়িত কুন্তলে ফিরছে পাগলিনীর মত। প্রভু ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'যার যা আছে সমস্ত এই ভিখিরিনিকে দিয়ে দাও। এখন সুযোগ আর না-ও পেতে পারো। পুরুষোত্তমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমাদের দর্শন দেবার জন্যে ভিখিরিনির

সাজে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছেন। দাও কী আছে।'

দেবার লুট পড়ে গেল। সতীশ তার ধোয়া কাপড়খানিই দিয়ে দিল।

ঠাকুর বললেন, 'যে সব স্থলে ভগবদবুদ্ধিতে সহস্র সহস্র লোক শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণ করেন সে সব স্থলে গেলেই ভিতরের ধর্মভাব জাগ্রত হয়ে ওঠে। এটা কি কম কথা?'

'আচ্ছা বিগ্রহ জাগ্রত, তার মানে কী?' কে একজন জিগগেস করল : 'বিগ্রহ কি কথা বলে? হাত-পা নাড়ে?'

'যাঁদের চোখ-কান আছে,' বললেন ঠাকুর, 'তাঁরা বিগ্রহের হাত-পা নাড়াও দেখেন, কথা বলাও শোনেন।'

'কিন্তু বৈরাগ্য কী?'

'বৈরাগ্য অর্থ ঈশ্বরে সঠিক অনুরাগ। বৈরাগ্য অর্থ এই নয় যে কাজকর্ম ছেড়ে দিলাম, ভিক্ষে করে জীবিকা নির্বাহ করলাম। সমস্ত বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়সমূহ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হলেই বৈরাগ্য। বিষয়ে অনাসক্ত হলেই বুঝবে বৈরাগ্য হয়েছে। মানুষের মরে যাওয়া আর বৈরাগ্য হওয়া এক বস্তু। মরে গেলে আর কি কেউ জিগগেস করে মরে গিয়েছি কিনা? তেমনি বৈরাগ্য উপস্থিত হলে আর কি প্রশ্ন ওঠে, কী বৈরাগ্য!'

'কিন্তু কর্ম?'

'কর্ম না করলে বৈরাগ্য হয় না। কর্ম যার যেটুকু আছে, আজ হোক কাল হোক, একদিন করতেই হবে। সেটি না করে কারু নিস্তার নেই। একমাত্র ভগবানের কৃপায় মুহূর্তমধ্যে সব শেষ হতে পারে। না হলে জোর করে কার সাধ্য কর্ম ছাড়ায়! তবে কর্তৃত্ব যতদিন আছে ততদিন তাপ যায় না।'

'তাপ কী?'

'ভগবৎ-দর্শনের অভাবই তাপ। ভিতরে অকর্তা ও বাইরে কাজ, অর্থাৎ অনাসক্ত কাজ—এই মহাপুরুষের লক্ষণ। কর্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ করলেই তাপ যায়। যে মুক্ত-ভক্ত তারই আর তাপ নেই।'

রাস্তার এক অন্ধ বৈষ্ণবকে ঠাকুর সহসা আলিঙ্গন করে ধরলেন। কী ব্যাপার? আমি যে ওর মধ্যে শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণুমূর্তি দেখলাম।

বাবাজির বাড়ি রায়বেরিলি। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে দ্বারকায় গিয়েছিলেন, সেখান থেকে রামেশ্বর। সেখান থেকে পুরী। মাধুর্যের প্রতিমূর্তি, সব সময়েই হাসিমুখ। কে এই অন্ধকে পথ দেখায়, কাকে দেখে এই অন্ধের এত প্রসন্নতা!

মানুষ তো নয় একটি দেবমন্দির।

ঠাকুর বললেন, 'এঁকে ধুতি, চাদর আর একটি ঘটি দাও।' পরে বললেন, 'এ স্থানের প্রতিটি ধূলিকণাই এক-একটি বিষ্ণু। জগন্নাথদেব মহাপ্রসাদ আর রজ, এ তিনই এক।'

আবার বললেন, 'মাথা উঁচু করে কখনো ধর্মলাভ হয় না। অভিমান বিষম জিনিস। জটা মালা তিলক গেরুয়া এসব বেশভূষা ধারণ করে যদি বিন্দুমাত্রও প্রতিষ্ঠার ভাব মনে আসে সেই মুহূর্তে তা ত্যাগ করবে। না করলে ওরাই সাপ হয়ে দংশন করবে। অন্যান্য অপরাধের পার আছে, ধর্মাভিমানের পার নেই। রসনাকে সংযত করবে। রসনা দু কাজ করে। খায় আর বকে। বাক্যসংযম করবে। জিজ্ঞাসিত না হলে কথা বলবে না। জিজ্ঞাসিত হলেও অতি সংক্ষেপে সত্য উত্তরটি দেবে। জিহ্বা বশ করবার জন্যে ঋষিরা মৌনী হতেন। লোকের গুণানুবাদ, শাস্ত্রপাঠ, নামকীর্তনে জিহ্বা শুদ্ধ ও ভদ্র হয়। ভদ্র হতে-হতেই সংযত হয়ে আসে। আর লোভ? কমে যায়। মুনি-ঋষিরা লোভ দমন করতে কী কঠোরই না করেছেন। অনাহারে, গলিত পত্রাহারে দিন কাটিয়েছেন। উপস্থ সংযত করা সোজা, কিন্তু জিহ্বা সংযত করাই কঠিন।'

কিন্তু কঠিনতম পথে না গেলে কোমলতমকে পাব কী করে?

৩৯

গোঁসাইজি বললেন, দেবপ্রসাদ আসছে। ওর জন্যে পাশের ঘরখানা ঠিক করে রাখো।

স্বামী দেবপ্রসাদ।

পূর্বাশ্রমের নাম দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বাড়ি চন্দননগর। আইন পরীক্ষা পাশ করলেও উকিল হয়নি। সন্ন্যাস নিয়েছে। বিদ্বৎ-সন্ন্যাস।

স্ত্রী মারা যাবার পরই মন উঠে যায় সংসার থেকে। কিন্তু, না, একটি শিশু পুত্র রেখে গিয়েছে আর একটি টিয়ে পাখি, তাদের প্রতিপালন করতে হয়। ছেলে কোলে করে দুধের বাটি হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় দেবেন। খিদে মিটে গেলেও ছেলে কাঁদে, মা-মা করে। বুকে যত মমতা আছে, চোখে যত জাগরণ, স্বরে যত মধু, সমস্ত একত্র করে ছেলেকে ঘুম পাড়ায়।

সেই ছেলেও চোখ বুজল।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল দেবেন, কিন্তু টিয়ে পাখিটাকে ভুলল না। কুম্ভমেলায় গিয়েছে সেখানেও সেই টিয়ে পাখি।

সবাই কটাক্ষ করল : এ আবার কোন মায়া।

প্রভু-অন্ত প্রাণ, আছেও তাঁর আশ্রয়ে। দেবপ্রসাদ নামও তাঁরই দেওয়া। তিনি বললেন, 'আশ্রিতকে ত্যাগ করবে কী করে? আশ্রিতকে রক্ষা করাই তো ধর্ম।'

পাখি বলে উঠল, 'শিব, শিব!'

কুতুবুড়ি পাখিকে খেতে দেয় আর পাখি তাকে নাম শোনায়। সাধুদের

সঙ্গে থাকতে থাকতে পাখিও সাধু হয়ে উঠেছে।

একদিন কুতুবুড়ি বিস্ময়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল : শোনো শোনো পাখি কী বলছে?

কী বলছিস? সবাই ছুটে এল খাঁচার কাছে।

পাখি স্পষ্ট মানুষের গলায় বললে, 'কালী কল্পতরু, শিব জগৎগুরু, শিব শিব, শিবরাম।'

সেই পাখিও আর থাকল না।

স্ত্রী আর ছেলের কিছু কাপড়চোপড় একটা পুঁটলিতে করে সঙ্গে-সঙ্গে রাখত স্বামীজি, এবার সেই পুঁটলিটাও উধাও হল।

এখন শুধু কমণ্ডলু আর ডোরকৌপীন।

পুরীতে এসে এখন তার কাজ নীরবে দাঁড়িয়ে প্রভুকে দেখা আর অশ্রু বিসর্জন করা আর সন্ধ্যায় প্রভুর ডান পাশে ধ্যানাসনে শান্ত হয়ে বসে থাকা। উন্মগ্ন-নিমগ্ন দুই অবস্থাতেই প্রভুর মাঝে জগন্নাথকেই অবলোকন।

বানরবধের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় বচন কোথায় কী আছে পুঙখানুপুঙখ সংকলন করে পাতি প্রস্তুত করার পাণ্ডিতও এই দেবপ্রসাদ।

কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্যে কী হবে যদি আসল বিদ্যা হরিভক্তি না থাকে? যদি না থাকে মহৎকুশলা বৈষ্ণবতা?

দেবপ্রসাদ মহোত্তম বিদ্বান-বৈষ্ণব। এক কথায় বৈষ্ণবতম।

কে বৈষ্ণবতম?

যাকে দেখা মাত্রই হরিনাম শুধু মনে পড়ে না মুখে আসে সেই বৈষ্ণবতম।

সেই দেবপ্রসাদকে মহোদধি টেনে নিল। স্নান করতে যে নামল আর উঠল না।

ক'দিন আগে থেকেই বলছিল, আমার এখানে থাকতে আর ইচ্ছে হচ্ছে না, কিন্তু কোথায় যে যাই তাও জানা নেই। এমন কেন হচ্ছে তা কে বলবে? নির্বাণ কি একেবারে নিবে যাওয়া, না, নিত্যের ঘরে জ্বলে ওঠা?

রোজকার মত সমুদ্রস্নান করতে এসেছে। তক্ষুনি-তক্ষুনি জলে না নেমে তীরে বসেছে স্থির হয়ে, চোখ বুজে। কেন এই তন্ময়তা তা কে বলবে?

সঙ্গে অশ্বিনী মিত্র ছিল, জিজ্ঞেস করলে, 'স্বামীজি, এভাবে রইলেন যে। স্নান করবেন না?'

'উঠে স্নান করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।' স্বামীজি বললে, 'অন্তরীক্ষে গান শুনছি। অনেক বাজনা বাজছে, যেন থিয়েটারের কনসার্ট বসেছে। যেমন তান লয় তেমনি মূর্ছনা।'

'আপনার বায়ু প্রবল হয়েছে। কাল সারারাত ঘুমোননি।' বললে অশ্বিনী, 'শুধু ভজন করেছেন। এ বিকার তারই ফল। চলুন স্নান করে নিলেই শরীর সুস্থ হবে। কানের মাঝে আর ঝিঁ-ঝিঁ ডাকবে না।'

'না হে, এ বিকার নয়, এ ঝিঁ-ঝিঁর ডাক নয়, এ এক অপার্থিব নৃত্যগীত।' স্বামীজি বললে বিমুগ্ধের মত, 'আরো কিছুক্ষণ শুনতে দাও। বেশি দেরি নেই, নামছি স্নান করতে।'

নামবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রমত্ত জোয়ার এল আর ভাসিয়ে নিয়ে গেল স্বামীজিকে। ভাসিয়ে নিয়ে গেল চক্রতীর্থের দিকে, যে দিকে মহাপ্রভু ভেসেছিলেন। জল থেকে হাত তুলে স্বামীজি দেখাল, কোন এক অদৃশ্য হাত তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। শেষে তিন-তিনবার লাফ দিল ঢেউয়ের উপর, উচ্চারণ করল, জয়গুরু জয়গুরু জয়গুরু।

কুলদানন্দ ভেসেছিল সঙ্গে-সঙ্গে, সেই শুনল সেই গুরুধ্বনি।

কুলদানন্দ ভাসল অন্য পথে, হরিদাসের সমাধির দিকে। দেখল ঢেউয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে তলিয়ে গেল দেবপ্রসাদ।

স্বামীজি আর নেই—আশ্রমে খবর এসে পেঁছুতেই ঠাকুর তিন-তিনবার শব্দ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন, 'ভূতানন্দ স্বামীকে খবর দাও।'

জগন্নাথবল্লভ মঠের প্রাচীন মোহান্ত এই ভূতানন্দ। মহাপ্রভুকে স্বচক্ষে দেখেছেন বলে দাবি করেন। তা হলে তাঁর বয়েস দাঁড়ায় সাড়ে চারশো বছরেরও উপর। এই কল্পনাতীত দীর্ঘ জীবনেও তাঁর ব্রহ্মচর্যের ব্রতভঙ্গ হয়নি, মূর্তিমান অনলের মত তেজস্বী ছিলেন। কিন্তু এমনি নিয়তির পরিহাস, নরহত্যার দায়ে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হলেন। হাইকোর্টের বিচারে শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেলেন বটে কিন্তু মোহান্তের পদ থেকে তাঁর বিচ্যুতি ঘটল। পড়লেন সম্মানহানির গ্লানিমার মধ্যে। গোস্বামী-প্রভু এসে তাঁকে তাঁর প্রাক্তন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। সবাইকে চেনালেন ভূতানন্দ কোন অভূতপূর্ব আনন্দের অধিকারী। বললেন, ওর সঙ্গ করব এই আশাও আমার পুরী আসার এক কারণ।

আর ভূতানন্দও চিনলেন এ কে দিব্যকলেবর! একদিন ঠাকুরের মুখোমুখি বসে স্থিরচক্ষে তাকিয়ে বলতে লাগলেন করজোড়ে : 'শ্রীসূর্য, শ্রীমহাদেব, শ্রীনারায়ণ, সাক্ষাৎ ভগবান।' বলেই বারবার নমস্কার করলেন।

ভূতানন্দ খবর পেয়ে বিধান দিলেন স্বামীজিকে সমাধি দিতে হবে। সন্ন্যাসীর তাতেই সদ্‌গতি।

বললেন, 'দেখলাম শ্রীমন্দিরে দেবপ্রসাদ জগন্নাথকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছে। আপত্তি জানালাম। বললাম, আপনি সন্ন্যাসী, বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গ করবেন কেন? সাষ্টাঙ্গ করে আপনি অপরাধী হয়েছেন। এক কথায় দেবপ্রসাদ পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেল। বললে, আপনারা উচ্চ অধিকারী, আমার তো ঐ অবস্থা হয়নি, কেবল পথে প্রবেশ করেছি মাত্র। আমাকে আপনারা শেখান, কৃপা করুন। ভক্তিমান সন্ন্যাসীর সে কী বিনয়, সে কী সর্বসমর্পণ।

মঙ্গলাঘাটে স্বামীজিকে সমাধিস্থ করা হল।

অশ্বিনী জিগগেস করল, 'স্নানের আগে তীরে বসে স্বামীজি গান

শুনছিলেন বলেছিলেন—সেটা কী?'

ঠাকুর বললেন, 'শাস্ত্রে আছে যোগী সন্ন্যাসীদের প্রয়াণকালে স্বর্গের কিন্নরী অপ্সরী বিদ্যাধরীরা নৃত্যগীত করে আনন্দ-অভ্যর্থনার আয়োজন করে। ওসব গান শুনতে শুনতে যোগী সন্ন্যাসীরা অন্তর্ধান করেন। সন্দেহ কী, দেবপ্রসাদ মহার্হতম পরম পদ লাভ করেছে।'

যারা বানরবধের পান্ডা ছিল তারা স্বামীজির মৃত্যুতে উল্লাস প্রকাশ করল। প্রচার করে বেড়াল, বানর না মারতে দেওয়ার দরুনই দেবপ্রসাদের অপঘাত মৃত্যু হল।

ঠাকুর বললেন, 'পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সমুদ্র যাকে নিজে টেনে নিয়ে যায় তার আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না। তাঁর বাসনা কামনা সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, সেইজন্যে কর্মও আর কিছু ছিল না। তাঁর নির্বাণ মুক্তিলাভ হয়েছে। তিনি ক্ষেত্রবাসী জগন্নাথের নিত্য সহচর হয়ে থাকলেন।'

'এই নির্বাণ অবস্থাই তাঁর অভিপ্রেত ছিল, বৌদ্ধ নির্বাণ।' যোগজীবন বললে।

'মহাপ্রভুকে যেদিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল স্বামীজিকেও সমুদ্র সেই দিকে নিয়েছে, মহাপ্রভু সমাধিস্থ ছিলেন বলে তাঁর মৃত্যু হয়নি।'

'শেষ সময়ে স্বামীজি তিনবার জয়গুরু বলে লাফিয়ে উঠেছিলেন—' বললে কুলদা।

'তাই তো বলছি তিনি পরমগতি লাভ করেছেন।'

স্বামীজি কি-কি জিনিস রেখে গিয়েছেন ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসা হল। একখানি বইয়ের মধ্যে একটুকরো কাগজে একটা গান পাওয়া গেল—স্বামীজির হাতে লেখা। ঠাকুর নিজেই সুর সংযোগ করে গান করতে লাগলেন :

'কে দরদী ভাবের ভাবী, আপনার খেয়ে আমার হবে।
বিশুদ্ধ প্রেম সেই জেনেছে, নির্হেতু যে জন ভাবে।
যে ছেড়েছে সুখের আশা, তার নির্হেতু ভালোবাসা
নিস্পৃহতার নেইক আশা সেই আশাতেই বসে রবে ॥'

আর কী জিনিস আছে?

ছোট একটি পুঁটলির মধ্যে একটি সিঁদুরের কৌটো।

'ওঁর স্ত্রীর বোধহয়।' বললে অশ্বিনী।

ঠাকুর বললেন, 'আহা, বিশুদ্ধ প্রেমের এই লক্ষণ। স্বয়ং মহাদেবও সতীদেহ নিয়ে দেশে-দেশে ফিরেছিলেন। যাক, সব এখন সমুদ্রে ফেলে এস।'

কী ভেবে কে সিঁদুরের কৌটোটি খুলল। ও হরি, কৌটোর মধ্যে তিনখানি চিঠি। আর তিনখানিই ঠাকুরের লেখা।

প্রথম পত্রে ঠাকুর স্বামীজির তপস্যার কুশল প্রার্থনা করেছেন। লিখেছেন, যতদিন অর্থের প্রয়োজন আছে অর্থোপার্জন করবেন। কর্মদ্বারাই কর্ম কেটে

যাবে। আর যেখানেই থাকুন না কেন, প্রাণের যোগে কিছুই দূরে নয়, সমস্ত নিকট।

দ্বিতীয় পত্রে সময়ের পরিপক্কতার বিষয় লিখেছেন। লিখেছেন, সকল বিষয়েই সময় আছে। সময় হলে ঘরে বসেই কাজ হবে। সময় না হলে সহস্র চেষ্টাতেও কিছু হবে না। তবুও চেষ্টা করতে হয়, আর তার নামই কর্মভোগ। কর্মভোগ না করলে শুভ সময় আসে না। সাধনে অগ্রসর হচ্ছেন এটাই প্রকৃত লাভ। যত আত্মহারা হয়ে নির্ভর করবেন ততই উন্নতি।

তৃতীয় পত্রে শুধু নিষ্ঠার কথা। লিখেছেন, নিষ্ঠা করে সাধন করলে নিশ্চয়ই ফললাভ হয়। ধর্ম আর তখন কথার ব্যাপার থাকে না। কোনো বিষয় অনুমান করে নিতে হয় না। সমস্তই প্রত্যক্ষ।

ঠাকুর বললেন, 'মোক্ষের চারটি দ্বার। প্রথম, শম; দ্বিতীয়, বিচার; তৃতীয়, সন্তোষ; চতুর্থ সৎসঙ্গ।

যাই ঘটুক না কেন, তাতে অধীর না হওয়ার নাম শম। সরলতাতেই এ লাভ হয়। সংসারে কোন বস্তু নিত্য আর কোন বস্তু অনিত্য তার তুলনা করাই বিচার। যেদিন যা ঘটে তাতেই খুশি থাকার নাম সন্তোষ। কারু মনে উদ্বেগ না আনা, কারু কাছে কিছু প্রত্যাশা না করা আর ভগবানই পালন-কর্তা এই বিশ্বাসই সন্তোষলাভের উপায়। সন্তোষই মোক্ষের শ্রেষ্ঠ দ্বার, সিংহদ্বার। সৎসঙ্গ অর্থ সাধুলাভ। যাকে দেখলে ভগবানের নামস্ফুরণ হয় সেই প্রকৃত সাধু।'

আবার বললেন, 'বাক্যসংযম করবে। কারু প্রতিবাদ করবে না। সত্যরক্ষা ও বীর্যধারণ করবে। পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি স্থির রাখবে। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করবে। আমার দুটো কথা শুধু ধরে থাকো, তাতেই সমস্ত লাভ হবে। বীর্যধারণ আর সত্যকথা। সত্য বলতে হলেই বাক্যসংযম হয় আর পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি হলেই বীর্য আপনা আপনি স্থির হয়ে আসে।'

স্বামীজির প্রয়াণে সবাই কাতর। যোগজীবন বললে, 'যেই একটা লোক তৈরি হচ্ছে ভগবান তাকে নিয়ে যাচ্ছেন।'

'বৃক্ষে ফল পাকলে পড়ে যাবেই।' বললেন ঠাকুর, 'ডকে' জাহাজ তৈরি হলে আর কি তা থাকে? চলে যায়।'

আশাবতীও যোগীবরকে এই কথা জিগগেস করেছিল : 'সময় হয়নি বা সময় হয়েছে এ কথার তাৎপর্য কি?'

যোগীবর বললেন, 'কৃষকেরা শস্য রোপণ করে শস্য না পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করে। পাখি ডিম প্রসব করে তা দিতে থাকে। সময় না হলে ডিম ফোটায় না। অসময়ে ফোটালে ডিম কেঁচে যায়। তেমনি যার হৃদয়ে ধর্মের জন্যে আকুলতা হয়নি, অহঙ্কার নষ্ট হয়নি, তাকে ধর্মের উপদেশ দিলে তাতে উপকার না হয়ে অপকার হয়।'

ঠাকুর বললেন, 'পৈতে ফেলে দিলাম, তাতে অভিমান গেল না। আরো

দ্বিগুণ বাড়ল। পৈতে ফেলে দিয়েছি তখন সেই অহঙ্কার। বুঝলাম অভিমান সহজে যায় না। কাম ছাড়ব, ক্রোধ ছাড়ব, লোকে সাধু বলবে, এ অভিমান সকলের চেয়ে বড় শত্রু। বিদ্যার অহঙ্কারে বিদ্যার নাশ, পুত্রের অহঙ্কারে পুত্রের নাশ, মানের অহঙ্কারে মানের নাশ। আর ধনের অহঙ্কারে ধনের সর্বনাশ। আবার যে নির্ধন তার ধনীকে ঘৃণা করার অহঙ্কার, আর তাতে তারও সর্বনাশ। বাগানের কর্তা বাগানে এলে মালী যেমন দূরে গিয়ে দাঁড়ায়, তেমনি দীনবন্ধু হৃদয়-বাগানে এলে অহঙ্কার মালী করজোড়ে দূরে গিয়ে অবস্থান করে।'

সেদিন সন্ধ্যের আগে আশ্রমদ্বারে এক ক্ষুধার্ত ভিখিরি এসে উপস্থিত, আর তার কী গগনভেদী কান্না : ম্যয় ভুখা হুঁ, ম্যয় ভুখা হুঁ।

আসনে ধ্যানস্থ ছিলেন প্রভু। কান্না শুনে চমকে উঠলেন, চেঁচিয়ে বললেন, 'কে কোথায় আছ, শিগগির এই ভিক্ষুককে অন্ন দাও।'

কী ব্যাপার, সেবক ভক্তের দল ছুটে এল। দেখল প্রভু কাঁদছেন, বলছেন, 'আজ সমস্ত দিন জগন্নাথদেবের ভোগ হয়নি, তাই তিনি ক্ষুধায় কাতর হয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছেন।'

কই, কোথায় ভিক্ষুক ? তাছাড়া জগন্নাথ তো ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত, তাঁর আবার ভিক্ষে করে বেড়ানো কেন ?

'তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত নন তা কে বলছে, কিন্তু যে সকল ভক্ত কাঙাল একমাত্র মহাপ্রসাদের উপর নির্ভর করে থাকে, তাদের ক্ষুধাই তাঁকে ক্লিষ্ট করছে। দেখ, যাও, খোঁজ নাও গে।'

ভক্তদল মন্দিরে গিয়ে খবর নিয়ে জানল পূজরী পাণ্ডাদের মধ্যে কলহ ঘটেছে, তার ফলে জগন্নাথের ভোগ হয়নি এতক্ষণ। জগন্নাথের নালিশ শুনে গোস্বামী-প্রভু চঞ্চল হয়ে ওঠবার পরেই পাণ্ডাদের ঝগড়া মিটেছে। জগন্নাথের ভোগ হয়েছে, প্রসাদ পেয়ে তৃপ্ত হয়েছে কাঙালিরা। আর সেই আর্তনাদী ভিক্ষুকও অন্তর্হিত।

ভক্ত সতীশ মুখুজ্জেও এখানে দেহ রাখল।

বাড়ি ঢাকা বিক্রমপুরের বাঘড়া গ্রামে, ময়মনসিংহের জামালপুর হাই স্কুলের প্রধান সহকারী শিক্ষক। ঠাকুর যখন ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন, দীক্ষা নিয়েছিল তাঁর কাছে। যখন শুনল ঠাকুর পুরী যাচ্ছেন, ইস্কুল থেকে বেরিয়ে সটান পায়ে হেঁটে চলে এল ময়মনসিং। পরনে কোট-পেণ্টালুন, মানে স্কুলের পোশাক, ময়মনসিংহের সকলে তো অবাক। এ কী পাগলের মত অবস্থা! হ্যাঁ, তাই, পাগল হতে আর বাকি নেই। কেন, কী হয়েছে? ঠাকুর পুরী চলেছেন। তা যান না যেখানে খুশি, তাতে তোমার কী। আমিও পুরী যাব। কলকাতার টিকিট কেটেছি। এই পোশাকে? পোশাক দেখো না, প্রাণটাকে দেখ। স্কুলের চাকরি? ঠাকুর জানেন।

কলকাতায় এসে ঠাকুরের সঙ্গ ধরল। চলে এল পুরুষোত্তম।

সবাই পাগল বলে ডাকে।

জগন্নাথকে নারকেল-জল দান করেছে কিন্তু নারকেলটা সে খাবে। সে কি, জগন্নাথকে দান করবার পর খাওয়া চলবে না। কে বললে? আমি তো জগন্নাথকে জল দিয়েছি, শাঁস দিইনি। জগন্নাথ তাতে ভাগ চান কোন হিসেবে?

'সতীশ, কেমন আছ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'গুরু যদি কৃপণ হন তবে আর আনন্দ কোথায়?'

ঠাকুর হাসলেন। এই হাসিটুকুই চেয়েছিল সতীশ। এই হাসিটুকুতেই সমস্ত দিন আলোকিত রইল। সারাদিনই সতীশের আনন্দে কাটল।

মহাপ্রসাদে তার কী নিদারুণ শ্রদ্ধা! বাসি হয়ে পোকা পড়ে পচে গেলেও তার কাছে তার সমান আদর। পোকা বেছেই খেতে লাগল তৃপ্ত মুখে, প্রতি গ্রাসে প্রণাম করে। বললে, 'মহাপ্রসাদে মন বড় প্রসন্ন হয়।'

ঠাকুর বললেন, 'সতীশকে মহাপ্রসাদ কৃপা করেছেন।'

সামান্য দুদিনের জ্বরে সতীশ দেহ ছাড়ল।

সকলের এত প্রিয়, অথচ সতীশের মৃত্যুতে কারু শোক উপস্থিত হল না। মালিন্যের এতটুকু ছায়া নেই কোথাও। সবাই বিমূঢ়, পরস্পর বলাবলি করছে, আমাদের কান্না পাচ্ছে না কেন? আমাদের সতীশ নেই, অথচ কান্না কী, তা আমরা ভুলে গেছি।

ঠাকুর বললেন, 'শাস্ত্রে আছে মৃত্যুর পর যার আত্মা সদ্গতি লাভ করে তার জন্যে কারু শোক হয় না।'

যখন সতীশের দেহ মন্ত্রপূত করে হোমাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হল চিতাধূম থেকে সুগন্ধ উঠল। সবাই মোহিত হয়ে গেল। সাধারণ জ্বালানি কাঠের ধোঁয়ায় চন্দনের গন্ধ।

ঠাকুর বললেন, 'যাদের দেহ ভগবান স্পর্শ করেন তাদের দাহকালে দেহ থেকে অমনি দিব্যগন্ধ নির্গত হয়। কৃষ্ণ পুতনার দেহ স্পর্শ করেছিলেন, তাই তার দাহকালে 'চতুঃসনের' গন্ধ বেরিয়েছিল। সতীশ অপ্রাকৃত ভাগবতী তনু লাভ করেছে। বৃন্দাবনে রাসস্থলীতে তার পাকা বাসস্থান হল।'

ঠাকুরের জন্যে রেকাবে করে মহাপ্রসাদ নিয়ে যাচ্ছে, একটা লাড্ডু আর একখানা খাজা। লাড্ডুর মনে লাড্ডু রইল, খাজাখানা শূন্যে ছিটকে গিয়ে দুতিন হাত দূরে গিয়ে পড়ল।

এ কী ভৌতিক কাণ্ড! গোল লাড্ডু এতটুকু নড়ল না আর চ্যাপ্টা খাজা উড়ে গেল শূন্যে!

'না, এ কারু অসাবধানতার জন্যে নয়, সতীশ শূন্য থেকে খাজায় থাবা মেরেছে।' বললেন ঠাকুর, 'ওর যে মহাপ্রসাদের জন্যে দারুণ বুভুক্ষা। এ মহাপ্রসাদের জন্যে শুধু সতীশ কেন, কত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব লালায়িত। শোনো, কাল সমুদ্রে গিয়ে ঐ খাজাখানা সতীশকে স্মরণ করে উৎসর্গ করে দিও।'

সতীশই সার্থক সন্ন্যাসী, সার্থক সংসারত্যাগী। ঠাকুর বললেন, 'বাড়ি ঘর টাকাকড়ি বিষয়সম্পত্তি এ সকলকে সংসার বলে না। এ সকল ত্যাগ করলেই সন্ন্যাসী হয় না। দেহাত্মবুদ্ধিই সংসার। দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট না হলে সমস্ত বিড়ম্বনা। যতদিন মানুষের যথার্থ বৈরাগ্য না জন্মে ততদিনই কর্ম থেকে যায়। ভগবানকে লক্ষ্য রেখে কর্ম করে গেলে অচিরে সেই কর্মের অবসান হয়। সতীশের দেহাত্মবুদ্ধি ছিল না, সেই প্রকৃত বৈরাগী।'

অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে উৎসব করলেন ঠাকুর। মঠের বাবাজিরা এসে যোগ দিল। ঠাকুর উদ্দণ্ড নৃত্য করলেন। হঠাৎ কোত্থেকে এক রুদ্রাক্ষধারী সন্ন্যাসী এসে ঠাকুরকে প্রণাম করে ঠাকুরের কোমর ধরে নাচতে লাগল। ঠাকুর যেন তার কতকালের অন্তরঙ্গ এমনি ভাবের সৃষ্টি করে সহসা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

'কে ইনি?' জিগগেস করল সরলনাথ : 'হাতে আবার ডমরু দেখলাম না?'

'হ্যাঁ,' ঠাকুর বললেন, 'ইনি ভুবনেশ্বরের মহাদেব। কী খেয়াল, ঐ বেশে এসেছিলেন।'

সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখলেন ঠাকুর। বাসায় ফিরছেন একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের কালো ছেলে ঠাকুরের কাছে ধুতি-চাদর চেয়ে বসল।

ঠাকুর বললেন, 'আমার সঙ্গে বাসায় চলো দেখি কী করতে পারি।'

রাত হয়ে আসছে, এখন আবার কী ঝামেলা, যোগজীবন ছেলেটিকে বাধা দিল। বললে, 'কাল এস।'

'কাল?' ছেলেটি ক্ষুণ্ণ হল।

'হ্যাঁ, কাল সকালে এস। রাত্রে সুবিধে হবে না। বাড়ি ফিরে যেতে তোমার কষ্ট হবে।'

ছেলেটি চলে গেল।

আশ্রমের দরজায় এসে ঠাকুর থমকে দাঁড়ালেন। সেই ছেলেটি কই?

'তাকে কাল আসতে বলে দিয়েছি।'

'সে কী, আমি তাকে আসতে বললাম আর তোমরা তাকে তাড়িয়ে দিলে?' ঠাকুর দৃঢ়স্বরে বললেন, 'যতক্ষণ ছেলেটিকে না আনবে ততক্ষণ আমি এখান থেকে নড়ব না।'

তখন সকলে ব্যস্ত হয়ে ছেলেটিকে খুঁজতে লাগল। ওরে দেখা দিয়ে আবার কোথায় পালালি? তোকে না পেলে যে ঠাকুর নড়বেন না, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবেন।

একটা চালার মধ্যে বেড়ার আড়ালে ছেলেটা লুকিয়ে আছে। ধর ধর। তাকে পাকড়াও করল সরলনাথ। একেবারে হাতে ধরে টেনে আশ্রমে নিয়ে এল।

ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। ঠাকুর বালকের পা টিপে দিতে লাগলেন।

ধুতি আর চাদর দেওয়া হল। বালক উঠে দাঁড়িয়ে খুব তেজের সঙ্গে বললে, 'তোমাদের খুব পুণ্য হল।' বলে চলে গেল নিজের পথে।

বালকের মধ্যে ঠাকুর কী দেখলেন?

'দেখলাম বালকের মধ্যে জগন্নাথের মূর্তি। তোমরা যখন তাকে তাড়িয়ে দিলে দেখলাম মণিকোঠায় জগন্নাথ রুদ্র মূর্তি ধরেছেন। বজ্রমুষ্টি তুলে আমাকে প্রহার করতে উদ্যত হয়েছেন। ছেলেটিকে খুঁজে পেলে, নিয়ে এলে আমার কাছে, দেখলাম জগন্নাথের মুষ্টি শিথিল হয়েছে, ভঙ্গিতে এসেছে কোমলতা। আর এখন ধুতি-চাদর দেবার পর তিনি প্রসন্নমুখে কী সুমধুর হাসছেন!'

যেখানে সঙ্কোচ সেখানে ভগবান বাস করেন না, তিনি বৈকুণ্ঠে বাস করেন। বৈকুণ্ঠ মানে কী? মানে যেখানে কুণ্ঠা নেই, শুধু স্বচ্ছতা আর সরলতা। সম্মানের লোভত্যাগই প্রধান ত্যাগ। স্ত্রী-পুরুষ সকলের পদধূলি গ্রহণ করো, বিশ্বাস করো দেহের মধ্যেই সমস্ত আছে। পদধূলি নেওয়ার উদ্দেশ্য বিনয় দেখানো নয়, শরীরে অপূর্ব শক্তি সঞ্চারের জন্যে। পদধূলির অদ্ভুত মাহাত্ম্য।

আর দীনতা ভিতরের বস্তু। একবার হৃদয়ে এলে মন আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। ঠাকুর বললেন, 'একবার একটি মুসলমান মুটের পা ধরে সাষ্টাঙ্গ করেছিলাম, সে বাপ বাপ বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল, বললে, যিনি রাম তিনিই রহিম, তিনিই কৃষ্ণ।'

বারে বারে চেষ্টা করে অকৃতকার্য হলে ভগবানের উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে বসে বসে তাঁর নাম করো। নিজের কোনো ক্ষমতা নেই তা তো বুঝলে। তাঁর উপর নির্ভর না করে আর উপায় কী। মন খোলসা করে ফেলে, নিজের দুরবস্থা পরিষ্কার বুঝে সরলভাবে একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে যদি বলতে পারো, আমি আর পারলাম না, আমাকে রক্ষা করো, তিনি ঠিক রক্ষা করবেন। ভগবৎকৃপার জন্যেও ব্যাকুলতার প্রয়োজন। ভগবান যেমন সতীকে রক্ষা করেন তেমনি কুলটাকেও পালন করেন। বেশ্যা উপবাসী থাকলে তাকে উপপতি এনে দেন। ভগবানের মত বন্ধু আর কে আছে? একমাত্র ভগবানের কাছেই সরল হওয়া যায়। কোনো প্রকার সাধন ভজন না করে শুধু সরলতার প্রভাবেই মানুষ মুক্ত হতে পারে। সরল হৃদয়ই সর্বদা—সর্বক্ষণ সত্যবাদী। কপট হৃদয় সর্বদা অসত্য চর্বণ করে, অসত্য রোমন্থন করে। একমাত্র বন্ধুহীনতায়ই তার এই দুর্গতি।

করতালের ধ্বনির সঙ্গে সুর মিলিয়ে ঠাকুর বলছেন : 'বদরিকাধামবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার। রামেশ্বরধামবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার। দ্বারকাধামবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার। শ্রীবৃন্দাবনধাম-বাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার। ইহকালবাসী নরকবাসী পাপী পুণ্যাত্মা সকলের চরণে নমস্কার। পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম সকলের চরণে

নমস্কার।'

যে এই স্তুতিপাঠ শুনছে সেই দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে।

॥ ৪০ ॥

বিজয়কৃষ্ণ নামের অর্থ কী? ঠাকুর নিজেই বললেন, 'আমার নামের অর্থ ঘুরে বেড়ানো।'

কৃষ্ণের বিজয়। তার মানে কৃষ্ণের ঘুরে বেড়ানো।

ঠাকুর বললেন, 'এক ত্রিভঙ্গ আমার মধ্যে প্রবেশ করে আমাকে ত্রিভুবন ঘোরাচ্ছেন। বার হতে চেষ্টা করছেন, পারছেন না। এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে ঠেকে যাচ্ছেন, এ'কে-বে'কে যাচ্ছেন—'

'আচ্ছা, যারা সাধন-ভজন করে, সত্যপথে চলে, ধার্মিক ও সদাশয়, সংসারে তাদেরই যত কষ্ট। আর যারা পাপ করে জাল-জোচ্চুরি করে, অন্যের সর্বনাশ করে, ধর্মের পাশ দিয়েও হাঁটেনা, তারা দিব্যি সুখে থাকে। এ কেন?' একজন জিগগেস করল ঠাকুরকে।

'এখন রাজা যে কলি। তাই ধর্ম করলে পুরস্কার নেই।' বললেন ঠাকুর, 'ধর্ম করলে যে রাজাকে অমান্য করলে, তাই শাস্তি অনিবার্য। বরং অধর্ম করো, রাজ-আজ্ঞা পালন করেছ বলে পুরস্কৃত হবে। কিন্তু তাই বলে মনে কোরো না, ভগবানের রাজ্য উঠে গিয়েছে। পাপের ভরা বোঝাই হলে ভগবান প্রথমত সাবধান করে দেবেন। তাতেও যদি পাপাচারীরা নিবৃত্ত না হয় ভগবান নানাপ্রকার শাস্তি পাঠাবেন—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, নানাবিচিত্র দুর্ঘটনা। কলির প্রজারা বিনষ্ট হবে। যারা দু পাতা ইংরিজি পড়েছে তারা হাসবে, এ আশ্চর্য নয়, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যাপকেরাও শাস্ত্রবাক্যে উপহাস করবে।'

আরো বললেন, 'এ দেশে আগে কখনো বড় দুর্ভিক্ষ হয়নি, এখন হবে, সহজেই হবে। এক রকম খাদ্য অভ্যস্ত হলেই দ্রুত দুর্ভিক্ষ হয়। তা কলিতে হবে, কারণ মানুষের পাপে অন্যান্য খাদ্য হ্রাস পাবে। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কমে যাবে, গরুও আগের মত পর্যাপ্ত দুধ দেবে না। কৃষকেরা কৃষিকার্য ছেড়ে কলকারখানায় কাজ নেবে, কৃষি রসাতলে যাবে। দুর্ভিক্ষ না হয়ে গত্যন্তর কী! দুর্ভিক্ষের চেহারা ঠিক পিশাচের মত—দেখলে মনে হয় যেন ভূত প্রেত পিশাচে দেশ ছেয়ে গেছে—শুধু কঙ্কালের মিছিল—'

'কলিতে তবে উপায় কী?' এক ভক্ত জিগগেস করল আকুল হয়ে।

'উপায় হরিনাম। কাতর হয়ে ভগবানকে ডাকা। কলিতে নামজপই একমাত্র উপায়—সমস্ত শাস্ত্রেরই এই একবাক্য। একমাত্র নামেই পাপ যাবে সংশয় যাবে, আসবে প্রেম ভক্তি পবিত্রতা। আসবে বিশ্বাস। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম-

সাধনই যথার্থ সাধন।'

এমার মঠে দু হাজার ব্রাহ্মণকে বস্ত্র দেওয়া হল। তাছাড়া জগন্নাথদাস বাবাজির আশ্রমে চার-পাঁচ হাজার সাধু আসছে। বাবাজির ইচ্ছে সাধুসেবায় ঠাকুর পাঁচ-সাত হাজার টাকা দেন। কোত্থেকে দেবেন? ঠাকুরের যে আকাশ-বৃত্তি—ভাণ্ডার শূন্য। কী করে কী হবে! কিন্তু হতেই হবে। ঠাকুর বললেন, 'আমার এক কানাকড়ির ক্ষমতা নাই থাক, কিন্তু এ জগন্নাথদেবের আদেশ। সাধুসেবা অসম্পূর্ণ থাকবে না।'

পঞ্চায়েত মাধব সোয়ারকে ডাকা হল। ঠাকুর বললেন, 'চার-পাঁচ হাজার সাধুভোজন করাতে হবে। মহাপ্রসাদ, মালপো, ডাল, তরকারি, কানিকা—সব দিতে হবে। ত্রুটি করলে চলবে না। প্রায় তিন হাজার টাকার মত খরচ। তুমি আমার মুখ রাখবে এই তোমাকে অনুরোধ।'

জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, উচ্চারণ করতে লাগলেন ঠাকুর। যদিও মাধবের কাছে আগের দরুন দেড় হাজার টাকার ধার, মাধব রাজি হয়ে গেল।

শুধু তো ভোজন নয়, সাধুদের বস্ত্র দিতে হবে, ঘটি দিতে হবে। ঘটিওয়ালা চার-পাঁচ শো ঘটি দিতে রাজি হয়েছে, কিন্তু কাপড়ওয়ালা দোকানে সাত হাজার টাকারও বেশি বাকি। আর বাকি ফেলা অসম্ভব, দোকান ফেল পড়বে।

কাপড়ওয়ালারা দু ভাই, হরি আর দীনবন্ধু। হরির ইচ্ছে নয় ধার দেয়। কিন্তু দীনবন্ধুর বিশ্বাস গোঁসাইয়ের টাকা মারা যাবে না।

'কোত্থেকে দেবে? ওর কি জমিদারি আছে?' হরি রুখে ওঠে।

'গোঁসাইকে দেখে আমার মনে হয় মহাপুরুষ।' দীনবন্ধু বলে গাঢ়স্বরে, 'তাঁর ধার বলে কিছু থাকতে পারে না।'

দুই ভাইয়ে ঝগড়া হয়ে হরি দোকান ছেড়ে দেশে চলে গেল। দীনবন্ধু বললে, 'যদি কিছু অন্তত দিতে পারতেন!'

ন্যায্য কথা। ঠাকুর বললেন সরলনাথকে, ঢাকায় জায়গায়-জায়গায় টেলি-গ্রাম করে দাও। যে যা পারে পাঠাক।

ঘটিওয়ালাও বেঁকে বসল : 'আমারও অগ্রিম কিছু দরকার।'

কিন্তু মাধব সোয়ার নির্বিচল। একবার রাজি হয়েছি তো হয়েছি, আর পেছপা হব না। যদি আমার কোঠাবাড়ি বিক্রিও করতে হয়, সাধুসেবায় ঠিক প্রসাদ জোগাব।

জগন্নাথ বাবাজিও কম যায় না। নতুন ভাবে চাপ দিতে চাইল। চার সম্প্রদায়ের সাধু আসছে, তাদের উট আর ঘোড়াই চার শো হবে, তাদের খোরাকি বাবদ টাকা চাই, গাঁজা-আফিঙেও খরচ কম পড়বে না। তার পর সাধুদের মর্যাদা করতে হবে, ভেট দিতে হবে নিশানের। মোটমাট আরো দু হাজার টাকা দরকার।

ঠাকুর আদেশ করলেন : 'কলকাতায়ও টাকা চেয়ে টেলিগ্রাম করো।'

যোগজীবন কুন্ঠিত হয়ে বললে, 'টাকা চাওয়া নিয়ে নানাজনে নানা কটাক্ষ করবে।'

'করুক। তাতে আমার মান-অপমান কী।' ঠাকুর স্নিগ্ধ গম্ভীর কন্ঠে বললেন, 'এ জগন্নাথ দেবের আদেশমত কাজ করছি। যারা বিশ্বাস করবে না, দেবেনা। কিন্তু পৃথিবীতে এমন একজন থাকতে পারে যে বিশ্বাস করবে।'

আগামী কাল 'পঙ্গত' বা সাধুসেবা, কিন্তু এ পর্যন্ত হাতে এসেছে মোটে একশো টাকা।

উপায় নেই, ঐ একশো টাকাই বাবাজিকে দিয়ে এস।

একশো টাকা দেখে বাবাজি খেপে গেল : 'শুধু গাঁজাতেই তো তিন-চারশো টাকা লেগে যাবে। নেমন্তন্ন করে এনে সাধুদের অমর্যাদা করবার হেতু কী? অন্তত এক হাজার টাকা দিন।'

ঠাকুর বলে পাঠালেন : 'শুধু এই একশো টাকাই হাতে এসেছে, হাজার টাকা দেব কোত্থেকে? ভগবান যা জুটিয়েছেন তাই দিয়েই নির্বাহ করা হোক।'

'তবে পঙ্গত বন্ধ করে দি।' বাবাজি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

ঠাকুর চুপ করে রইলেন।

সাধুদের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল এখনো তাদের নিমন্ত্রণ হয়নি। কার নিমন্ত্রণ? গোঁসাইয়ের? গোঁসাইয়ের নেমন্তন্নে আমরা অমনি যাব। মর্যাদা লাগবে না। বলে কিনা তিন-চারশো টাকার গাঁজা! বাবাজির মতলব কী। কোঠাবাড়ি তৈরি করবে বোধহয়।

যথাদিনে 'পঙ্গত' বসল। আসতে লাগল ধুতি, আসতে লাগল ঘটি। যত চাও তত নাও, তারপর বিলোও সাধুদের। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব মিলে সাধুদের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। প্রত্যেকে একখানা করে ধুতি আর একটা করে ঘটি পেল। কেউ কেউ ছল করে দু-তিনবার করে নিল। আর মাধব সোয়ার এমন ভোজ বসাল বিরাটত্বে যা দ্বিতীয়রহিত। এমনটি কেউ কখনো দেখেনি, শোনেনি।

পুরুষোত্তমের ইচ্ছা পুরুষোত্তমই পূরণ করেছেন।

প্রসাদ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এক মুটে এক ভাঁড় কানিকা বা মিষ্টি পোলাও চুরি করলে। চুরি করে পার পাবে কোথায়, ঠাকুর ঠিক শুনতে পেলেন। লোকটাকে ঠাকুরের কাছে ধরে নিয়ে এস তো। প্রসাদ চুরি করে! পুলিশে দিয়ে দেওয়া উচিত।

ঠাকুর অন্তত তীব্র ভর্ৎসনাও তো করতে পারতেন।

কী করলেন ঠাকুর?

বললেন, 'আহা, প্রসাদ তো বিতরণ করবার জন্যেই আনা হয়েছে। তুমিও তো এ প্রসাদ খাবার জন্যেই নিয়েছ। কিন্তু এক ভাঁড়ে কী হবে? আরো

চার ভাঁড় নাও, নইলে ঘরে গিয়ে দশজনে মিলে আনন্দ করে খাবে কী করে? দাও ওকে আরো চার ভাঁড় দিয়ে দাও।'

ঠাকুরের এ ব্যবস্থায় সকলে হতবাক হয়ে গেল। পরে বুঝল ঠাকুরের করুণার তাৎপর্য। দোষের মধ্যেও গুণদর্শন।

চুরি দোষ, কিন্তু নিচ্ছে তো পরিজনকে খাওয়াবার জন্যে।

পরনিন্দা কাকে বলে? একজনের দোষ উচ্চারণ করাই পরনিন্দা নয়। বাপ ছেলের দোষের কথা বলে, সংশোধনের জন্যে—সেটা পরনিন্দা নয়। যখন লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার উদ্দেশ্যে অন্যের কাছে কারুর সম্পর্কে দুর্বাক্য বলা হয় তখনই তা পরনিন্দা। পরনিন্দা মহাপাপ। হত্যা করার চেয়েও গুরুতর পাপ। হত্যায় মৃত্যু শুধু একবার কিন্তু যতবার পরনিন্দা ততবার নিন্দিতের মৃত্যুযন্ত্রণা। পরনিন্দুকের মত কুসঙ্গী আর হতে নেই। পরনিন্দুকের হৃদয় এত অন্ধকার যে ভগবানও সেখানে তিষ্ঠোতে পারেন না। তাই যেখানে পরনিন্দা হয় সেখানে থাকতে নেই। অন্যান্য পাপীর সহজে মুক্তি আছে কিন্তু পরনিন্দুকের নেই।

আরো শোনো। যার নিন্দা করা যায় তার পাপ নিন্দুকে সংক্রামিত হয়। নিন্দিতের মুক্তি হয় কিন্তু নিন্দুকের নয়।

এক রাজা কুষ্ঠাক্রান্ত হয়ে বনে গেল। বনে না গিয়ে তার উপায় ছিলনা, ভয়ে ও ঘৃণায় কেউ তার কাছে আসে না, সেবা করে না, রাজা বলেও তার কোনো মান নেই আদর নেই, সবাই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। আর এ ব্যাধি তো শিবেরও অসাধ্য। সুতরাং আত্মধিক্কারে পরিপূর্ণ রাজা বনে গেল আত্মহত্যা করতে। বনে গিয়ে এক সাধুর দেখা পেল। সাধু বললে, আমি ছ মাসের মধ্যে তোমার ব্যাধি সারিয়ে দেব, যদি অবিচারে আমার কথা শোনো। কী এমন কথা, রাজা স্তম্ভিত হয়ে রইল। এমন কিছু দুঃসাধ্য নয়, আশ্বাস দিল সাধু। তোমার এক সুন্দরী যুবতী বিধবা মেয়ে আছে না? সেও পরিত্যক্ত, তাকে নিয়ে এস। একটি কুটির নির্মাণ করে তোমরা পিতা-পুত্রী থাকো আর মেয়েকে বলো তোমার অবিচ্ছিন্ন সেবা করতে। আমি জানি পিতৃসেবা করতে তোমার মেয়ে কুন্ঠিত হবে না।

তাই হল। বাপ কুটির বাঁধল আর মেয়ে লাগল তার পরিচর্যায়। ব্যস, আর কথা নেই। দিকে-দিকে রাজার নামে নিন্দা প্রচারিত হতে লাগল, কানে শোনা যায় না জঘন্যতম নিন্দা। কানে শোনা যায় না অথচ মুখে বেশ বলা যায়, নিন্দা ক্রমেই বিস্তৃততর বিপুলতর হতে লাগল। আর কথা নেই, ক্রমে-ক্রমে আরোগ্য হতে লাগল রাজার। ছ মাসের মধ্যে ব্যাধির একেবারে মূলোচ্ছেদ। সমস্ত শরীর স্নিগ্ধ মসৃণ পরিচ্ছন্ন। ক্ষত নেই স্ফীতি নেই, নেই কর্কশতা।

কী করে ঘটল এই অঘটন? রাজা সাধুর পায়ে গিয়ে পড়ল। ওষুধ-বিষুধ দিলেন না, একটা ফুল-পাতা পর্যন্ত না, কী করে ব্যাধির মোচন হল?

সাধু বললে, 'নিন্দা দ্বারা নিন্দুকেরা তোমার পাপ গ্রহণ করেছে। যে পাপে তোমার ব্যাধি, নিন্দুকেরা তা গ্রহণ করাতে তুমি ব্যাধিমুক্ত হয়েছ।'

এত দিয়ে-থুয়েও প্রায় দু হাজার বস্ত্র ও একশো ঘটি উদ্বৃত্ত হল। ঠাকুর সে সমস্ত বড় আখড়ার মোহন্তকে সঁপে দিলেন, বললেন, আপনার ইচ্ছেমত দান করবেন।

কিন্তু বাজার-ধার শোধ হবে কী করে? বাজার-ধারের পরিমাণ প্রায় কুড়ি হাজার টাকা।

'এত ধার গোঁসাই শোধ করবে কী করে?' হাটে-বাজারে সবাই বলাবলি করতে লাগল : 'কোনো উপায়ই তো দেখি না। শেষে একদিন অন্ধকারে গা-ঢাকা দেবে।'

দেখ না কী হয়! এক ধার করে আরেক ধারের নিরাকরণ। শেষে উত্তাল দানসাগরে সমস্ত ধারক্ষয়।

জগন্নাথই তাঁর ঠুঁটো হাত অবাধে প্রসারিত করে দেন। যাঁর ধন তাঁরই ঋণ। যাঁর হরণ তাঁরই আবার পরিপূরণ।

কুঞ্জলাল নাগ টাকা পাঠাল। পাঠাল উমাচরণ। পাঠাল সতীশ মুখুজ্জে। আরো কত শিষ্য-ভক্ত।

কুঞ্জলাল নিজেই ঋণগ্রস্ত তবু প্রভুর জন্যে আরো ঋণ করতে পরাঙমুখ হলনা। যিনি নেবেন তিনিই আবার দেবেন অঢেল করে। উমাচরণ লিখল, আমি দীনহীন, তবু ঠাকুরকে আমার অর্থ দিয়ে সাধুসেবা করবেন এই আমার পরম সৌভাগ্য। আর সতীশ মুখুজ্জে, বিখ্যাত 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক, ঠাকুরের জন্যে তার বইয়ের কপিরাইট বেচে দিল।

এ তো শুধু দানসাগর নয়, প্রাণসাগর। শুধু সম্ভ্রান্তের দলই নয়, অখ্যাত সাধারণ লোকও নিয়ে এল সাধ্যমত। ভূতনাথ গোয়ালা, গোষ্ঠ কেরানি, বেকার জ্ঞানেন্দ্র হাজরা।

ঠাকুর বললেন, 'ভগবান যে খেলা খেলছেন বসে-বসে তাই নিরীক্ষণ করো।'

যোগজীবন মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠে, কিন্তু ঠাকুরের নির্মল নিশ্চিন্ততা। শুধু বলেন, 'ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হবে। ব্যস্ত হও কেন?'

ঠাকুরের এই প্রশান্তি দেখে সকলে আশ্বস্ত হয়। প্রাণ শীতল হয়ে যায়। কারু অবিশ্বাস করতে সাহস হয় না।

দেখতে-দেখতে সব ধার শোধ হয়ে গেল। তখন আবার কেউ-কেউ শোক করতে লাগল, আমার কাছে ঠাকুর কিছু চাইলেন না কেন? আমার কেন দানে সুমতি হলনা? পরসেবায়, নরসেবায়, নারায়ণসেবায় লাগল না, আমার বিষয়সম্পত্তি দিয়ে কী হবে?

সবাই দেখল, সদগুরুর বাক্য জগদগুরুর বাক্য কখনো অন্যথা হয় না।

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগবিভাগে।

বিকশিত যদি পদ্মঃ পর্বতানাং শিখাগ্রে ॥
প্রচলিত যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ।
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ ॥

পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হতে পারে, পর্বতশৃঙ্গে ফুটতে পারে পদ্মফুল, মেরু স্খলিত হতে পারে, আগুন হতে পারে সুশীতল, কিন্তু সজ্জন বা ভগবজ্জনের বাক্যের ব্যতিক্রম হয় না।

এমন দয়ালু আর নেই, এমন দাতা আর হবে না, সাক্ষাৎ মহাদেবের মত এমন শোভন মূর্তি আর দেখিনি, সকলের মুখে এখন শুধু এই কথা। ঠাকুর শুধু সুন্দর নন, সবাই বলছে, ঠাকুর ভুবন-সুন্দর।

মাধোদাস বাবাজির শিষ্য নারায়ণ দাস বাবাজি এসেছে। ঠাকুর সম্পর্কে বলছে, উনি ভগবানের স্বরূপ। তোমাদের সকলকে উনি পরিত্রাণ করবেন। উনিই পারায়ণ-পরায়ণ। ওঁকে নমস্কার করো সকলে।

এক শিষ্য ঠাকুরের আসনের সামনে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করল। ঠাকুর চমকে উঠলেন। বললেন, 'এ কি? সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়লেই নমস্কার হল? শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে না করলে নমস্কার কোরো না, ওতে ক্ষতি হয়। নমস্কার যদি ভাবের সঙ্গে করো, তাহলে যে করে ও যাকে করে দুয়েরই উপকার। ভাব-ভক্তি না থাকলে দুয়েরই অনিষ্ট।'

ঠাকুর মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্যকীর্তনে পঞ্চমুখ—মহাপ্রসাদ ছাড়া আর কিছু তিনি খান না, কেউ মহাপ্রসাদ এনে দিলেও তা প্রত্যাখ্যান করেন না। বলেন, 'যেমন নাম ও নামী, ভক্ত ও ভগবান একই বস্তু তেমনি জগন্নাথদেব আর মহাপ্রসাদও অভেদ। জগন্নাথদর্শনে যে ফল মহাপ্রসাদভোজনেও তাই।'

'তবে মহাপ্রসাদ খাওয়ামাত্রই ফল পাওয়া যায় না কেন?' একজন সন্দিগ্ধ সুরে জিগগেস করলে।

'ভোক্তার শরীর-মন যে অশুদ্ধ থাকে।' বললেন ঠাকুর, 'বিমল দর্পণে কি ছায়া পড়ে? তবে দীর্ঘকাল মহাপ্রসাদ পেয়ে-পেয়ে শরীর-মন শুদ্ধ হয়ে উঠলেই পরম ফল লাভ হয়।'

এই যে মহাপ্রসাদ এনেছি—বলে এক বাবাজি একটা বিষ-মেশানো লাড্ডু ঠাকুরের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

ঠাকুর বুঝতে পারলেন এ বিষ, বিষম ষড়যন্ত্রের ফল, কিন্তু বলেছে মহাপ্রসাদ, মহাপ্রসাদ বলে তাকে নিবেদন করেছে—ঠাকুর লাড্ডু প্রত্যাখ্যান করলেন না, প্রাপ্তিমাত্র প্রণাম করে মুখে ফেললেন। প্রহ্লাদকেও তো বিষ খাইয়েছিল, তার তো মৃত্যু হয়নি। দেখি আমার কী হয়!

মঠের মোহন্তদের রুজি মারা যাচ্ছে, দেশের যত গণ্যমান্য সবাই ঠাকুরের পদচ্ছায়ায় এসে বসছে, মোহন্তদের মানসম্ভ্রম ধূলিসাৎ হবার জোগাড়, বিজয়কৃষ্ণকে বধ না করতে পারলে তাদের শান্তি কই?

আত্মশক্তি অসার হতেও অসার। একমাত্র ভগবৎশক্তিই বস্তু। বলছেন ঠাকুর, মানুষ যখন বোঝে তার নিজের কোনোই ক্ষমতা নেই, সামান্য একটা ঘাসও সে নিজের শক্তিতে তুলতে পারে না তখনি তার হৃদয়ে ভক্তি বিকশিত হতে শুরু করে।

'বুঝলে, অহঙ্কারটি নষ্ট হলেই শীত-গ্রীষ্ম মান-অপমান স্তুতি-নিন্দা কিছুরই আর বোধ থাকে না। মানুষ যখন ভগবানে যুক্ত হয়ে যায়, যখন তার আমিত্ব বলে কিছু থাকে না, তখন সুখ-দুঃখ ধন-দারিদ্র্য সমস্তই ভগবান গ্রহণ করেন। ভগবানের কৃপায় ভক্তের সে সব কিছুই ভোগ করতে হয় না।' বললেন ঠাকুর, 'এই নিয়মেই প্রহ্লাদ অগ্নি জল হস্তী বিষ সব কিছু দুর্নিমিত্ত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। প্রকৃতির মধ্যে একটা সাধারণ নিয়ম আছে, যদি একজন আরেকজনকে ভালোবাসে তবে একের কষ্ট হলে আরেক-জন তা ভোগ করে। একের দেহে বেত মারলে অন্যের দেহে তার চিহ্ন পড়ে। তেমনি ভক্তের কষ্ট ভগবান টেনে নেন।'

লাড্ডু খেয়ে ঠাকুর অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। সঙ্গে প্রচণ্ড জ্বর।

কেন, কী করে হঠাৎ এমন ব্যাধি এসে পড়ল কেউ কিছু হদিস খুঁজে পেল না। ভক্ত-শিষ্যের দল দিশেহারা হয়ে পড়ল। ডাক্তার ডাকো। কীর্তন লাগাও।

একটা পেরেক-ঠোকা আমগাছের কাতরোক্তি শুনেছিলেন ঠাকুর, তিনি এখন শুনবেন না যন্ত্রণাবিদ্ধ ভক্ত-শিষ্যদের আর্তনাদ?

একদিন ঢাকায় প্রত্যুষে আসন থেকে ওঠবার আগে ঠাকুর বললেন, 'আহা, আমগাছটি খুব ক্লেশ পাচ্ছে। আমাকে বললে, আমার বুকে পেরেক মেরে রেখেছে, যন্ত্রণায় সারা রাত আমার ঘুম হয়নি। দেখ তো সত্যি কিনা।'

ভক্ত-শিষ্যেরা আমতলায় গিয়ে দেখল চাঁদোয়া টাঙাবার জন্যে ছেলেরা গাছে একটা লোহা পুঁতে রেখেছে। জায়গাটা থেকে রক্তের মত ঝরছে লালচে রস। আর কথা নেই, লোহাটাকে টেনে তুলে ফেলা হল তক্ষুনি। কত নাজানি আরাম পেল আম গাছ।

শুধু পশুপাখির নয় বৃক্ষলতারও খবর নেন ঠাকুর। প্রত্যেকের মধ্যেই প্রাণ, প্রত্যেকেই নিজের গণ্ডিতে নিজের প্রয়োজনে অনুভবময়। ঠাকুর সমস্ত চৈতন্যের অতন্দ্র প্রহরী।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া-মেতাং তরন্তি তে ॥ বস্তু এক মাত্র ভগবানের হাতে, দাতা একমাত্র তিনি। পুরুষকার কৃষিকার্যে কৃষকের কর্মের মত। কৃষক ভূমি প্রস্তুত করে, শস্য বপন করে, এইমাত্র তার কাজ। তার পরে তার আর ক্ষমতা নেই। আকাশ হতে জলবর্ষণ না হলে, শুধু জলসেচন করেও সে কিছু করে উঠতে পারে না। তবু তার প্রাথমিক, তার আন্তরিক উদ্যমটাকে তো চাই। সেইটেই তপস্যা। সেই তপস্যার বলেই জলবর্ষণের মত কৃপাবর্ষণ অবশ্যম্ভাবী।

সমস্ত চেষ্টাই পূজা, সমস্ত উদ্যমই উৎসব। ঠাকুর বললেন, 'দশ মাসের গর্ভবতীর মত ধীরে-ধীরে চন্দন ঘষতে হয়। সেই ঘর্ষণে নিজেকে মিশিয়ে দিতে হয়। চন্দন ঘষাই পূজার্চনা।'

উচ্চ কীর্তনে ঠাকুরের বাহ্যসংজ্ঞা কিঞ্চিৎ ফিরে এল। ওষুধ খাওয়ানো হল। খাওয়ানো হল তেঁতুলের সরবৎ। দু দিনেই প্রভু সুস্থ হয়ে উঠলেন। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব দেখিয়ে ঠাকুর তাঁর নিত্য পূজা-পাঠে নিযুক্ত হলেন।

শিষ্য-ভক্তেরা বুঝে নিয়েছে কেন এই ব্যাধি। যে বাবাজি বিষের নাড়ু দিয়েছিল তাকেও খুঁজে পেয়েছে। খুঁজে পেয়েছে ষড়যন্ত্রীদের। আর কথা নেই, দুর্বৃত্তদের পুলিশে দাও। এত বড় পাপ! প্রভুর প্রাণনাশের চেষ্টা। বিচারে নিশ্চিত দ্বীপান্তর।

সবাইকে নিবৃত্ত করলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোমরা শান্ত হও। আমি জগন্নাথদেবের আশ্রয়ে বাস করছি। তিনি সমস্ত দেখেছেন। ইচ্ছে হলে তিনিই প্রতিবিধান করবেন। ইচ্ছে হলে তিনিই ক্ষমা করবেন। আমার দিক থেকে প্রতিকারের কোনোই প্রার্থনা নেই।'

ঠাকুর একবার বলেছিলেন কুলদানন্দকে, 'ব্রহ্মচারী, প্রার্থনা কোরো না। প্রার্থনা করলেই কিন্তু তা মঞ্জুর হবে। সাবধান। তখন আবার সেই প্রাপ্তির থেকে অশান্তি।'

কুলদানন্দ বললে, 'মঙ্গলময় ঠাকুর, তুমি কিসে কী করো, কী তোমার অভিপ্রায় কিছুই বুঝি না। সর্বত্র তোমার ইচ্ছা, সর্বত্র তোমার হাত, এটি পরিষ্কার দেখলেই নিশ্চিন্ত। এ না হওয়া পর্যন্ত কামনা-বাসনার নিবৃত্তি নেই, অহংকারের উচ্ছেদ নেই, নেই শান্তিলাভের সম্ভাবনা।'

ঠাকুরের শরীররক্ষার জন্যে সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রশ্রয় পেয়ে দুর্বৃত্তরা আবার কী চক্রান্ত করে, কে জানে। কেউ কেউ বললে, ঠাকুরকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে চলো। যেন বাজে লোক ঢুকতে না পায় সব সময়ে কড়া নজর রেখো।

ঠাকুর বিরক্ত হলেন। বললেন, 'তোমরা এত ভাবছ কেন? স্বয়ং জগন্নাথদেব দিনে তিন বার করে আমার খবর নিচ্ছেন। আমার ভয় কী! অন্যস্থানে গেলে কি ত্রাণ পাব? সামান্য একটা কাঁটা ফুটলেও মৃত্যু হতে পারে। আর তাঁর ইচ্ছা না হলে ধরে পাথরে আছড়ালেও কিছু হবে না। তোমাদের কলকাতা যাবার ইচ্ছে হলে তোমরা চলে যাও, আমি আমার লাঠি-গাছ ধরে এখানে পড়ে থাকব। যখন সময় হবে তখন ভগবান ঘরের ছেলেকে ঘরে পাঠিয়ে দেবেন।'

নির্ভয় হও। তবে এটা ঠিক জেনো, নরকেও যদি যাও সেখানেও বুকে করে রাখবার একজন আছেন। ভগবান যখন যে ভাবে রাখেন তাতেই আনন্দ করতে হবে। আমার নিজের যাচাই-বাছাই করবার কিছু নেই। 'কাষ্ঠের

পুত্তলি যেন কুহকে নাচায়'—আমাকে তেমনি করো।

রেবতীমোহন সেন ঢাকা থেকে এসে পৌঁছুল। অপূর্ব কণ্ঠস্বরের অধিকারী রেবতীমোহন। তার কীর্তন শুনলেই ঠাকুরের গভীর আনন্দাবেশ হয়। পুলকরোমাঞ্চে সর্বশরীর সন্দীপিত হয়ে ওঠে। বলেন, ভগবৎ ভজনের জন্যে ভগবানের বিশেষ কৃপায় রেবতী এই অসাধারণ কন্ঠনাদ লাভ করেছে। এই নাদে নিজেই আকৃষ্ট ভগবান।

'ভগবানের কাজ দেখে লোকে এত অভ্যস্ত হয়েছে যে ভগবানকেই ভুলে আছে। ভগবানকে কারু প্রশংসা করার ইচ্ছে হয় না।' বলছেন ঠাকুর, 'রবি ঠাকুর গান করলে লোকে কত প্রশংসা করে, কিন্তু যে এই কন্ঠস্বর দান করেছে সেই ভগবানের কেউ গুণগান করে না। ভগবান কী আশ্চর্য কৌশলে বাকযন্ত্রের সৃষ্টি করেছেন। তোমার মনের যেমন ভাব হবে বাক-যন্ত্রে তেমনি শব্দ হবে। রাগরাগিণীর কোনো রূপ নেই, শুধু মানুষের মনের ভাবমাত্র। সেই ভাব মনে আসামাত্র নানা রাগরাগিণী কন্ঠের শিরায় বাজতে থাকবে। নিরাকার ভাব সাকার হয়ে রাগরাগিনীরূপে পরিণত হচ্ছে। এর প্রশংসা কেউ করে না। কন্ঠের শিরা কয়েকটিমাত্র, তাতে বিচিত্র সুর-প্রকাশ।

রেবতী গান ধরল :

> 'গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর
> হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নীর।
> আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে
> সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।
> বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন
> কবে হাম হেরব সো বৃন্দাবন ॥'

ঠাকুরের শরীর দুর্বল, তবু কী শক্তিতে কে বলবে, অনেকক্ষণ নৃত্য করলেন। বললেন, 'ঐ দেখ জগন্নাথদেব কীর্তন শুনতে এসেছেন। বলছেন যে গাইছে তাকে একজোড়া লুই দাও।'

ব্যবস্থা হল, ঠাকুরকে বেদানার রস খাওয়াতে হবে। কিন্তু তখন কলকাতায়ও বেদানা পাওয়া যাচ্ছে না। তবে উইলসনের হোটেলে এক প্রকার বেদানার রস বিক্রয় হয়, তা দেওয়া যাক। তাতেই উপকার হবে।

ঠাকুর শুনে বিরক্ত হলেন। বললেন, 'সে কী! আমি চিরকাল শাস্ত্র-সদাচারের মহিমা প্রচার করছি আর আমিই এখন সদাচারবহির্ভূত কাজ করব? না, কখনো না।'

কুলদানন্দ বললে, 'কেন আপনি তো আগে উইলসনের হোটেলের পাঁউরুটি খেয়েছেন।'

'দশবছর আগে যা করেছি আমাকে এখনো তাই করতে হবে? দেখছনা কোত্থেকে কোথায় এসে পড়েছি আমি?'

শাস্ত্র-সদাচারের অনুসরণই একমাত্র নিরাপদ। শাস্ত্র ঋষিবাক্য, সদাচার মহাজনদের আচরণ। এ বাক্য ও আচরণের সঙ্গে যা মিলবে তাই নেবে, যা মিলবেনা তা নেবে না। শাস্ত্রপাঠে অবিশ্বাস নষ্ট হয়, আর শাস্ত্রে বিশ্বাস হলেই শুভবুদ্ধির আবির্ভাব। যে ঋষি-মুনিদের বাক্যে মর্যাদা দেয় সে ঋষি-মুনিদের আশীর্বাদ পায়। যে গৃহে রামায়ণ মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত আছে সেখানে সমস্ত তীর্থ বর্তমান। যারা শাস্ত্র মেনে চলে তারা দেবতা, যারা নিজের বুদ্ধিতে চলে তারা অসুর। যদি শাস্ত্র মান্য কর তবে গঙ্গা থেকে চারশো ক্রোশের মধ্যে গঙ্গা বলে যেখানে স্নান করবে সেখানেই পাপমুক্ত হবে আর সেই বিশ্বাসের জোরেই পাবে বিষ্ণুলোক।

'তুমি এখন কিছু দিন শয়ন করলেও তো পারো।' স্নেহে অনুনয় করলেন মুক্তকেশী।

বহু বছর ধরেই ঠাকুর নিদ্রা ত্যাগ করে আছেন। দিনে তো কোনো-দিনই নয়, রাত্রেও বহুদিন ধরে জিতনিদ্র। আসনে স্থির হয়ে বসেই ভগবৎধ্যানে রাত কাটিয়ে দিচ্ছেন, কখনো বা জাগ্রত শিষ্যদের সঙ্গে ধর্মা-লোচনা করে। কিন্তু এখন এই ভগ্নস্বাস্থ্যে এত কঠোরাচরণ করা কি সমীচীন? সেই কথাই বলছিলেন শাশুড়িঠাকরুন।

উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'আমি যেদিন শয়ন করব, যেদিন আসন ত্যাগ করব, সেদিন আমি থাকব না।'

আসন সম্বন্ধে স্থিরতা থাকা দরকার। প্রতিদিন সাধনের সময় একই স্থানে একই আসনে একই দিকে অভিমুখী হয়ে বসবে। এ সবের পরিবর্তন ঘটলে চিত্তস্থৈর্যে বাধা পড়ে। তেমনি প্রতিদিন একই স্তবপাঠ একই সংকীর্তন-গান একই নামজপ বিধেয়। তাতেই চিত্তের স্থিরতা ভাবের গাঢ়তা ও চরিত্রের শক্তি সাধিত হয়।

এক দিন বলে বসলেন: 'মায়ের কথাই বুঝি সত্য হয়!'

কী মায়ের কথা? মনে নেই মা এক দিন বলেছিলেন, বিজয় পুরী গেলে আর ফিরবেনা। সে গানটা গাও তো। দীনবন্ধু হে, দিন যাবে রবে না।

রেবতীই গান ধরল :

দীনবন্ধু হে, দিন যাবে রবে না।
দিন যাবে সুখে না হয় দুখে, রবে কেবল ঘোষণা।
লোকে বলে, তুমি দয়াময় দীনবন্ধু, প্রেমময় প্রেমসিন্ধু
ওহে করুণার সিন্ধু, এক বিন্দু দানে শুকাবেনা।
তুমি বাম করে ধরলে শৈল সে ভার তো তোমার সৈল
ত্রিজগতের ভার সৈল, বুঝি অধমের ভার সৈল না ॥

কে এক নবাগত ভক্তশিষ্য ঠাকুরের পাশে বসে পাখার হাওয়া করছিল। ঠাকুর কুলদানন্দকে ডেকে বললেন, 'ব্রহ্মচারী, যাকে-তাকে বাতাস করতে দাও

কেন? একেবারে উচ্চাধিকার! একে বলে দাও এ যেন কালই দেশে চলে যায়।'

সেবা এক মহৎ সাধনা, গুরুসেবা তো মহত্তম। অনেক নিষ্ঠা, ভক্তি ও একাগ্রতায়ই গুরুসেবার উচ্চাধিকার লাভ হয়। অন্তরে অনুরাগ নেই, বাইরে অনুষ্ঠান—একে সেবা বলে না। অন্তরে ব্যথাবোধের থেকেই আসল সেবা।

'অভিমান কি সহজে যায়?' বলছেন ঠাকুর, 'শুধু পরসেবাতেই অভিমানের নিরসন। সংসারে তোমার চেয়ে যাকে ছোট মনে করবে, আসলে ছোট কেউই নয়, তাকেই সেবা করতে হবে। সেবায় বিরক্ত হলে তা আর সেবা থাকবে না।'

'কেউ শীত চায় আবার শীত পড়লে গরমের জন্যে ব্যাকুল হয়। এক বুড়ি রোদে বড়ি শুকোচ্ছে, হঠাৎ মেঘ করল। বুড়ি প্রার্থনা করতে লাগল, রোদ হোক। পাশেই চাষী ক্ষেত চষছে, তার প্রার্থনা, জল হোক। তা শুনে বুড়ির রাগ। দুজনে লেগে গেল ঝগড়া, রোদে-বৃষ্টিতে ঝগড়া। এর সামঞ্জস্য কোথায়? একমাত্র ভগবানই সকলের সামঞ্জস্য করতে পারেন।' বললেন ঠাকুর, 'তিনিই বৃষ্টি হয়ে জল দেন, শস্য জন্মান, আবার তিনিই রোদ হয়ে বুড়ির বড়ি শুকোন। আবার তিনিই চাষী তিনিই বুড়ি।'

'মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে।
ইহকালে পরকালে মা তারে আনন্দে রাখে ॥
সদানন্দময়ী তারা সদানন্দের মনোহরা
এই মিনতি করি তারা ঐ পদে যেন মতি থাকে ॥'

'স্ত্রীলোকের প্রতি কুদৃষ্টি?' বলছেন ঠাকুর, 'মাটির দিকে তাকাবে। শুধু বলবে, মা, আনন্দময়ী, আমাকে কৃপা করো। মা আনন্দময়ী সকলের মধ্যে, বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা। বিশ্বজননী মা আর গর্ভধারিণী মা সমান। নারীর মধ্যে যদি সেই দৃষ্টিতে একটি নারীকে ভালোবাসতে পারো, প্রণাম করতে পারো, চন্ডীদাস যেমন রজকিনীর মধ্যে করেছিল, তা হলেই সিদ্ধি করায়ত্ত।'

কী বলছে শাস্ত্র? বলছে, সাধ্বী স্ত্রী আদরগৌরবে হর্ষোৎফুল্ল থাকলে সমস্ত বংশের শ্রীবৃদ্ধি। আর স্ত্রীলোকের অবমাননা হলে সে বংশের অপঘাত। যেখানে গভীররাত্রে স্ত্রীলোকের দীর্ঘশ্বাস পড়ে সেস্থান অচিরে শ্মশান হয়ে যায়। নারীই অশেষ মঙ্গলের আস্পদ। গৃহের শোভা, সংসারের লক্ষ্মী, অমরাবতীর প্রদীপটি একমাত্র তার হাতে। যে মূঢ় পুরুষাধম স্ত্রীলোককে অবমাননা করে সতী পার্বতী পদে পদে তার অমঙ্গল করেন।

রাতে হঠাৎ ঠাকুর চেঁচিয়ে উঠলেন : 'ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ রামঃ।'

পরদিন এক শিষ্য জিগগেস করলে, 'ঐ মন্ত্র বললেন কেন?'

'আমার অন্তর্জলী হল।'

'সে আবার কী!' চমকে উঠল সকলে।

'কাল যখন দেখলাম রক্ত আক্রমণ করেছে, তখন গঙ্গার বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের আকাঙ্ক্ষা হল। এই সময় দেখি', বললেন ঠাকুর, 'দেবতারা একখানা হীরামাণিক্যখচিত খাট নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছেন। বললেন, এতে উঠুন। আমি উঠলাম। বললাম, বসে যেতে পারব না, শুয়ে যাব। দেখলাম খাট গঙ্গাতীরে এসে পেঁচেছে। বললাম, আমাকে অন্তর্জলী করুন। দেবতারা খাটশুদ্ধ আমাকে গঙ্গায় নামালেন। আমি উচ্চস্বরে বলতে লাগলাম, ওঁ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ রামঃ। গঙ্গার হাওয়ায় আমার শরীর পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।'

প্রিয়নাথ ঘোষও ভারি মিষ্টি গায়। ঠাকুর বললেন, 'প্রিয়নাথ, দয়া করে একটি গান শোনাও।'

প্রিয়নাথ গাইল :

'দেখলেম যত নারী বসে নীরে, নিয়ে সে কমলিনীরে
নীরে নিবারিছে আঁখিনীরে।
কেহ নিয়ে যায় তুলসী, করে গঙ্গাজল
রাই ম'ল রাই ম'ল বলে করে অন্তর্জল।
কৃষ্ণ লাগি যার অন্তর জ্বলে কাজ কি রে তার অন্তর্জলে
হরি হরি বল সকলে, কালে কি করিবে কিশোরীরে।
কেহ বলে যায় গো ধনী কেহ বলে আয় গো ধনী
কেহ দিচ্ছে হরিধ্বনি, ধনীর ধ্বনি আর কি শুনব ফিরে ॥'

বাজারের সমস্ত দেনা শোধ হয়ে গিয়েছে, বিষও উঠে গিয়েছে শরীর থেকে—সর্বত্র বইতে লাগল প্রসন্নতার হাওয়া।

'দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুণে।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥'

দেবতা, যদি বিশ্বাস হয়, কথা কন। যেমন ইচ্ছে তেমনি করে নেওয়া যায় দেবতাকে। তীর্থে, তীর্থপাণ্ডারাই গুরু। তাদের না মানলে সবই বৃথা। দ্বিজে, গোব্রাহ্মণহিতায় চ। দৈবজ্ঞে, অরুন্ধতী দর্শন ও সুহৃদবাক্যে বিশ্বাস। দীপনির্বাণের গন্ধ না পায় তো মৃত্যু নিকট।

পাণ্ডারা ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

ঠাকুর সরলনাথের সাহায্যে বারান্দায় গেলেন ও পাণ্ডাদের পঁচিশ টাকা দর্শনী দিলেন। বললেন, 'আপনারা আশীর্বাদ করুন আমাকে যে বিষ খাইয়েছিল তার জ্বালার যেন নিবারণ হয়।'

এ যেন সেই প্রহ্লাদের বর চাওয়া—আমার শত্রুপক্ষের মঙ্গল হোক।

এতখানি করুণা আর কার! এতখানি কার আর ভগবৎনির্ভরতা! আকাশঢালা ভালোবাসা!

পাণ্ডারা বললে, 'তাই হোক।'

'আরো আশীর্বাদ করুন যেন জগন্নাথদেবের দাসানুদাস হয়ে থাকতে পারি।'

পাণ্ডারা আশীর্বাদ করলে।

অবিশ্রাম নাম করো। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করো। কে জানে এই হয়তো তোমার অন্তিম শ্বাস। তাই একটি শ্বাসও যেন না বৃথা যায়। নামই শ্রেষ্ঠ মাদক। আর সব নেশা ছুটে যায়, নামের নেশা ছোটে না। নাম করা মাত্রই সমস্ত মহাত্মার দৃষ্টি পড়ে। কোনো ভয় থাকে না। এক হরিনাম ছাড়া সহজ সুখের বস্তু আর কিছু নেই। হরের্নামৈব কেবলম্।

কাম নষ্ট হোক, এ কথা ঠিক নয়। কাম থাক কিন্তু ত্রিগুণাতীত হয়ে। এই কামই উপাসনা, ভজন, যা কিছু। তখনই এর নাম প্রেম। যখন দেখবে প্রেম জাগছে না, জানবে কাউকে তুমি অহংকারে অপমান বা অবজ্ঞা করেছ। ভগবান দর্পহারী, অভক্তের দর্প চূর্ণ করেন।

মধ্যরাতে ঠাকুর সরলনাথকে গান গাইতে বললেন। সরলনাথ গান ধরল :

লম্পট নিরদয়, হরি দয়াময় বলে তোমায় কোন গুণে
ও কেউ চন্দনদানে বসল রাজসিংহাসনে
আমরা প্রাণদানেও স্থান পেলেম না চরণে।
হরি সকলি তোমার কৃপায়
তুমি যারে না রাখ পায়, তার বিপদ ঘটে পায় পায়
আর তুমি যারে রাখ পায়, সে সকলই পায়
লজ্জা পায় হে হরি, তোমার পায় ধরা দিনু প'লে মনে ॥

সমস্ত ধার শোধ হয়ে গিয়েছে, পুরীতে আর থাকা কেন, ভক্তেরা কলকাতায় ফেরবার ব্যবস্থা করে ফেলল।

ঠাকুর বললেন, 'নরেন্দ্রের পার থেকে একটি তুলসী গাছ নিয়ে এস।'

তুলসী গাছ আনা হল। ঠাকুর বললেন, 'নরেন্দ্রের তুলসী গাছ নরেন্দ্রেই যাবে।'

ঠাকুর চলে যাবেন শুনে মালী আর মহাপাত্র দেখা করতে এসেছে। মালীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'মালী, তুমি আমার চিরদিনের মালী, তুমি আমাকে চিরদিন ফুল দেবে।' তাকালেন মহাপাত্রের দিকে : 'সোয়ার, তুমি আমার চিরদিনের সোয়ার। তুমি আমাকে চিরদিন মহাপ্রসাদ দেবে।'

এ সবের মানে কী? মুক্তকেশীর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল।

দুই শিষ্য তর্কাতর্কি করতে গিয়ে ক্রুদ্ধ কলহ করে বসেছে। ঝগড়ার সুরটা অস্পষ্ট হলেও ঠাকুরের কানে এসে লেগেছে। তিনি ডাকালেন শিষ্যদের। কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'আমাকে তোমরা ক্ষমা করো।'

দু জনেই বিমূঢ়। আপনি কী করেছেন, আপনাকে ক্ষমা করার কথা ওঠে কী করে।

ঠাকুর বললেন, 'জগন্নাথদেবের প্রকাশ হয়েছিল। আমাকে বললেন, ওদের কাছে তুমি ক্ষমা চাও।'

'সে কী কথা? আপনাকে ক্ষমা করব কী করে?' দুজনেই বিহ্বলব্যাকুল।

'তোমরা পরস্পরকে ক্ষমা করলেই আমাকে ক্ষমা করা হয়ে গেল।'

সবাই বুঝলে ক্ষমার তাৎপর্য। দুই তার্কিক তখন প্রসন্নমুখে আলিঙ্গনাবদ্ধ হল।

বাইশে জ্যৈষ্ঠ, তেরোশ ছয় সাল। সমস্ত দিনই ঠাকুর সমাধিস্থ রইলেন। ভক্তের দল কীর্তন সুরু করল : হরি হরয়ে নমঃ। কিন্তু সমাধি ভাঙে কই?

রাত্রি প্রায় আটটায় ঠাকুরের দিব্যজ্ঞান হল। ব্রহ্মচারীকে ওষুধ দিতে বললেন। জগদ্বন্ধুকে বললেন, 'আমার কাছে থেকো।'

সরলনাথকে ধরে গেলেন স্নানঘরে। ফিরে এসে, এ কী, আসনে বসলেন না, বসলেন নিত্য পূজার তুলসীমূলে। যেদিন আসন ছাড়ব সেদিন আমি থাকব না—এ কী, ঠাকুর যে আজ আসনছাড়া। তবে কি ঠাকুর আর থাকবেন না মরদেহে? এই তো সেদিন বললেন, তাঁর পথ্য, গাঁদালের ঝোল, জগন্নাথদেব এসে খেয়ে ফেলেছেন—বললেন, 'এমনিভাবে তিনি আশ্বস্ত না করলে দয়া না করলে কি বাঁচি? তাঁর অপার করুণা!' সেই করুণার ধারা কি আজ শুকিয়ে যাবে?

বারে বারে জিগগেস করছেন, কটা বেজেছে? এখন রাত কত?

জগদ্বন্ধু জিগগেস করলে : 'কেমন আছেন?'

'ভালো আছি।' ঠাকুর বললেন, 'শুধু মাথাটা ধরে আছে।'

'আপনার চা খাবার অভ্যেস,' জগদ্বন্ধু মিনতিমাখানো স্বরে বললে, 'সমস্ত দিন তো খাননি, একটু চা খাবেন?'

জগবন্ধুর বুঝি অন্তরতম ইচ্ছে ঠাকুরকে নিজের হাতে খাওয়ায়। তার সে ইচ্ছা পূর্ণ করলেন ঠাকুর। বললেন, 'তাই একটু দাও।'

মাটিতে বালিশে হেলান দিয়ে বসে চায়ের বাটিতে দুবার চুমুক দিলেন ঠাকুর। পরে কাকে প্রকাশিত দেখে ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করলেন। নতমস্তকে প্রণাম করলেন সেই প্রকাশমূর্তিকে। সেই প্রণামের মধ্য দিয়েই নিত্যধামে মহাপ্রয়াণ করলেন।

রেবতী নক্ষত্রে কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে রাত ন-টা বেজে কুড়ি মিনিটে নীলাচলে তাঁর অন্তর্ধান হল।

> 'বৃন্দাবিপিনে মঙ্গল আরতি হের রে নয়ন আনন্দে
> মঙ্গল আরতি হতেছে নাচিছে সখীবৃন্দে
> কুঞ্জ কুঞ্জ হইতে ধাইছে সবে হেরিতে শ্রীগোবিন্দে ॥'

ভক্ত-শিষ্যের দল বিচ্ছেদব্যথায় হাহাকার করে উঠল। কিন্তু শোক কেন, শোক কোথায়? তিনি তো ভক্তদের জীবনেই অনুস্যূত হয়ে রইলেন। তিরোধানের আগের দিন বলে দিলেন, 'আজ থেকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তোমাদের

সকলের ভার গ্রহণ করলেন।' তার অর্থ আর কী! অর্থ, ঠাকুর আ
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব অভেদ। অর্থ, ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবেই বিলীন হলেন।

কীর্তনশেষে ঠাকুর যেমন জয় দিতেন তেমনি জয় দাও সকলে।

শ্রীবৃন্দাবনকি জয়। গোপেশ্বর মহাদেব কি জয়। গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনকি জয়। কেশীঘাটকি জয়। দ্বাদশআদিত্য টীলাকি জয়। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডকি জয়। গিরিগোবর্ধনকি জয়। বিশ্রামঘাটকি জয়। কেশবজিকি জয়। বৃন্দাবনবাসী সাধুভক্ত বৈষ্ণববৃন্দকি জয়।

নরেন্দ্রসরোবরের উত্তর দিকে ইঙ্গিত করে ঠাকুর একবার বলেছিলেন : ওপারে একটি স্বর্ণচূড়াবিশিষ্ট মন্দির দেখা যাচ্ছে। সেই ভবিষ্যৎ-বাণীই বাস্তবে রূপায়িত হল। নরেন্দ্র সরোবরের উত্তরেই ঠাকুরকে সমাধিস্থ করা হল। কালক্রমে নির্মিত হল স্বর্ণচূড় মহামন্দির, লোকমুখে নাম হল জটিয়া বাবার সমাধি-মঠ। তাতে প্রতিষ্ঠিত হল নাম-ব্রহ্ম।

'তোরা কে নিবি লুট নিত্যইচাঁদের প্রেমের বাজারে,
হাটের রাজা নিত্যানন্দ, পাত্র হলেন শ্রীচৈতন্য,
মুন্সিগিরি দিলেন অদ্বৈতেরে।
হরিদাস খাজাঞ্চি হয়ে লুট বিলালেন নগরে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাঁরাও ভাবেন নিরন্তর
ধ্যান করিয়ে না পেলেন যাঁহারে।
নারদমুনি মগ্ন হয়ে বীণাযন্ত্রে গান করে।
হরি বোল বলে রে ॥'

আশাবতী বললে, আমাকে কিছু-কিছু সদুপায় উপদেশ করুন, যাতে যোগীদের নিত্যানন্দধাম দর্শন করে কৃতার্থ হতে পারি।

যোগীবর বললেন, করুণাময় পরমেশ্বর মানুষের প্রতি দয়া করে তাঁকে লাভ করবার সহজ উপায় করে দিয়েছেন। মানুষ কুসঙ্গে কুঅভ্যাসে তার পবিত্র স্বভাব নষ্ট করে ফেলে। সেই কারণে পুনর্বার সেই স্বভাব ফিরে পাবার জন্যে সাধনের প্রয়োজন হয়। তারই নাম প্রায়শ্চিত্ত, অর্থাৎ পুনর্বার পূর্বাবস্থা ফিরে পাওয়া। এই শরীর আমাদের বাসগৃহ, এ একদিন নষ্ট হবে, তবু, দেখ দয়াময় প্রভু এই ক্ষণভঙ্গুর দেহকে রক্ষা করবার জন্যে কত শত উপায় করেছেন। মার বুকে স্নেহ দিয়েছেন স্তন্য দিয়েছেন, দিয়েছেন জল বায়ু আগুন শস্য খাদ্য ফল-মূল—যা কিছু শরীর রক্ষার উপযোগী তাই সহজলভ্য করে দিয়েছেন। এই শরীরের চেয়ে আবার আত্মা শ্রেষ্ঠ, আর আত্মাই শাশ্বত। আত্মার প্রয়োজনীয় বস্তুকেও দয়াময় প্রভু দুষ্প্রাপ্য করেন নি। শরীরের পক্ষে যেমন মাতার স্তনদুগ্ধ, তেমনি আত্মার পক্ষে প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রেমরস। শিশু সন্তান খিদেয় কাতর হয়ে কান্না জুড়লেই জননী সন্তানের মুখে স্তনদান করেন, তেমনি আত্মা খিদেয় কাতর হয়ে কান্না জুড়লেই বিশ্বজননী তার মুখে অমৃতরস ঢেলে দেন। ঈশ্বরের

ন্য প্রবল ক্ষুধা বা অনুরাগ হলে অনায়াসে যোগলাভ করা যায়। সংসারাসক্তিতে এই ধর্ম ক্ষুধা নষ্ট হয়েছে। এর জন্যেই যোগ-সাধনের প্রয়োজন। শারীরিক খিদে নষ্ট হলে যেমন মন্দাগ্নির ওষুধ খেতে হয় তেমনি আত্মার অনুরাগ-ক্ষুধার মান্দ্যভাব দেখলেই তার চিকিৎসা সাধনভজন করা দরকার।

কিন্তু আমি অসহায়, আমি কী করব? কী করে আমার অনুরাগ আসবে? আশাবতী আকুল হয়ে জিগগেস করল।

তুমি পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করো। বললেন যোগীবর।

পরোপকার-ব্রতে যে টাকা চাই। আমি টাকা কোথায় পাব?

না মা, টাকা না থাকলেও পরোপকার-ব্রত সাধন করা যায়। শুধু শরীর দিয়ে পরসেবা করা যায়। যদি শরীরও অক্ষম হয় তবে দুটো মিষ্টি কথা বলে, বিপদে সুপরামর্শ দিয়ে লোকের হিতসাধন করা যায়। সেবাব্রত পালন না করলে হাজার সাধন ভজন কর কিছুতেই পরব্রহ্মের চরণলাভে সমর্থ হবে না।

আমার যে ভয়ংকর স্বার্থপরতা। বললে আশাবতী, আমার সংসারে কেউ নেই, তবু কোনো কিছু যখন পরিবেশন করি, তখন পরিচিতদের ভালো দেখে বেশি-বেশি করে দি, অন্য লোককে যেমন-তেমন করে দিয়ে দায় সারি। সবচেয়ে ভালো জিনিসটি নিজে নিই, মন্দটা পরের জন্যে তুলে রাখি। একবার জগন্নাথে দিয়েছিলাম, পথে অনেক চটি আছে, চটির মধ্যে যেটি ভালো ঘর সেটি আমি নিতাম, ঘুসটুস দরকার হলে তাও দিতাম, আর সকলে যে যেখানে পারুক মরুক গে। লোকে কষ্ট পাচ্ছে তা অনায়াসে দেখতাম। কারো ভালো দেখতে পারি না। অন্যের ভালো দেখলে কষ্ট হয়। এমন স্বার্থপরতায় ভরা মন নিয়ে কী করে পরসেবা করতে সক্ষম হব? আমার কিছু নেই, তবু এই—যাদের স্বামী-পুত্র টাকা-কড়ি আছে তাদের স্বার্থপরতা না-জানি আরো কত বেশি।

যোগীবর বললেন, মা আশাবতী, সন্দেহ নেই স্বার্থপরতাই সকল পাপের মূল। সামান্য ওষুধে এ রোগের নিবারণ নেই। সংসার অসার অনিত্য, সর্বদা এই চিন্তা ও আলোচনা করতে করতে আর সাধুসঙ্গ করতে করতে যখন সত্যি-সত্যি সংসারের তাবৎ পদার্থকে অসার বলে উপলব্ধি করতে পারবে তখনই স্বার্থপরতা চলে গিয়ে দেখা দেবে জীবন্ত বৈরাগ্য। সাধকমাত্রেরই প্রথমে এই বৈরাগ্য অবলম্বনীয়। ভস্মমাখা বা কৌপীন পরা বৈরাগ্য নয়, স্বার্থনাশই আসল বৈরাগ্য। যেমন মনে মনে পরপুরুষ কামনা করলে সতীত্ব নষ্ট হয় তেমনি মনে মনে অধর্ম আলোচনা করলে চরিত্র কলঙ্কিত হয়। কলঙ্কিত মনে ধর্মসাধন হয় না। চরিত্র শুদ্ধ রেখে বৈরাগ্য অবলম্বন করে প্রস্তুত থাকো। তোমার গুরুকরণ হবে। পরব্রহ্মে সংযুক্ত হয়ে কৃতার্থ হবে।

'সংসারে থেকে ধর্ম হয়, চিরকাল হয়েছে, এখনো হচ্ছে।' বলছেন

গোঁসাইজি, 'এই শরীরই সংসার। এই সংসারে যদি তাঁকে রাজা করতে পারি, তবেই তো সুখ। সংসারে যদি তাঁর সম্মান না দেখি তবে সুখ সৌন্দর্য কোথায়? অযোধ্যা রামবিহনে শ্মশান হয়েছিল, সংসারও তাঁকে ছাড়া শ্মশান, নইলে প্রভুর গৌরব কী? প্রভুকে ফেলে নিজে সিংহাসনে বসলাম, আমার স্বার্থ আমার সুখই শ্রেষ্ঠ হল—তবে এ তো পৃথিবীর রাজত্ব, তাঁর রাজত্ব নয়। যেখানে তাঁর রাজত্ব সেখানেই স্বার্থত্যাগ। সংসার কী? পরমেশ্বরে যে বহির্মুখিতা, তাই সংসার। টাকাকড়ি স্ত্রীপুত্র সংসার নয়, পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করে স্বার্থের পূজা, তাঁর অনাদর, এই সংসার। এই সংসার আমিই সৃষ্টি করি। যদি আমার মনে সত্যিকার ইচ্ছা জাগে, যদি প্রভুকে রাজা করে হৃদয়-সিংহাসনে বসাতে পারি, কারো সাধ্য নেই আমাকে অতিক্রম করতে পারে, পরাজিত করতে পারে। আমার প্রভু পরমেশ্বর আমার সংসারের রাজা এ দেখতে পেলেই আমার জীবন সফল। আমাদের সংসার ধর্মের সংসার হোক, পরিবারে পরিবারে তাঁর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হোক। জয় প্রভু জয় রাজা জয় মহারাজা!'

আরো বলছেন : 'যন্ত্রণাভোগ ছাড়া জীবন প্রস্তুত হয় না, দুরন্ত রিপু বশীভূত হয়না, বন্ধু হয়ে ওঠে না। এ যন্ত্রণা অগ্নিপরীক্ষা, যত পোড় খাবে তত বিশুদ্ধ হবে। যন্ত্রণার সময়ও একমাত্র ভগবানের নামই ভরসা। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করবে, কখনো নাম পরিত্যাগ করবে না। নাম ছাড়া সুস্থ হবার উপায় নেই। জ্বলন্ত দাবানলের মধ্য দিয়েই পথ জানবে। কত জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পাপ, তাকে দগ্ধ করতে অনেক অগ্নির দরকার। এই যন্ত্রণাই তাই যথার্থ মুক্তির হেতু। প্রথমে যন্ত্রণায় শুকিয়ে নীরস হবে। বিষয়রস একবিন্দু থাকতে ব্রহ্মানন্দ আসেনা।'

'প্রভু, আমার পরীক্ষা আসুক, আমি পরীক্ষা চাই। আমি কেবল বলব হরিবোল, হরিবোল। প্রভু, আমার থেকে সব কেড়ে নাও, আমাকে শ্মশানে নিয়ে যাও, আমাকে কটাহে ফেল, আমার অস্থিমাংস ভস্ম হয়ে যাক, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হরিবোল, হরিবোল বলব। কে আমার এমন বন্ধু আছেন, আমাকে শ্মশানে পুড়িয়ে খাঁটি করে তুলুন। দগ্ধ হয়ে প্রাণ খাঁটি হলেই তো পরমেশ্বরকে খাঁটি হয়ে সেবা করতে পারব।'

'দীনবন্ধু, কৃপা করো। এই যে তুমি সম্মুখে বর্তমান, এই বলে একবার তাঁকে প্রণাম করতে পারলেই যথেষ্ট। এই করো প্রভু, যেন তোমাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখে একটি প্রণাম করতে পারি। এই যেন জপ হয়, প্রভু, সুখে-দুঃখে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

'যেমন শোণিত আমার সর্বশরীরে প্রবহমান, তেমনি ধর্ম যদি আমার সমস্ত হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার না করে তা হলে শুধু পোশাকী-ভাবে অন্বেষণ করে কি শান্তি পাওয়া যায়? লোককে দেখাবার জন্যে, লোকের কাছে সাধু-ভক্ত বলে প্রশংসা নেবার জন্যে যা করি তাতে কি ধর্ম

হয়? প্রাণের মধ্যে অন্ধকারে বসে যেন চিন্তা করে দেখি আমার প্রার্থনা কি কবি-কল্পনা, না, সত্য? চাই কী? কী অন্বেষণ করি? এই মুহূর্তেই যদি মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তবে কি বলি, সংসারের কোনো কিছু চাই না, শুধু ঈশ্বরকেই চাই? পরমেশ্বরই সত্য, এ কথা প্রত্যেক কথায় প্রত্যেক ভাবে শরীরে মনে সর্বাঙ্গে সমস্ত জীবনে বলবে। নইলে হস্তপদ স্তব্ধ হোক, জিহ্বা নীরব হোক, পরমেশ্বরের নাম যেন বৃথা উচ্চারণ না করি। যে নামে পাতকীর উদ্ধার হয় সেই নাম যেন সত্যভাবে উচ্চারণ করতে পারি। রসনা যেন সত্যভাবে তাঁকে ডাকতে পারে এই প্রাণের প্রার্থনা।'

'সেই দিন নৌকো করে ঢাকায় আসতে আসতে দেখলাম তিনটি স্ত্রীলোক বুড়িগঙ্গার পারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, বাবা গো, পার করো গো। তাদের বাপ অন্য পারে ছিল, তারা ঢাকার পারে দাঁড়িয়ে ওপারে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ডাকছে, বাবা গো পার করো গো। এই শব্দ অনেকবার শুনেছি, কিন্তু সেদিন যেমন শুনলাম তেমনটি আর কখনো শুনিনি। ভাবলাম এই তো প্রকৃত অবস্থা। যদি ভবসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে এমনি ব্যাকুল হয়ে প্রাণের সঙ্গে 'পার করো' বলে একবার ডাকতে পারি তা হলে কি আর পারে যেতে বিলম্ব হবে? স্ত্রীলোক তিনটি জানে বাপ শুনতে পেলেই তাদের এসে নিয়ে যাবে। আমরা ওদের মত অমন প্রাণপণে ডাকতে পারছি কই? আমার প্রাণের বস্তু কই? এখনো মোহ আমাকে ভোলায়, প্রলোভন আমকে বিচলিত করে, এখানো সেই পারের কর্তাকে সর্বসার বলে বুঝতে পারিনি। যদি বুঝতাম তাহলে তাঁকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারতাম না। আমি তো কত সময় তাঁকে ছেড়ে সংসারের বস্তু নিয়ে থাকি। তবে কেমন করে তাঁকে সারাৎসার বলি? যদি বুঝতাম তিনিই আমার গতি, তিনিই আমার মা-বাপ, তাহলে ঠিক বলতাম, বাবা গো পার করো গো। আমি খেতে শুতে পারতাম না। কত দিন কত সময় তাঁকে পাই না, কিন্তু আমোদ-আহ্লাদ করি, প্রাণের প্রাণ হারিয়ে আমি কি পারতাম আমোদ করতে, নিশ্চিন্ত থাকতে? কবে বুঝতে পারব, কবে বলতে পারব প্রাণের সঙ্গে, বাবা গো পার করো গো।'

'আমার এই বাসনা করহে পূরণ
ওহে অনাথনাথ অধমতারণ।
যেদিকে ফিরাই আঁখি সেদিকে তোমাকে দেখি
হৃদয়মন্দিরে সদা দাও দরশন।
না চাহি বিষয়সুখ চাহি তব প্রেমমুখ
তাহলে যাইবে দুঃখ আনন্দে হব মগন॥'

সমাপ্ত